বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ

[পঞ্চম খণ্ড]

সম্পাদক

শ্রীগোপাল হালদার

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত

বইপত্র ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীবিকাশ ঘোষ
বইপত্র
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীঅভয় সাহা মণ্ডল
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
কুইক বাইণ্ডার্স
৩৮।১এ বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

Vivekananda Rachana Samagraha
the Works of Swami Vivekananda
Volume V

নিবেদন

প্রকাশনা ক্ষেত্রে গত একমাসে ব্যয়বৃদ্ধির নজীর সম্প্রতিকালে মেলে না। কাগজ শুধু দুর্মূল্য নয়, দুর্লভও বটে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ও বেড়েছে। এর কি কোন প্রতিকার আছে? জানি না।

বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ-এর আর মূল্যবৃদ্ধি না করা সম্পর্কে আমরা কৃতসংকল্প। এই সংগ্রহ প্রকাশে আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে গ্রাহকদের সহযোগিতার ওপর। আমাদের নিত্যকর্মের একটি হল, গ্রাহকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশিত খণ্ড সংগ্রহের অনুরোধ জানানো। প্রকাশনা ক্ষেত্রের সংকট মোচনে গ্রাহক তথা পাঠককুলকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে—তাঁদের দিনযাপনের বহুবিধ অসুবিধার মধ্যেই।

বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহের এই খণ্ডে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ছাড়াও থাকছে অনেকগুলি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। দীর্ঘদিন প্রবাস জীবনযাপনের পর দেশে ফেরার পথে কলম্বোয় তিনি প্রাচ্যদেশে প্রথম বক্তৃতা দেন। কলকাতার নাগরিকরা বিশেষত তরুণ সমাজ তাঁকে বিজয়ী বীরের সংবর্ধনা জানান। কলকাতায় তাঁর দুটি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ একই সঙ্গে প্রকাশিত হল সংবর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত মূল ইংরাজী বক্তৃতাসহ।

এই খণ্ডে অনুবাদ কর্মে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ, সুকুমার গুপ্ত, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, অহীন্দ্র মিত্র, অমিতাভ সেনগুপ্ত ও রাণা চট্টোপাধ্যায়। ডক্টর রবীন্দ্র গুপ্ত শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে পাণ্ডুলিপিগুলি দেখে দিয়েছেন। এঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পূজার আগে ছাপাখানার ব্যস্ততার মধ্যেও কর্মীদের সহযোগিতায় এই খণ্ড প্রকাশ সম্ভব হল। তাঁদেরও আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশক-পক্ষে
বিকাশ ঘোষ

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রবন্ধ

রাজযোগ সংক্রান্ত ছটি অনুশীলনী

রাজযোগ পৃথিবীর যে কোন বিজ্ঞানের মতই একটি বিজ্ঞান। এটি হল মনের বিশ্লেষণ, অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্য সমন্বয় এবং সে কারণে অধ্যাত্মজগতের নির্মিতি। পৃথিবীতে যে সব অধ্যাত্মগুরুদের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা সকলেই বলেছেন "আমি দেখেছি, আমি জেনেছি।" যীশু, পল এবং পিটার—যেসব আধ্যাত্মিক সত্য শিক্ষা দিয়েছেন তার সবকটিই তাঁরা প্রকৃত উপলব্ধি করেছেন বলে দাবি করেন।

যোগের মাধ্যমে এই উপলব্ধি হয়। স্মৃতি অথবা চেতনা কোনটিই অস্তিত্বকে সীমায়িত করতে পারে না। একটা অতি-চৈতন্য অবস্থা আছে। এই আমি চৈতন্য ও অচেতন অবস্থা উভয়ই অনুভূতির বাইরে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, সে পার্থক্য জ্ঞান ও অজ্ঞানের। যোগকে দেখা উচিত বিজ্ঞান হিসাবে, যুক্তির প্রতি আবেদন হিসাবে।

মনঃসংযোগই হল সমস্ত প্রকার জ্ঞানলাভের মূল উৎস। জড়ের উপর আমাদের আধিপত্য থাকা উচিত, যোগ আমাদের সেই আধিপত্য বিস্তারের শিক্ষা দেয়। যোগের অর্থ 'সংযোজন' অর্থাৎ ঈশ্বরের পরম সত্তার সঙ্গে মানব আত্মার সংযোজন। মন চৈতন্যের অধীন, চৈতন্যেরই ক্রিয়া। আমরা যাকে চৈতন্য বলি তা হল সেই অসীম গ্রন্থি, যা নাকি মনুষ্য-প্রকৃতি, তারই একটি সূত্রবিশেষ।

আমাদের 'আমিত্ব' ক্ষুদ্র চৈতন্য এবং এক বিশাল অচৈতন্যের সংমিশ্রণ। কিন্তু এ সমস্তের উর্ধ্বে, প্রায় অপরিচিতির অন্ধকারে রয়েছে অতি-চৈতন্য লোক।

একাগ্র অনুশীলনের মাধ্যমে মনের এক একটি স্তর আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়, এবং প্রতিটি স্তর আমাদের কাছে কিছু নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করে। মনে হয় যেন আমাদের চোখের সামনে নতুন জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, আমরা নতুন বলে বলীয়ান হচ্ছি। কিন্তু চলার পথে আমাদের থামলে চলবে না কিংবা কাঁচের টুকরোর দ্যুতিতে চোখ ধাঁধানো চলবে না, কারণ হীরের খনি আমাদের সামনেই রয়েছে।

ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ঈশ্বরোপলব্ধি না হলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য।

সফলতাকামী শিক্ষার্থীর তিনটি বস্তুর প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, ইহজগতের ও পরজগতের সমস্ত প্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বর ও সত্যের চিন্তা করতে হবে। সত্যোপলব্ধির জন্যই আমাদের জন্ম, ভোগের জন্য নয়। ভোগানন্দ পশুদের জন্য, আমরা ঐ ধরনের ভোগ করতে পারি না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী, এবং মৃত্যুঞ্জয়ী না হওয়া পর্যন্ত, সত্যের আলো না দেখা পর্যন্ত, তাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। নিষ্ফলা, অর্থহীন কথা বলে তার শক্তিক্ষয় করা চলবে না। সমাজ ও প্রচলিত মতবাদের পূজা করার অর্থ পৌত্তলিকতা। আত্মার কোন লিঙ্গ নেই, কোন দেশ, স্থান, কালের অধীন সে নয়।

দ্বিতীয়তঃ, সত্য এবং ঈশ্বরকে জানার তীব্র আকুতি। এ দুয়ের জন্য আকুল হতে হবে, ডুবন্ত মানুষ যেমন শ্বাস নেবার জন্য ব্যাকুল হয়, তেমনি ব্যাকুলতা চাই।

শুধু ঈশ্বরকে কামনা করতে হবে, বাকি সবকিছু বর্জনীয়। বস্তুর 'প্রতীয়মান রূপ' যেন প্রবঞ্চনা না করে। সবকিছু পরিত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, ছটি অনুশীলন : প্রথম—মনকে বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়া। দ্বিতীয়—ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখা। তৃতীয়—মনকে অন্তর্মুখী করা। চতুর্থ—নীরবে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করা। পঞ্চম—একটি মাত্র ভাবে মনোনিবেশ করা, বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে, কখনই পরিত্যাগ করা চলবে না। সময়ের হিসাব করবে না। ষষ্ঠ—কুসংস্কার মুক্ত হয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপের কথা সর্বদা ভাবতে হবে. হীনাহংমন্যতার গ্লানিকবলিত হওয়া চলবে না। নিজের প্রকৃত স্বরূপের কথা দিবারাত্রি স্মরণে রাখতে হবে যতক্ষণ নিজের সঙ্গে ঈশ্বরের একত্বের প্রকৃত উপলব্ধি না হচ্ছে।

এইসব কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া কোন ফল লাভ হয় না। পরব্রহ্মকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারি না। যে মুহূর্তে তাঁর ব্যাখ্যা দিতে যাই, সে মুহূর্তে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন, পরমেশ্বর থাকেন না।

ইন্দ্রিয়ের এমন কি যুক্তিরও সীমা আমাদের অতিক্রম করতে হবে এবং এই অতিক্রমণের ক্ষমতা আমাদের আছে। [এক সপ্তাহে প্রাণায়ামের প্রথম অনুশীলন শেষ করে ছাত্র শিক্ষককে জানাবে।]

প্রথম অনুশীলনী

এই অনুশীলনীর উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তিত্বেরই অনুশীলন প্রয়োজন। প্রত্যেকেই একটি কেন্দ্রে মিলিত হবে। "কল্পনাই প্রেরণার প্রবেশপথ এবং সমস্ত ভাবনার ভিত্তি।" সমস্ত যোগী, কবি ও আবিষ্কারকরা বিরাট কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রকৃতির ব্যাখ্যা মানুষের মধ্যেই মেলে; পাথরের টুকরো ছিটকে বাইরে পড়ছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ নিহিত রয়েছে আমাদেরই মধ্যে, বহির্জগতে নয়। যারা অতিভোজী, যারা উপবাসী, যারা অতিরিক্ত নিদ্রাবিলাসী অথবা যারা কম ঘুমায় তারা কখনও যোগী হতে পারে না। অজ্ঞতা, অস্থিরতা, হিংসা, আলস্য এবং অতিরিক্ত আসক্তি, যোগাভ্যাসে সাফল্য লাভের পথে বিরাট অন্তরায়। তিনটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হল :

প্রথম—মানসিক ও শারীরিক বিশুদ্ধতা। সমস্ত রকমের অপরিচ্ছন্নতা যা মনকে নিম্নগামী করে, সেগুলি সবই অবশ্য বর্জনীয়।

দ্বিতীয়—ধৈর্য্য : প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু চিত্তাকর্ষক অনুভূতি (wonderful manifestations) হলেও সেগুলি সবই অপসৃত হবে। সবচেয়ে কঠিন সময় এইটি, কিন্তু এসময়েই দৃঢ়চেতা হতে হবে। ধৈর্য থাকলে শেষ পর্যন্ত সুফল মিলবেই।

তৃতীয়—অধ্যবসায় : স্বজন পরিবৃত হয়ে, সুস্থতা অথবা অসুস্থতার মধ্যে, নিষ্ঠাসহকারে অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে, একদিনও নষ্ট করা চলবে না।

অভ্যাসের উৎকৃষ্ট সময় হল ব্রাহ্মমুহূর্ত, এই সন্ধিলগ্নে আমাদের দেহতরঙ্গ সবচেয়ে শান্ত থাকে। দুটি পর্যায়ের মধ্যে তখন শূন্য বিন্দু বিরাজমান। যদি ব্রাহ্মমুহূর্তে করা সম্ভব না হয় তাহলে শয্যাত্যাগের পর এবং শয্যাগ্রহণের আগে অভ্যাস করা উচিত। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজন—প্রত্যহ স্নান করতে হবে।

স্নানের পর স্থির হয়ে বসো, মনে ভাবো যেন শিলাখণ্ডের মত অনড়ভাবে তুমি বসে আছ। মাথা, দুই কাঁধ এবং নিতম্বদ্বয়কে সমান্তরাল রাখো, মেরুদণ্ডকে সহজ রাখতে হবে। সমস্ত ক্রিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে হয় এবং একে দুর্বল করা চলবে না।

পায়ের আঙুল থেকে শুরু কর এবং দেহের প্রতিটি অংশকে পবিত্র মনে কর; মনে মনে সেইভাবে চিন্তা কর, যদি চাও তাহলে প্রতিটি অঙ্গকে সেইভাবে ভাবতে পারো। ধীরে ধীরে উর্ধ্বাঙ্গের দিকে মনঃসংযোগ কর, যতক্ষণ না মস্তিষ্কভাগে মনোনিবেশ করতে পারছো। প্রতিটি অঙ্গকে বিশুদ্ধ, সম্পূর্ণ ভাবতে হবে। তারপর সমস্ত দেহকে পবিত্র চিন্তা করতে হবে। সত্যোপলব্ধির জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত একটি যন্ত্র হিসাবে দেহকে কল্পনা করতে হবে। একে এক তরণী হিসাবে কল্পনা করতে হবে যাতে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চিরন্তন সত্যের তীরে উপনীত হওয়া যায়। এইসব চিন্তা সমাপ্ত হলে দুটি নাসারন্ধ্র দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিতে হবে এবং আবার ছাড়তে হবে। তারপর যতক্ষণ সহজভাবে পারা যায় ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকো। এরকম চারবার শ্বাসগ্রহণ কর, তারপর স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নাও এবং আনোদয়ের জন্য প্রার্থনা করো। "যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর গৌরব দ্যুতিকে স্মরণ করি; তিনি আমার অন্তরলোক উদ্ভাসিত করুন।" আসনস্থ হয়ে দশ থেকে পনের মিনিট এই ধ্যান করো।

গুরু ছাড়া অন্য কাউকে তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলবে না। যতটা সম্ভব স্বল্পভাষী হবে।

পবিত্র চিন্তায় মনঃসংযোগ করবে; আমরা যেরকম চিন্তা করি সেরকম হবার প্রবণতা আমাদের মধ্যে থাকে।

পুণ্য চিন্তা সমস্ত মানসিক অপবিত্রতা বিনষ্ট করে। যারা যোগী নয় তারা দাস। নিজেদের মুক্ত করার জন্য একের পর এক বাঁধন ছিঁড়তেই হবে।

পরমার্থ সত্যের সন্ধান সবাই পেতে পারে। ঈশ্বর যদি সত্য হন তাহলে সত্য রূপে আমরা তাঁকে অবশ্যই উপলব্ধি করব। যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে নিশ্চয় আমরা সে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবো, উপলব্ধি করবো।

একমাত্র দেহাতিশায়ী হতে পারলেই আত্মার দর্শন মেলে।

যোগীরা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মূলত দুভাগে ভাগ করে থাকেন: অনুভূতির অঙ্গ এবং গতি অথবা জ্ঞান ও কর্মের অঙ্গ।

আভ্যন্তরীণ অঙ্গ অথবা মনের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম: মনস্—ধ্যান অথবা চিন্তাশক্তি। সাধারণতঃ এই শক্তির সম্পূর্ণ অপচয় হয়ে থাকে, কারণ একে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না। সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এটি বিস্ময়কর শক্তিতে পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয়: বুদ্ধি—ইচ্ছাশক্তি (কখনও কখনও একে বোধশক্তিও বলা হয়)। তৃতীয়: অহঙ্কার—আত্মসচেতন অহংবোধ। চতুর্থ: চিত্ত—সেই পদার্থসার যাতে এবং যার

মাধ্যমে সমস্ত শক্তি কাজ করে থাকে, মনের মেঝেও বলা যায় ; অথবা চিত্ত হল সমুদ্র এবং বিভিন্ন শক্তিগুলি হল তার তরঙ্গরাশি।

যোগ হল সেই বিজ্ঞান যার দ্বারা আমরা চিত্তকে বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া বন্ধ করতে পারি। সমুদ্রে চাঁদের ছায়া যেমন ঢেউয়ের ওঠা পড়ায় কখনও অস্পষ্ট, কখনও খণ্ডিত হয়, তেমনি আত্মন্ বা প্রকৃত সত্তার প্রতিবিম্ব মনের তরঙ্গভঙ্গে খণ্ডিত হয়ে থাকে। সমুদ্র যখন আয়নার মত স্থির তখনই চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। একইভাবে 'মন বস্তুটিকে' অথবা চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে সম্পূর্ণ শান্ত করলে, আত্মোপলব্ধি হয়।

মন দেহ নয়, যদিও এটি পদার্থেরই একটি সূক্ষ্মতর রূপ। দেহের সঙ্গে মন চিরকালীন বাঁধনে বাঁধা নয়। মাঝে মাঝে যখন আমাদের এই বন্ধন শিথিল হয়ে আসে তখনই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে আমরা ইচ্ছামত মনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি।

যখন একাজ আমরা সম্পূর্ণভাবে করতে পারবো, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যা আমাদের সামনে ধরে দেয় তাকেই আমরা জগৎ বলি।

মুক্তি হল উচ্চতর সত্তার পরীক্ষা। ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলে তবেই আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরবশ সে বিষয়ী—দাস মাত্র। মন নামক বস্তুটিকে যদি বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গে খণ্ডিত হতে না দিই, তাহলে আমাদের দেহ বিলুপ্ত হবে।

লক্ষ লক্ষ বছরের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের দেহ তৈরী হয়েছে। লড়াই করতে গিয়ে দেহপ্রাপ্তির মূল উদ্দেশ্যকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি। সে উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ হয়ে ওঠা। আমরা ভাবতে শিখেছি যে দেহ-নির্মিতিই আমাদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য। এই হল মায়া। এই মোহ থেকে আমাদের অবশ্যই মুক্ত হতে হবে এবং আসল লক্ষ্যে ফিরে যেতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা দেহবন্দী নই, দেহ আমাদের ভৃত্য।

মনকে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসতে শেখো, এবং একে দেহ থেকে আলাদাভাবে দেখতে চেষ্টা কর। দেহকে আমরা অনুভূতি ও জীবন দিয়ে সমৃদ্ধ করি এবং তখন একে সজীব ও প্রকৃত সত্তা হিসাবে চিন্তা করি। এত দীর্ঘদিন যাবৎ এই দেহ আমরা ধারণ করেছি যে আমরা ভুলে যাই যে দেহ আমাদের সমগোত্রীয় নয়। ইচ্ছামত দেহকে পরিহার করতে যোগ আমাদের সাহায্য করে। আমরা দেহকে দাস ভাবতে পারি, আমাদের শাসক হিসাবে নয়, আমাদের যন্ত্র হিসাবে গণ্য করতে পারি। মানসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাই যোগের প্রথম মহৎ লক্ষ্য। দ্বিতীয় হল সেই শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করা।

অতিভাষী হলে যোগী হওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অনুশীলনী

এই যোগ অষ্টমুখী যোগ হিসাবে পরিচিত, কারণ একে আটটি মুখ্য পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এগুলি হল : প্রথম—যম। এইটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্ত জীবনকে পরিচালিত করে ; এর পাঁচটি ভাগ আছে।

(১) চিন্তায়, কথায় অথবা কাজে কোন জীবের অনিষ্ট না করা।

(২) চিন্তায়, কথায় অথবা কাজে লালসা বর্জন।

(৩) কাজে, কথায়, চিন্তায় পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষা করা।

(৪) কাজে, কথায়, চিন্তায় পূর্ণ সত্যতা রক্ষা করা।

(৫) দান গ্রহণ না করা।

দ্বিতীয়—নিয়ম। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া, প্রত্যহ স্নান করা, নিয়ন্ত্রিত খাদ্য আহার করা ইত্যাদি।

তৃতীয়—আসন, অঙ্গবিন্যাস। নিতম্বদ্বয়, দুই কাঁধ এবং মাথাকে সোজা রাখতে হবে, মেরুদণ্ডকে ভারহীন রাখতে হবে।

চতুর্থ—প্রাণায়াম, নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (প্রাণ অথবা মূল শক্তিকে আয়ত্তাধীন করার জন্য)।

পঞ্চম—প্রত্যাহার, মনকে অন্তর্মুখী করা, বহির্মুখী না হতে দেওয়া, কোন বিষয়কে বোঝার জন্য মনে মনে তা নিয়ে চিন্তা করা।

ষষ্ঠ—ধারণা—কোন বিষয়ে একাগ্র মনোনিবেশ।

সপ্তম—ধ্যান—গভীর চিন্তা।

অষ্টম—সমাধি, বোধোদয়—আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।

যম এবং নিয়ম সারাজীবন ধরে চর্চা করতে হবে। জোঁক যেমন একটি ঘাসকে কামড়ে না ধরে অন্য একটি ঘাস ছাড়ে না, অন্যান্য পর্যায়গুলি সম্বন্ধে আমাদের অনুরূপ সতর্ক হতে হবে। অর্থাৎ, একটি পর্যায়কে সম্পূর্ণভাবে বুঝে এবং অনুশীলন করে তবেই নতুন পর্যায়ে যাওয়া যাবে।

এই অনুশীলনের বিষয় হল প্রাণায়াম, অথবা প্রাণের নিয়ন্ত্রণ। রাজযোগের মাধ্যমে নিঃশ্বাস মনোজগতে প্রবেশ করে আমাদের অতীন্দ্রিয় মার্গে উন্নীত করে। সমস্ত দৈহিক গঠনতন্ত্রের পরিচালক হল এইটি। প্রাণায়াম সর্বপ্রথম ফুসফুসের উপর কাজ করে, ফুসফুস প্রভাবিত করে হৃৎপিণ্ডকে, হৃৎপিণ্ড প্রভাবিত করে রক্তচলাচলকে, রক্তচলাচলের দ্বারা প্রভাবিত হয় মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক মনকে প্রভাবিত করে। ইচ্ছাশক্তি একটি বাহ্যিক অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম, এবং বাহ্যিক অনুভূতি ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করতে পারে। আমাদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল ; আমরা তার ক্ষমতাকে উপলব্ধি করি না, জড়ের বন্ধনীতে আমরা এমনই আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়েছি। আমাদের অধিকাংশ কাজই বহির্জগতের প্রেরণাসঞ্জাত। বহিঃপ্রকৃতি আমাদের ভারসাম্য নষ্ট করে, আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করতে পারি না (যা আমাদের পারা উচিত)। এ সবই ভুল ; সত্যিই এক বৃহত্তর শক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছে।

বিখ্যাত যোগী ও পথপ্রদর্শকরা এই ইন্দ্রিয়প্রসূত জগৎকে জয় করেছিলেন, তাই

তাঁরা বাচনে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এক মন্ত্রী একটি উঁচু মিনারে বন্দী ছিলেন। সে অবস্থায় তাঁর স্ত্রী তাঁকে একটি গুবরে পোকা, মধু, রেশমের সুতো এবং একটি দড়ি যোগান দেন এবং এইগুলির সাহায্যে মন্ত্রী নিজেকে মুক্ত করেন। এই গল্পটির মাধ্যমে বোঝা যায় কিভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে আমরা মনকে আয়ত্তে আনতে পারি। এক্ষেত্রে নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণই হল গল্পে বর্ণিত সেই রেশমী সুতো। এর দ্বারা আমরা একটির পর একটি ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারি যতক্ষণ না মনঃসংযোগরূপী দড়িটি দেহের কারাগার থেকে আমাদের উদ্ধার করছে, আমরা মুক্ত হচ্ছি। মুক্তি লাভ করলে, মুক্তির পন্থাগুলিকে আমরা বর্জন করতে পারি।

প্রাণায়ামের তিনটি অংশ আছে :

(১) পূরক : শ্বাসগ্রহণ।

(২) কুম্ভক : শ্বাসসংযমন।

(৩) রেচক : শ্বাসত্যাগ।

মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে দুটি তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং এই তরঙ্গ দুটি নিম্নগামী হয়ে মেরুদণ্ডের দুই পাশে প্রবাহিত হয় ও মেরুদণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করে পুনরায় মস্তিষ্কে ফিরে আসে।

একটি তরঙ্গ 'সূর্য' (পিঙ্গলা) নামে পরিচিত। এর উৎপত্তি মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ থেকে। এটি মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করে মেরুদণ্ডের ডান দিকে চলে আসে। তারপর আবার মেরুদণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করে। এর গতিপথ অনেকটা ইংরেজী আট সংখ্যার অর্ধাংশের মত।

অপর তরঙ্গ 'চন্দ্র' (ঈড়া) সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে প্রবাহিত হয়ে এই আট সংখ্যাটিকে সম্পূর্ণ করে। একথা ঠিক যে নিম্নভাগটি ঊর্ধ্বভাগের তুলনায় দীর্ঘতর। এই তরঙ্গ দুটি দিবারাত্র প্রবাহিত হয় এবং বিভিন্ন বিন্দুতে বিশাল জীবনীশক্তির ভাণ্ডার গড়ে তোলে। প্রচলিত অর্থে এই বিন্দুগুলিকে ঝিল্লী বলা হয় ; খুব কম ক্ষেত্রেই এই সঞ্চিত শক্তির সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। মনঃসংযোগের মাধ্যমে আমরা এই শক্তিগুলিকে উপলব্ধি করতে এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গে তাদের অনুসন্ধান করতে শিখি। পিঙ্গলা ও ঈড়া তরঙ্গ দুটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত এবং সেই শ্বাসক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে আমরা দেহকে বশে আনতে পারি।

কঠোপনিষদে দেহকে রথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, মন হল তার লাগাম, বুদ্ধি সারথি, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি হল তার পথ। আত্মা এই রথের আরোহী। আরোহী সচেতন না হলে, সারথিকে তার অশ্বপরিচালনায় নির্দেশ না দিলে, কখনই তার পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে না। পরন্তু, ইন্দ্রিয়গুলি বন্য ঘোড়ার মত তাদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী আরোহীকে টেনে নিয়ে চলবে, এমনকি তাকে ধ্বংসও করতে পারে। এই দুটি তরঙ্গ হল সারথির হাতের নিয়ন্ত্রক বল্গা এবং অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সারথিকে এই বল্গা দুটিকে অবশ্যই হাতে নিতে হবে। নীতিবান হবার শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে ; তা না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের কার্যবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। একমাত্র যোগই আমাদের

নীতিশিক্ষাগুলিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা দেয়। নীতিবান হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য। অধ্যাত্মবাদের সকল মহান গুরুই ছিলেন যোগীপুরুষ এবং প্রতিটি তরঙ্গকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সমস্ত তরঙ্গগুলিকে যোগীরা মেরুদণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে ধরে রাখেন এবং মেরুদণ্ডভাগের মধ্য দিয়ে তাদের প্রেরণ করেন। এই তরঙ্গগুলি তখন জ্ঞানতরঙ্গে পরিণত, যা না কি একমাত্র যোগীপুরুষের মধ্যেই থাকে।

নিঃশ্বাসের দ্বিতীয় অনুশীলন: একটি প্রক্রিয়া সকলের জন্য নয়। এই নিঃশ্বাস অবশ্যই ছন্দোবদ্ধ নিয়মে নিতে হবে এবং সবচেয়ে সহজ উপায় হল সংখ্যাগণনার মাধ্যমে নিঃশ্বাস নেওয়া। যেহেতু ঐটি পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতি, এর পরিবর্তে আমরা পবিত্র 'ওঁ' শব্দটিকে নির্দিষ্ট কয়েকবার আবৃত্তি করি।

প্রাণায়ামের প্রথা হল এইরূপ: ডানদিকের নাসারন্ধ্র হাতের তালু দিয়ে বন্ধ কর, তারপর বাঁ দিকের রন্ধ্র দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নাও। এ সময়ে 'ওঁ' শব্দটি পর পর চারবার মনে মনে আবৃত্তি করতে হবে।

তারপর বাম নাসারন্ধ্রের উপর তর্জনী রাখো, নিঃশ্বাস ধরে রাখো, মনে মনে 'ওঁ' শব্দটিকে আটবার আবৃত্তি কর।

তারপর ডান নাসারন্ধ্র থেকে হাতের তালু সরিয়ে নিয়ে ঐ রন্ধ্র দিয়েই ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ো। এ সময়েও চারবার 'ওঁ' বলতে হবে।

প্রশ্বাস ছেড়ে দেওয়া সম্পূর্ণ হলে তলপেট ভিতরের দিকে টেনে নাও যাতে ফুসফুসে কোন বাতাস না থাকে। তারপর বাঁ দিকের নাসারন্ধ্র বন্ধ করে ডান দিক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে, এসময় চারবার 'ওঁ' বলতে হবে। তারপর ডান রন্ধ্র হাতের তালু দিয়ে বন্ধ করে নিঃশ্বাস ধরে রাখতে হবে এবং মনে মনে 'ওঁ' আটবার উচ্চারণ করতে হবে। তারপর বাঁ দিকের রন্ধ্র উন্মুক্ত করে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে এবং 'ওঁ' চারবার বলতে হবে। তলপেটকে আগের মতই ভেতরে গুটিয়ে নিতে হবে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে প্রত্যেক অধিবেশনে দু বার করে অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ দুটি নাসারন্ধ্রের প্রত্যেকটির জন্য দুটি করে মোট চারবার প্রাণায়াম করতে হবে। আসনে বসার আগে প্রার্থনা দিয়ে শুরু করা ভালো।

এক সপ্তাহ এই অনুশীলন করতে হবে; তারপর একই হার বজায় রেখে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাসের সময় বাড়াতে হবে। অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণের সময় যদি ছবার 'ওঁ' বলে থাকো তাহলে শ্বাসত্যাগের সময়ও ছবার বলতে হবে এবং কুম্ভকের সময় বারো বার 'ওঁ' উচ্চারণ করতে হবে। এই আসনগুলি আমাদের আরও বেশী অধ্যাত্মভাবুক, আরও পবিত্র ও শুদ্ধ করে তুলবে। বিপথে পরিচালিত হয়ো না, অথবা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা কোর না। প্রেমই হল একমাত্র শক্তি, যা আমাদের কাছে থাকে এবং বর্ধিত হয়। রাজযোগের মাধ্যমে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সমীপবর্তী হতে চান তাঁকে মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অবশ্যই বলশালী হতে হবে। এই সত্য স্মরণ রেখেই প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হবে। হাজারে একজনই বলতে পারে "আমি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবো।" খুব কম লোকই

সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে ; কিন্তু কিছু অর্জন করতে হলে,সত্যের জন্য মৃত্যুবরণে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩

তৃতীয় অনুশীলনী

কুণ্ডলিনী : আত্মাকে জড় হিসাবে চিন্তা না করে, আত্মা যা সেই রূপেই তাকে বোঝা উচিত, আত্মাকে আমরা দেহ হিসাবে চিন্তা করি, কিন্তু অনুভূতি ও ভাবনা থেকে একে অবশ্যই আলাদা করতে হবে। একমাত্র তখনই আমরা আমাদের অমরত্ব উপলব্ধি করবো। পরিবর্তনের অর্থ কার্য-কারণের দ্বৈতভা, এবং যা কিছু পরিবর্তিত তা সমস্তই মরণশীল, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দেহ কখনও অমর হতে পারে না, এমন কি মনও নয়, কারণ এই দুটিই প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। একমাত্র অপরিবর্তনশীল বস্তুই অমর হতে পারে, কারণ কোনকিছুই এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আমরা সেই শক্তিতে রূপান্তরিত হই না, আমরাই সেই শক্তি ; কিন্তু যে অজ্ঞতার আবরণ সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে, তাকে আমাদের অপসারিত করতেই হবে। দেহ হল চিন্তার অভিব্যক্ত রূপ, 'সূর্য' এবং 'চন্দ্র' এই দুটি তরঙ্গ দেহের সমস্ত অঙ্গে শক্তি সঞ্চার করে। অতিরিক্ত শক্তি মেরুদণ্ডের কয়েকটি কেন্দ্রে সঞ্চিত হয় (ঝিল্লী= plexuses) সাধারণত: এগুলিকে স্নায়ুকেন্দ্র বলা হয়।

মৃতদেহের মধ্যে এই তরঙ্গগুলিকে পাওয়া যাবে না, একমাত্র সুস্থ অবয়বের মধ্যে এদের সন্ধান মিলবে।

যোগীর একটি সুবিধা রয়েছে ; কারণ তিনি শুধু এই তরঙ্গগুলিকে উপলব্ধি করতেই সক্ষম নন, তিনি প্রকৃতই তাদের চোখে দেখতে পান। তাঁর জীবনে এই তরঙ্গগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল, স্নায়ুকেন্দ্রগুলিও অনুরূপ দীপ্তিমান।

কর্ম দুপ্রকার—সচেতন এবং অচেতন। অতিসচেতন কর্ম বলে যোগীদের এক তৃতীয় প্রকার কর্ম থাকে। সমস্ত দেশে সমস্ত কালে এই অতিসচেতন কর্মই সমস্ত ধর্মজ্ঞানের উৎসস্বরূপ। অতিসচেতন অবস্থায় কোনরূপ ভ্রান্তি হয় না।

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে কাজ হয় সেগুলি একেবারেই কৃত্রিম, কিন্তু অতিসচেতন কর্ম চৈতন্যের অতীত।

অতিসচেতন কর্মকে দৈব অনুপ্রেরণা বলা হয়েছে। কিন্তু যোগীরা বলেন, "এই গুণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বর্তমান ; সুতরাং সকলেই তাকে ব্যবহার করতে পারে।"

'সূর্য' এবং 'চন্দ্র' তরঙ্গ দুটিকে আমাদের একটি নতুন দিকে পরিচালিত করতে হবে এবং মেরুদণ্ডের মধ্যভাগ দিয়ে তাদের জন্য একটি নতুন পথ খুলে দিতে হবে। যখন আমরা এই দুটি তরঙ্গকে 'সুষুম্না' নামক মেরুদণ্ড মধ্যবর্তী এই পথে নিয়ে এসে মস্তিষ্কে পৌঁছে দিতে পারি, তখনই দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবার ক্ষমতা আমাদের জন্মায়। ত্রিকাস্থির কাছাকাছি মেরুদণ্ডের মূলে যে স্নায়ুকেন্দ্র রয়েছে তার গুরুত্ব

অপরিসীম। যৌনশক্তির সৃজক সত্তার অবস্থান এখানেই। একটি প্রতীকের মাধ্যমে যোগীপুরুষ এই স্থানটির বর্ণনা দেন। প্রতীকটি হল একটি ত্রিভুজ, একটি কুন্ডলাকৃতি সাপ এর মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে।

এই ঘুমন্ত সাপটিকে কুণ্ডলিনী বলা হয়। এই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করাই রাজযোগের মূল উদ্দেশ্য। জৈবক্রিয়া হতে যে বিরাট যৌনশক্তির উৎপন্ন হয়ে উর্দ্ধ-মুখে, মানবদেহের মূল শক্তি উৎপাদক-কেন্দ্র মস্তিষ্কে প্রেরিত হচ্ছে এবং সেখানেই সঞ্চিত হচ্ছে, তার নাম ওজস্ বা আধ্যাত্মিক শক্তি। এই ওজসই হল প্রকৃত মানবসত্তা। একমাত্র মানুষের পক্ষেই এই ওজস্ সংরক্ষণ সম্ভব। " যে মানুষ জৈবিক যৌনশক্তির সম্পূর্ণ অংশকে ওজসে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন তিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন। তিনি ওজস্বীভাবে কথা বলেন এবং তাঁর বক্তব্য পৃথিবীকে পুনরুজ্জীবিত করে।

যোগীর কল্পনায় এই সাপটি ক্রমিক পর্যায়ে উত্থিত হয়। এইভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বা তৃণ গ্রন্থিতে (pineal gland) পৌঁছয়। কোন পুরুষ বা রমণীই প্রকৃত অধ্যাত্ম-ভাবুক হতে পারে না যতক্ষণ মানুষের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা যৌনশক্তিকে, ওজসে রূপান্তরিত না করা যায়।

কোন শক্তিই সৃষ্টি করা চলে না, শুধু পরিচালনা করা যায়। সুতরাং যে বিরাট শক্তিগুলি আমাদের হাতে রয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে অবশ্যই শেখা উচিত।

সেগুলিকে শুধু পশুশক্তিতে পর্যবসিত না করে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে শেখা উচিত। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা গেল যে পরিশুদ্ধই হল সকল নৈতিকতার, সকল ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর। বিশেষতঃ রাজযোগের ক্ষেত্রে, ভাবনায়, কথায় এবং কাজে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয়ের ক্ষেত্রেই এক নিয়ম প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তি যদি তার দেহের সবচেয়ে বলবান শক্তিগুলিকে নষ্ট করে তাহলে তার পক্ষে অধ্যাত্মবাদী হওয়া সম্ভব নয়।

সমস্ত দেশের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টারা ছিলেন হয় সন্ন্যাসী, যোগী, অথবা তাঁরা বিবাহিত জীবন বর্জন করেছিলেন। একমাত্র পরিশুদ্ধ জীবনেই ভগবৎদর্শন হয়।

প্রাণায়াম করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই ঐ ত্রিকোণটি কল্পনা করার চেষ্টা কর। চোখ বন্ধ করে তার নিখুঁত রূপটি কল্পনা কর। কল্পনা কর যেন অগ্নিশিখা এই ত্রিকোণটিকে ঘিরে রেখেছে এবং সেই ছোট্ট সাপটি মাঝখানে রয়েছে। যখন কুণ্ডলিনীটিকে স্পষ্ট দেখতে পাবে তখন মনে মনে তাকে মেরুদণ্ডের মূলভাগে স্থাপিত কর, কুম্ভকে যখন নিঃশ্বাস সংযত করবে তখন সেই নিঃশ্বাসকে জোরে ঐ সাপটির মাথায় ফেলো যাতে সে জেগে ওঠে। কল্পনাশক্তি যত প্রখর হবে, তত তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাবে এবং কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হবে। যতক্ষণ না কুণ্ডলিনীর জাগরণ হচ্ছে, ততক্ষণ একে জাগ্রত রূপে কল্পনা কর, তরঙ্গগুলিকে অনুভব করার চেষ্টা কর এবং সুষুম্নার মধ্য দিয়ে তাদের চালিত করার চেষ্টা কর। এতে দ্রুত ফল মিলবে।

চতুর্থ অনুশীলনী

মনকে নিয়ন্ত্রিত করার আগে তাকে নিরীক্ষণ করা কর্তব্য।

এই অস্থির মনকে বন্দী করে, উদ্‌ভ্রান্তির মাঝ থেকে ছিনিয়ে এনে একটি নির্দিষ্ট ধারণায় স্থিরীকৃত করতে হবে। বার বার এই প্রচেষ্টা করতে হবে। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই মনকে আয়ত্তে আনবো এবং একে স্থির করে ঈশ্বরের মহিমার অনুধ্যানে নিয়োজিত করবো। মনকে আয়ত্তে আনার শ্রেষ্ঠ উপায় হল স্থির হয়ে বসে কিছুক্ষণের জন্য মনকে স্বেচ্ছাচারী হতে দেওয়া। একান্তভাবে ভাবতে হবে : "আমি প্রত্যক্ষদর্শী, আমার মনকে বিক্ষিপ্ত হতে দেখছি। আমার সঙ্গে আমার মনের কোন সম্পর্ক নেই।" তারপর ভাবতে চেষ্টা কর যেন তোমার মন তোমার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। নিজেকে ঈশ্বরের সমগোত্রীয় ভাবো, জড় অথবা মনের সঙ্গে একত্রিত কোর না।

কল্পনা কর যেন একটি শান্ত সরোবরের মত তোমার মন তোমার সামনে প্রসারিত রয়েছে এবং যেসব চিন্তার আনাগোনা করছে সেগুলি যেন বুদ্‌বুদের মত জলের উপর ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। চিন্তাগুলিকে দমন করার কোন চেষ্টা কোর না, সেগুলিকে নিরীক্ষণ কর এবং কল্পনায় সেই ভেসে বেড়ানো চিন্তাগুলিকে অনুসরণ করো। এর ফলে চিন্তার বেড়গুলি ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। কারণ মন চিন্তার বিস্তীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং সেই গণ্ডিগুলি প্রসারিত হয়ে ক্রমবর্ধমান গণ্ডিতে পরিণত হয়। অনেকটা যেরকম একটি পুকুরে ঢিল মারলে তরঙ্গের বেড় ক্রমশ বেড়ে চলে। আমরা বিপরীতভাবে শুরু করতে চাই, অর্থাৎ একটি বিরাট গণ্ডি থেকে শুরু করে সেই গণ্ডিকে ক্রমশ সকীর্ণ করে আনা, যতক্ষণ আমরা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে মনকে একটি কেন্দ্রে আবদ্ধ করতে না পারছি। এই চিন্তা মনে রাখতে হবে "আমি এবং আমার মন স্বতন্ত্র, আমি নিজেকে চিন্তামগ্ন দেখছি, মনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছি।" এভাবে প্রতিদিন তোমার সঙ্গে তোমার চিন্তার ও অনুভূতির একীকরণের প্রয়াস কমে আসবে, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত নিজেকে মন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে পারছো এবং প্রকৃতই তোমার থেকে পৃথক একটি সত্তা হিসাবে মনকে চিনছো।

এই কাজ সম্পাদিত হলে মন তোমার ভৃত্যে পরিণত হবে এবং তুমি তোমার ইচ্ছামত তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যোগী হবার প্রথম পর্যায় হল ইন্দ্রিয়ের বেড়াগুলি অতিক্রম করা। মন বশীভূত হলে একজন মানুষ তুরীয় অবস্থায় উন্নীত হয়।

যতদূর সম্ভব একাকী থাকো। আসনটি আরামদায়ক দৈর্ঘ্যের হবে; প্রথমে কুশাসন, তারপর ছালের এবং পরে একটি রেশমের ঢাকনা পেতে দাও। আসনের হেলান দেবার ব্যবস্থা না থাকাই ভালো এবং আসনটি অবশ্যই ঋজু গঠনের হবে।

চিন্তাগুলি যেহেতু ছবির মত, সেহেতু আমরা তাদের সৃষ্টি করবো না। সমস্ত চিন্তা মন থেকে সরাতে হবে এবং মনকে সম্পূর্ণ শূন্য করতে হবে, যত দ্রুত হবে একটি চিন্তার আবির্ভাব, তত দ্রুতই আমাদের তাকে বিতাড়িত করতে হবে। এই সামর্থ্য অর্জন করতে হলে, আমাদের জড়ের ঊর্ধ্বে, দৈহিক চেতনাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। প্রকৃত পক্ষে মানুষের সমস্ত জীবন এই কর্ম সম্পাদনেরই প্রচেষ্টা স্বরূপ।

প্রত্যেক শব্দেরই নিজস্ব অর্থ আছে: আমাদের প্রকৃতিতে এই দুটি বস্তু হল পরস্পরসাপেক্ষ।

আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলেন ঈশ্বর। তাঁর ধ্যান কর। জ্ঞানদাতাকে আমরা জানতে পারি না, কিন্তু আমরা তাঁরই অংশ।

যে অশুভকে আমরা দেখি তা আমাদেরই সৃষ্টি। বহির্জগতে আমরা আমাদের স্বরূপই প্রত্যক্ষ করি, কারণ, পৃথিবী আমাদের আয়না। এই ক্ষুদ্র দেহটি হল আমাদেরই তৈরী একটি ছোট্ট আয়না, কিন্তু বিশ্বচরাচর হল আমাদের দেহ। সবসময় এই চিন্তা আমাদের করতে হবে; তখন আমরা জানবো যে আমরা অমর, এবং অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়, কারণ তারাও আমাদেরই আত্মীয়। আমাদের সৃষ্টি নেই, বিনাশ নেই, আমাদের শুধু ভালোবাসতে হবে।

"সমগ্র বিশ্ব আমার দেহ; সব স্বাস্থ্য, সব সুখের অধিকারী আমি, কারণ সবই এ বিপুল বিশ্বের অন্তর্গত।" বলো, "আমিই বিশ্ব"। পরিশেষে আমরা শিখলাম, যে-সব কাজই আমরা করছি তা একটি দর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছে।

যদিও ক্ষুদ্রতরঙ্গের মতই আমাদের আবির্ভাব, গোটা সমুদ্র আমাদের পেছনে রয়েছে এবং আমরা তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন তরঙ্গই একাকী অগ্রসর হতে পারে না।

সুপরিচালিত কল্পনাই আমাদের পরম বন্ধু; এই কল্পনা যুক্তিরও ঊর্ধ্বে এবং এইটিই একমাত্র আলোকবর্তিকা যা আমাদের সর্বত্র নিয়ে যায়।

প্রেরণা অন্তঃস্থল থেকেই আসে এবং আমাদের যেসব উচ্চতর গুণাবলী রয়েছে তা দিয়েই নিজেদের অনুপ্রাণিত করা দরকার।

পঞ্চম অনুশীলনী

প্রত্যাহার এবং ধারণা। কৃষ্ণ বলছেন: "যে যেভাবে যে মাধ্যমেই আমাকে চায়, সে আমার কাছেই পৌঁছবে।" "প্রত্যেক ব্যক্তিই আমাতে উপনীত হবে।" প্রত্যাহার হল মনকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে মনকে নিয়োজিত করা। প্রথম পথ হল মনকে ভাসতে দেওয়া, লক্ষ্য কর; দেখো মন কি ভাবছে, শুধু নীরব সাক্ষী হও। মন আমাদের আত্মা বা সারসত্তা নয়। মন শুধু পদার্থেরই সূক্ষ্মতর রূপ, আমরা এই বস্তুটির অধিকারী এবং একে স্নায়ুশক্তিগুলির মধ্যে নিয়োজিত করা শিখতে পারি।

দেহ হল আমরা যাকে মন বলি তার বিষয়মুখী রূপ। আমরা, অর্থাৎ আমাদের আত্মা, দেহ ও মন উভয়েরই ঊর্ধ্বে; আমরা 'আত্মন্' শাশ্বত অপরিবর্তনশীল দর্শক। দেহ চিন্তারই বিমূর্ত রূপ।

নিঃশ্বাস যখন বাঁ নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন বিশ্রামের সময়; যখন ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন কাজের সময় এবং যখন দুটিরই মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন ধ্যানের সময়। যখন আমরা প্রশান্ত থাকি এবং দুটি নাসারন্ধ্র

দিয়েই সমানভাবে নিঃশ্বাস নিই সেইটিই আমাদের পক্ষে ধ্যানের প্রকৃষ্ট সময়। প্রথমেই মনঃসংযোগের চেষ্টা করা অর্থহীন। চিন্তার সংযম নিজে থেকেই আসবে। হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে নাসারন্ধ্রগুলিকে বন্ধ করার যথেষ্ট অনুশীলনের পর আমরা ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই শুধুমাত্র চিন্তার মাধ্যমেই এ কাজ করতে পারবো।

এবার প্রাণায়ামকে সামান্য পরিবর্তিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর যদি নির্ধারিত আদর্শ বা 'ইষ্ট' থেকে থাকে তাহলে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের সময় 'ওঁ'-এর পরিবর্তে ঐটিকেই ব্যবহার করতে হবে। কুম্ভকের সময় 'হুম্' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবার 'হুম্' শব্দটিকে উচ্চারণ করার সময় নিয়ন্ত্রিত শ্বাসকে জোর কুণ্ডলিনীর মাথায় ফেলতে হবে এবং ভাবতে হবে যে এর ফলে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হচ্ছে। নিজেকে একমাত্র ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবো। কিছুক্ষণ পরে ভাবনার আবির্ভাব হবে এবং তাদের প্রারম্ভিক পর্যায় সম্বন্ধে আমরা পরিচিত হব। আমাদের আগামী চিন্তা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হতে হবে, ঠিক যেমন সামনের দিকে তাকিয়ে আমরা কোন মানুষকে অগ্রসর হতে দেখতে পাই। যখন মন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারি এবং ভাবতে পারি আমরা এবং আমাদের ভাবনা দুটি পৃথক সত্তা তখনই এই পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। চিন্তা যেন তোমাকে গ্রাস করে ; সরে দাঁড়াও এবং চিন্তাগুলি অবলুপ্ত হবে।

এই পুণ্য চিন্তাগুলি অনুসরণ কর ; এগুলির অনুগামী হও এবং যখন এগুলি বিগলিত হবে তখন তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পদতলে উপনীত হবে। এইটি হল অতি-চেতন অবস্থা ; যখন ধারণা বিগলিত হয় ; তাকে অনুসরণ কর এবং তুমিও বিগলিত হও।

জ্যোতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ আলোর প্রতীক এবং যোগীরাই সেই জ্যোতি দেখতে পান। কখনও কখনও একটি মুখ দেখে মনে হয় যেন উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি তাকে ঘিরে রেখেছে এবং সেই দ্যুতির মধ্যে চরিত্রটিকে চিনে নেওয়া যায় এবং নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

আমাদের ইষ্ট আমাদের সামনে দৃশ্য হয়ে উঠতে পারে এবং এটি এমন একটি প্রতীক হবে যার উপর আমরা নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারি এবং যাতে আমরা সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারি। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই আমরা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চোখের মাধ্যমে আমরা কল্পনা করি। প্রত্যেক কল্পনাই অর্ধ-বাস্তব। অর্থাৎ কিছুটা অলৌকিকের সংমিশ্রণ ছাড়া আমরা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে পশুরাও চিন্তা করে অথচ কথা বলতে পারে না, সেজন্য মনে হয় চিন্তা ও রূপকের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

যোগে কল্পনাকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা কর, সর্তক হতে হবে যাতে সে কল্পনা বিশুদ্ধ ও পবিত্র থাকে। আমাদের প্রত্যেকের কল্পনাশক্তিরই নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। যে পদ্ধটি তোমার কাছে সবচেয়ে স্বাভাবিক মনে হবে সেটিকেই অনুসরণ কর। সেইটিই সবচেয়ে সহজ হবে।

কর্মফল অনুযায়ী আমাদের পুনর্জন্ম হয়েছে। বৌদ্ধরা বলেন: "একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বালানো"—প্রদীপ অনেকগুলি হলেও আলো একই।

উৎফুল্ল হও, সাহসী হও, প্রতিদিন স্নান করো, ধৈর্যবান হও, পবিত্র ও অধ্যবসায়ী হও, তাহলেই তুমি প্রকৃতার্থে যোগী হবে। কখনও ব্যস্ত হয়ো না, যদি উচ্চতর শক্তির সন্ধান পাও তাহলে মনে রেখো যে সেগুলি শাখা-পথ মাত্র। তারা যেন তোমাকে মূল পথ থেকে ভুলিয়ে না নিয়ে যায়; তাদের উপেক্ষা কর এবং তোমার একমাত্র সত্য লক্ষ্য ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখো।

একমাত্র চিরন্তনের সন্ধান কর, যাকে উপলব্ধি করতে পারলে আমরা চিরকালীন বিশ্রাম নিতে পারবো। কারণ সবকিছু পেলে, আর কোনকিছুর জন্যই সংগ্রাম করা চলে না এবং আমরা চিরকালের জন্য মুক্ত ও পরম সত্তায় বিলীন হই—পরমসত্তা পরম চিৎ, পরম আনন্দ।

ষষ্ঠ অনুশীলনী

সুষুম্না: সুষুম্নার ধ্যান করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুষুম্নার কল্পমূর্তিও তুমি দেখতে পারো এবং এইটিই সর্বোৎকৃষ্ট পথ। তখন দীর্ঘ সময় সেই কল্পমূর্তিকে ধ্যান কর। এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অত্যন্ত চমৎকার তন্ত্রী। এটি মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী, মুক্তির সজীব পথ, যার মধ্য দিয়ে হয় কুণ্ডলিনীর জাগরণ। যোগীর ভাষায় সুষুম্নার শেষাগ্রভাগ রয়েছে দুটি পদ্মে। নিচের পদ্মটি কুণ্ডলিনীর ত্রিভুজকে ঘিরে রয়েছে, এবং উপরের পদ্মটি রয়েছে মস্তিষ্কে, মূল গ্রন্থিকে ঘিরে; এদুটির মধ্যে রয়েছে আরও চারটি পদ্ম, মার্গের নানা স্তর:

ষষ্ঠ: মূল গ্রন্থি (সহস্রার)
পঞ্চম: দুই চোখের মাঝখানে
চতুর্থ: কণ্ঠনালীর উপরিভাগে
তৃতীয়: হৃৎপিণ্ডের সম-স্তরে
দ্বিতীয়: নাভির বিপরীতদিকে
প্রথম: মেরুদণ্ডের মূলভাগে (মূলাধার)

কুণ্ডলিনীকে আমাদের জাগ্রত করতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে তাকে একটি পদ্ম থেকে আর একটি পদ্মে নিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছি। প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে মনের এক একটি নতুন স্তরের যোগসূত্র রয়েছে।

গীতা সম্পর্কে মতামত

গীতা নামক গ্রন্থ মহাভারতের অংশ। গীতা যথাযথভাবে বুঝতে হলে কতকগুলি জিনিস জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত, এটি মহাভারতের অংশ ছিল কিনা, অর্থাৎ বেদব্যাসকে যে এর রচয়িতা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তা ঠিক কিনা, অথবা এ আসলে মহাকাব্যের মধ্যে আরোপিত একটা বিক্ষেপ; দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণ নামে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা; তৃতীয়ত, গীতায় বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সত্যিই হয়েছিল কিনা; আর চতুর্থত, অর্জুন ও অন্যরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা।

এখন প্রথমত দেখা যাক এ সব অনুসন্ধানের কারণ কি? আমরা জানি বেদব্যাস বলে অনেকে পরিচিত ছিলেন; তাঁর মধ্যে গীতার আসল রচয়িতা কে ছিলেন—বাদ্রায়ন ব্যাস না দ্বৈপায়ন ব্যাস? "ব্যাস" তো কেবল একটা পদবী। যে কেউ কোনও নতুন পুরাণ রচনা করতেন তিনিই ব্যাস নামে পরিচিত হতেন, অনেকটা বিক্রমাদিত্য শব্দটির মত—যেটাও ছিল একটা সাধারণ নাম। আর একটা কথা হল গীতা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য তাঁর বিখ্যাত ভাষ্য লেখার আগে এ গ্রন্থটি জনসাধারণের মধ্যে তেমন পরিচিত ছিল না। অনেকের মতে বোধায়ন কৃত গীতা ভাষ্য তার অনেক আগে থেকেই চালু ছিল। এ যদি প্রমাণ করতে পারা যায় তাহলে গীতার প্রাচীনত্ব ও গীতা যে বেদব্যাসের রচনা তা প্রতিষ্ঠা করায় নিঃসন্দেহে অনেক দূর এগোন যায়। বেদান্ত সূত্রের উপর বোধায়ন ভাষ্য—যা থেকে রামানুজ শ্রী-ভাষ্যের সঙ্কলন করেছিলেন, যা শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন ও এখানে ওখানে যার থেকে উদ্ধৃতি পর্যন্ত দিয়েছেন এবং যা স্বামী দয়ানন্দের দ্বারা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে, সেই বোধায়ন ভাষ্যের একটি নকল পর্যন্ত আমি সারা ভারত পরিব্রাজনের সময়েও খুঁজে পাইনি। কথিত আছে যে রামানুজ তাঁর ভাষ্যের সঙ্কলন করেছিলেন হঠাৎ-পাওয়া পোকায় খাওয়া একটি পাণ্ডুলিপি থেকে। যখন বেদান্ত সূত্রের উপর এই বিখ্যাত বোধায়ন ভাষ্যই অনিশ্চয়তার অন্ধকারে এমন আচ্ছন্ন, তখন গীতার উপর বোধায়ন ভাষ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা একেবারে নিরর্থক। কেউ কেউ এই অনুমান করেন যে শঙ্করাচার্যই গীতার রচয়িতা এবং তিনিই একে মহাভারতের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন।

দ্বিতীয় আলোচ্য প্রশ্নটি সম্পর্কে বলা যায়, কৃষ্ণের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক জায়গায় আমরা কৃষ্ণের উল্লেখ দেখি দেবকীর পুত্র হিসাবে, যিনি ঘোর নামে এক যোগীর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিয়েছিলেন। মহাভারতে কৃষ্ণ হলেন দ্বারকার রাজা; বিষ্ণুপুরাণে আমরা কৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে খেলার একটা বিবরণ দেখতে পাই। আবার ভাগবতে রাসলীলার বিস্তৃত বিবরণ আছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে মদনোৎসব (কিউপিড বা মদনের সম্মানে উৎসব) নামে একটি উৎসব চালু ছিল। সেই জিনিসটিই দোলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল ও কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপান হয়েছিল। এ কথা বলার মত সাহস কার আছে যে রাসলীলা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিসও অনুরূপভাবে

তাঁর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় নি? প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা সত্য সন্ধানের ঝোঁক কমই ছিল। কাজেই যথোপযুক্ত তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই যার যা খুশি বলতে পারত। আর একটা কথা: ওই প্রাচীনকালে মানুষের নাম ও যশের জন্য কাঙালপনা খুব কমই ছিল। কাজেই এমন প্রায়ই হত যে কেউ একখানা বই লিখল তারপর সেখানা তার গুরু বা অন্য কারও নামে চালান করে দিল। এই রকম সব ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্য-সন্ধানীদের পক্ষে সত্য খুঁজে বের করা খুব কঠিন। প্রাচীনকালে ভূগোলের জ্ঞান বলে কিছু ছিল না, কল্পনার দৌড় ছিল একেবারে বল্গাহীন। কাজেই মধু-সমুদ্র, দুধ-সমুদ্র, বিশুদ্ধ মাখন-সমুদ্র, দধি সমুদ্র প্রভৃতি মস্তিষ্কের অসম্ভব সৃষ্টির আমরা সাক্ষাৎ পাই। পুরাণে আমরা দেখি কেউ দশ হাজার বছর, কেউ লক্ষ বছর বাঁচছে! কিন্তু বেদ বলছে 'শতায়ুর্ব পুরুষঃ'— মানুষ একশ বছর বাঁচে। এখানে কার কথা মানব? কাজেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসা প্রায় অসম্ভব।

মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্র ঘিরে নানারকম কাল্পনিক অতি-মানবিক গুণাবলী আরোপ করা মনুষ্য চরিত্র। কৃষ্ণ সম্বন্ধেও নিশ্চিত এই হয়েছিল, তবে এটা খুবই সম্ভব বলে মনে হয় যে তিনি একজন রাজা ছিলেন। খুব সম্ভব বললাম কারণ প্রাচীনকালে আমাদের দেশে প্রধানত রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করতেন। এখানে আর একটা বিষয়ও উল্লেখ করা দরকার। গীতার রচয়িতা যিনিই হয়ে থাকুন না কেন, আমরা দেখি এই শিক্ষা ও গোটা মহাভারতের শিক্ষা একই। এ থেকে আমরা নিরাপদে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি যে মহাভারতের যুগে কোনও একজন মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল যিনি তৎকালীন সমাজকে এই নতুন পোশাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিখিয়েছিলেন। আর একটা কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রাচীনকালে যেমন একের পর এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হত, তাদের মধ্যে এক একটা নতুন ধর্মগ্রন্থ উদ্ভূত হত ও ব্যবহৃত হত। এমনও হত যে কালক্রমে সে সম্প্রদায় ও ধর্মগ্রন্থ উভয়েই প্রয়াত হত, অথবা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ পেত, কিন্তু তার ধর্মগ্রন্থ থাকত। অনুরূপভাবে, খুবই সম্ভব যে গীতাও এই রকম একটা সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ছিল, তারা তাদের উচ্চ ও মহৎ ভাবধারাকে এই পবিত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছিল।

এখন তৃতীয় প্রশ্নটি, যেটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। এর সমর্থনে কোনও বিশেষ সাক্ষ্য হাজির করা যাবে না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কুরু ও পাঞ্চালদের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। আর একটা ব্যাপার: যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে রণসাজে সজ্জিত বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কেবল শেষ সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে সেখানে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে এত আলোচনা হল কি করে? আর যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর গোলযোগের মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন লিখে নেওয়ার মত কোনও সংক্ষিপ্ত শ্রুতিলেখক কি উপস্থিত ছিলেন? কারও কারও মতে এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একটা রূপক মাত্র। যখন আমরা এর গূঢ় তাৎপর্যের সার সংকলন করি

তখন এর মানে দাঁড়ায় মানুষের ভিতরকার ভাল ও মন্দের প্রবণতার মধ্যে চিরকাল চলমান যুদ্ধ। এ অর্থটাও অযৌক্তিক নাও হতে পারে।

চতুর্থ প্রশ্ন সম্পর্কে অর্থাৎ অর্জুন ও অন্যদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার অনেক ভিত্তি আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এর মধ্যে এক জায়গায় কারা কারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে অর্জুন ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই, শুধু তাই নয়, তাঁদের নাম সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিতও নেই। যদিও এতে অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের নাম আছে। তথাপি মহাভারতে ও অপরাপর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও অন্যরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

এখানে একটা কথা বিশেষত স্মরণ রাখা কর্তব্য। এইসব ঐতিহাসিক গবেষণার সঙ্গে আমাদের আসল লক্ষ্যের কোনও সম্বন্ধ নেই। সে লক্ষ্য হল ধর্মলাভ করানোর জ্ঞান। আজ যদি এসবের ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিতও হয়, তা আমাদের পক্ষে আদৌ কোনও ক্ষতি বলে গণ্য হবে না। আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তা হলে এত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি? এর নিজস্ব ভূমিকা আছে, কারণ আমাদের সত্যে পৌঁছান দরকার। অজ্ঞতাপ্রসূত ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। এ দেশে লোকে এ সব অনুসন্ধানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কোনও কোনও ধর্মসম্প্রদায় মনে করে যে বহুর পক্ষে কল্যাণকর কোনও শিক্ষা প্রচার করতে গিয়ে একটা অসত্য বললে ক্ষতি নেই, যদি তাতে এই শিক্ষায় সাহায্য হয়। ভাষান্তরে বললে পরিণামের দ্বারা উপায়ের ন্যায্যতা নির্ধারিত হয়। কাজেই আমরা দেখি আমাদের অনেক তন্ত্র এই বলে শুরু হচ্ছে: "মহাদেব পার্বতীকে বললেন।" কিন্তু আমাদের কর্তব্য হল সত্য সম্পর্কে প্রত্যয়সম্পন্ন হওয়া, কেবল সত্যেতেই বিশ্বাস করা। কুসংস্কারের অথবা সত্যানুসন্ধান না করেই প্রাচীন প্রথায় বিশ্বাসের ক্ষমতা এত প্রবল যে তা মানুষের হাত-পা বেঁধে রাখে; ব্যাপারটা এমনই যে যিসাস ক্রাইস্ট, মহম্মদ প্রভৃতির মত মহৎ ব্যক্তিরাও এমন অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন ও সেগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। আপনাদের সর্বদা কেবল সত্যের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে ও সকল কুসংস্কার সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

এখন আমাদের দেখতে হবে গীতায় কি আছে। উপনিষদ অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই যে বহু অবান্তর বিষয়ের গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা মহাসত্য সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে, ঠিক যেমন এক মহারণ্যে ঘুরতে ঘুরতে এখানে ওখানে পথিক এক একটি অপূর্ব সুন্দর গোলাপের সন্ধান পায়, যার পাতা, কাঁটা, মূল সব জড়াজড়ি করে আছে। এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে গীতায় এই সত্যগুলি যথাযথ স্থানে চমৎকারভাবে গ্রথিত—গীতা যেন চমৎকার এক-গাছি মালা কিংবা বাছা বাছা ফুলের তোড়া। উপনিষদে অনেক জায়গায় শ্রদ্ধা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে, কিন্তু ভক্তির উল্লেখ নেই বললেই চলে। অপরপক্ষে গীতায় ভক্তির কথা বারংবার উল্লেখিত হয়েছে শুধু তাই নয়, এতে ভক্তির অন্তর্নিহিত মনোভাবটি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

এখন আসুন গীতায় আলোচিত কতকগুলি প্রধান বিষয় দেখা যাক। গীতার নতুনত্ব কি যা তাকে অন্য সব ধর্মগ্রন্থ থেকে বিশিষ্ট করে? তা হল এই: গীতার আবির্ভাবের আগেও যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি প্রত্যেকের নিজ নিজ দৃঢ় ভক্ত ছিল, কিন্তু তারা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করত, প্রত্যেকেই নিজের পছন্দ মত পথের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করত; কিন্তু কেউ এই সব বিভিন্ন পথের সমন্বয়ের চেষ্টা করেনি। গীতার রচয়িতাই প্রথম এদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলেন। তখনকার দিনের সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলিকে নিয়ে গীতায় তিনি একসূত্রে গাঁথলেন। কিন্তু কৃষ্ণও যেখানে এই যুধ্যমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয় দেখাতে ব্যর্থ হলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংস সেখানে সম্পূর্ণ সার্থক হলেন।

এর পর হল নিষ্কাম কর্ম, অর্থাৎ কামনা বা আসক্তিবিহীন কর্ম। আজকালকার লোকে এর অর্থ নানাভাবে বোঝে। কেউ বলে আসক্তিবিহীন হওয়ার মধ্যে যা নিহিত আছে তা হল উদ্দেশ্যহীন হওয়া। তাই যদি আসল অর্থ হত তাহলে হৃদয়হীন পশুরা ও দেওয়ালগুলি নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের সবচেয়ে বড় উদ্যোক্তা হত। কেউ কেউ আবার জনকের উদাহরণ দেন, আর আশা করেন যে নিষ্কাম কর্ম অভ্যাসে জনকের মতই পারঙ্গম হওয়ার স্বীকৃতি পাবেন! জনক (আক্ষরিক অর্থে পিতা) ওই স্বীকৃতি সন্তান জন্ম দিয়ে লাভ করেন নি, কিন্তু এ লোকেরা কেবল এক গাদা সন্তানের পিতা হওয়ার গুণেই জনক হতে চান। না! প্রকৃত নিষ্কাম কর্মীকে (কামনাবিহীন কর্ম সম্পাদক) পশুর মত, অথবা জড় বা হৃদয়হীন হলে চলবে না। তিনি তামসিক নয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন। তাঁর হৃদয় সহানুভূতি ও প্রেমে এমন পরিপূর্ণ যে সমগ্র জগতকে তিনি প্রেমে আলিঙ্গন করতে পারেন। বাইরের জগৎ সাধারণত তাঁর সর্বব্যাপী প্রেম ও সহানুভূতিকে উপলব্ধি করতে পারে না।

ধর্মের বিভিন্ন পথের সমন্বয় এবং কামনা বা আসক্তিবিহীন কর্ম—এই দুটি হল গীতার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আসুন দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটু পড়া যাক।

সঞ্জয় উবাচ ॥

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রী ভগবানুবাচ ॥

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥
ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

"সঞ্জয় বললেন:

যিনি কৃপায় আবিষ্ট ও বিষাদগ্রস্ত, যাঁর অক্ষি অশ্রুসমাচ্ছন্ন, তাঁকে মধুসূদন এই বাক্যগুলি বললেন।

শ্রীভগবান বললেন :

হে অর্জুন, কোথা থেকে, এই অনার্য-সুলভ, লজ্জাকর, স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল ক্লেশ তোমাতে এল ?

হে পার্থ! ক্লৈব্যের কাছে নত হয়ো না। এ তোমার শোভা পায় না। হে পরন্তপ শত্রুদমন এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করে ওঠ।

'তং তথা কৃপয়াবিষ্ট' দিয়ে শুরু শ্লোকটিতে কি কাব্যিকভাবে, কি সুন্দরভাবে অর্জুনের প্রকৃত অবস্থা চিত্রিত হয়েছে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিলেন ; 'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি বলে কেন তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করছেন ? কারণ অর্জুনের এই যুদ্ধে অনীহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের অতিশয় প্রাবল্য থেকে জাগেনি, তমসই এই অনিচ্ছা এনেছে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষের প্রকৃতি এই যে তিনি সর্ব অবস্থায় শান্ত থাকবেন—সে সমৃদ্ধিতেই হোক আর দুর্দশাতেই হোক। কিন্তু অর্জুন ভয় পেয়েছিলেন, তিনি করুণায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

তাঁর যে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা ছিল তা এই একটা ছোট্ট কথা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি। আমাদের জীবনেও অনেক সময়ে এমন ঘটতে দেখা যায়। অনেক লোক মনে করে যে তারা সাত্ত্বিক স্বভাবের, অথচ তারা তামসিক ছাড়া আর কিছু নয়। অপবিত্র জীবন যাপন করছে এমন অনেক লোক নিজেদের পরমহংস ভাবে। কেন ? কারণ শাস্ত্রে বলে পরমহংসরা জড়, উন্মাদ বা অপবিত্র আত্মার মত বাস করেন। পরমহংসদের শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়, কিন্তু এখানে একথা বোঝা উচিত যে এ তুলনা একপেশে। পরমহংস ও শিশু এক নয়, পার্থক্যবিহীন নয়। তারা কেবল আপাতদৃষ্টিতে অনুরূপ, যেন দুই চরম মেরু। একজন জ্ঞান ছাড়িয়ে একটা অবস্থায় গিয়েছেন, আর একজনের জ্ঞানের একটা ঝলকও জোটেনি। আলোকের দ্রুততম ও মৃদুতম স্পন্দন উভয়েই আমাদের সাধারণ দৃষ্টিগোচর নয় ; কিন্তু এর একটিতে ভয়ঙ্কর গরম, আর একটিতে কোনও গরম নেই বললেই চলে। সত্ত্ব ও তমসের বিপরীত গুণ সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কোনও কোনও দিক থেকে এদের এক বলে মনে হয় নিঃসন্দেহে, কিন্তু এদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তমোগুণ সত্ত্বের পোশাকে নিজেকে সাজাতে খুব ভালবাসে। এখানে পরাক্রান্ত যোদ্ধা অর্জুনের কাছে সে এসেছে দয়ার ছদ্মবেশ ধরে।

যে বিভ্রম অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করেছে তা দূর করার জন্য ভগবান তাঁকে কি বললেন ? আমি যেমন আপনাদের কাছে বরাবর প্রচার করেছি যে কাউকে পাপী বলে নিন্দা করবেন না, বরং তার মধ্যে সর্বশক্তিমান ক্ষমতা আছে তার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, সেইভাবেই ভগবান অর্জুনকে বললেন, নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে—"এ তোমার শোভা পায় না!"

"তুমি অমর আত্মা, সকল অমঙ্গলের অতীত। নিজের প্রকৃত চরিত্র ভুলে গিয়ে, নিজেকে পাপী মনে করে, শারীরিক অনিষ্ট ও মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়ে তুমি নিজেকে তাই করে ফেলেছ—এ তোমার শোভা পায় না!" তাই ভগবান বললেন,

"ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ—হে পার্থ! ক্লৈব্যের কাছে নত হয়ো না। এ জগতে পাপও নেই দুর্দশাও নেই, ব্যাধিও নেই দুঃখও নেই, জগতে যদি এমন কিছু থাকে যাকে পাপ বলা যায় তো সে হল—'ভয়'; একথা জেনো যে, যে কোনও কর্ম তোমার ভিতরকার সুপ্ত ক্ষমতাকে বের করে আনে, সেই পুণ্য; আর যে দেহমনকে দুর্বল করে সে নিতান্তই পাপ। এই দুর্বলতা, এই হৃদয় দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেল! ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ। তুমি বীর, এ তোমার শোভা পায় না।"

হে আমার পুত্রগণ, আপনারা যদি জগতের কাছে এই বাণী নিয়ে যেতে পারেন—ক্লৈব্যং, মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে—তা হলে জগত থেকে সকল ব্যাধি, দুঃখ, পাপ, বেদনা তিনদিনের মধ্যে অদৃশ্য হবে। এই সব দুর্বলতার ভাব দূর হবে। এখন এই ভয়ের স্রোত সর্বত্র স্পন্দিত হচ্ছে। এই স্রোতকে উল্টে দিন; বিপরীত স্পন্দন আসুন, আর দেখুন যাদুমন্ত্রের মত পরিবর্তন! আপনি সর্বশক্তিমান—যান, যান, কামানের মুখে যান, ভয় করবেন না।

নিতান্ত পাপীকেও ঘৃণা করবেন না, তার বাইরেটাই দেখবেন না। দৃষ্টি অন্তর্লোকের দিকে ফেরান যেখানে পরমাত্মা বাস করেন। সারা জগতের কাছে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করুন "তোমার মধ্যে কোনও পাপ নেই, তোমার মধ্যে কোনও দুঃখ নেই, তুমি সর্বশক্তিমান ক্ষমতার আধার। ওঠ, জাগ, আর অন্তরের দেবত্বকে প্রকাশ কর!"

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ —এই একটি শ্লোক যদি কেউ পড়ে তবে সে সমগ্র গীতা পাঠের ফল পাবে। কারণ এই একটি শ্লোকে গীতার সমগ্র বাণী নিহিত আছে।

[এই প্রবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৭ সালে কলকাতার আলমবাজারের মঠে অবস্থান কালে অনুরাগী যুবকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গীতা সম্পর্কে বক্তৃতার সারাংশ]

জড় ভরতের গল্প

(ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত)

ভরত নামে একজন মস্ত সম্রাট ছিলেন। বিদেশীরা যে দেশটিকে ভারত বলেন সে দেশের সন্তানদের কাছে দেশটি ভারতবর্ষ বলে পরিচিত। বৃদ্ধ হলে প্রত্যেকটি হিন্দুর উপর প্রত্যাদেশ হল সমস্ত পার্থিব কর্ম পরিত্যাগ কর, জগতের সকল উদ্বেগ, সকল সুখ-সম্পদ ও উপভোগ পুত্রের উপর ন্যস্ত করে বনবাসে যাও, সেখানে গিয়ে পরমাত্মার ধ্যান কর—যা তোমার মধ্যে একমাত্র বাস্তব, আর যা কিছু জীবনের সঙ্গে বেঁধে রাখে তা থেকে এইভাবে মুক্ত হও। রাজাই হোন বা পুরোহিতই হোন, কৃষক হোন বা দাস হোন, পুরুষ হোন বা নারীই হোন এ কর্তব্য থেকে কারও রেহাই নেই; কারণ গৃহীর সকল কর্তব্য অর্থাৎ পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, পিতা, স্ত্রী, কন্যা, মাতা ও ভগিনী হিসাবে সকল কর্তব্যই আসলে সেই এক স্তরে যাওয়ার প্রস্তুতি, যে স্তরে আত্মাকে বস্তুর সঙ্গে বেঁধে রাখা সকল বন্ধন চিরকালের জন্য ছিন্ন হয়।

রাজা ভরত বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে বনে চলে গেলেন। যে রাজা লক্ষ লক্ষ প্রজাকে শাসন করতেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত মর্মর প্রাসাদে বাস করতেন, মণি-মুক্তা খচিত পানপাত্র থেকে পান করতেন, তিনি হিমালয়ের জঙ্গলে এক নদীর তীরে শর ও ঘাস দিয়ে স্বহস্তে একটি ছোট্ট কুটির তৈরি করলেন। স্বহস্তে সংগৃহীত মূল ও ওষধি ছিল তাঁর জীবনধারণের জন্য খাদ্য। মানুষের আত্মার মধ্যে যিনি সর্বদা বিরাজমান রাজা তাঁর ধ্যান করতেন। বহু দিন, বহু মাস, বহু বছর কেটে গেল। রাজর্ষি যেখানে ধ্যান করছিলেন একদিন তার কাছেই একটি হরিণী জল পান করতে এল। সেই মুহূর্তেই একটু তফাতে একটি সিংহ গর্জন করে উঠল। হরিণীটি এত ভয় পেল যে সে তৃষ্ণা নিবারণ না করেই নদী পার হওয়ার জন্য এক বিরাট লাফ দিল। হরিণীটি গর্ভবতী ছিল। চরম ক্লান্তি ও হঠাৎ আতঙ্কের ফলে সে একটি মৃগশিশুর জন্ম দিল ও তারপরেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। মৃগশিশুটি জলে পড়ে গেল ও ফেনময় তীব্র স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। তখন সে রাজার চোখে পড়ল। ধ্যান ভেঙে উঠে রাজা জল থেকে মৃগশিশুটিকে উদ্ধার করলেন ও নিজের কুটিরে আনলেন। আগুন জ্বাললেন, সেবাযত্ন করে বাচ্চাটিকে বাঁচিয়ে তুললেন। দয়ালু ঋষি মৃগশিশুটিকে আশ্রয় দিলেন এবং কচি ঘাস ও ফল খাইয়ে তাকে লালন-পালন করতে লাগলেন। অবসর-প্রাপ্ত সম্রাটের পিতৃসুলভ যত্নে মৃগশিশুটি বড় হয়ে একটি সুন্দর হরিণে পরিণত হল। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও পরিবারের প্রতি সারা জীবনের আসক্তি কাটিয়ে ওঠার পক্ষে যে রাজার মন যথেষ্ট শক্ত ছিল, তিনি জল থেকে তোলা হরিণটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। হরিণটির প্রতি তাঁর স্নেহ যত দিন দিন বাড়তে লাগল, ভগবানের প্রতি মনের একাগ্রতা তত কমতে লাগল। হরিণটি বনে চরতে যাওয়ার পর ফিরতে যদি দেরি করত তবে রাজর্ষি উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়তেন। তিনি তখন ভাবতেন "হয় তো আমার ছোট্ট হরিণটিকে কোনও বাঘ আক্রমণ করেছে, কিংবা হয় তো তার আর কোনও বিপদ হয়েছে, নইলে এত দেরি কেন?"

এইভাবে কয়েক বছর কাটল, কিন্তু একদিন মৃত্যু এল। রাজর্ষি মৃত্যুশয্যায় শুলেন, কিন্তু তাঁর মন পরমাত্মায় নিবিষ্ট হওয়ার বদলে হরিণটির কথাই চিন্তা করতে লাগল। প্রিয় হরিণটির বিষাদ-মাখা চাহনির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ অবস্থাতেই আত্মা তাঁর দেহ ছেড়ে চলে গেল। এর ফলে পরজন্মে তিনি হরিণ হয়ে জন্মালেন। কিন্তু কোনও কর্মই নষ্ট হয় না এবং রাজা ও ঋষি হিসাবে তিনি যে সব মহৎ কাজ করেছিলেন তার ফল এখন ফলল। হরিণটি জাতিস্মর হয়ে জন্মাল এবং বাক্‌শক্তি রহিত ও জন্তুদেহ থাকলেও সে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারত। সে সর্বদাই সঙ্গীদের ছেড়ে যেত এবং যেখানে পূজার্চনা হত ও উপনিষদ শিক্ষা দেওয়া হত সেই সব তপোবন সহজাত-ভাবে তাকে আকর্ষণ করত ও সেগুলির কাছেই সে চরে বেড়াত।

হরিণের স্বাভাবিক জীবনকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার মৃত্যু হল। পরজন্মে রাজা এক ধনী ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র হিসাবে জন্ম নিলেন। আর এ জীবনেও তিনি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারতেন এবং শৈশব থেকেই জীবনের ভালমন্দর সঙ্গে আর জড়িয়ে না পড়ার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি একটিও কথা বলতেন না, এবং পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে তিনি জড় ও উন্মাদের মত থাকতেন। তিনি সর্বদাই অসীমের চিন্তা করতেন এবং অতীতের প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্ত করার জন্যই তিনি বেঁচেছিলেন। কালক্রমে তাঁর পিতার মৃত্যু হল এবং পুত্রেরা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে নিল, কনিষ্ঠটিকে মূক ও অপদার্থ মনে করে অন্যরা তাঁর সম্পত্তি আত্মসাৎ করল। তাঁদের দয়া কেবল তাঁকে জীবনধারণের মত খাদ্য যোগানতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর ভ্রাতৃবধূরা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করত, সমস্ত ভারী কাজ তাঁকেই করতে দিত; তারা যা চাইত তার সব কিছু করতে না পারলে তাঁর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করত। কিন্তু তিনি বিরক্তি বা ভয় প্রকাশ করতেন না, কোন কথাও বলতেন না। যখন তারা অতিরিক্ত নির্যাতন করত তখন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন, তাদের রাগ না পড়া পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছতলায় বসে থাকতেন, তারপর শান্তমনে আবার বাড়ি ফিরে যেতেন।

একদিন তাঁর ভ্রাতৃবধূরা অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি নির্দয় ব্যবহার করতে থাকলে ভরত বাড়ির বাইরে একটা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। ঘটনাচক্রে তখন সে দেশের রাজা বেহারাদের কাঁধে বওয়া পাল্কি চড়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন পাল্কি-বাহক অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাজপরিচারকরা তার জায়গায় একজন লোকের খোঁজ করতে লাগল। গাছের তলায় বসা ভরতকে তারা দেখতে পেল। তাঁকে একজন সবল যুবক দেখে জিজ্ঞাসা করল অসুস্থ লোকটির জায়গায় পাল্কি বইতে রাজি কিনা। কিন্তু ভরত কোনও জবাব দিলেন না। শক্ত-সমর্থ লোক দেখে রাজভৃত্যরা তাঁকে জোর করে টেনে নিয়ে তাঁর কাঁধের পাল্কির দাঁড় চাপিয়ে দিল। কোনও কথা না বলে ভরত চলতে লাগলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই রাজা মন্তব্য করলেন যে পাল্কি সমতালে চলছে না। পাল্কি থেকে মুখ বের করে তিনি নতুন পাল্কি-বাহককে বললেন "ওরে নির্বোধ, একটু বিশ্রাম কর। তোর কাঁধে যদি

ব্যথা হয়ে থাকে তো একটু বিশ্রাম কর।" তারপর ভরত পাল্কির দাঁড় নীচে নামিয়ে তাঁর এ জীবনে এই সর্বপ্রথম মুখ খুললেন ও বললেন "হে রাজন্, কাকে আপনি নির্বোধ বলছেন? কাকে আপনি পাল্কি নামাতে বললেন? কাকে আপনি ক্লান্ত বললেন? কাকে আপনি 'তুই' বলে সম্বোধন করলেন? হে রাজন্, এই তুই শব্দটির দ্বারা আপনি যদি এই মাংসপিণ্ডকে বুঝিয়ে থাকেন তবে আপনার শরীরও এই একই বস্তুতে গঠিত, এ অচেতন, এ কোনও ক্লান্তি জানে না, কোনও ব্যথা জানে না। আর আপনি যদি মনকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে এ মনও আপনার মনের মতই; এ সার্বজনিক। কিন্তু যদি 'তুই' শব্দটিকে তার বাইরের কিছুর প্রতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তবে তা পরমাত্মা, আমার মধ্যেকার প্রকৃত পরমসত্তা আপনার মধ্যে যা তাই, আর তিনিই জগতের একমাত্র সত্তা। হে রাজন্, আপনি কি মনে করেন যে আত্মা কখনও ক্লান্ত হতে পারে, কখনও শ্রান্ত হতে পারে, কখনও আহত হতে পারে? হে রাজন্, আমি চাইনি, এই দেহ চায়নি, পথ-চলতি বেচারা পোকাগুলোকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতে, তাই ওগুলোকে এড়াতে গিয়ে পাল্কি বেতালে চলেছে। কিন্তু পরমাত্মা কখনও ক্লান্ত হয়নি, সে কখনও দুর্বল হয়নি, সে কখনও পাল্কির দাঁড় কাঁধে নেয়নি, কারণ পরমাত্মা সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান।" এইভাবে তিনি আত্মার প্রকৃতি ও সর্বোচ্চ জ্ঞান সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করলেন। নিজের শিক্ষা, জ্ঞান ও দর্শন নিয়ে গর্বিত রাজা পাল্কি থেকে নেমে এসে ভরতের পায়ে পড়ে বললেন "হে শক্তিমান, ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আপনাকে যখন পাল্কি বইতে বলেছিলাম তখন জানতাম না যে আপনি একজন ঋষি।" ভরত তাঁকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন। তারপর তিনি তাঁর পূর্ব জীবনের শান্ত ছন্দে ফিরে গেলেন। ভরত যখন দেহত্যাগ করলেন তখন তিনি জন্মের দাসত্ব থেকে চিরমুক্তি লাভ করলেন।

প্রহ্লাদের গল্প
(ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত)

হিরণ্যকশিপু দৈত্যদের রাজা ছিলেন। দেবতাদের সঙ্গে একই বংশোদ্ভব হলেও সর্বদাই দৈত্যরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাত। মানবজাতির পূজার্চনার অর্ঘ্যে দৈত্যদের কোনও ভাগ ছিল না, জগতের শাসনকার্যে বা পরিচালনায়ও তাদের কোনও ভাগ ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও তারা প্রবল হয়ে উঠত; দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে তাদের সিংহাসন দখল করত ও কিছুকাল শাসন চালাত। তখন দেবতারা সর্বত্র-বিরাজমান, জগদীশ্বর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হতেন ও বিষ্ণু তাঁদের উদ্ধার করতেন। দৈত্যদের তাড়িয়ে দেওয়া হত ও দেবতারা আবার সিংহাসনে বসতেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁর জ্ঞাতিভাই দেবতাদের পরাজিত করতে সক্ষম হলেন ও স্বর্গের সিংহাসন দখল করলেন, আর ত্রিভুবন, অর্থাৎ মানুষ ও জন্তু-অধ্যুষিত মর্ত্য, দেবতা ও দেবতুল্য সত্তা অধ্যুষিত স্বর্গ এবং দৈত্য-অধ্যুষিত পাতাল শাসন করতে লাগলেন। তারপর হিরণ্যকশিপু নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলে দাবি করলেন ও ঘোষণা করলেন যে তিনি ছাড়া আর কোনও ভগবান নেই, কঠোর নির্দেশ দিলেন যে কোথাও সর্বত্র-বিরাজমান বিষ্ণুর পূজা চলবে না, আর এখন থেকে সমস্ত অর্ঘ্যাদি তাঁকেই দিতে হবে।

প্রহ্লাদ নামে হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র ছিল। ঘটনাচক্রে এই প্রহ্লাদ শিশুকাল থেকেই ভগবানের ভক্ত হয়ে উঠেছিল। শিশু অবস্থায় তার এইসব লক্ষণ দেখা দেয়। দৈত্যরাজ যে অমঙ্গলকে জগৎ থেকে তাড়াতে চেয়েছিলেন তা পাছে তাঁর নিজের পরিবারেই ঢুকে পড়ে এই ভয়ে তিনি তাঁর পুত্রকে ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই গুরুর কাছে দিলেন, যাঁরা ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ। আর তাঁদের নির্দেশ দিলেন যে প্রহ্লাদের সামনে যেন বিষ্ণুর নামও উচ্চারিত না হয়। গুরুরা যুবরাজকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গেলেন ও তার সমবয়সী বালকদের সঙ্গে পড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু ছোট্ট প্রহ্লাদ বই থেকে কিছু শেখার পরিবর্তে অপরাপর বালকদের কিভাবে বিষ্ণুপূজা করতে হয় তাই শিখিয়ে সময় কাটাতে লাগল। গুরুরা যখন তা জানতে পারলেন তখন পরাক্রান্ত রাজা হিরণ্যকশিপুর রোষের ভয়ে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া থেকে বালককে বিরত করার তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু নিঃশ্বাস নেওয়া যেমন বন্ধ করা যায় না তেমনি প্রহ্লাদও তার বিষ্ণুপূজা বন্ধ করতে পারল না। নিজেদের উপর যাতে দোষ না পড়ে তার জন্য গুরুরা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা রাজাকে জানালেন; জানালেন যে তাঁর পুত্র শুধু যে নিজে বিষ্ণুপূজা করছে তা-ই নয়, অন্যান্য বালকদেরও বিষ্ণুপূজা শিখিয়ে নষ্ট করছে।

সম্রাট একথা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন ও পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। পুত্রকে আদর করে বুঝিয়ে তিনি বিষ্ণুপূজা থেকে বিরত করার চেষ্টা করলেন ও তাকে শেখালেন যে রাজাই একমাত্র ভগবান যাঁকে পূজা করতে হবে। কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। বালক বার বার বলতে লাগল যে সর্বত্র-বিরাজমান জগদীশ্বর বিষ্ণুই কেবল পূজ্য—

কারণ এমনকি রাজাও ততক্ষণই সিংহাসনে আসীন যতক্ষণ তা বিষ্ণুর ইচ্ছা। রাজার ক্রোধের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। তিনি অবিলম্বে বালককে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। দৈত্যরা তাকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করল। কিন্তু প্রহ্লাদের মন বিষ্ণুতে এত অভিনিবিষ্ট ছিল যে সে কোনও ব্যথা অনুভব করল না।

রাজা এসব দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর মধ্যে দৈত্যের ভয়ঙ্কর ক্রোধ জাগ্রত হল। বালকটিকে হত্যা করার জন্য তিনি নানা দানবীয় ফন্দি আঁটতে লাগলেন। তাকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারার নির্দেশ দিলেন। ক্রোধোন্মত্ত হাতি যেমন এক তাল লোহাকে পিষে ফেলতে পারে না, প্রহ্লাদকেও তেমনি পিষতে পারল না। এ ব্যবস্থাও ব্যর্থ হল। তারপর রাজা বালককে পাহাড়ের চুড়ো থেকে ফেলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। সে আদেশও যথাযথভাবে পালিত হল। কিন্তু প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণুর বাস, কাজেই ঘাসের উপর যেমন ফুল পড়ে তেমনি আলতোভাবেই সে মাটিতে পড়ল। বিষ, আগুন, অনাহার, কূপে নিক্ষেপ, যাদুমন্ত্র ও অন্যান্য নানা পীড়ন বালকের উপর করা হল। কিন্তু যার হৃদয়ে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান তাকে কিছুই আঘাত করতে পারল না।

অবশেষে রাজা নির্দেশ দিলেন যে পাতাল থেকে বিরাট বিরাট সাপ এনে তা দিয়ে তাকে বেঁধে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দিতে হবে। তার উপর বড় বড় পর্বত চাপিয়ে দিতে হবে যাতে তখনই না হোক পরে পশ্চাতে তার মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থাতেই তাকে রেখে দিতে হবে। তার প্রতি এ রকম ব্যবহার সত্ত্বেও বালক তার প্রিয় বিষ্ণুর উপাসনা করে চলল: "জগদীশ্বর, তোমায় প্রণাম। তুমি অনিন্দ্য-সুন্দর বিষ্ণু।" এইভাবে বিষ্ণু-চিন্তা, বিষ্ণু-ধ্যান করতে করতে সে অনুভব করল যে বিষ্ণু তার কাছেই আছেন, না, তিনি তার নিজের আত্মাতেই আছেন। শেষ পর্যন্ত সে অনুভব করতে লাগল যে সে-ই বিষ্ণু, সে-ই সব ও সর্বত্র বিরাজমান।

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সাপের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, পর্বতগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হল, সমুদ্র উত্তাল হল। তারপর ঢেউ-এর মাথায় মৃদুমন্দ দুলতে দুলতে প্রহ্লাদ সমুদ্রসৈকতে পৌঁছে গেল। সেখানে দাঁড়াতেই সে ভুলে গেল যে সে একটি দৈত্য ও তার একটি মরদেহ আছে, তার মনে হল সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি তার থেকেই নির্গত হচ্ছে; প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাকে আঘাত করতে পারে; সে নিজেই প্রকৃতির শাসক। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রহ্লাদের মনে পড়তে শুরু করল যে তার একটা দেহ আছে ও সে প্রহ্লাদ, ততক্ষণ তার কেটে গেল নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত সুখের অনির্বচনীয় আনন্দে। নিজের দেহ সম্বন্ধে সচেতন হতেই সে দেখল ভগবান ভিতরেও আছেন, বাইরেও আছেন। সব কিছুই তার কাছে বিষ্ণু বলে প্রতীয়মান হল।

হিরণ্যকশিপু যখন সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলেন যে তাঁর শত্রু ভগবান বিষ্ণুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত পুত্রকে হত্যা করার সমস্ত রকম মারাত্মক পদ্ধতি ক্ষমতাহীন, তখন তিনি কি করবেন বুঝে পেলেন না। রাজা আবার পুত্রকে ডেকে পাঠালেন, নিজের উপদেশ মানানোর জন্য শান্তভাবে আবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ একই জবাব দিল।

বয়স হলে ও আরও শিক্ষা পেলে বালকের এই সব শিশু-সুলভ খামখেয়ালি শোধরাবে এ কথা ভেবে রাজা আবার ওই দুই গুরু ষণ্ড ও অমর্কের তত্ত্বাবধানে প্রহ্লাদকে দিলেন এবং তাঁদের বলে দিলেন তাকে রাজার কর্তব্য শেখাতে। কিন্তু সে সব শিক্ষা প্রহ্লাদের মনে ধরল না। বিষ্ণু আরাধনার পথে সতীর্থদের শিক্ষা দেওয়াতেই সে তার সময় কাটাল।

এ সব কথা শোনার পর তার পিতা আবার ক্রোধে ফেটে পড়লেন। পুত্রকে ডেকে হত্যা করার হুমকি দিলেন ও জঘন্য ভাষায় বিষ্ণুকে গালিগালাজ করলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ তখনও জোর গলায় বলতে থাকল যে বিষ্ণু হলেন জগদীশ্বর, যাঁর আদি নেই, অন্ত নেই, যিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান, কাজেই তিনিই একমাত্র পূজ্য। রাজা ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন: "অলক্ষুণে কোথাকার! তোর বিষ্ণু যদি সর্বত্রই থাকে তবে সামনের ওই থামটার মধ্যে সে থাকুক দেখি?" প্রহ্লাদ বিনম্র ভাবে বলল "তিনি ওখানে আছেন।" রাজা চিৎকার করে উঠলেন "যদি তাই হয় তবে সে তোকে রক্ষা করুক, এই তরবারি দিয়ে তোকে কেটে ফেলব," এই বলে রাজা তরবারি হাতে তার দিকে ছুটে গেলেন ও থামের উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল। আর সে কি কাণ্ড! থামের ভিতর থেকে বিষ্ণু ভয়ঙ্কর নৃসিংহ রূপে, অর্থাৎ অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক মানুষ রূপে বেরিয়ে এলেন। আতঙ্কিত দৈত্যরা চতুর্দিকে দৌড়ে পালাল; কিন্তু সম্পূর্ণ পরাস্ত ও নিহত না হওয়া পর্যন্ত হিরণ্যকশিপু তাঁর সঙ্গে বহুক্ষণ মরীয়া হয়ে লড়াই করলেন।

তারপর দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে এলেন ও বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। প্রহ্লাদ তাঁর পায়ে পড়ে প্রশংসা ও ভক্তিতে আপ্লুত অপূর্ব স্তুতিগান করতে লাগল। তখন সে ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল "প্রহ্লাদ, বর চাও, তোমার যা খুশি বর চাও। তুমি আমার প্রিয় সন্তান; তাই তোমার যা ইচ্ছা তাই চাইতে পার।" আনন্দে কণ্ঠরুদ্ধ অবস্থায় প্রহ্লাদ জবাব দিল "ভগবান, আমি তোমার দর্শন পেয়েছি। আর আমার কি চাওয়ার আছে? আমাকে পার্থিব বা স্বর্গীয় বরের কথা বলে লোভ দেখিও না।" আবার বাণী শোনা গেল "পুত্র, তবু তুমি কিছু চাও।" প্রহ্লাদ জবাব দিল "ভগবান, পার্থিব বস্তুর প্রতি অজ্ঞদের যেমন সুগভীর আসক্তি থাকে, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা তেমনই গভীর থাকুক। কিন্তু সে ভালবাসা কেবল ভালবাসারই জন্য!"

তখন ভগবান বললেন "প্রহ্লাদ, আমার পরম ভক্তরা যদিও কখনও এ জগতে বা পরলোকে কিছুই চায় না, তবু তোমার হৃদয় আমাতে স্থির রেখে আমার আদেশে বর্তমান চক্রের শেষ পর্যন্ত তুমি পার্থিব সুখ ভোগ কর, ধর্মনিষ্ঠ কীর্তি প্রতিষ্ঠা কর; যথা সময়ে তোমার দেহ বিলীন হলে তুমি আমাকে পাবে।" এই ভাবে প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করে ভগবান বিষ্ণু অন্তর্ধান করলেন। তারপর ব্রহ্মার নেতৃত্বে দেবতারা প্রহ্লাদকে দৈত্যদের সিংহাসনে বসালেন ও নিজ নিজ মণ্ডলে ফিরে গেলেন।

জগতের মহাগুরুগণ

(ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনার শেক্সপীয়ার ক্লাবে ১৯০০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত ভাষণ)

হিন্দুদের তত্ত্ব অনুযায়ী এই মহাজগত তরঙ্গ রূপের চক্রে চক্রে চলছে। এই তরঙ্গ ওঠে, সর্বোচ্চ বিন্দুতে ওঠে, তারপর পড়ে যায় ও কিছুকাল যেন গহ্বরে পড়ে থাকে, আবার ওঠে। এই রকম তরঙ্গের পর তরঙ্গ ও পতনের পর পতন। জগৎ সম্বন্ধে যা সত্য জগতের সকল অংশ সম্পর্কেও তা সত্য। মানবিক ব্যাপারের অগ্রগতি সেই রকম। বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও সেই রকম, সেগুলি ওঠে ও পড়ে। উত্থানের পর একটা পতন আসে, আবার সেই পতন থেকে প্রবলতর শক্তিতে উত্থান আসে। এই গতি সর্বদা চলেছে। ধর্মীয় জগতেও এই রকম আন্দোলন চলছে। প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে পতনও আছে, আবার উত্থানও আছে। জাতির পতন হয়, মনে হয় সবকিছু ভেঙে-চুরে গেল। তারপর আবার সে প্রবল হয়, উত্থিত হয়; বিরাট তরঙ্গ আসে, কখনও কখনও জলোচ্ছ্বাস আসে—সর্বদা সর্বোচ্চ তরঙ্গের একেবারে শীর্ষে থাকেন একটি দীপ্যমান আত্মা, যিনি মহাদূত। পর্যায়ক্রমে স্রষ্টা ও সৃষ্ট তিনিই হলেন সেই উদ্দীপনা যে তরঙ্গকে ওঠায়, জাতিকে ওঠায়। একই সঙ্গে তিনিও আবার সেই একই শক্তির দ্বারা সৃষ্ট যা পর্যায়ক্রমে ক্রিয়া ও পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা সেই তরঙ্গকে সৃষ্টি করে। তিনি সমাজের উপর তাঁর বিপুল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, আর সমাজ তাঁকে তিনি যা তাই করে তোলে। এঁরা মহান বিশ্ব-চিন্তাবিদ। এঁরা জগতের প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ (prophet), জীবনের মহাদূত ও ভগবানের অবতার।

লোকের একটা ধারণা আছে যে ধর্ম একটাই হতে পারে, প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ একজনই হতে পারেন এবং অবতার একটিই হতে পারেন। কিন্তু এ ধারণা সত্যি নয়। এই সব মহাদূতদের জীবন অধ্যয়ন করে আমরা দেখি যে প্রত্যেকের জন্যই যেন একটা ভূমিকা নির্দিষ্ট করা আছে, আর সে ভূমিকা কেবল আংশিক; সমন্বয় হয় সব কটি সুর নিয়ে, কেবল একটি নিয়ে নয়। জাতিগুলির জীবনেও তাই, কোনও জাতি একা বিশ্ব উপভোগের জন্য জন্মায়নি। কারও সাহস নেই না বলবে। জাতিগুলির দিব্য সমন্বয়ে প্রত্যেক জাতির একটা ভূমিকা আছে। প্রত্যেক জাতির পালনীয় আপন ব্রত আছে, সম্পাদনীয় আপন কর্তব্য আছে। মোট ফল হল মহৎ সমন্বয়।

কাজেই কোনও একজন প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ জগতের উপর চিরকাল কর্তৃত্ব করার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি। কেউ চিরকাল জগতের কর্তা থাকতে এখনও পর্যন্ত পারেন নি, পারবেনও না। প্রত্যেকে কেবল আংশিক অবদান করেন, আর সেই অংশের কথা বললে একথা সত্য যে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষই জগৎ ও তার ভবিতব্যের উপর কর্তৃত্ব করবেন।

আমাদের বেশির ভাগই এক একটা ব্যক্তিগত ধর্মে আজন্ম বিশ্বাসী। আমরা নীতির কথা বলি, তত্ত্বের কথা ভাবি, সে ঠিক আছে; কিন্তু প্রতিটি চিন্তা ও প্রতিটি

আন্দোলন, আমাদের প্রতিটি ক্রিয়া দেখিয়ে দেয় যে নীতিটা আমরা তখনই কেবল বুঝি যখন তা কোনও একজন ব্যক্তির মাধ্যমে আসে। একটা ভাবধারা আমরা কেবল তখনই আয়ত্ত করতে পারি যখন তা বাস্তবায়িত আদর্শ ব্যক্তির মাধ্যমে আসে। শিক্ষাকে আমরা কেবল দৃষ্টান্ত দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। ভগবান এমন করতে পারতেন যে সকলেই আমরা এত উন্নত যে আমাদের কোনও দৃষ্টান্তের, কোনও ব্যক্তির দরকার নেই। কিন্তু তা আমরা নই; স্বভাবতই মানবসমাজের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ তাদের আত্মাকে এই সব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের—এই প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের, এই ভগবানের অবতারদের পাদমূলে অর্পণ করেছে; ক্রিশ্চানরা, বৌদ্ধরা ও হিন্দুরা এই অবতারদের পূজা করে। মুসলমানরা প্রথম থেকেই এই ধরনের উপাসনার বিরুদ্ধে ছিল। পয়গম্বর বা মহাদূতদের পূজার সঙ্গে তারা কোনও সম্পর্ক রাখতে চায়নি, অথবা তাঁদের পূজার্ঘ দিতে চায়নি। কিন্তু বস্তুত এক পয়গম্বরের বদলে হাজার হাজার পীরের উপাসনা চলছে। তথ্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিত্বকে পূজা করতে আমরা বাধ্য, আর তা ভালও। "ঈশ্বর, আমাদের পিতাকে দেখান" এ প্রশ্নের উত্তরে আপনাদের মহাগুরুর উত্তর স্মরণ করুন: "যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে।" আমাদের কে তাঁকে একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু হিসাবে কল্পনা করতে পারেন? মানবজাতির মধ্যেও তার মাধ্যমেই কেবল আমরা তাঁকে দেখতে পারি। এই ঘরের সর্বত্র আলোর স্পন্দন আছে, কেন আমরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছিনে? ওই বাতিটাকেই কেবল কেন দেখতে হচ্ছে। ভগবান এক সর্বত্র-বিরাজিত মৌলিক উৎস—সর্বত্র; কিন্তু আমরা বর্তমানে এমনভাবে গঠিত যে তাঁকে কেবল একজন মানবিক ভগবানের মধ্যে দিয়েই দেখতে পাই, উপলব্ধি করতে পারি। আর যখন এই মহান আলোকগণ আসেন তখন মানুষ ভগবানকে উপলব্ধি করে। আমরা আসি ভিক্ষুক হিসাবে, তাঁরা আসেন সম্রাট হিসাবে। আর আমরা যে ভাবে আসি তার থেকে পৃথকভাবে তাঁরা আসেন। আমরা আসি অনাথের মত, আমরা তাদের মত আসি যারা পথ হারিয়েছে ও পথ জানে না। আমাদের কি করতে হবে? আমরা আমাদের জীবনের অর্থ জানি না। তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। আজ আমরা এক জিনিস করছি, কাল আর এক। আমরা যেন জলের মধ্যে ইতস্তত ভাসমান খড়, যেন ঘূর্ণিঝড়ে ওড়ান পালক।

কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে দেখতে পাবেন এই মহাদূতেরা আবির্ভূত হন, আর জন্মলগ্ন থেকেই তাঁদের ব্রত স্থিরীকৃত ও সুগঠিত হয়ে যায়। সমস্ত পরিকল্পনাটি তৈরি ও ছকা থাকে, তাঁদেরকে এক ইঞ্চি এদিক ওদিক যেতে দেখবেন না। কারণ তাঁরা ব্রত নিয়ে আসেন, একটা বাণী নিয়ে আসেন, তর্ক-বিতর্ক করতে চান না। এই সব মহান শিক্ষক বা প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের কখনও তাঁদের শিক্ষাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে শুনেছেন? না, তাঁদের একজনও তা করেন নি। তাঁরা সরাসরি কথা বলেন। তাঁদের যুক্তি দিতে হবে কেন? তাঁরা সত্যকে দর্শন করেন। সত্যকে কেবল দেখেন না, দেখানও! আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন "ভগবান আছেন?" আর আমি বলি "হাঁ," তাহলে আপনি আমাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করবেন তার যুক্তি কি। আমি

বেচারিকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আপনাকে কিছু যুক্তি বাৎলাতে হবে। যদি আপনি খ্রীষ্টের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন "ভগবান আছেন?" তিনি বলতেন "হাঁ", আর যদি আপনি জিজ্ঞাসা করতেন "কোনও প্রমাণ আছে?" তিনি জবাব দিতেন "ভগবানকে দেখ।" কাজেই দেখছেন এ হল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, মোটেই অনুমান নয়। এখানে অন্ধকারে হাতড়ান নেই। প্রত্যক্ষ দর্শনের শক্তি আছে। এই টেবিলটা আমি দেখছি, যতই যুক্তি দেওয়া হোক আমার সে বিশ্বাস কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এ প্রত্যক্ষ দর্শন। এই রকমই তাঁদের বিশ্বাস—বিশ্বাস নিজেদের আদর্শে, বিশ্বাস নিজেদের ব্রতে, সর্বোপরি বিশ্বাস নিজেদের উপর। তাঁরা মহাজ্যোতি। লোকেরা নিজেদের যতটা বিশ্বাস করে আর কাউকে ততটা করে না। লোকে বলে "আপনি কি ভগবান বিশ্বাস করেন? আপনি কি পরজন্মে বিশ্বাস করেন? আপনি কি অমুক তত্ত্বে বা তমুক আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করেন?" কিন্তু এখানে ভিত্তিটারই অভাব: তা হল নিজের উপর বিশ্বাস। হায়, যে লোক নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারে না, সে অন্য কিছু বিশ্বাস করবে এমন আশা করা যায় কি করে? আমি আমার আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত নই। এক মুহূর্তে ভাবছি আমি আছি, আমায় কেউ ধ্বংস করতে পারে না; পরমুহূর্তেই মৃত্যুভয়ে কাঁপছি। এক মুহূর্তে ভাবছি আমি অমর; পরমুহূর্তে একটা অপচ্ছায়া দেখা দেয়, তারপরই আর জানি না আমি কে, আমি কোথায়। জানি না আমি জীবিত কি মৃত। এক মুহূর্তে মনে করি আমি আধ্যাত্মিক ও আমি নৈতিক বলে বলীয়ান; পরমুহূর্তেই একটা আঘাত আসে, আর আমি চিৎপাত হয়ে যাই। কিন্তু কেন? আমি নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি, আমার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে।

কিন্তু মহাগুরুদের মধ্যে সর্বদা একটা লক্ষণ দেখতে পাবেন: তাঁদের নিজের উপর সুগভীর বিশ্বাস আছে। এ রকম সুগভীর বিশ্বাস অনন্য, আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না। সেই কারণেই এই সব মহাগুরুরা নিজেদের সম্পর্কে যা বলেন তার বহু রকম ব্যাখ্যা করে আমরা উড়িয়ে দিতে চাই, আর তাঁরা তাঁদের উপলব্ধি সম্বন্ধে যা বলেন তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য লোকে বিশ হাজার তত্ত্ব উদ্ভাবন করে। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে তাদের মতো করে ভাবতে পারি না, স্বভাবতই আমরা তাঁদের বুঝতে পারি না।

উপরন্তু, তাঁরা যখন কথা বলেন তখন জগৎ শুনতে বাধ্য। যখন তাঁরা কথা বলেন প্রতিটি শব্দ প্রত্যক্ষ, বোমার মত ফাটে। কথার মধ্যে কি আছে যদি তার পিছনে শক্তি না থাকে? কি ভাষায় আপনি কথা বলেন, কেমন করে আপনার ভাষা সাজান তাতে কি আসে যায়? আপনি বিশুদ্ধ ব্যাকরণ অথবা চমৎকার অলঙ্কারসহ বলেন তাতে কি আসে যায়? আপনার ভাষা শোভন কি না তাতে কি আসে যায়? প্রশ্ন হল আপনার কিছু দেওয়ার আছে কি নেই। এখানে দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্ন, শোনার নয়। আপনার কি কিছু দেওয়ার আছে?—তাই হল প্রথম প্রশ্ন। যদি থাকে তো দিন। কথা কেবল সেই দানকে বহন করে আনে; এ কেবল অনেক পদ্ধতির মধ্যে একটি। কখনও কখনও আমরা আদৌ কথা বলি না। একটা পুরানো সংস্কৃত শ্লোকে

বলা আছে "মহাগুরুকে দেখলাম বৃক্ষতলে আসীন। তিনি ষোল বছরের যুবক, আর শিষ্য আশি বছরের বৃদ্ধ। গুরুর শিক্ষা ছিল নীরবতা, আর শিষ্যের সংশয় দূরীভূত হল।"

কখনও কখনও তাঁরা আদৌ কথা বলেন না, তবু সত্যকে মন থেকে মনে পৌঁছে দেন। তাঁরা দিতে আসেন, তাঁরা আদেশ দেন, তাঁরা মহাদূত, সে আদেশ আপনাকে নিতে হবে, আপনাদের কি মনে নেই যে আপনাদের নিজেদের ধর্মশাস্ত্রে যিসাস কি কর্তৃত্বের সঙ্গে কথা বলেন? "কাজেই তুমি যাও, সমস্ত জাতিকে শেখাও,...তাদের শেখাও আমি যা কিছু আদেশ তোমাদের দিয়েছি তা পালন করতে।" তাঁর সব বাণীতেই এ আছে, নিজের বাণীর উপর বিপুল বিশ্বাস। জগৎ যাঁদের প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ বলে পূজা করে সেই সব বিরাট পুরুষদের জীবনে আপনি এ জিনিস দেখতে পাবেন।

এই সব মহাগুরুরা এ পৃথিবীতে জীবন্ত ভগবান। আর কাকে আমাদের পূজা করা উচিত? আমি আমার মনে ভগবানের একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করি, আর দেখি কি একটা বাজে ছোট্ট জিনিস আমি কল্পনা করেছি; সে ভগবানকে পূজা করা পাপ। চোখ খুলে আমি পৃথিবীর এই মহাত্মাদের বাস্তব জীবন দেখি। আমি ভগবানের যে কল্পনা করে উঠতে পারব তার চেয়ে এ অনেক উঁচু। যদি কেউ আমার কিছু চুরি করে তো আমি তাকে জেলে পাঠাতে ছুটি, সেই আমার মত লোক দয়া সম্বন্ধে কি ধারণা তৈরি করবে? আর আমার ক্ষমার সর্বোচ্চ ধারণাই বা কি হতে পারে? নিজেকে ছাড়িয়ে কিছু নয়। আপনাদের মধ্যে কে নিজের শরীর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন? আপনাদের কে নিজের মন থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন? একজনও নয়। আপনি নিজে বাস্তবে যে জীবন যাপন করেন সে ছাড়া স্বর্গীয় প্রেমের আর কি ধারণা আপনি করতে পারেন? যে অভিজ্ঞতা আমাদের কখনও হয়নি সে বিষয়ে কোনও ধারণা আমরা গড়ে তুলতে পারি না। কাজেই ভগবান সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলার জন্য আমার যথাসাধ্য চেষ্টাও সর্বদাই ব্যর্থ হবে। এখানে আদর্শবাদের কথা নয়, সোজাসুজি ঘটনা—প্রেম, দয়া, পবিত্রতার বাস্তব ঘটনা, যে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা পর্যন্ত থাকতে পারে না।

এই সব লোকের পদতলে পড়ে আমি তাদের ভগবান বলে পূজা করব এতে আশ্চর্যের কি আছে? আর এ ছাড়া কে বা কি করবে? আমি এমন একজন লোক দেখতে চাই যে, যতই কথা বলুক, এছাড়া অন্য কিছু করতে পারে। কথা বলা বাস্তবতা নয়। ভগবান ও মহা-নৈর্ব্যক্তিক ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা-কওয়া তো ভালই, কিন্তু এই মানুষ-ভগবানরাই সকল জাতি ও বর্ণের প্রকৃত ভগবান। মানুষ যতক্ষণ মানুষ আছে ততক্ষণ এই দিব্য পুরুষেরা পূজিত হয়েছেন ও ভবিষ্যতেও হবেন। এরই মধ্যে নিহিত আমাদের বিশ্বাস, এর মধ্যেই নিহিত আমাদের বাস্তবতার আশা। কেবল একটা রহস্যময় নীতি নিয়ে কি কাজ হবে?

আপনাদের কাছে যা বলতে চাই তার অর্থ ও উদ্দেশ্য হল এই যে আমি আমার জীবনে এঁদের সকলকে পূজা করা সম্ভবপর বলে দেখতে পেয়েছি এবং পরে আরও যাঁরা আসবেন তাঁদের জন্যও প্রস্তুত আছি। ছেলে যে কোনও বেশেই হাজির হোক

মা তাকে চিনতে পারবেই ; আর তা যদি না পারে তা হলে আমি নিশ্চিত যে সে ওই লোকের মা নয়। আপনাদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা জগতের কেবল একজন প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষের মধ্যেই সত্য, দেবত্ব ও ভগবানকে দেখতে পান এবং স্বভাবতই অন্য কারও মধ্যে পান না, তাঁদের সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত হল যে তাঁরা কারও মধ্যেই দেবত্ব উপলব্ধি করেন না ; আপনি কেবল কথাই গিলেছেন ও নিজেকে কোনও একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র করে ফেলেছেন, ঠিক যেমন নিজের মতের ব্যাপারে পার্টি-রাজনীতিতে করতেন ; কিন্তু এ আদৌ ধর্ম নয়। কিছু এমন বোকা আছে যে চমৎকার মিষ্টি জল থাকতেও বদ্ধ কষা জলের কুয়ো থেকে জল খাবে কারণ সেটি নাকি তার বাবা খুঁড়িয়েছিলেন। এখন আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ধর্মকে যত রকম শয়তানির অভিযোগে নিন্দা করা হয় তার জন্য ধর্মের আদৌ দোষ নেই। কোনও ধর্ম কোনও দিন মানুষকে নিপীড়ন করেনি, কোনও ধর্ম কখনও ডাইনি পোড়ায়নি, কোনও ধর্ম কোন কালে এ সব করেনি। তাহলে মানুষকে এসব করতে প্ররোচিত করল কি? রাজনীতি, কিন্তু কখনও ধর্ম নয় ; এই রকম রাজনীতি যদি ধর্মের নাম নেয় তো সে দোষ কার?

কাজেই যখন প্রত্যেক লোক উঠে বলে যে "আমার প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষই জগতের একমাত্র ধর্মপ্রবর্তক মহাগুরু," সে ঠিক বলে না—ধর্মের অ-আ, ক-খও সে জানে না। ধর্ম কথাও নয়, তত্ত্বও নয়, মননগত সম্মতিও নয়। এ হল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি ; এ হল ভগবানকে স্পর্শ করা ; এ হল সেই অনুভূতি ও উপলব্ধি যে আমিও সার্বজনিক পরমাত্মা ও তাঁর সকল মহৎ প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি আত্মা। আপনি যদি সত্যিই পিতার গৃহে প্রবেশ করে থাকেন তবে তাঁর সন্তানদের দেখেও চিনবেন না কেন? আর যদি তাঁদের না চিনে থাকেন তো পিতার গৃহে প্রবেশ করেন নি। মা সন্তানকে যে কোনও পোশাকে চেনে, যত ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন চিনতে পারে। প্রতি যুগের ও প্রতি দেশের ঐশিক পুরুষ ও নারীদের চিনুন, দেখতে পাবেন যে তাঁরা একে অপর থেকে সত্যিই তফাৎ নন। যেখানেই সত্যিকার ধর্ম বিরাজ করেছে—দিব্যসত্তার এই স্পর্শ, দিব্যসত্তার সঙ্গে আত্মার এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গত সংযোগ লাভ হয়েছে—সেখানেই সর্বদা মনের এমন প্রসার ঘটেছে যা তাকে সর্বত্র আলো দেখতে সক্ষম করেছে। কিছু মুসলমানরা এদিক থেকে সবচেয়ে স্থূল ও সবচেয়ে সঙ্কীর্ণতাবাদী। তাদের মন্ত্র হল: "আল্লা একই, আর মহম্মদই তাঁর পয়গম্বর।" তার বাইরে সব কিছু কেবল খারাপই নয়, অবিলম্বে তা ধ্বংস করতে হবে ; এতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নয় এমন প্রত্যেক নরনারীকে মুহূর্তের মধ্যে খুন করতে হবে ; এই উপাসনার অঙ্গ নয় এমন সব কিছুকে অবিলম্বে চূর্ণ করতে হবে ; যে কোনও বই এছাড়া অন্য কিছু শিক্ষা দেয় ত অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পাঁচশ বছর ধরে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সর্বত্র রক্ত ঝরেছে। এই হল ইসলাম। তথাপি এই সব মুসলমানদের মধ্যেও যেখানেই একজন দার্শনিক ব্যক্তি দেখা দিয়েছেন তিনিই নিশ্চিতভাবে এই সব

নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এর ভিতর দিয়ে তিনি দিব্যসত্তার স্পর্শ দেখিয়েছেন এবং সত্যের একটি টুকরোকে উপলব্ধি করেছেন; তিনি তাঁর ধর্মের সঙ্গে খেলা করেননি; কারণ তিনি তাঁর পিতৃধর্মের কথা বলেননি, মানুষের মত প্রত্যক্ষ সত্য বলেছেন।

আধুনিক বিবর্তনের তত্ত্বের পাশাপাশি আর একটি জিনিস আছে আদিম অতীতে প্রত্যাবর্তন। আমাদের মধ্যে ধর্মের পুরানো ভাবধারায় ফিরে যাওয়ার একটা ঝোঁক আছে। নতুন কিছু একটা ভাবা যাক, যদি ভুল হয় তবুও। তা করা বরং ভাল। ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করবেন না কেন? ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে আমরা বিজ্ঞতর হই। কাল অনন্ত। দেওয়ালটাকে দেখুন। দেওয়াল কখনও মিথ্যা কথা বলেছে? সে বরাবর দেওয়ালই। মানুষ মিথ্যা কথা বলে—আবার ভগবানও হয়। কিছু একটা করা বরং ভাল; তা যদি ভুলও হয় তাতে আসে যায় না; কিছু না করার চেয়ে তা বরং ভাল। গরু কখনও মিথ্যা বলে না, কিন্তু সে বরাবর গরুই থাকে। কিছু একটা করুন। কিছু চিন্তা করুন, আপনার ভুল হল কি ঠিক হল তাতে কি আসে যায়? একটা কিছুতো ভাবুন! আমার পূর্বপুরুষরা যেহেতু এইভাবে ভাবতেন না, কাজেই আমি কি চুপ করে বসে থাকব ও ক্রমে ক্রমে আমার অনুভূতি বোধ ও আমার নিজের চিন্তাশক্তি হারাব? তা হলে তো মরে গেলেই হয়! আর আমাদের যদি কোন জীবন্ত ভাবধারা না থাকে, ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব কোনও প্রত্যয় না থাকে, তাহলে জীবনের মূল্য কি? নাস্তিকদের পক্ষে বরং কিছু আশা আছে, কারণ যদিও তারা অন্যদের থেকে ভিন্নমত তবু তারা নিজেরা চিন্তা করে। যে লোকেরা নিজেরা কিছু ভাবে না ধর্মের জগতে এখনও তাদের জন্মই হয়নি; তাদের অস্তিত্বটা কেবল জেলি-মাছের মত! তারা চিন্তা করে না, ধর্মের ধার ধারে না। কিন্তু অবিশ্বাসী, নাস্তিক ধার ধারে, আর সে সংগ্রাম করছে। কাজেই কিছু ভাবুন! সংগ্রাম করে ভগবানের দিকে এগোন! ব্যর্থ হলে ঘাবড়াবেন না, অদ্ভুত কোনও তত্ত্বে পৌঁছলে ঘাবড়াবেন না। লোকে অদ্ভুত বলবে বলে যদি ভয় পান তো তা নিজের মনে রাখুন—অন্যের কাছে প্রচার করার দরকার নেই। কিন্তু করুন কিছু! সংগ্রাম করে ভগবানের দিকে এগোন। আলো আসবেই। জীবনের প্রতিদিন যদি কেউ আমায় খাইয়ে দেয় তো শেষ পর্যন্ত আমার ভাতের ব্যবহারটাই হারাব। পরস্পরকে ভেড়ার পালের মত অনুসরণ করার ফলেই আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়। মৃত্যু হল নিষ্ক্রিয়তার ফল। সক্রিয় হন; আর যেখানেই ক্রিয়া আছে সেখানেই পার্থক্য হতে বাধ্য। পার্থক্য জীবনের ব্যঞ্জন; পার্থক্য হল সৌন্দর্য, সে হল সব কিছুর কলা। এখানে পার্থক্যই সব কিছুকে সুন্দর করে। বৈচিত্র্যই জীবনের উৎস, জীবনের লক্ষণ। তাকে ভয় করব কেন?

এখন আমরা প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষদের সম্বন্ধে বোঝার একটা অবস্থায় আসছি। এখন আমরা দেখছি যে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হল—ধর্মে জেলি-মাছের মত অস্তিত্ব ছাড়া—যেখানেই কোনও সত্যিকারের চিন্তা হয়েছে, ভগবানের প্রতি কোনও সত্যিকারের ভালবাসা এসেছে, আত্মা ভগবানের দিকে এগিয়েছে এবং যেন এক

মুহূর্তের জন্য হলেও, জীবনে একবার হলেও কখনও কখনও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির একটা ঝলক এসেছে। "যিনি নিকটের নিকটতম ও দূরের দূরতম, তাঁকে যখন দেখা যায় তখন সকল সংশয় চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়, হৃদয়ের সকল কুটিলতা সরল হয়ে যায় এবং ক্রিয়া ও কর্মের সকল ফল উড়ে যায়।" এই হল ধর্ম, এই হল ধর্মের সর্বস্ব; বাকিটা কেবল তত্ত্ব, আপ্তবাক্য, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অবস্থায় পৌঁছানোর বিভিন্ন পথ। এখন আমরা ঝুড়ির জন্য ঝগড়া করছি, ফল খানায় পড়ে গিয়েছে।

দু জন লোক যদি ধর্ম নিয়ে ঝগড়া করে তাদের কেবল এই প্রশ্নটা করুন: "ভগবানকে দেখেছেন? এই সব জিনিস দেখেছেন?" একজন বলছে খ্রীষ্টই একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ: বেশ, সে কি খ্রীষ্টকে দেখেছে? "আপনার বাবা ভগবানকে দেখেছেন?" "না, মশাই।" "আপনার ঠাকুর্দা তাঁকে দেখেছেন?" "না, মশাই।" "আপনি দেখেছেন?" "না, মশাই।" "তা হলে কি নিয়ে ঝগড়া করছেন? ফলগুলো খানায় পড়ে গেল, আর আপনারা ঝুড়ি নিয়ে ঝগড়া করতে থাকলেন!" বুদ্ধিমান নরনারীর এভাবে ঝগড়া করতে লজ্জিত হওয়া উচিত!

এই মহাদূতেরা ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষেরা প্রকৃতই মহৎ ও সত্য। কেন? কারণ তাঁদের প্রত্যেকেই একটা করে মহৎ ভাবধারা প্রচার করতে আসেন। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষের প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের কথা ধরা যাক। ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে তাঁরা প্রাচীনতম। প্রথমে কৃষ্ণের কথা ধরা যাক। আপনারা গীতা পড়েছেন আর দেখেছেন সমগ্র গ্রন্থটি জুড়ে একটিই ভাব—তা হল নিরাসক্তি। নিরাসক্ত থাকুন। আপনার হৃদয়ের ভালবাসা কেবল একজনের প্রতিই। কার প্রতি? তাঁর প্রতি যিনি কখনও বদলান না। তিনি কে? তিনি ভগবান! যা কিছু পরিবর্তনশীল তাকে হৃদয়ে দিয়ে ভুল করবেন না, কারণ তা দুঃখ। কোনও মানুষকে হৃদয় দিতে পারেন, কিন্তু সে যদি মারা যায় ফল হবে দুঃখ। বন্ধুকে হৃদয় দিতে পারেন, কিন্তু কাল সে শত্রু হয়ে উঠতে পারে। স্বামীকে যদি হৃদয় দেন, সে কোনও দিন আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে। স্ত্রীকে হৃদয় দিতে পারেন, সে পরশু মারা যেতে পারে। জগৎ এই পথেই চলেছে। তাই গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন: ভগবানই কেবল একমাত্র যিনি কখনই বদলান না। তাঁর প্রেম কখনও ক্ষয় হয় না। যেখানেই আমরা থাকি, যাই আমরা করি তিনি চিরকাল একই করুণাময়, একই প্রেমপূর্ণ হৃদয়। তিনি কখনও বদলান না। আমরা যাই করি না কেন, তিনি কখনও রাগ করেন না। ভগবান কি করে আমাদের উপর রাগ করবেন? আপনার বাচ্চা অনেক কিছু দুষ্টুমি করে; আপনি কি সেই বাচ্চার উপর রাগ করেন? ভগবান কি জানেন না আমরা কি হতে যাচ্ছি? ভগবান জানেন যে আগেই হোক আর পরেই হোক আমরা সবাই নিখুঁত হতে যাচ্ছি। তাঁর ধৈর্য আছে, অসীম ধৈর্য। আমাদের তাঁকে ভালবাসতে হবে, যা কিছু জীবন্ত তাকে ভালবাসতে হবে কেবল তাঁর মধ্যে ও তাঁর মারফৎ। এই হল মূলমন্ত্র। স্ত্রীকে ভালবাসতে হবে, কিন্তু স্ত্রীর জন্য নয়। "হে প্রিয়, স্বামী কখনও স্বামী বলে ভালবাসা পায় না, পায় স্বামীর মধ্যে ভগবান আছেন বলে।" বেদান্ত দর্শন বলে যে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায়ও পর্যন্ত, স্ত্রী যদিও ভাবে স্বামীকে

ভালবাসছে কিন্তু আসল আকর্ষণ হলেন ভগবান, যিনি তার মধ্যে বিরাজ করছেন। তিনিই একমাত্র আকর্ষণ, আর কেউ নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রী জানে না যে ব্যাপারটা এই, কিন্তু অজ্ঞানেও সে ঠিক কাজই করছে, সে হল ভগবানকে ভালবাসা। কেবল কেউ যখন অজ্ঞানে তা করে তখন তা বেদনা আনতে পারে। কেউ যদি জ্ঞানে করে তবে তা হল মুক্তি। আমাদের ধর্মশাস্ত্র তাই বলে। যেখানেই ভালবাসা সেখানেই আনন্দের স্ফুলিঙ্গ, সে স্ফুলিঙ্গকে তাঁর উপস্থিতির স্ফুলিঙ্গ বলেই জানবেন, কারণ তিনিই আনন্দ, সুখ এবং স্বয়ং ভালবাসা। তা ছাড়া কোনও ভালবাসা হতে পারে না।

কৃষ্ণের শিক্ষার এই হল বরাবরকার ধারা। তিনি তাঁর জাতির মধ্যে একে বপন করেছেন, তাই একজন হিন্দু যখন কিছু করে, এমনকি সে যদি জলও পান করে তা হলে বলে "এতে যদি কোনও পুণ্য থাকে তো এ ভগবানের কাছে যাক।" বৌদ্ধ যদি কোনও ভাল কাজ করে তো বলে "সৎকর্মের গুণ জগতের সম্পত্তি হোক; আমি যা করি তাতে যদি কোনও পুণ্য থাকে তাহলে তা জগতের কাছে যাক; আর জগতের অনিষ্ট আমার কাছে আসুক।" হিন্দু বলে সে ভগবানে সুগভীর বিশ্বাসী; হিন্দু বলে ভগবান সর্বশক্তিমান, আর তিনি সর্বত্র সকল আত্মার পরমাত্মা; হিন্দু বলে "আমি যদি আমার সকল পুণ্য তাঁকে সমর্পণ করি, তাই-ই মহত্তম ত্যাগ, আর তা সমগ্র জগতে যাবে।"

এখন, এ হল একটা পর্যায়; কৃষ্ণের অন্য বাণীটি কি? "জগতের মধ্যে যে বাস করে ও কর্ম করে এবং সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে, জগতের অনিষ্ট তাকে কখনও স্পর্শ করে না। পদ্ম যেমন জলের নীচে জন্মিয়ে উপরে ওঠে, জলের ওপর প্রস্ফুটিত হয়, যে মানুষ সর্ব কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে জাগতিক কর্মে নিযুক্ত থাকে সেও তেমনি।" (গীতা, পঞ্চম অধ্যায়, দশম শ্লোক)।

নিবিড় কর্মযোগের শিক্ষক হিসাবে কৃষ্ণ আর একটি ধারা তুলে ধরেন। গীতা বলে কর্ম কর, কর্ম কর, দিবারাত্র কর্ম কর। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন "তাহলে শান্তি কোথায়? গোটা জীবনটা যদি আমায় গাড়িতে জোতা ঘোড়ার মত কাজ করতে হয় ও জোয়াল কাঁধে মরতে হয় তাহলে এখানে আমি এলাম কি করতে?" কৃষ্ণ বলেন "হাঁ, তুমি শান্তি পাবে। কর্ম থেকে পলায়ন কখনও শান্তির পথ নয়।" যদি পারেন কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করে পর্বত শিখরে যান; এমনকি সেখানেও আপনার মন ছুটে যায়, ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে। একজন এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মহাশয়, আপনি কি সুন্দর একটি জায়গা পেয়েছেন? কত কাল হিমালয়ে পরিভ্রমণ করছেন?" সন্ন্যাসী জবাব দিলেন "চল্লিশ বছর ধরে।" "বেছে নেওয়ার ও স্থির হয়ে বসার মত অনেক তো সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, তা করেন নি কেন?" "কারণ এই চল্লিশ বছরেও আমার মন তা করতে দেয়নি।" আমরা সবাই বলি "শান্তি পাওয়া যাক; কিন্তু মন আমাকে তা করতে দেয় না।"

একজনের তাতার ধরার সেই গল্পটা তো আপনারা জানেন। একজন সৈনিক শহরের বাইরে ছিল, সৈন্যাবাসের কাছে এসে সে চেঁচিয়ে উঠল "আমি এক তাতার ধরেছি।" কে একজন হেঁকে উঠল "নিয়ে এস ভিতরে।" "সে আসবে না, মশাই।"

"তা হলে তুমি চলে এস।" "সে আমায় আসতে দিচ্ছে না, মশাই।" সেই রকমই আমাদের এই মনে আমরা "এক ভাতার ধরেছি।" আমরাও তাকে শান্ত করতে পারছি না, সেও আমাদের শান্ত হতে দিচ্ছে না। সবাই আমরা "ভাতার ধরেছি।" আমরা সবাই বলি "নিরিবিলি হও, শান্ত হও," ইত্যাদি। কিন্তু সে তো প্রত্যেক বাচ্চাও বলতে পারে, আর ভাবে যে সে তা করতে পারে। যাহোক, সে অত্যন্ত কঠিন, আমি চেষ্টা করে দেখেছি। আমি আমার সব কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে পর্বত শিখরে পালিয়েছিলাম; গুহায় ও গভীর অরণ্যে বাস করেছিলাম—কিন্তু সে একই অবস্থা, আমি "ভাতার ধরেছিলাম।" কারণ আমি সর্বদা আমার জগৎ নিয়েই ছিলাম। "ভাতার" আমাদের মনেই আছে, কাজেই বাইরের বেচারিদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা বলি "এই পরিবেশ ভাল, ওই পরিবেশ মন্দ", অথচ "ভাতার" এখানে ভিতরেই আছে। আমরা যদি তাকে শান্ত করতে পারি তো ঠিক হয়ে যাব।

কাজেই কৃষ্ণ আমাদের বলেন কর্তব্যে অবহেলা না করতে, কর্তব্যকে পুরুষের মত নিতে ও ফলের ভাবনা না করতে। ভৃত্যের প্রশ্ন করার অধিকার নেই। সৈনিকের বিতর্ক করার অধিকার নেই। এগিয়ে যান, কি ধরনের কাজ করতে হচ্ছে তার উপর অতিরিক্ত নজর দেবেন না। মনকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিঃস্বার্থ কি না। যদি নিঃস্বার্থ হন কিছুর পরোয়া করবেন না, কেউ আপনাকে ঠেকাতে পারবে না! ঝাঁপিয়ে পড়ুন! উপস্থিত কর্তব্য করুন। আর করলে ক্রমে ক্রমে আপনি সত্যকে উপলব্ধি করবেন: "যে কেউ নিবিড় কর্মের মধ্যে সুগভীর শান্তি পায়, যে কেউ গভীরতম শান্তির মধ্যে মহত্তম কর্ম খুঁজে পায়, সে যোগী, সে মহাত্মা, সে নিখুঁতে পরিণত হয়েছে।"

কাজেই দেখছেন এই শিক্ষার সার হল জগতের সকল কর্তব্য পবিত্র। জগতে এমন কোনও কর্তব্য নেই যাকে আমাদের হীন বলার অধিকার আছে। প্রত্যেক লোকের কর্মই সিংহাসনে সমাসীন সম্রাটের কর্তব্যের মতই ভাল।

বুদ্ধর বাণী শুনুন—বিপুল তাৎপর্যময় বাণী। আমাদের হৃদয়ে এর একটা স্থান আছে। বুদ্ধ বলেছেন "স্বার্থপরতা ও যা কিছু তোমায় স্বার্থপর করে তা নির্মূল কর। দারা, পুত্র, পরিবার রেখ না। বিষয়ী হয়ো না; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও।" বিষয়ী লোক মনে করে সে নিঃস্বার্থ হবে, কিন্তু স্ত্রীর মুখ দেখলেই স্বার্থপর হয়ে যায়। মা মনে করে সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হবে, কিন্তু বাচ্চার দিকে চাইলেই স্বার্থপরতা আসে। যেই কোনও স্বার্থপর বাসনার উদয় হল, যেই কোনও স্বার্থপর কাজ করা হল, অমনি গোটা মানুষটা, আসল মানুষটা বরবাদ হয়ে গেল: সে পশুর মত, দাসের মত, সঙ্গী মানুষদের সে ভুলে যায়। সে আর বলে না "তুমি প্রথমে ও আমি পরে," দাঁড়ায় গিয়ে "আমিই প্রথম, যে যার ব্যবস্থা করুক।"

আমরা দেখি কৃষ্ণের বাণীর আমাদের কাছেও মূল্য আছে। ওই বাণী ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। কৃষ্ণের বাণীতে কান না দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের কোনও কর্তব্য সৎভাবে, শান্তি, আনন্দ ও সুখ নিয়ে করতে পারি না। "তোমার

কর্মে যদি অকল্যাণ থাকে তাতে ভয় পেয়ো না, কারণ এমন কোনও কর্ম নেই যাতে অকল্যাণ নেই।" "ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও, ফলের প্রত্যাশা করো না।"

অপর পক্ষে অপর বাণীটির জন্যও মনের কোণে একটা স্থান আছে: সময় উড়ে চলে যায়, এ জগৎ সীমাবদ্ধ, দুঃখে পরিপূর্ণ। হে সুপ্ত নরনারী, তোমাদের সুখাদ্য, সুবেশ ও আরামদায়ক গৃহ নিয়ে তোমরা কি লক্ষ লক্ষ অনাহারী ও মুমূর্ষুদের একবারও ভাব? এই বিরাট ঘটনার কথা ভাব, কেবল দুঃখ, দুঃখ, আর দুঃখ! শিশুর প্রথম চিৎকারটা লক্ষ্য কর, জগতে যখন প্রথম প্রবেশ করে তখন সে কাঁদে। এই হল সত্য কথা—শিশু কাঁদে। এ কাঁদারই জায়গা। আমরা যদি মহাদূতের কথা শুনি তাহলে আমাদের স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়।

আর একজন মহাদূতকে দেখুন। নাজারেথের তিনি। তিনি শিক্ষা দেন, "প্রস্তুত হও, স্বর্গ রাজ্য হাতের কাছে।" কৃষ্ণের বাণীটি নিয়ে আমি চিন্তা করেছি, নিরাসক্তভাবে কর্ম করার আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু কখনও কখনও ভুলে যাই। তখন হঠাৎ বুদ্ধের বাণী কানে আসে: "সাবধান, কারণ জগতে সব কিছু ক্ষণস্থায়ী, আর এ জীবনে সব সময়ে দুঃখ আছে।" আমি তা শুনি ও কোন্‌টা গ্রহণ করব সে সম্বন্ধে অনিশ্চিত বোধ করি। তখন আবার বজ্রনির্ঘোষে বাণী আসে: "প্রস্তুত হও, স্বর্গরাজ্য হাতের কাছে।" এক মুহূর্তও দেরি করো না। আগামী কালের জন্য কিছু ফেলে রেখ না। চরম ঘটনার জন্য প্রস্তুত হও, অবিলম্বে, এমনকি এক্ষুনি সে তোমায় ধরে ফেলতে পারে। এই বাণীরও একটা স্থান আছে ও তা আমরা স্বীকার করি। মহাদূতকে প্রণাম করি, ভগবানকে প্রণাম করি।

তারপর আসেন মহম্মদ, সাম্যের মহাদূত। আপনারা জিজ্ঞাসা করেন "তাঁর ধর্মে কি ভাল থাকতে পারে?" ভাল যদি নাই থাকত তো তা বাঁচল কেমন করে? ভালই কেবল জীবন্ত থাকে, কেবল বেঁচে যায়; ভালই কেবল শক্তিমান, তাই সে বেঁচে যায়। একজন অপবিত্র লোকের জীবন এমন কি এ জীবনেও কতটা দীর্ঘ? পবিত্র লোকের জীবন কি দীর্ঘতর নয়? নিঃসন্দেহে, কারণ পবিত্রতাই শক্তি, সততাই শক্তি। মহম্মদের শিক্ষায় যদি ভাল কিছু নাই থাকে তো ইসলাম ধর্ম বাঁচল কি করে? অনেক কিছু ভাল আছে। মহম্মদ ছিলেন সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের ধর্মপ্রবর্তক পয়গম্বর।

আমরা দেখি যে প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষের, প্রত্যেক মহাদূতের একটা বিশেষ বার্তা আছে। যখন প্রথম সে বাণী শোনেন ও তারপর তাঁর জীবনের দিকে তাকান, তা হলে দেখবেন তাঁর সমস্ত জীবন ব্যাখ্যাত ও ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠেছে।

অজ্ঞ নির্বোধেরা নিজেদের মানসিক বিকাশ অনুযায়ী বিশ হাজার তত্ত্ব খাড়া করে, নিজেদের ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার ব্যাখ্যা করে, আর সেগুলি মহাগুরুদের উপর চাপায়। তারা এঁদের শিক্ষাগুলো নিয়ে তার উপর নিজেদের ভুল ব্যাখ্যা চাপায়। প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষের জীবনই তাঁর ধর্মের একমাত্র ব্যাখ্যা। তাঁর জীবন দেখুন, তিনি যা করেছিলেন তা দিয়েই তাঁর ধর্মশাস্ত্র প্রমাণিত

হয়েছে। গীতা অধ্যয়ন করুন, দেখুন শিক্ষাদাতার জীবন দিয়ে তা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মহম্মদ তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে মুসলমানদের মধ্যে নিখুঁত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব থাকা উচিত। সেখানে জাতি, বর্ণ, বিশ্বাস, গায়ের রং বা স্ত্রী-পুরুষের কোন প্রশ্ন ছিল না। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার বাজার থেকে একজন নিগ্রোকে কিনতে পারেন ও শিকলে বেঁধে তাকে তুরস্কে নিয়ে আসতে পারেন; কিন্তু সে যদি মুসলমান হয় ও তার যদি যথেষ্ট গুণ ও যোগ্যতা থাকে, তাহলে সে এমনকি তুরস্কের সুলতানের কন্যাকে বিবাহও করতে পারে। এর সঙ্গে তুলনা করুন এ দেশে নিগ্রোদের সঙ্গে ও আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা হয়! আর হিন্দুরা কি করে? আপনাদের কোনও মিশনারি যদি কোনও গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁয়ে ফেলেন তো তিনি সে খাবার ফেলে দেবেন। আমাদের মহান দর্শন সত্ত্বেও আমাদের অভ্যাসের দুর্বলতা লক্ষ্য করুন। কিন্তু সেখানে মুসলমানদের মহত্ত্ব দেখুন, জাতির সীমা পার হয়েও, সাম্যের মধ্যে, জাতি ও গায়ের রং নির্বিশেষে নিখুঁত সাম্যের মধ্যে প্রতীয়মান।

অন্যান্য ও আরও মহান প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের কি আর আবির্ভাব হবে? এ জগতে নিশ্চয়ই তাঁরা আসবেন। কিন্তু তার জন্য চেয়ে বসে থাকবেন না। আমি বরং চাই আপনারা সকলে এই সত্যিকারের নিউ টেস্টামেণ্টের—যা সমস্ত ওল্ড টেস্টামেণ্ট দিয়ে তৈরি—তার প্রত্যাদিষ্ট মহাগুরু হন। সমস্ত পুরানো বাণীগুলি নিন, নিজের উপলব্ধি দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করুন ও অন্যদের কাছে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হন। এই সব মহাগুরুর প্রত্যেকেই মহান ছিলেন; প্রত্যেকেই আমাদের জন্য কিছু রেখে গিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন আমাদের ভগবান। তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই, আমরা তাঁদের সেবক, আবার সেই সঙ্গে নিজেদের উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানাই; কারণ তাঁরা যদি প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হন ও ভগবানের সন্তান হন, আমরাও তাই। যিশাস-এর সেই কথাগুলি স্মরণ করুন "স্বর্গরাজ্য হাতের কাছেই!" এই মুহূর্তে আসুন আমাদের প্রত্যেকে একটা সুদৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করি: "আমি একজন প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হব, আমি আলোকের দূত হব, আমি ভগবানের সন্তান হব, না, আমি স্বয়ং ভগবান হব!"

প্রভু বুদ্ধ সম্বন্ধে

(ডেট্রয়েটে প্রদত্ত ভাষণ)

প্রত্যেক ধর্মেই এক ধরনের আত্ম-নিষ্ঠা খুব উন্নত। অভিপ্রায় ছাড়া কর্ম করা বৌদ্ধধর্মে সুবিকশিত। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে যেন গুলিয়ে ফেলবেন না। এ দেশে আমাদের এ ভুল প্রায়ই হয়। বৌদ্ধধর্ম হল আমাদের একটি সম্প্রদায়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহামানব গৌতম। তিনি সমসাময়িক কালের অবিশ্রান্ত আধিবিদ্যক আলোচনা, জবড়জং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিশেষত জাতিভেদ প্রথার প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। কিছু লোক বলে যে আমরা একটা বিশেষ অবস্থায় জন্ম নিই, কাজেই যারা সে অবস্থায় জন্ম নেয় না তাদের চেয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ। তিনি বিপুল পুরোহিততন্ত্রেরও বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করেছিলেন যাতে কোনও চালিকাশক্তি (motive power) ছিল না এবং যা অধিবিদ্যা ও ভগবান সম্পর্কিত নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নাস্তিক ছিল। তাঁকে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হত ভগবান আছেন কিনা, তিনি জবাব দিতেন যে তিনি জানেন না। সঠিক আচরণ কি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলতেন "ভাল কর ও ভাল হও।" পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের বিতর্কের সমাধান করতে। একজন বললেন "প্রভু, আমার গ্রন্থ বলছে যে ভগবান অমুক, আর ভগবানের কাছে পৌঁছানোর পথ অমুক।" আর একজন বললেন "ও কথা ভুল, কারণ আমার গ্রন্থ অমুক বলছে, আর ভগবানের কাছে যাওয়ার এই-ই পথ।" অন্যরাও সেই রকম বললেন। তিনি শান্তভাবে সকলের কথা শুনলেন, তারপর একে একে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনাদের কারও গ্রন্থে কি বলে ভগবান ক্রুদ্ধ হন, তিনি কখনও কাউকে আঘাত করেন, কি তিনি অপবিত্র?" "না, প্রভু, সবাই শেখায় যে ভগবান পবিত্র ও ভাল।" "তাহলে, বন্ধুগণ, আপনারা গোড়ায় সৎ ও ভাল হন না কেন, যাতে ভগবান কি তা জানতে পারেন?"

এই দর্শনের সবটা অবশ্য আমি অনুমোদন করি না। আমার দেশ কিছুটা অধি-বিদ্যা পছন্দ করে। অনেক ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ দ্বিমত, কিন্তু তাই বলে মানুষটির সৌন্দর্য আমি দেখব না এটা কি হতে পারে? তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি সমস্ত চালিকাশক্তি-বিরহিত ছিলেন। অন্যান্য অনেক মহাপুরুষ ছিলেন যাঁরা বলেছিলেন যে তাঁরা স্বয়ং ভগবানের অবতার এবং তাঁদের যারা বিশ্বাস করবে তারা স্বর্গে যাবে। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে কি বলেছিলেন?

"কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারে না, নিজেকে নিজে সাহায্য কর, নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নাও।" নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন "বুদ্ধ হল অসীম জ্ঞানের নাম, আকাশের মত অসীম; আমি, গৌতম, সেই অবস্থায় পৌঁছেছি; তোমরা যদি সংগ্রাম কর তো তোমরাও সকলে সেই অবস্থায় পৌঁছবে।" সকল চালিকাশক্তি-বিরহিত বুদ্ধ স্বর্গে যেতে চাননি, অর্থ চাননি; সিংহাসন ও অন্য সমস্ত ত্যাগ করেছিলেন; আর ভারতের পথে পথে খাদ্য ভিক্ষা করে ফিরেছিলেন, সাগরের মত দরাজ মন নিয়ে মানুষ ও জন্তুর কল্যাণের জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি বলি বন্ধ করতে জন্তুর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে সদাই প্রস্তুত ছিলেন। একবার এক রাজাকে তিনি বলেছিলেন "মেষশাবক বলি যদি তোমায় স্বর্গে যেতে সাহায্য করে তবে নরবলি আরও বেশি করবে, কাজেই আমায় বলি দাও।" রাজা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবু এই মানুষটির কোনও চালিকাশক্তি ছিল না। সক্রিয় আদর্শের নিখুঁত রূপ হিসাবে তিনি বিরাজ করছেন, আর তিনি যে তুঙ্গে পৌঁছেছিলেন তা দেখিয়ে দেয় যে কর্মের শক্তির মাধ্যমেও আমরা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতা লাভ করতে পারি।

ভগবানে বিশ্বাস করলে অনেকের পক্ষে পথ সহজতর হয়। কিন্তু বুদ্ধের জীবন দেখিয়ে দেয় যে, যে মানুষ ভগবানে বিশ্বাস করে না, যার কোনও অধিবিদ্যা নেই, যে কোনও ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত নয়, কোনও গীর্জা বা মন্দিরে যায় না ও প্রকাশ্যেই জড়বাদী, সেও তুঙ্গে উঠতে পারে। তাঁকে বিচার করার আমাদের অধিকার নেই। আমি ভাবি বুদ্ধের হৃদয়ের এক কণাও যদি আমি পেতাম। বুদ্ধ ভগবানে বিশ্বাস করে থাকতে পারেন বা না করে থাকতে পারেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। অন্যরা ভক্তি (ভগবানের প্রতি ভালবাসা) যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে নিখুঁতত্ব লাভ করেন বুদ্ধ সেই একই নিখুঁতত্বে পৌঁছেছিলেন। বিশ্বাস বা প্রত্যয় থেকে নিখুঁতত্ব আসে না। বুলির কোনও মূল্য নেই। তোতাপাখিও তা পারে। নিখুঁতত্ব আসে নিরাসক্ত কর্ম করার ভিতর দিয়ে।

ধর্মের দাবি

(৫ই জানুয়ারি, সোমবার)

আপনাদের অনেকেরই মনে আছে বাল্যকালে চমৎকার উদীয়মান সূর্য দেখে কি আনন্দ শিহরণ জাগত ; সকলেই জীবনের কোনও না কোনও সময়ে মহিমময় অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে থেকেছেন, আর অন্তত কল্পনানেত্রে ওপারের রহস্যভেদ করতে চেষ্টা করেছেন। মহাজগতের মর্মস্থলে আসলে এই আছে—এই ওপার থেকে উদিত হওয়া আর ওপারেই অস্ত যাওয়া, অজানা থেকে সমগ্র মহাবিশ্বের আবির্ভাব আবার সেই অজানাতেই তিরোধান, অন্ধকার থেকে শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে আসা, আবার বৃদ্ধের মত হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারেই যাওয়া।

আমাদের এই মহাজগৎ, ইন্দ্রিয়ের জগৎ, যুক্তির জগৎ, মননের জগৎ অসীমের দ্বারা, অজ্ঞেয়ের দ্বারা, চির অজ্ঞেয়ের দ্বারা দুদিকে পরিবৃত। এইখানেই এষণা, এইখানেই অনুসন্ধান, এইখানেই সত্য, এইখান থেকে আসে সেই আলোক পৃথিবীর কাছে যে ধর্ম বলে পরিচিত। ধর্ম অবশ্য মূলত অতীন্দ্রিয়ের জিনিস, ইন্দ্রিয়-গোচর স্তরের নয়। এ সমস্ত যুক্তির অতীত, আর মননের স্তরের নয়। এ এক কল্পদৃষ্টি, এক অনুপ্রেরণা, অজানা ও অজ্ঞেয়তে ঝাঁপ, যাতে অজ্ঞেয়কে জানার চেয়ে বেশি করা যায়, কারণ এ কখনও "জানা" হয় না। আমার বিশ্বাস মানব-জন্মের প্রথম থেকেই মানুষের মনে এই অনুসন্ধান ছিল। এই সংগ্রাম, বিশ্ব ইতিহাসের কোনও পর্যায়ে ওপার সম্বন্ধে এই অনুসন্ধান ছাড়া মানবিক যুক্তি ও মনন থাকতে পারত না। আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে মানবমনে আমরা চিন্তার উদয় হতে দেখি। কোথা থেকে সে ওঠে আমরা জানি না, যখন মিলিয়ে যায় তখনও কোথায় যায় তা আমরা জানি না। বৃহৎ জগৎ ও ক্ষুদ্র জগৎ যেন একই খাতের, একই স্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছে, একই মাত্রায় স্পন্দিত হচ্ছে।

ধর্ম বাইরে থেকে আসে না, ভিতর থেকে আসে—এই হিন্দুতত্ত্ব আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা করব। আমার বিশ্বাস যে ধর্মীয় চিন্তা মানুষের একেবারে ধাতের মধ্যেই আছে, এতটা আছে যে মন ও দেহ বিসর্জন না দেওয়া পর্যন্ত, চিন্তা ও জীবন থামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে ধর্ম ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। যতদিন মানুষ চিন্তা করবে ততদিন এ সংগ্রাম চলবেই, ততদিন মানুষের কোনও না কোনও রূপের ধর্ম থাকতেই হবে। কাজেই পৃথিবীতে আমরা ধর্মের নানা রূপ দেখি। এ বেশ হতবুদ্ধিকর অনুশীলন, কিন্তু অনেকে যা ভাবি তা নয়, এ নিরর্থক জল্পনাকল্পনা নয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য আছে, এই বেসুরো ধ্বনির মধ্যেও একটা অন্বয়ের সুর আছে, যে শুনতে প্রস্তুত তার কাছে সে সুর ধরা পড়বে।

বর্তমানকালে সকল প্রশ্নের মহাপ্রশ্ন হল এই : জ্ঞাতব্য ও জ্ঞাত উভয়েই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞতা দিয়ে উভয়দিক দিয়েই পরিবৃত এ কথা স্বীকার করে নেওয়া গেল, তাহলে সেই অজানার জন্য সংগ্রাম কেন? জানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব না কেন?

খাওয়া, পান করা ও সমাজের একটু উপকার করা নিয়েই খুশি থাকব না কেন? হাওয়ায় হাওয়ায় কথাটা চলছে। পণ্ডিত অধ্যাপক থেকে বকবকে শিশু পর্যন্ত সকলকেই বলা হচ্ছে: "বিশ্বের উপকার কর, তা-ই ধর্মের সব, ওপারের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিও না।" জিনিসটা এত বেশী চলছে যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ওপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান আমাদের করতেই হবে। এই বর্তমান, এই প্রকাশিত অপ্রকাশিতের একটি মাত্র অংশ ইন্দ্রিয়ের জগৎ যেন ইন্দ্রিয় সচেতনতার স্তরে ঢুকে আসা সেই অসীম অতীন্দ্রিয় জগতের কেবল একটা অংশ, একটা টুকরো। ওপারে যা আছে তাকে না জানলে এই ঢুকে-আসা টুকরো-টুকুকে ব্যাখ্যা করা যাবে কি করে, জানা যাবে কি করে? সক্রেটিসের সম্পর্কে গল্প আছে যে একদিন এথেন্সে বক্তৃতা দিতে দিতে তাঁর গ্রীসে ভ্রমণরত এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হল। সক্রেটিস ব্রাহ্মণকে বললেন, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ অধীতব্য হল মানুষ। ব্রাহ্মণ রীতিমত চটে উঠলেন "ভগবানকে না জানা পর্যন্ত মানুষকে কি করে জানবেন?" এই ভগবান, এই শাশ্বত অজ্ঞেয়, অথবা অনপেক্ষ, অথবা অসীম, বা নামহীন—তাঁকে যে নামে খুশি ডাকতে পারেন, তিনিই যা জ্ঞাত ও জ্ঞেয় তার, অর্থাৎ এই বর্তমান জীবনের মূলীভূত কারণ, একমাত্র ব্যাখ্যা, অস্তিত্বের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি। সামনে থেকে যে কোনও জিনিস, সব চেয়ে বৈষয়িক জিনিস ধরুন—সবচেয়ে বস্তুবাদী বিজ্ঞান যথা রসায়ন অথবা পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান অথবা জীববিজ্ঞান ধরুন, অনুশীলন করুন, অনুশীলনকে আরও আরও সামনে ঠেলে নিয়ে যান, স্থূল রূপগুলি মিলিয়ে যেতে শুরু করবে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হবে, শেষ পর্যন্ত এমন একটা বিন্দুতে আসবে যখন এই শরীরী জিনিসগুলি থেকে অশরীরীতে একটা বিরাট লাফ দিতে আপনি বাধ্য হবেন। বিজ্ঞানের সকল বিভাগে স্থূল সূক্ষ্মে বিলীন হবে, পদার্থবিজ্ঞান বিলীন হবে অধিবিদ্যায়।

আমাদের যা কিছু আছে, যেমন আমাদের সমাজ, আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক, আমাদের ধর্ম, আর আপনারা যাকে বলেন নীতিশাস্ত্র সকল ক্ষেত্রেই এই রকম। কেবল উপযোগের যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে একটা নীতিশাস্ত্র ব্যবস্থা সৃষ্টি করবার চেষ্টা হচ্ছে। নীতিশাস্ত্রের এই রকম একটা বুদ্ধিসিদ্ধ ব্যবস্থা হাজির করার জন্য আমি যে কোনও লোককে প্রতিদ্বন্দ্বে আহ্বান করছি। অন্যদের ভাল করুন। কেন? কারণ এটাই সর্বোচ্চ উপযোগ। ধরুন একটা লোক বলল "উপযোগের জন্য আমার মাথাব্যথা নেই; আমি অন্যদের গলা কাটতে ও নিজে ধনী হতে চাই।" আপনার জবাব কি? এ যে গুরু-মারা চেলা! কিন্তু আমার পৃথিবীর ভাল করার উপযোগ কি? আমি কি একটা বোকা যে অন্যরা যাতে সুখী হতে পারে তার জন্য জীবন পাত করব? সমাজের ওপরে আর কিছু সম্পর্কে বোধশক্তি যদি না থাকে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত আর কোনও জগৎ যদি না থাকে, তা হলে আমি নিজে সুখী হব না কেন? যতক্ষণ আমি পুলিশের হাত এড়াতে পারি ও নিজে সুখী হতে পারি ততক্ষণ ভাইয়ের গলা কাটায় আমার বাধা কোথায়? আপনি কি জবাব দেবেন?

আপনি নিশ্চয় কোনও একটা উপযোগ দেখাবেন। যখন যুক্তিতে টিকতে পারবেন না তখন বলবেন "ওহে বন্ধু, ভাল হওয়া ভাল।" যে মানবমন বলে "ভাল করা ভাল" তার শক্তিটা কি?—যে শক্তি আমাদের সামনে আত্মার মাহাত্ম্যের, ভালোর সৌন্দর্যের, ভালোর সর্বজয়ী শক্তির, ভালোর অপরিসীম শক্তির গৌরবোজ্জ্বল দিগন্ত উন্মোচিত করবে? তাকেই আমরা ভগবান বলি, তাই নয় কি?

দ্বিতীয়ত আমি একটু সঙ্কোচজনক একটা ব্যাপারে যেতে চাই। আপনাদের মনোযোগ চাই, আমি যা বলব তা থেকে তাড়াহুড়োয় কোনও সিদ্ধান্ত না নিতে অনুরোধ করি। পৃথিবীর বিশেষ কিছু ভাল করতে আমরা পারি না। পৃথিবীর ভাল করা খুব ভাল। কিন্তু পৃথিবীর খুব একটা ভাল কি আমরা করতে পারি? এই যে হাজার হাজার বছর ধরে আমরা সংগ্রাম করছি তাতে খুব একটা ভাল কি করেছি—পৃথিবীর মোট সুখ কি বাড়িয়েছি? পৃথিবীর সুখবৃদ্ধি করার জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে, আর শত শত, সহস্র সহস্র বছর ধরে সে কাজ চলছে। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি: পৃথিবীর মোট সুখ কি এক শতাব্দী আগে যা ছিল তার চেয়ে বেশি হয়েছে? হতেই পারে না। সমুদ্রে প্রত্যেকটা ঢেউ ওঠে অন্যত্র গহ্বর সৃষ্টির মূল্যে। কোন একটা জাতি যদি ধনী ও শক্তিশালী হয় তো তা অন্যত্র কোনও একটা জাতির ঘাড়ের উপর দিয়ে যায়। প্রতিটি যন্ত্রের উদ্ভাবন বিশটা লোককে ধনী করে তো বিশ হাজার লোককে দরিদ্র করে। সর্বত্র প্রতিযোগিতার আইন চালু। মোট ব্যয়িত কর্মশক্তি সমানই রয়ে যায়। এ একটা গোয়ার্তুমির কাজও বটে। একথা বলা অযৌক্তিক যে আমরা দুঃখ ছাড়া সুখ পেতে পারি। এই সমস্ত উপকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনারা পৃথিবীর অভাববোধও বাড়াচ্ছেন, আর বর্ধিত অভাববোধ মানে অনিবার্য তৃষ্ণা, যার কখনও শান্তি হবে না। এই অভাববোধ, এই তৃষ্ণাকে কি মেটাতে পারে? আর যতক্ষণ এই তৃষ্ণা আছে দুঃখও অনিবার্য। একবার সুখী ও একবার দুঃখী হওয়া জীবনের ধর্ম। তাছাড়া এই পৃথিবীটা কি আপনি তার ভাল করবেন বলে ছেড়ে রাখা হয়েছে? এ জগতে আর কি কোনও শক্তি কাজ করছে না? আপনার ও আমার হাতে নিজের জগৎকে ফেলে রেখে ভগবান কি মৃত হয়েছেন, শেষ হয়ে গিয়েছেন? সেই ভগবান যিনি শাশ্বত, যিনি সর্ব-শক্তিমান, সর্ব-করুণাময়, সদা-জাগ্রত, জগৎ যখন ঘুমোয় তখনও যিনি কখনও ঘুমোন না, যাঁর চোখের পলক পড়ে না? এই অসীম আকাশ যেন তাঁর সদা-উন্মুক্ত চক্ষু। তিনি কি মৃত? এ জগতে তিনি কি কাজ করে যাচ্ছেন না? তাঁর কাজ চলছে, আপনার তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, নিজেকে ক্লিষ্ট করে ফেলার দরকার নেই।

[এই প্রসঙ্গে স্বামীজী একটি লোকের গল্প বলেন যিনি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এক ভূত পেয়েছিল। অবশেষে ভূতের কাজ যোগানর জন্য কুকুরের লেজ সোজা করার কাজ দিতে বাধ্য হয়েছিল।]

আমাদের জগতের ভাল করার কাজটার অবস্থাও তাই। কাজেই ভাইসব, এই হাজার হাজার বছর ধরে আমরা কুকুরের লেজ সোজা করার কাজ করে চলেছি।

এ বাতব্যাধির মত। পা থেকে তাড়ান, মাথায় যায়, মাথা থেকে তাড়ান, অন্য কোথাও যায়।

আপনাদের অনেকের কাছে মনে হবে পৃথিবী সম্পর্কে এ একটা ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু তা নয়। নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদ দুই-ই ভুল। দুটোই চরমে যাওয়া। যতক্ষণ কোন লোকের ভাল খাওয়া-দাওয়া, ভাল পোশাক-আশাক জোটে। ততক্ষণ সে মস্ত আশাবাদী; কিন্তু যেই সে সব হারায় অমনি মস্ত নৈরাশ্যবাদী হয়ে ওঠে। যখন কোনও লোক সব টাকা পয়সা হারায় ও নিতান্ত গরিব হয়ে যায় তখনই মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের ধারণা তার মনে সবচেয়ে সজোরে ওঠে। এই হল দুনিয়া। আমি যত নানা দেশে যাচ্ছি ও দুনিয়াটা দেখতে পাচ্ছি, আমার বয়স যত বাড়ছে, তত আমি নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদের এই দুই চরমকেই এড়াতে চাইছি। এই পৃথিবী ভালও নয়, মন্দও নয়। এ হল ভগবানের দুনিয়া। এ ভাল-মন্দ দুয়েরই অতীত, আপনাতে আপনি নিখুঁত। তাঁর ইচ্ছাই চলছে, তাঁর ইচ্ছাতেই এই সব ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে, আর আদিহীন, অন্তহীন এই-ই চলবে। এ একটা বিরাট ব্যায়ামাগার, যেখানে আপনি, আমি ও আরও কোটি কোটি আত্মাকে আসতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে এবং নিজেদের সবল ও নিখুঁত করতে হবে। তার জন্যই এ আছে। ভগবান যে একটা নিখুঁত জগৎ তৈরি করতে পারতেন না তা নয়। দুনিয়ার দুঃখও নিবারণ করতে পারতেন না তা নয়। সেই ধর্মযাজক ও তরুণীর গল্পটা আপনাদের মনে আছে যাতে দুজনেই দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখতে গিয়ে চাঁদের কলঙ্ক দেখতে পেলেন। যাজক বললেন "এগুলো নিশ্চয়ই কোনও গীর্জার চুড়ো," তরুণী বললেন "বাজে কথা। ও নিশ্চয়ই তরুণ প্রেমিকযুগল পরস্পরকে চুমা খাচ্ছে।" পৃথিবী নিয়ে আমরাও তাই করছি। যখন আমরা ভিতরে থাকি তখন ভাবি আমরা ভিতরটা দেখছি। অস্তিত্বের যে স্তরে আমরা থাকি জগৎকে সেই অনুযায়ী দেখি। রান্নাঘরের আগুন ভালও নয়, মন্দও নয়। যখন তাতে খাদ্যবস্তু রান্না হয় তখন আপনি তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, "কি ভাল জিনিস!" যখন তাতে আপনার আঙুল পোড়ে তখন বলেন "কি বাজে জিনিস!" এ কথা বলাও সমান সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হবে যে: জগৎটা ভালও নয়, মন্দও নয়। জগৎটা জগৎই আর চিরকাল তাই-ই থাকবে। আমরা যদি তার কাছে নিজেকে এমনভাবে মেলে ধরি যে জগতের ক্রিয়া আমাদের পক্ষে কল্যাণজনক হয় তাহলে আমরা তাকে ভাল বলি। আমরা যদি নিজেদের এমন অবস্থায় ফেলি যা যন্ত্রণাদায়ক, তাহলে আমরা তাকে মন্দ বলি। তাই আপনারা সব সময়ে দেখবেন অনেক শিশু আছে যারা নিষ্পাপ ও আনন্দময়, যারা কারও ক্ষতি করতে চায় না। তারা আশাবাদী। তারা সোনালী স্বপ্নে বিভোর। বৃদ্ধ লোক, যাদের হৃদয়ে সমস্ত রকম আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ তা পূরণের সামর্থ্য নেই, বিশেষত যারা জগতের কাছ থেকে অনেক ধাক্কা-গুঁতো খেয়েছে, তারা অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী। ধর্ম সত্য জানতে চায়। আর প্রথম যে কথাটা সে আবিষ্কার করেছে তা হল এই সত্যের জ্ঞান ছাড়া জীবনধারণের কোনও সার্থকতা নেই।

ওপারকে যদি আমরা জানতে না পারি তা হলে জীবন মরুভূমি হবে, মানব-

জীবন নিরর্থক হবে। এ কথা বলতে ভাল যে বর্তমান মুহূর্তের জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। গরু ও কুকুর তাই থাকে। অন্য পশুরাও তাই, সেই জন্যই তারা পশু। কাজেই মানুষ যদি বর্তমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং ওপারের অনুসন্ধান ছেড়ে দেয়, মানুষকে তাহলে আবার পশুর স্তরে ফিরে যেতে হবে। ধর্মই, এই ওপারের সন্ধানই মানুষ ও পশুকে তফাৎ করে। এ কথাটা ভালই বলা হয়েছে যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে স্বভাবত উপরের দিকে তাকায়, অন্য সব প্রাণীই নীচের দিকে তাকায়। ওই উপরের দিকে চাওয়া, উপরকে খোঁজা ও নিখুঁত হতে চাওয়াকেই বলে মুক্তি, আর যত তাড়াতাড়ি কেউ আরও উঁচুতে যেতে শুরু করে তত তাড়াতাড়ি সে মুক্তিই যে সত্য এই ধারণার দিকে নিজেকে তুলে ধরে। পকেটে কত টাকা আছে, অথবা পরনে কি পোশাক আছে, কি কোন বাড়িতে বাস তার মধ্যে এ নিহিত নেই, নিহিত আছে মাথায় আধ্যাত্মিক চিন্তার সম্পদের মধ্যে। এই দিয়েই মানব-প্রগতি তৈরী হয়, এই-ই হল সমস্ত বস্তুগত ও মননগত প্রগতির উৎস, মানব-জাতিকে সামনে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহের চালিকা শক্তি।

মানবজাতির লক্ষ্য কি? সে কি সুখ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ আনন্দ? পুরাকালে লোকেরা বলত স্বর্গে তারা ভেরী বাজাবে ও সিংহাসন ঘিরে বাস করবে। আধুনিক কালে আমি দেখছি যে তারা এ ধারণাটাকে খুব দুর্বল ভাবছে ও এর কিছু উন্নতি করেছে, বলছে সেখানে বিয়ে-টিয়েও হবে। এ দুয়ের মধ্যে যদি কোনও উন্নতি থেকে থাকে তো দ্বিতীয়টা হল আরও খারাপের দিকে উন্নতি। স্বর্গের সম্পর্কে এই যে সব নানা তত্ত্ব হাজির করা হচ্ছে এগুলি মনের দুর্বলতাকেই দেখাচ্ছে। আর সে দুর্বলতা এখানে: প্রথমত তারা ভাবে ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, তারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত কিছু ভাবতে পারে না। তারা উপযোগবাদীদের মতই অযৌক্তিক। তবে তারা আধুনিক নাস্তিক উপযোগবাদীদের চেয়ে অন্তত অনেক ভাল। শেষত, এই উপযোগবাদী অবস্থান একেবারে ছেলেমানুষি। আপনার কি অধিকার আছে একথা বলার যে এই আমার মানদণ্ড, সমস্ত জগৎকে আমার মানদণ্ড অনুযায়ীই চলতে হবে।" একথা বলার আপনার কি অধিকার আছে যে প্রত্যেক সত্যকে আপনার এই মানদণ্ডেই বিচার করতে হবে—যে মানদণ্ড তুচ্ছ রুটি, অর্থ ও পোশাককে ভগবান বলে প্রচার করে?

ধর্ম রুটিতে থাকে না, বাড়িতে বাস করে না। বারংবার আপনারা এই আপত্তি শোনেন: "ধর্ম কি উপকার করে? সে কি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করতে পারে, তাদের আরও কাপড়-চোপড় দিতে পারে?" ধরা যাক পারে না, তাতে কি ধর্মের অসত্যতা প্রমাণ হয়ে যাবে? ধরুন আপনারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন এমন সময়ে একটা বাচ্চা উঠে দাঁড়িয়ে বলল "এ কি মিষ্টি রুটি দিতে পারবে?" আপনি জবাব দিলেন "না, পারবে না।" বাচ্চা বলল "তাহলে এ কোনও কাজের নয়।" বাচ্চারা জগৎকে বিচার করে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, মিষ্টি রুটি দিতে পারবে কিনা সেই অনুযায়ী, আর জগতের বাচ্চারাও তাই করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ কথা বলতে দুঃখ হয় যে এইসব লোকই পৃথিবীর

সবচেয়ে পণ্ডিত, সবচেয়ে যুক্তিবাদী, সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকের দল বলে চলছে।

উচ্চতর বস্তুকে আমাদের এই নিম্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আদৌ বিচার করা চলে না। প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব মানদণ্ড দিয়ে বিচার করতে হয়, অসীমকে বিচার করতে হয় অসীমের মানদণ্ডে। ধর্ম মানুষের সমগ্র জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হয়, কেবল বর্তমানে নয়, অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। কাজেই এ হল শাশ্বত আত্মা ও শাশ্বত ভগবানের মধ্যেকার শাশ্বত সম্পর্ক। মানবজীবনের পাঁচ মিনিটের উপর ক্রিয়া দিয়ে এর মূল্য নির্ধারণ কি যুক্তিযুক্ত? নিশ্চয়ই নয়। এ সবই হল নেতিবাচক যুক্তি।

এখন প্রশ্ন আসে : ধর্ম কি সত্যিই কিছু করতে পারে? পারে।

ধর্ম কি সত্যি রুটি ও কাপড়-চোপড় আনতে পারে? আনে। বরাবর আনছে, আর তার চেয়ে অপরিসীম বেশি কিছু আনছে, মানুষকে শাশ্বত জীবন এনে দিচ্ছে। মানুষকে এই-ই মানুষ করেছে, আর এই-ই মনুষ্য প্রাণীকে দেবতা করবে। ধর্ম তাই করতে পারে। মানবসমাজ থেকে ধর্মকে বের করে নিন, রইবেটা কি? পশুভর্তি জঙ্গল ছাড়া কিছু নয়। আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি যে ইন্দ্রিয়সুখই মানবজাতির লক্ষ্য এ কথা মনে করা হাস্যকর, এই সিদ্ধান্তেই আমাদের আসতে হয় যে সকল জীবনেরই লক্ষ্য হল জ্ঞান। আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি যে সত্য ও মানবজাতির কল্যাণের সন্ধানে এই সহস্র সহস্র বৎসরের সংগ্রামে আমরা অনুভবনীয় সামান্য ফললাভও করেছি কিনা সন্দেহ। কিন্তু জ্ঞানে মানবজাতি বিপুল অগ্রগতি লাভ করেছে। এই প্রগতির সর্বোচ্চ উপযোগ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সে যে আরাম এনেছে তার মধ্যে নিহিত নয়। মানুষ পশুটাকে দেবতা তৈরি করে তোলার মধ্যে নিহিত। তারপর, জ্ঞানের সঙ্গে স্বভাবতই আসে প্রশান্ত সুখ (bless)। বাচ্চারা মনে করে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই হল সর্বোচ্চ সুখ যা তারা পেতে পারে। আপনাদের বেশির ভাগই জানেন যে বয়স্ক মানুষ মননের মধ্যে ইন্দ্রিয়গত উপভোগের চেয়ে তীব্রতর উপভোগ পান। খাওয়ায় কুকুরের যা আনন্দ তা আপনারা কেউ পাবেন না। এটা আপনারা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন। মানুষের আনন্দ কোথা থেকে আসে? শূয়োর বা কুকুরের খাওয়ায় যে প্রাণ-মন ঢালা উপভোগ তা থেকে নয়। শূয়োর কিভাবে খায় দেখুন। খাওয়ার সময়ে সে জগৎ ভুলে যায়, তার গোটা আত্মাটা বাঁধা থাকে ওই খাবারে। তাকে মেরে ফেলা হতে পারে, কিন্তু খাবার থাকলে সে তাতেও পরোয়া করে না। ভাবুন শূয়োরের উপভোগ কি তীব্র হয়! কোনও মানুষের তা হয় না। গেল কোথায়? মানুষ তাকে মননগত উপভোগে পরিবর্তিত করেছে। শূয়োর ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ উপভোগ করতে পারে না। এ আবার মননগত আনন্দের চেয়ে আরও এক পা বেশি উঁচু ও তীব্র, এ হল আধ্যাত্মিক স্তরে, স্বর্গীয় বস্তুর আধ্যাত্মিক উপভোগ, যুক্তি ও মননের উর্ধ্বে উড়ে যাওয়া। তা পেতে হলে আমাদের এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-ভোগ হারাতে হবে। এই-ই

হল সর্বোচ্চ উপযোগ। উপযোগ হল যা আমি উপভোগ করি, যা প্রত্যেকে উপভোগ করি, আর তার পিছনেই আমরা ছুটি।

আমরা দেখি একটা পশুর ইন্দ্রিয়গত উপভোগের চেয়ে মানুষের মননগত উপভোগ অনেক বেশি; আরও দেখি মানুষ তার যুক্তিভিত্তিক প্রকৃতির চেয়ে আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে আরও বেশি উপভোগ করে। কাজেই সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা নিশ্চয়ই এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের সঙ্গেই আসবে প্রশান্ত সুখ। সমস্ত পার্থিব বস্তু হল কেবল ছায়া, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রশান্ত সুখের তৃতীয় বা চতুর্থ মাত্রায় প্রতিফলন।

মানবজাতিকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে এই প্রশান্ত সুখ আসে, মানবিক ভালবাসা হল সেই আধ্যাত্মিক প্রশান্ত সুখের ছায়া, কিন্তু তাকে মানবিক প্রশান্ত সুখের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না।—সেইটাই হল মস্ত ভুল। আমাদের যে ভালবাসা আছে—এই ইন্দ্রিয়গত, মানবিক ভালবাসা, অনুকণার প্রতি এই আসক্তি, সমাজের মানুষদের প্রতি এই তীব্র আসক্তি—একে আধ্যাত্মিক প্রশান্ত সুখ বলে আমরা বরাবর ভুল করছি। একেই শাশ্বত অবস্থা বলে ভুল করার আমাদের ঝোঁক আছে, কিন্তু তা এ নয়। ইংরেজি আর কোনও শব্দের অভাবে আমি একে 'ব্লিস' (bliss) বলে অভিহিত করেছি, এ এবং শাশ্বত জ্ঞান একই বস্তু, আর তাই-ই আমাদের লক্ষ্য। সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানেই কোনও ধর্ম আছে অথবা যেখানেই কোনও ধর্ম উঠবে, তারা একই উৎস থেকে উঠেছে ও উঠবে, বিভিন্ন দেশে তার বিভিন্ন নাম; পশ্চিমী দেশগুলিতে একেই আপনারা নাম দিয়েছেন "প্রেরণা" ("inspiration")। এই প্রেরণা কি? প্রেরণা হল ধর্মীয় জ্ঞানের একমাত্র উৎস। আমরা দেখেছি ধর্ম মূলত ইন্দ্রিয়াতীত স্তরের বস্তু। এ হল "চোখ বা কান যেখানে যেতে পারে না, মন যেখানে পৌঁছতে পারে না অথবা ভাষা যা প্রকাশ করতে পারে না।" ধর্মের সেই হল ক্ষেত্র ও লক্ষ্য, আর আমরা যাকে প্রেরণা নামে অভিহিত করছি তা সেখান থেকেই আসে। এর থেকে স্বভাবতই একথা ওঠে যে ইন্দ্রিয়ের অতীত লোকে যাওয়ার জন্য কোনও একটা পথ থাকতেই হবে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে আমাদের যুক্তি ইন্দ্রিয়ের ওপারে যেতে পারে না, সমস্ত যুক্তিই বোধশক্তির মধ্যে, ইন্দ্রিয় তথ্যে পৌঁছতে পারে, আর যুক্তি তথ্য-নির্ভর। কিন্তু মানুষ কি ইন্দ্রিয়ের ওপারে পৌঁছতে পারে? মানুষ কি অজ্ঞেয়কে জানতে পারে? এরই ভিত্তিতে ধর্মের সমগ্র প্রশ্নটি নির্ধারণ করতে হয় ও নির্ধারিত হয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে এই দুর্ধর্ষ প্রাচীর, ইন্দ্রিয়ের সামনেকার এই প্রতিবন্ধক ছিল; প্রাচীর ভেদ করে ওপারে যাওয়ার জন্য স্মরণাতীত কাল থেকে শত শত, হাজার হাজার নরনারী এই প্রাচীরে মাথা ভেঙেছে। কোটি কোটি লোক ব্যর্থ হয়েছে, আবার কোটি কোটি সফল হয়েছে। এই হল পৃথিবীর ইতিহাস। আরও কোটি কোটি লোক বিশ্বাস করে না যে কেউ আদৌ সফল হয়েছে; এরা হল বর্তমান কালের সন্দেহবাদীর দল। মানুষ এই প্রাচীরের ওপারে যেতে পারে যদি সে কেবল চেষ্টা করে। মানুষের কেবল যুক্তি নেই, কেবল ইন্দ্রিয় নেই, ইন্দ্রিয়ের ওপারের অনেক কিছুও তার মধ্যে আছে। এটা

আমরা একটু ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা অনুভব করবেন যে এ আপনাদের মধ্যেও আছে।

আমি হাত নাড়ি, আমি অনুভব করি ও জানি যে আমি হাত নাড়ছি। একে আমি বলি চেতনা। আমি সচেতন যে আমি হাত নাড়ছি। কিন্তু আমার হৃদপিণ্ড নড়ছে। আমি সে সম্পর্কে সচেতন নয়, তবু হৃদপিণ্ডকে নাড়াচ্ছে কে? এ নিশ্চয়ই একই সত্তা। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই সত্তা যা হাত নাড়ায় ও কথা বলে, অর্থাৎ সচেতনভাবে ক্রিয়া করে, সে অচেতনভাবেও ক্রিয়া করে। কাজেই আমরা দেখি এই সত্তা দুটি স্তরে কাজ করতে পারে—একটা সচেতনতার, আর একটা তার নীচের স্তরের। অচেতনতার স্তর থেকে আসা আবেগকে আমরা বলি সহজাত প্রবৃত্তি, আর যখন এই একই আবেগ সচেতনতার স্তর থেকে আসে তখন আমরা তাকে যুক্তি বলি। কিন্তু এর চেয়েও একটা উচ্চতর স্তর আছে, মানুষের অতি-চেতনা। দৃশ্যত এ অচেতনতার সঙ্গে একই, কারণ এ চেতনার স্তরের অতীত। কিন্তু এ চেতনার উর্ধ্বে, নীচে নয়। এ সহজাত প্রবৃত্তি নয়, এ প্রেরণা। এর একটা প্রমাণ আছে। বিশ্ব যে সব প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ বা মুনি-ঋষিদের তৈরি করেছে তাদের কথা ভাবুন, আর এ কথা সুবিদিত যে তাঁদের জীবনে এমন অনেক সময় আসবে, অভিজ্ঞতার এমন অনেক মুহূর্ত আসবে যখন তাঁরা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে দৃশ্যত অচেতন থাকবেন; কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁদের কাছ থেকে যেসব জ্ঞান আসে তাঁরা দাবি করেন যে সেগুলি অস্তিত্বের ওই অবস্থায় অর্জিত হয়েছে। সক্রেটিসের সম্পর্কে গল্প আছে যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলতে চলতে তিনি একদিন চমৎকার সূর্যোদয় দেখলেন, আর তাই-ই তাঁর মনে একটা চিন্তাধারার জন্ম দিল, দুদিন ধরে তিনি রোদে দাঁড়িয়ে রইলেন সম্পূর্ণ অচেতনভাবে। এই রকম মুহূর্তগুলিই পৃথিবীকে সক্রেটিসের জ্ঞান উপহার দিয়েছে। সমস্ত মহান গুরু ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে, যখন যেন তাঁরা চেতনা থেকে ওঠেন ও তার উপরে চলে যান। আর তাঁরা যখন চেতনার স্তরে ফিরে আসেন তখন তাঁরা আলোকে উদ্দীপ্ত, ওপার থেকে তাঁরা খবর এনেছেন, আর বিশ্বের তাঁরা প্রেরণ-উদ্দীপ্ত স্রষ্টা।

কিন্তু একটা মস্ত বিপদ আছে। যে কোনও লোক বলতে পারে আমি প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। পরীক্ষা কি দিয়ে হবে? ঘুমের সময়ে আমরা অচেতন, বোকাও ঘুমোয়, তিন ঘণ্টা সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। যখন সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে তখনও সে সেই বোকাই থাকে যদি না আরও খারাপ হয়ে যায়। নাজারেথের যিসাস রূপান্তর পরিগ্রহ করলেন, যখন তিনি বেরিয়ে এলেন তখন যিসাস ক্রাইস্ট হয়ে গিয়েছেন। এই হল আসল তফাৎ। একটা হল প্রেরণা, আর একটা সহজাত প্রবৃত্তি। একটি বাচ্চা, অন্যটি বৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোক। প্রেরণা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। সমস্ত ধর্মের এ উৎস, আর সমস্ত উচ্চতর জ্ঞানের উৎস হয়ে চিরকাল থাকবেও। পথে তবু মস্ত বিপদ অনেক আছে। কখনও কখনও জোচ্চোর লোকেরা নিজেদের মানব-জাতির ঘাড়ে চাপাতে চায়। আজকাল এটা খুবই চালু হয়ে উঠছে। আমার এক

বন্ধুর একখানি চমৎকার ছবি ছিল। আর এক ভদ্রলোক, যাঁর একটু ধর্ম-ধর্ম ভাব ছিল, আর ধনও ছিল, তাঁর ওই ছবিখানার উপর নজর ছিল। কিন্তু আমার বন্ধু সেখানা বিক্রি করতে চাননি। ওই ভদ্রলোক একদিন এসে আমার বন্ধুকে বললেন আমার একটা প্রেরণা এসেছে, ভগবানের কাছ থেকে আমি একটা বার্তা পেয়েছি। বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন "কি বার্তা ?" "বার্তা এই যে ওই ছবিখানি আমাকে আপনার দিতেই হবে।" আমার বন্ধুও তেমনি তৈরি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললনে "ঠিক বলেছেন ; কি চমৎকার। আমারও ঠিক এই প্রেরণা এসেছে যে ছবিটা আপনাকে দেওয়া উচিত। চেক নিয়ে এসেছেন তো ?" "চেক, কিসের চেক ?" বন্ধু বললেন "আমার মনে হচ্ছে তা হলে আপনার প্রেরণা ঠিক ছিল না। আমার প্রেরণা এই ছিল যে, যে লোক এক লক্ষ ডলারের চেক আনবে তাকেই ছবিখানা দিতে হবে। আপনাকে আগে চেক নিয়ে আসতে হবে। অন্য লোকটি বুঝলেন যে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন, তখন প্রেরণার তত্ত্ব ছাড়লেন। এই হল বিপদ। বোস্টনে আমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এলেন, বললেন তাঁর দিব্যদর্শন হয়েছে আর সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে হিন্দু ভাষায় কথা বলা হয়েছে। আমি বললাম "তিনি যা বলেছেন তা যদি আমি দেখতে পাই তাহলে আমি বিশ্বাস করব।" কিন্তু লোকটি অনেক কিছু আজে বাজে লিখে দিলেন। বোঝার জন্য অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না। তাঁকে বললাম আমি যতদূর জানি এরকম ভাষা ভারতে কখনও ছিল না, হবেও না। এরকম ভাষা পাওয়ার মত অত সভ্য হতে তারা এখনও পারেনি। লোকটি নিশ্চয়ই আমাকে শয়তান ও সন্দেহবাদী বলে মনে করলেন। যা হোক তিনি প্রস্থান করলেন। পরে যদি শুনি যে তিনি পাগলা গারদে গিয়েছেন তো আশ্চর্য হব না। এ জগতে দুটি বিপদ বরাবর আছে, একটি জোচ্চোরের কাছ থেকে বিপদ, অপরটি বোকার কাছে থেকে বিপদ। কিন্তু তাতে আমাদের নিবৃত্ত হওয়ার দরকার নেই, কারণ পৃথিবীতে সমস্ত মহৎ ব্যাপারই বিপদে সমাকীর্ণ থাকে। তাহলেও আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কখনও কখনও আমি এমন লোক দেখি যারা কোনও বিষয়ের কোনও যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের ধার ধারে না। একজন এসে বলল "অমুক দেবতার কাছ থেকে আমি বার্তা পেয়েছি।" তারপর জিজ্ঞাসা করল "আপনি অস্বীকার করতে পারেন ? এটা কি সম্ভব নয় যে অমুক দেবতা আছেন ও তিনি আমায় বার্তা পাঠাবেন ?" শতকরা ৯০ জন বোকা এ গিলবে। তারা মনে করে এতেই যথেষ্ট যুক্তি হল। কিন্তু একটা জিনিস আপনাদের বোঝা উচিত—যে কোনও জিনিস ঘটা সম্ভব—হতেই পারে যে আগামী বছরে পৃথিবী লুব্ধকের সঙ্গে সংস্পর্শে আসবে ও চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু এ কথাটা যদি আমি হাজির করি আপনার অধিকার আছে উঠে দাঁড়িয়ে সে কথা আপনার কাছে প্রমাণ করতে আমায় বলার। আইনজ্ঞরা যাঁকে বলেন "ওনাস প্রোবাণ্ডি" (প্রমাণ করার দায়িত্ব) তা যে মানুষটা কথাটা হাজির করেছিল তার। আপনার দায়িত্ব নয় এ কথা প্রমাণ করার যে আমি কোনও এক দেবতার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছি, সে দায়িত্ব আমার, কারণ আমিই আপনার কাছে কথাটা হাজির করেছিলাম। যদি আমি প্রমাণ করতে না পারি তা হলে আমার চুপ করে থাকাই

ভাল। এই দুটো বিপদই এড়িয়ে চলুন, তাহলে আপনারা যেখানে খুশি পৌঁছতে পারবেন। অনেকেই আমরা আমাদের জীবনে অনেক বার্তা পেয়েছি, অথবা পেয়েছি বলে মনে করেছি, যতক্ষণ সে বার্তা আমাদের নিজেদের নিয়ে ততক্ষণ যা খুশি করতে পারা যায়; কিন্তু সেটা যখন অন্য লোকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কিংবা অন্যের প্রতি ব্যবহার সংক্রান্ত হবে তখন তা নিয়ে কিছু করার আগে একশ বার ভেবে দেখবেন, তাহলেই নিরাপদ হবেন।

আমরা দেখছি এই প্রেরণাই হল ধর্মের একমাত্র উৎস, অথচ এতে আবার নানা রকমের বিপদ জড়িয়ে আছে; আর সর্বশেষ ও সবচেয়ে বড় বিপদ হল অতিরিক্ত দাবির। কিছু লোক দাঁড়িয়ে পড়ল আর বলল তাদের ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তারা সর্বশক্তিমান ভগবানের মুখপাত্র, তারা ছাড়া এই যোগাযোগের অধিকার আর কারও নেই। এ একেবারে স্পষ্টতই অযৌক্তিক। জগতে কিছু একটা যদি থাকে তাহলে তা সার্বজনিক হবে, পৃথিবীতে এমন কোনও আন্দোলন নেই বা সার্বজনিক নয়, কারণ সমগ্র জগতটাই বিধি-শাসিত। এর গোটাটাই প্রণালীবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই যে কোনও এক জায়গায় যা হতে পারে তা প্রত্যেক জায়গায় হতে পারে। বৃহত্তম সূর্য ও তারারা যে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে জগতের প্রতিটি অণুও সেই অনুযায়ী হয়েছে। একজন লোকও যদি আদৌ প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই প্রেরণায় উদ্দীপিত হওয়া সম্ভব, আর তাই হল ধর্ম। এই সমস্ত বিপদ, মোহ ও বিভ্রান্তি, জোচ্চুরি ও অতিরিক্ত দাবি এড়িয়ে চলুন, কিন্তু ধর্মীয় তথ্যগুলির সরাসরি সম্মুখীন হন এবং ধর্মের বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করুন। যত খুশি মতবাদ ও আপ্তবাক্যে বিশ্বাস, গীর্জা বা মন্দিরে যাওয়া, কিংবা কিছু বই পড়ার মধ্যে ধর্ম নিহিত নেই। ভগবানকে দেখেছেন? আত্মাকে দেখেছেন? না দেখে থাকলে দেখার জন্য সংগ্রাম করছেন কি? এ কাজ এখনই করতে হবে, ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করলে হবে না। অসীম বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যতটা আর কি? এক সেকেণ্ডের বারংবার পুনরাবৃত্তি ছাড়া গোটা সময়টা আর কি? ধর্ম এখানেই, এখনই, এই বর্তমান জীবনেই।

আরও একটা প্রশ্ন: লক্ষ্য কি? আজকাল জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে মানুষ সীমাহীনভাবে এগোচ্ছে, ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, নিখুঁত হওয়ার কোনও লক্ষ্য নেই। সমানে কাছাকাছি যাচ্ছে, কখনও পৌঁছচ্ছে না, এ সবের মানে যাই হোক না কেন, আর যতই চমৎকার হোক না কেন, স্পষ্টতই এ অসম্ভব। কোনও গতি কি সরল রেখায় হয়? সরল রেখা অসীমে এগিয়ে গেলে চক্র হয়ে যায়, শুরুর বিন্দুতেই আবার ফিরে আসে। যেখানে শুরু করেছিলেন সেখানেই শেষ করতে হবে, আর শুরু যেহেতু ভগবান থেকে করেছিলেন, ভগবানেই ফিরে যেতে হবে। অবশিষ্ট রইল কি? খুঁটিনাটি কাজ। অনন্ত কাল ধরে খুঁটিনাটি কাজ করে যেতে হবে।

আরও আরেকটা প্রশ্ন: চলার পথে কি আমাদের ধর্মের নতুন নতুন সত্য আবিষ্কার করতে হবে? হাঁ ও না। প্রথমত ধর্মের আমরা আর কিছু জানতে

পারি না ; সব জানা হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই দাবি শুনবেন যে আমাদের মধ্যে ঐক্য আছে। ভগবৎ সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় সে অর্থে আর অগ্রগতি হতে পারে না। জ্ঞান মানে বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্য খুঁজে বের করা। আমি আপনাদের পুরুষ ও নারী হিসাবে দেখছি, এ হল বৈচিত্র্য। যখন আমি আপনাদের একত্র জোট বাঁধি ও মানুষ বলে অভিহিত করি তখন সেটা হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ, রসায়ন বৈজ্ঞানিককে ধরা যাক। রসায়নবিদরা চেষ্টা করছেন সমস্ত পদার্থকে তার আদি উপাদানে প্রকাশ করতে এবং সম্ভবপর হলে একটি উপাদান খুঁজে বের করতে যা থেকে এই সমস্ত এসেছে। এমন সময় আসতে পারে যখন সেই একটি উপাদান পাওয়া যাবে। সেইটিই হল অন্য সব উপাদানের উৎস। সেটাতে পৌঁছলে আর এগোন যাবে না, রসায়ন বিজ্ঞান নিখুঁত হয়ে যাবে। ধর্মের বিজ্ঞানেরও তাই। যদি আমরা এই নিখুঁত ঐক্য খুঁজে বের করতে পারি তা হলে তারপর আর অগ্রগতি হতে পারে না।

যখন একথা আবিষ্কৃত হল যে "আমি ও আমার পিতা এক", তখন ধর্মের শেষ কথা বলা হয়ে গেল। তারপর রইল কেবল খুঁটিনাটি কাজ। সত্যিকারের ধর্মে অন্ধ বিশ্বাসের অর্থে কোনও বিশ্বাস বা আস্থা নেই। কোনও মহান গুরু কখনও অমন শিক্ষা দেননি। তা আসে কেবল অধঃপতন হলেই। বোকারা এক বা অন্য আধ্যাত্মিক মহাবলীর ভক্ত বলে ভান করে, যদিও তারা হয় তো ক্ষমতাহীন, তবু মানবজাতিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে শেখাতে চেষ্টা করে। কিসে বিশ্বাস? অন্ধভাবে বিশ্বাস করা মানে মানবাত্মার অধঃপতন ঘটান। নাস্তিক হতে চান তাও হন, কিন্তু বিনা প্রশ্নে কিছু বিশ্বাস করবেন না। আত্মাকে কেন জন্তুর স্তরে নামাবেন? তাতে কেবল নিজেদের ক্ষতি করবেন তাই নয়, সমাজেরও ক্ষতি করবেন, উত্তর-সূরীদের বিপদ সৃষ্টি করে যাবেন। অন্ধ বিশ্বাস না রেখে দাঁড়িয়ে পড়ুন, তর্ক-বিতর্ক করে সমাধানে আসুন। ধর্ম হল অস্তিত্বের প্রশ্ন, বিশ্বাসের নয়। এই হল ধর্ম, আর যখন আপনি তা আয়ত্ত করেছেন তখন আপনার ধর্ম আছে। তার আগে আপনি জন্তুর চেয়ে ভাল কিছু নন। মহান বুদ্ধ বলেন "যা শুনেছ তাতে বিশ্বাস কর না, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে এসেছে বলেই কোনও মতবাদে বিশ্বাস কর না ; অনেকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বলেই কোনও কিছুতে বিশ্বাস কর না, কোনও বৃদ্ধ মুনি বলেছেন বলেই বিশ্বাস কর না, অভ্যাসের বশে আসক্ত হয়ে কোনও সত্যে বিশ্বাস কর না, কেবল গুরু ও বয়োবৃদ্ধদের প্রাধিকারের দরুণই বিশ্বাস কর না। আলোচনা কর, বিশ্লেষণ কর, ফল যখন যুক্তির সঙ্গে মিলবে ও বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেকের পক্ষে কল্যাণকর হবে, তখন তা গ্রহণ কর ও তার যোগ্য হও।"

কেন্দ্রীভূত মনোযোগ বা একাগ্রতা (Concentration)

(সান্‌ফ্রান্সিসকোর ওয়াশিংটন হলে ১৯০০ সালের ১৬ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণ)

বহির্জগৎ অথবা অন্তর্জগতের যা কিছু জ্ঞান আমাদের আছে তা কেবল একটিই পদ্ধতিতে অর্জিত—কেন্দ্রীভূত মনোযোগ বা মনের একাগ্রতার দ্বারা। কোনও বিজ্ঞানের কোন জ্ঞানই লাভ করা যায় না সেই বিষয়ে মনকে একাগ্র করা ছাড়া। জ্যোতির্বিজ্ঞানী দূরবীনের ভিতর দিয়ে তাঁর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন··· ইত্যাদি। আপনি যদি নিজের মনকে অধ্যয়ন করতে চান, তারও ওই একই প্রক্রিয়া হবে। আপনাকে কেন্দ্রীভূত মনোযোগ দিতে হবে ও সে মনোযোগকে মনের উপরই আবার ফেলতে হবে। এই পৃথিবীতে একটি মন ও অপর মনের মধ্যে তফাৎ শুধু এই কেন্দ্রীভূত মনোযোগ বা একাগ্রতা, একটি অন্যটির চেয়ে বেশি একাগ্র হয় ও বেশি জ্ঞান লাভ করে।

অতীত ও বর্তমানের সমস্ত মহামানবের মধ্যেই আমরা একাগ্রতার বিপুল শক্তি দেখতে পাই। আপনারা বলবেন ওঁরা প্রতিভাধর। যোগবিজ্ঞান আমাদের বলে যে আমরা সকলেই প্রতিভাধর, যদি অবশ্য হওয়ার জন্য কঠোর চেষ্টা করি। কেউ হয়তো এর জন্য বেশি তৈরী হয়ে জগতে আসবে ও কাজটা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি করবে। আমরাও তা করতে পারি। প্রত্যেকের মধ্যেই একই ক্ষমতা আছে। বর্তমান ভাষণের বিষয়বস্তু হল মনকে অধ্যয়ন করার জন্য কিভাবে মনকে একাগ্র করতে হবে। যোগীরা কতকগুলি নিয়ম স্থির করে দিয়েছেন, সেই নিয়মগুলিরই কিছু রূপরেখা আজ রাত্রে আমি আপনাদের দেব।

মনের একাগ্রতা অবশ্য বিভিন্ন উৎস থেকে আসে। ইন্দ্রিয়ের মারফৎ আপনি মনকে একাগ্র করতে পারেন। কেউ তা পারে যখন সুন্দর সঙ্গীত শোনে, আবার কেউ পারে যখন চমৎকার দৃশ্য দেখে।···কেউ ফলক-ওয়ালা, ধারাল লোহার ফলক-ওয়ালা বিছানায় শুয়ে কেউ বা তীক্ষ্ণধার নুড়ির উপর বসে পারে। এগুলি অসাধারণ উদাহরণ, অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হল মনকে ক্রমাগত শিক্ষিত করা।

কেউ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে মনের একাগ্রতা লাভ করে। নিপীড়ন তাকে বাঞ্ছিত একাগ্রতা দেয়। কিন্তু এসবও অসাধারণ।

বিভিন্ন দার্শনিকের মতানুযায়ী বিভিন্ন সার্বজনিক পদ্ধতি সংগঠিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন আমরা যে অবস্থা আয়ত্ত করতে চাই তা হল মনের অতি-চেতনা, শরীর যে সীমা আরোপ করেছে তা অতিক্রম করে। যোগীর পক্ষে নীতিশাস্ত্রের মূল্য এই যে তা মনকে পবিত্র করে। মন যত পবিত্র হবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা তত সহজ হবে। যে কোনও চিন্তার উদয় হয় মন তাকে গ্রহণ করে ও বিস্তারিত করে। মন যত স্থূল হয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা তত কঠিন হয়। অসচ্চরিত্র লোক কখনও মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করার জন্য একাগ্র মনোযোগ দিতে পারবে না। শুরুতে সে হয়তো একটু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শোনার ক্ষমতা একটু পেতে পারে···কিন্তু সেসব ক্ষমতাও তার কাছ থেকে চলে যাবে। মুস্কিল এই যে যদি আপনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখেন যে

এই যে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ হয়েছে তা নিয়মিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করা হয়নি। যে সব লোক যাদুবিদ্যার সাহায্যে সাপকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা সাপের কাছে মরে।···যে লোক কোনও অসাধারণ ক্ষমতা পায় সে শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষমতার কাছে পরাস্ত হয়। ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক নানা কায়দায় ক্ষমতা পায়। তাদের বেশির ভাগই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে মারা যায়। মনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার দরুন অনেকে আত্মহত্যা করে।

এই অনুশীলন নিরাপদে করা দরকার: বৈজ্ঞানিক, মন্থর, শান্তিপূর্ণ। প্রথম প্রয়োজন হল নৈতিক দিক থেকে সৎ হওয়া। এ রকম লোক চায় দেবতারা নেমে আসুন, তাঁরা নেমে আসবেন ও তার কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন। নিখুঁতভাবে নীতিবান হওয়া, এই হল আমাদের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের সার। একবার ভেবে দেখুন তার মানে কি! কোনও হিংসা নয়, নিখুঁত পবিত্রতা, নিখুঁত কৃচ্ছ্রসাধন। এগুলি একান্ত প্রয়োজন। ভেবে দেখুন, একজন মানুষ যদি নিখুঁতভাবে এই সব আয়ত্ত করতে পারে! আর কি চাই? সে যদি যে কোনও সত্তার প্রতি শত্রুতা থেকে মুক্ত হতে পারে···সমস্ত প্রাণী তাদের শত্রুতা বিসর্জন দেবে। যোগীরা অত্যন্ত কঠোর বিধান দেন···যাতে দয়ালু না হলে কোনও লোক দয়ালু বলে পার না পায়।

আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন, আমি একটি মানুষকে দেখেছি যিনি একটা গর্তে বাস করেন, আর তাঁর সঙ্গে গোখরো সাপ ও ব্যাং একত্রে বাস করত। কখনও কখনও তিনি উপবাস করতেন ও তারপর বাইরে আসতেন। তিনি বরাবর মৌনী ছিলেন। একদিন এক ডাকাত এল···

আমার প্রাচীন গুরু বলতেন "হৃদপদ্ম যখন ফুটে উঠেছে, মৌমাছিরা আপনিই এসে পড়বে।" এরকম লোকেরা এখনও আছে। তাদের কথা বলার দরকার নেই।···কোনও মানুষ যখন হৃদয় থেকে নিখুঁত হবে, ঘৃণার একটা চিন্তাও করবে না, সমস্ত প্রাণীরা ঘৃণা বিসর্জন দেবে। পবিত্রতা সম্পর্কেও তাই। অপরাপর প্রাণী সম্বন্ধে ব্যবহারে এগুলো দরকার। আমাদের সবাইকে ভালবাসতে হবে।···অপরের খুঁত ধরার কোনও দরকার নেই: তাতে কিছু ভাল হয় না। আমাদের সেসব ভাবারও দরকার নেই। আমাদের কারবার হল ভাল নিয়ে। আমরা এখানে খুঁত ধরতে আসিনি। আমাদের কাজ হল ভাল হওয়া।

এই কুমারী অমুক এলেন। তিনি বললেন "আমি যোগী হব।" বিশ বার তিনি খবরটা বললেন, পঞ্চাশ দিন ধ্যান করলেন, তারপর বললেন "এ ধর্মে কিছু নেই। আমি চেষ্টা করে দেখেছি। এতে কিছু নেই।"

আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিটাই সেখানে নেই। এই ভিত্তি হতে হবে নিখুঁত নীতিবোধ। সেই হল সবচেয়ে মুস্কিল।···

আমাদের দেশে নিরামিষাশী সম্প্রদায় আছে। তারা ভোরে পাউণ্ড পাউণ্ড চিনি নিয়ে পিঁপড়ের জন্য মাটিতে রাখবে। গল্প আছে যে তাদের একজন যখন পিঁপড়ের জন্য মাটিতে চিনি রাখছিল, আর একজন পিঁপড়েদের উপর পা দিয়ে দিল। আগের

জন বলল "হতচ্ছাড়া, তুমি প্রাণীগুলোকে মারলে!" এই বলে সে তাকে এমন এক ঘুষি দিল যে লোকটা মরে গেল।

বাইরেকার পবিত্রতা অতি সহজ, আর গোটা জগৎ সে দিকে ছোটে। বিশেষ ধরনের পোশাক যদি নীতি মেনে চলার ধরন হয়, তো যে কোনও বোকাও তা করতে পারে। যখন মনেরই সঙ্গে এঁটে ওঠার ব্যাপার, তখন তা কঠিন কাজ।

যে লোকেরা বাইরেকার উপরে উপরের ব্যাপার করে তাদের কি আত্মগরিমা! আমার মনে আছে বালক বয়সে আমার যিশাস ক্রাইস্টের চরিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলে বিয়ের ভোজের কথা। বই বন্ধ করে আমি বললাম "উনি মাংস খেতেন, মদ খেতেন! উনি ভাল লোক হতে পারেন না!"

বস্তুর প্রকৃত অর্থ সর্বদা আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। ছোটখাট খাওয়া-দাওয়া আর পোশাক-পরিচ্ছদ! যে কোনও বোকাও তা দেখতে পারে। তার ওপারে কি আছে তা কে দেখে? আমরা চাই হৃদয়ের সংস্কৃতি। ভারতে এক দল লোককে আমরা দেখি দিনে বিশ বার স্নান করছে, নিজেদের ভারী পবিত্র করছে। তারা কাউকে ছোঁয় না।...স্থুল তথ্য, বাইরেকার বস্তু! স্নান করলেই যদি পবিত্র হয় তাহলে মাছেরা পবিত্রতম প্রাণী।

স্নান ও পোশাক এবং খাওয়া-দাওয়ার নিয়মকানুন—এ সবের উপযুক্ত মূল্য আছে যদি সেগুলি আধ্যাত্মিক-এর পরিপূরক হয়। সেটা প্রথম, আর এগুলি সব সাহায্য করে। কিন্তু এ ছাড়া যতই ঘাস খাওয়া যাক...তাতে কিছু লাভ নেই। এগুলি সব সাহায্য করে যদি যথাযথভাবে বোঝা যায়। কিন্তু যথাযথভাবে না বুঝলে এগুলি ক্ষতিকারক।...

সেই কারণেই আমি এ সব ব্যাখ্যা করছি। প্রথমত, সব ধর্মই অজ্ঞানের দ্বারা আচরিত হলে সব কিছুই অধঃপতিত হয়। বোতলের কর্পূর উবে গিয়েছে, বোতল নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি করছে।

আর একটা কথা:...আধ্যাত্মিকতা উবে যায় যখন ওরা বলে "এটা ঠিক আর ওটা ভুল।" যত ঝগড়া সব রূপ ও মতবাদ নিয়ে, অধ্যাত্মে নয়। বৌদ্ধরা বহু বছর ধরে গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা প্রচার করেছিলেন, ক্রমে সেই আধ্যাত্মিকতা উবে গেল।...তারপর ঝগড়া শুরু হল তিনে এক দেবতা, না একে তিন; তখন কেউ স্বয়ং ভগবানের কাছে যেতে ও তিনি কি তাঁরই কাছ থেকে জানতে চায় না। ভগবান তিনে এক কি একে তিন তা জানার জন্য আমাদের স্বয়ং ভগবানের কাছেই যেতে হবে।

এই ব্যাখ্যার পর এখন ভঙ্গি। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গির দরকার। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দে বসতে পারবে তার পক্ষে সেটাই উপযুক্ত ভঙ্গি। সাধারণত দেখবেন মেরুদণ্ডটাকে মুক্ত রাখতে হয়। মেরুদণ্ড দেহের ভার বইবার জন্য নয়।...বসার ভঙ্গি সম্পর্কে একমাত্র যা মনে রাখতে হয় তা হল যে কোনও ভঙ্গি যাতে মেরুদণ্ড দেহের ভার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে।

এরপর…নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আপনাদের যা বলছি তা ভারতের কোনও বিশেষ সম্প্রদায় থেকে সংগৃহীত কিছু নয়। এ সার্বজনিক সত্য। ঠিক যেমন এদেশে আপনাদের বাচ্চাদের আপনারা কিছু প্রার্থনা শেখান, লোকেরা বাচ্চাদের কিছু তথ্য ইত্যাদি জানিয়ে দেয়।

ভারতে বাচ্চাদের দু-একটা স্তব ছাড়া আর কোনও ধর্ম শেখান হয় না। তারা এমন কাউকে খোঁজে যার সঙ্গে তারা আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করতে পারে। বিভিন্ন লোকের কাছে ঘোরে, একসময়ে খুঁজে পায়, বলে "এই-ই আমার লোক", তারপর তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেয়। আমার যদি বিয়ে হয়ে থাকে আমার স্ত্রী হয়তো। আর একজন পুরুষ গুরু পেতে পারেন, আমার ছেলে হয়তো আরও অন্য কাউকে পেতে পারে, তা সব সময়েই আমার ও আমার গুরুর মধ্যেকার গোপন কথা। স্ত্রীর ধর্ম স্বামীর জানার দরকার নেই, স্বামী জিজ্ঞাসা করতেই সাহস করবে না স্ত্রীর ধর্ম কি। একথা সুবিদিত যে তারা কিছুতেই বলবে না। তা কেবল সেই ব্যক্তি ও তার গুরুর কাছে জ্ঞাত।…কখনও কখনও দেখতে পাবেন একজনের কাছে যা নিতান্ত হাস্যকর, অন্যজনের কাছে তা শিক্ষা।…যে যার বোঝা বইছে আর তার বিশেষ মন অনুযায়ী তাকে সাহায্য করতে হবে। এ হল পৃথক পৃথক ব্যক্তির ব্যাপার, সে, তার গুরু ও ভগবানের মধ্যেকার ব্যাপার। কিন্তু কতকগুলো সাধারণ পদ্ধতি আছে যা সব গুরুই শিক্ষা দেন। প্রাণায়াম ও ধ্যান সার্বজনিক। ভারতবর্ষে এই হল আরাধনা।

গঙ্গাতীরে আমরা দেখতে পাব স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সব প্রাণায়াম করছে ও পরে ধ্যান করছে। তাদের অবশ্য অন্য কাজ আছে। এতে তারা বেশি সময় দিতে পারে না। কিন্তু যারা এটাই সারা জীবনের অনুশীলন হিসাবে নিয়েছে তারা নানা পদ্ধতি অভ্যাস করে। চুরাশিটি বিভিন্ন আসন আছে। যারা কারও কাছে শিখে আসন করে তারা দেহের সমস্ত অঙ্গে নিঃশ্বাস ও নড়াচড়া অনুভব করে।

তারপর আসে ধারণা।…ধারণা হল মনকে কতকগুলি বিশেষ জায়গায় ধরে রাখা।

হিন্দু ছেলে বা মেয়ে…দীক্ষা পায়। গুরুর কাছ থেকে সে একটা শব্দ পায়। তাকে বলা হয় বীজ মন্ত্র। গুরুকে এই মন্ত্রটি দিয়েছিলেন তাঁর গুরু, আর তিনি সেটি তাঁর শিষ্যকে দেন। এই রকম একটা শব্দ হল ওঁ। এই সমস্ত প্রতীকগুলির বিরাট অর্থ আছে, তারা এগুলিকে গোপন রাখে, কখনও লেখে না। এ তাদের গুরুর কাছ থেকে কানের ভিতর দিয়ে পেতে হয়. লেখায় নয়, তারপর স্বয়ং ভগবান হিসাবে ধরে রাখতে হয়। তারপর সেই শব্দটি নিয়ে তারা ধ্যান করে।

আমি এক সময়ে এইভাবে প্রার্থনা করতাম। গোটা বর্ষাকালে, চার মাস ধরে। ভোরে উঠে নদীতে ডুব দিতাম, ভিজে কাপড়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মন্ত্র জপ করতাম। তারপর কিছু খেতাম, সামান্য একটু ভাত বা অন্য কিছু। বর্ষাকালে চার মাস ধরে!

ভারতীয় মন বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা পাওয়া যায় না। এ দেশে যদি কেউ টাকা চায় তো সে কাজ করতে যায় ও টাকা রোজগার করে। সেখানে

সে একটা সঙ্কেতসূত্র পায় ও গাছের তলায় বসে, আর বিশ্বাস করে টাকা আসবেই। সব কিছুকে তার চিন্তার জোরে আসতে হবে। এখানে আপনারা টাকা করেন। একই ব্যাপার। আপনারা টাকা করায় আপনাদের সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করেন।

হঠ-যোগী বলে কতকগুলি ধর্ম সম্প্রদায় আছে।...তারা বলে সর্বোচ্চ কল্যাণ হল দেহকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা।.. তাদের সমগ্র প্রক্রিয়াটি হল দেহকে আঁকড়ে থাকা। বারো বছর ধরে শিক্ষা! তারা বাচ্চাদের নিয়ে শুরু করে, তা নইলে অসম্ভব। ...হঠ-যোগীদের বিষয়ে একটা ব্যাপার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক: যখন সে প্রথম শিষ্য হয় সে বনে যায় ও ঠিক চল্লিশ দিন একা বাস করে। যা কিছু তাদের আছে তারা এই চল্লিশ দিনের মধ্যে শেখে।...

কলকাতায় একজন পাঁচশ বছর বেঁচে আছে বলে দাবি করে। লোকে আমায় বলে যে তাদের ঠাকুর্দারা ওই লোকটিকে দেখেছিল।...শরীর ঠিক রাখার জন্য রোজ সে কুড়ি মাইল ভ্রমণ করে, কখনও হাঁটে, দৌড়ায়। জলে নামে, আপাদমস্তক কাদায় ঢেকে ফেলে। তারপর আবার জলে ডুব দেয়, আবার গায়ে কাদা মাখে।... এর মধ্যে আমি তো কিছু ভাল দেখি না। লোকটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রাচীন, কারণ ভারতে আমি চৌদ্দ বছর ধরে ভ্রমণ করছি, যেখানেই গিয়েছি সকলেই তাকে জানে। লোকটি সারাজীবন ভ্রমণ করছে।...হঠযোগী একটা আশি ইঞ্চি লম্বা রবার গিলে ফেলবে, আবার উগরে দেবে। দিনে চার বার ক'রে তাকে দেহের সর্বাঙ্গ ভিতরের ও বাইরের ধুতে হবে।...

দেওয়ালগুলো তো হাজার হাজার বছর দেহ বাঁচাতে পারে।...তাতে হল কি? আমি অত দিন বাঁচতে চাই না। "এত অমঙ্গল নিয়ে অল্প দিনই যথেষ্ট।" সমস্ত বিভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটা ছোট দেহই যথেষ্ট।

আরও ধর্ম সম্প্রদায় আছে। তারা আপনাকে এক ফোঁটা সঞ্জীবনী সুধা দেবে, আর আপনি তরুণ থাকবেন।...এই সব ধর্ম সম্প্রদায়ের তালিকা দিতে আমার কয়েক মাস লেগে যাবে। তাদের সকল ক্রিয়াকলাপ হল এপারে।...রোজ একটা করে নতুন ধর্ম সম্প্রদায়।...

এই সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের শক্তি হল মনে। তারা চায় ভাব-মনটাকে ধরে রাখতে। প্রথমে মনকে একাগ্র কর তারপর একটা জায়গায় ধরে রাখ। ওরা সাধারণত বলে মেরুদণ্ড বরাবর দেহের অংশ বিশেষের উপর, অথবা স্নায়ুকেন্দ্রগুলির উপর। স্নায়ুকেন্দ্র-গুলির উপর মনকে ধরে রেখে যোগী নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ পায়। শরীর তার শান্তির পক্ষে বিরাট বিঘ্ন, তার সর্বোচ্চ আদর্শের উল্টো, কাজেই সে নিয়ন্ত্রণ চায় শরীরকে ভৃত্য হিসাবে রাখতে।

তারপর আসে ধ্যান। তা হল সর্বোচ্চ অবস্থা।...যখন মন দ্বিধাগ্রস্ত তখন সেটা তার পরম অবস্থা নয়। পরম অবস্থা হল ধ্যান। নিজেকে অন্য কিছুর সঙ্গে একাত্ম না হয়ে ধ্যান জিনিসগুলির উপর চোখ বোলায় ও দেখে। যতক্ষণ ব্যথা বোধ করি ততক্ষণ আমি শরীরের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছি। যখন আমি আনন্দ অথবা সুখ বোধ করি ততক্ষণ শরীরের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছি।

কিন্তু পরম অবস্থা আনন্দ অথবা ব্যথাকে একই আনন্দ অথবা প্রশান্ত সুখ নিয়ে দেখবে।...প্রত্যেক ধ্যানই প্রত্যক্ষ অতি-চেতনা। নিখুঁত একাগ্রতায় আত্মা স্থূল দেহের বন্ধন থেকে আসলে মুক্ত হয়ে যায় এবং নিজে যা তা বলেই নিজেকে চিনতে পারে। লোকে যা চায় তা তার কাছে আসে। ক্ষমতা ও জ্ঞান তো ইতিমধ্যেই রয়েছে। যে বস্তু ক্ষমতাহীন তার সঙ্গে আত্মা নিজেকে একাত্ম করে ফেলে, কাজেই কাঁদে। সে মরণশীল কায়ার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে।...কিন্তু সেই মুক্ত আত্মা যদি কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায় তা হলে তা পারে। সে যদি না করে তো তা আসে না। যে ভগবানকে জেনেছে সে ভগবান হয়ে গিয়েছে। এ রকম মুক্ত আত্মার কাছে কিছু অসম্ভব নয়। তার আর জন্ম-মৃত্যু নেই সে চিরকালের জন্য মুক্ত।

ধ্যান

(সানফ্রান্সিসকোর ওয়াশিংটন হলে ১৯০০ সালের ৩রা এপ্রিলে প্রদত্ত)

ধ্যানের উপর সব ধর্মেই জোর দেওয়া হয়। মনের ধ্যানস্থ অবস্থাকে যোগীরা মনের অস্তিত্বের যত অবস্থা আছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ বলে ঘোষণা করেন। মনে যখন বাইরের বস্তুকে অধ্যয়ন করে তখন সে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের উপমা ব্যবহার করে বলা যায়: আত্মা এক টুকরো স্ফটিকের মত, কিন্তু যা কিছু কাছে থাকে সে তারই রং নেয়। আত্মা যাকেই স্পর্শ করে··· তারই রং তাকে নিতে হয়। এই হল মুস্কিল। এতেই বন্ধন হয়। রং এত কড়া যে স্ফটিক নিজেকে ভুলে যায় ও রঙের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। ধরুন স্ফটিকের কাছে একটা লাল ফুল আছে, স্ফটিক সেই রং নেয় ও নিজেকে ভুলে যায়, মনে করে নিজেও লাল। আমরা দেহের রং নিয়েছি এবং নিজেরা কি তা ভুলে গিয়েছি। যা কিছু মুস্কিল পরে হয় তা ওই একটা মৃতদেহ থেকেই আসে। আমাদের সকল ভয়, সকল দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, ঝঞ্ঝাট, ভুল, দুর্বলতা, অনিষ্ট ওই এক মহাভুল থেকে—যে আমরা দেহ। এই হল সাধারণ লোক। এই হল সেই লোক যে কাছের ফুলটি থেকে রং নেয়। স্ফটিকও যেমন লাল ফুল নয়, আমরাও তেমনি দেহ নই।

ধ্যান অভ্যাস করা হয়। স্ফটিক জানে সে কি, সে তার আপন রং নেয়। অন্য যে কোনও জিনিসের চেয়ে ধ্যান আমাদের সত্যের বেশে কাছাকাছি আনে।···

ভারতে দুজন লোকের দেখা হল। ইংরেজিতে লোকে বলে "কেমন আছেন?" ভারতীয় সম্ভাষণ হল "আপনাতে আপনি নির্ভর তো?" যে মুহূর্তে আপনি অন্য কিছুর উপর ভর করে দাঁড়ালেন, সেই দুঃখে পড়ার ঝুঁকি নিলেন। ধ্যান বলতে আমি এই বুঝি—আত্মা নিজের উপর ভর করে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। এই অবস্থাই আত্মার সবচেয়ে সুস্থ অবস্থা, যখন সে নিজেরই কথা ভাবছে, আপন গৌরবেই বাস করছে। না, আর যা কিছু পদ্ধতি আমাদের আছে—ভাবাবেগ জাগিয়ে, প্রার্থনা করে ইত্যাদি—সবারই একই উদ্দেশ্য। গভীর ভাবাবেগের উত্তেজনায় আত্মা নিজের উপর ভর করে দাঁড়ানর চেষ্টা করে। ভাবাবেগ যদিও বাইরের যে কোনও জিনিস থেকে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে মনের একাগ্রতা থাকে।

ধ্যানের তিনটি স্তর আছে। প্রথমটিকে বলা হয় ধারণা। একটা জিনিসের উপর মনকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এই গ্লাসটির উপর আমি মনকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করলাম, মন থেকে এই গ্লাসটি ছাড়া আর সব বের করে দিলাম। কিন্তু মনটা চঞ্চল হচ্ছে।···যখন মনটা শক্ত হয় ও অতটা চঞ্চল হয় না তখন তাকে বলা হয় ধ্যান। পরে আরও উচ্চতর একটা অবস্থা আছে যখন গ্লাস ও আমার মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়—মন ও গ্লাস একাত্ম। আমি আর কোনও প্রভেদ দেখতে পাই না। সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যায়, অন্য ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে কাজ করছিল যেসব ক্ষমতা···

তখন গ্লাসটা সমগ্রভাবে মনের ক্ষমতায় অধীনে আসে। এই জিনিসটা বুঝতে হবে। ...যোগীদের এ এক বিরাট খেলা।...ধরে নিন বাইরের বস্তুটি আছে। তা হলে যে জিনিসটা সত্যিই আমাদের বাইরে যেটা দেখছি সেটা তা নয়। যে গ্লাসটা আমরা দেখছি সেটা নিশ্চয়ই বাইরের বস্তু নয়। গ্লাস বলে বাইরের যে বস্তুটি তাকে আমরা জানি না, কখনও জানবও না।

কোনও কিছু আমার উপর একটা ছাপ ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিক্রিয়াটা তার দিকে পাঠিয়ে দিই, আর গ্লাস হল এই দুইয়ের সমন্বয়ের ফল। বাইরে থেকে ক্রিয়া—ক। ভিতর থেকে ক্রিয়া—খ। গ্লাসটা হল কখ। যখন আপনি ক-এর দিকে তাকাচ্ছেন, তাকে বাইরের জগৎ বলুন, আর খ-এর দিকে তাকালে বলুন অন্তর্জগৎ।...আপনি যদি এখন তফাৎ করার চেষ্টা করেন যে কোনটি আপনার মন আর কোনটি জগৎ—সে রকম কোনও পার্থক্য নেই। জগৎ হল আপনি ও আর একটা কিছুর সমন্বয়।

আর একটা উদাহরণ ধরা যাক। হ্রদের মসৃণ উপরিভাগে আপনি পাথর ফেলছেন। প্রত্যেকটা পাথর যে ফেলছেন তার একটা করে প্রতিক্রিয়া হয়। পাথরটা হ্রদের ছোট ছোট ঢেউয়ে ঢেকে যায়। অনুরূপভাবে বাইরের বস্তুগুলি হল মনের হ্রদে পড়া পাথরের মত। কাজেই আমরা আসলে বাইরের বস্তুটিকে দেখি না,... দেখি কেবল ঢেউ।...

মনের মধ্যে যেসব ঢেউ ওঠে তা বাইরে অনেক কিছু ঘটিয়েছে। আমরা ভাববাদ ও বস্তুবাদের [গুণ] আলোচনা করছি না। আমরা একথা ধরে নিই যে বাইরে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, কিন্তু আমরা যা দেখি তা বাইরে যা আছে তা থেকে পৃথক, কারণ আমরা যা দেখি তা বাইরের বস্তু ও আমাদের নিজেদের যোগফল, বস্তু যোগ আমরা নিজেরা।

ধরুন গ্লাস থেকে আমার অবদানটি নিয়ে নিলাম। থাকে কি? প্রায় কিছু না। শূন্য। গ্লাস অদৃশ্য হয়ে যাবে। টেবিল থেকে আমার অবদান যদি নিয়ে নিই টেবিলের থাকবে কি? নিশ্চয়ই এ টেবিলটা নয়, কারণ এটা হল বাইরের বস্তু ও আমার অবদানের যুক্ত সংমিশ্রণ। যখনই হ্রদে পাথর ফেলা হয় বেচারা হ্রদকে তখন পাথরের দিকে ঢেউ পাঠাতেই হবে। মনকে যে কোনও অনুভূতির দিকে ঢেউ তুলতেই হবে। ধরা যাক···আমরা মনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রভু। এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা আমাদের অংশটা যোগ করতে অস্বীকার করি।...আমাদের ভাগটা না দিলে একে থেমে যেতেই হবে।

সর্বদা আপনি এই বন্ধন সৃষ্টি করছেন। কিভাবে? আপনার ভাগটা দিয়ে। আমরা আমাদের নিজেদের শয্যা রচনা করছি, নিজেদের শৃঙ্খল গড়ছি।...যখন এই বাইরেকার বস্তু ও আমার সঙ্গে একাত্মতা বন্ধ হয়, তখন আমি আমার অবদান তুলে নিতে সমর্থ হব এবং বস্তু অদৃশ্য হবে। তখন আমি বলব "এই তো গ্লাস," তারপর মনটাকে তফাৎ করে নেব আর তা অদৃশ্য হবে।...যদি আপনি আপনার অংশটা তুলে নিতে পারেন তো জলের উপর দিয়ে হাঁটতে পারেন। সে আপনাকে

আর ডোবাবে কেন? বিষেই বা কি হবে? আর কোনও অসুবিধা নেই। প্রকৃতির প্রতিটি ব্যাপারে অন্তত অর্ধেক আপনি দেন আর অর্ধেক প্রকৃতি দেয়। যদি আপনার অর্ধেক নিয়ে নেওয়া হয় তো জিনিসটাকে থেমে যেতেই হবে।

…প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান প্রতিক্রিয়া আছে।…আমাকে যদি কেউ আঘাত করে ও আহত করে, তাহলে তা সেই লোকটার ক্রিয়া ও আমার দেহের প্রতিক্রিয়া।… ধরা যাক দেহের উপর আমার এমন ক্ষমতা আছে যে আমি স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া পর্যন্ত ঠেকাতে পারি। এরকম ক্ষমতা অর্জন করতে পারা যায় কি? বইতে বলে যে পারা যায়।…আপনি যদি হঠাৎ তা পেয়ে যান সে হল অলৌকিক ঘটনা।' যদি বৈজ্ঞানিকভাবে শেখেন তা যোগ।

আমি মনের শক্তিতে মানুষকে নিরাময় হতে দেখেছি। এই হল অলৌকিক শক্তিধর। আমরা বলি সে প্রার্থনা করল আর মানুষটা নিরাময় হয়ে গেল। আর একজন বলে "মোটেই না। এ হল কেবল মনের ক্ষমতা। এ লোকটা বৈজ্ঞানিক। সে জানে কি সে করছে।"

ধ্যানের ক্ষমতা আমাদের সব দেয়। প্রকৃতির উপরে ক্ষমতা পেতে চান তো ধ্যানের ভিতর দিয়ে তা পেতে পারেন। ধ্যানের ক্ষমতা দিয়েই বর্তমানে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। লোকেরা বিষয়টি অধ্যয়ন করে ও সব কিছু ভুলে যায়, নিজেদের একাত্মতা ও সবকিছু, তখন মহৎ সত্য বিদ্যুৎ চমকের মত এসে পড়ে। কিছু লোক মনে করে যে এ প্রেরণা। মৃত্যু যত প্রেরণা তার চেয়ে বেশী নয়; কোনও জিনিস শুধু শুধু পাওয়া যায়নি।

সর্বোচ্চ তথাকথিত প্রেরণা ছিল যিসাসের কাজ। পূর্বজন্মগুলিতে যুগ যুগ ধরে তিনি কাজ করেছিলেন। এ ছিল তাঁর আগেকার কাজের—কঠিন কাজের ফল। প্রেরণার কথা বলা অর্থশূন্য। প্রেরণা যদি হত তো বৃষ্টির মত পড়ত। চিন্তার যে কোনও ধারায় প্রেরণা-উদ্দীপ্ত লোক কেবল সেই সব জাতির মধ্যেই দেখা দেয় যাদের সাধারণ শিক্ষা আছে। প্রেরণা বলে কিছু নেই।…প্রেরণা বলে যা চালু তা হল ইতিমধ্যে মনে অবস্থিত কারণসমূহের ফল। একদিন বিদ্যুৎ চমকের মত ফল আসে। তাদের অতীত কাজই ছিল এর কারণ।

এর মধ্যেও আপনি দেখছেন ধ্যানের ক্ষমতা—চিন্তার নিবিড়তা। এই সব লোক তাদের নিজের আত্মাকে মন্থন করেন। মহৎ সত্য উপরে উঠে আসে ও আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই ধ্যান অভ্যাস করা হল জ্ঞানের মহৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ধ্যানের ক্ষমতা ছাড়া কোনও জ্ঞানলাভ হয় না। অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে ধ্যানের দ্বারা আমরা সাময়িকভাবে নিরাময় হতে পারি, তার বেশি নয়। ধরুন একটা লোক আমায় বলল তুমি যদি অমুক বিষপান কর তাহলে মরে যাবে, আর একটা লোক রাত্রে এসে বলল "যাও, ওই বিষ পান কর!" আর আমি তাতে মরলাম না। আমার মন ধ্যান থেকে ঠিক সেইটুকু সময়ের জন্য বিষ ও আমার মধ্যেকার একাত্মতা কেটে দিল। আর এক সময়ে বিষ পান করলে আমি মরে যাব।

আমি যদি কারণটা জানি ও মনটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সেই পর্যন্ত তুলতে পারি, আমি যে কোনও কাউকে বাঁচাতে পারি। বইয়ে এই কথা বলা আছে; তবে এ কতটা নির্ভুল আপনাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনারা ভারতীয় লোকেরা এ সব জিনিস জয় করেন না কেন? আপনারা সব সময়ে অন্য সব লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেন। আপনারা যোগাভ্যাস করেন ও অন্যদের চেয়ে তাড়াতাড়ি করেন। আপনারা অধিকতর উপযুক্ত। করে ফেলুন! আপনারা যদি মহান জাতি হন তবে আপনাদের একটা মহৎ পদ্ধতি থাকা উচিত। আপনাদের সব দেবতাদের বিদায় দিতে হবে। আপনারা মহৎ দার্শনিকদের ধরুন আর দেবতাদের ঘুম পাড়িয়ে দিন। আপনারা নিতান্তই শিশু, পৃথিবীর অন্যান্যদের মতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর আপনাদের সব দাবিই ব্যর্থ। আপনাদের যদি দাবি থাকে তো উঠে দাঁড়ান, সাহসী হন, যা কিছু স্বর্গ আছে সে আপনাদেরই। কস্তুরী মৃগের ভিতরে সুগন্ধ থাকে, সে জানে না এ সুগন্ধ কোথা থেকে আসে। তারপর অনেক অনেক দিন পরে নিজের ভিতরেই তার সন্ধান পায়। সমস্ত দেবতা ও দানব মানুষের ভিতরেই থাকে। যুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বলে নিজেদের মধ্যেই সব খুঁজে বের করুন। আর দেব-দেবী ও কুসংস্কার নয়। আপনারা যান যুক্তিবাদী হতে, যোগী হতে, সত্যিকারের আধ্যাত্মিক হতে।"

আমার জবাব সব কিছুই বাস্তব। ভগবান সিংহাসনে বিরাজমান এর চেয়ে বাস্তব কি আছে? যে বেচারী মূর্তি পূজা করে তাকে আপনারা হীনচক্ষে দেখেন, আপনারাও তার চেয়ে কিছু ভাল নয়। আর আপনারা, স্বর্ণ-উপাসকেরা, আপনারা কি? মূর্তি পূজকেরা তাদের দেবতাকে পূজা করে, এমন একটা কিছু যা সে দেখতে পায়। আপনারা এমন কি তাও করেন না। আপনারা আত্মার উপাসনা করেন না, যা বুঝতে পারেন এমন কিছুও করেন না।···বুলি-উপাসকরা! "ভগবান পরমাত্মা!" ভগবান অবশ্যই পরমাত্মা, আর তাঁকে আধ্যাত্মিকভাবে ও বিশ্বাস নিয়েই আরাধনা করা উচিত। পরমাত্মা বাস করে কোথায়? গাছে? মেঘে? ভগবান আমাদের বলতে কি বোঝেন? আপনিই তো আত্মা। এটাই হল প্রথম মৌলিক বিশ্বাস যা আপনাদের কখনও ছাড়া উচিত নয়। আমিই হলাম আধ্যাত্মিক সত্তা। এ আছে। যোগের সব কৌশল ও ধ্যানের এই ব্যবস্থা হল তাঁকে সেখানে খুঁজে বের করা।

এখন আমি এসব বলছি কেন? সঠিক স্থানটি খুঁজে বের না করলে কথা বলতে পারবেন না। আপনারা কেবল সঠিক স্থানটি ছাড়া স্বর্গেও জগতের সর্বত্র এটি নির্ধারণ করছেন। আমি আত্মা, কাজেই সকল আত্মার পরমাত্মা নিশ্চয়ই আমার আত্মাতেই আছেন। যারা মনে করে তিনি অন্য কোথাও আছেন তারা অজ্ঞ। তাঁকে এখানে, এই স্বর্গেই খুঁজতে হবে; যা কিছু স্বর্গ আছে তা আমার নিজের মধ্যেই। কিছু ঋষি আছেন যাঁরা এ কথা বুঝে দৃষ্টি অন্তর্লোকের দিকে ফেরান এবং পরমাত্মাকে নিজেদের আত্মার

মধ্যেই খুঁজে পান। এই হল ধ্যানের জায়গা। ভগবানের ও নিজের আত্মা সম্বন্ধে সত্য খুঁজে বের করুন ও মুক্তি অর্জন করুন।...

আপনারা সব জীবনের পেছনে দৌড়চ্ছেন, আমরা তাকে বোকামি মনে করি। এমন একটা কিছু আছে বা জীবনের চেয়ে উচ্চতর। এই জীবন নিম্নতর, বৈষয়িক। আদৌ বাঁচতে যাব কেন? আমি জীবনের চেয়ে উচ্চতর কিছু। জীবনধারণ সর্বদা দাসত্ব। আমরা বরাবর গুলিয়ে ফেলি।...সব কিছু দাসত্বের নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খল।

কিছু একটা আপনি পান, কোনও লোক অন্যকে শেখাতে পারে না। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই আমরা শিখি।...ওই তরুণটিকে কিছুতেই বোঝাতে পারবেন না যে জীবনের কোনও বাধাবিঘ্ন আছে। বুড়ো লোককে আপনি বোঝাতে পারবেন না যে জীবনটা মসৃণ। ওঁর অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই হল তফাৎ।

ধ্যানের শক্তিতে এসব জিনিসকে আমাদের ধাপে ধাপে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমরা দার্শনিকভাবে দেখেছি যে আত্মা, মন, বস্তু ইত্যাদির মধ্যে এইসব পার্থক্যের কোনও বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই।...যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সব এক। বহু হতে পারে না। জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাই বোঝায়। অজ্ঞতা বহু দেখে। জ্ঞান এককে উপলব্ধি করে।...বহুকে একে পরিণত করা হল বিজ্ঞান। সমগ্র জগৎ একের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সেই বিজ্ঞানকে বলা হয় বেদান্ত। সারা জগত এক। সমস্ত আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে একই বিরাজমান।...

এখন আমাদের এইসব বৈচিত্র্য আছে ও সেগুলিকে আমরা দেখি—যাকে আমরা পঞ্চভূত বলি: ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ,ব্যোম। তার পরের অস্তিত্বের অবস্থা মানসিক, আর তারও পরে আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা এমন নয় যে আত্মা এক, মন আর এক, ব্যোম আর এক, ইত্যাদি। এ একই অস্তিত্ব এইসব বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। পিছিয়ে যেতে হলে ক্ষিতিকে অপ হতে হবে। যেভাবে উপাদানগুলি উদ্ভূত হয়েছে সেই ভাবেই তাদের ফিরে যেতে হবে। কঠিন তরল হবে, ইথারে পরিণত হবে। এই হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা—আর তা সার্বজনিক। বহির্বিশ্ব রয়েছে, আছে সার্বজনিক আত্মা, মন, ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ, ক্ষিতি।

মন সম্বন্ধেও একই কথা। বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণেও আমি ঠিক একই। আমিই আত্মা, আমিই মন, আমি ব্যোম, ক্ষিতি, অপ, মরুৎ। আমি যা করতে চাই তা হল আমার আধ্যাত্মিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া। ব্যক্তিকে একটি স্বল্পস্থায়ী জীবনের মধ্যে সমগ্র জগতের জীবনটি যাপন করতে হবে। এইভাবেই মানুষ এই জীবনে মুক্ত হতে পারে। সে তার নিজের স্বল্পস্থায়ী জীবনের মধ্যে জীবনের সমগ্র পরিসরটি যাপনের ক্ষমতা ধরবে।

আমরা সবাই সংগ্রাম করি।...আমরা যদি পরম সত্তায় পৌঁছতে না পারি, কোথাও একটা পৌঁছব, এখন যে অবস্থায় আছি তার চেয়ে সে ভাল হবে।

ধ্যান এই আচরণের মধ্যে নিহিত। ক্ষিতি অপে গলে যায়, অপ মরুতে, মরুৎ ব্যোমে, তারপর মনে, আর মন বিলীন হয়ে যায়। সমস্তই আত্মা।

কিছু যোগী দাবি করেন যে এই দেহ তরল হয়ে যাবে, ইত্যাদি। এ নিয়ে আপনি

যা খুশি করতে পারেন, একে ছোট্ট করে ফেলতে পারেন বা মরুতে পরিণত করতে পারেন বা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে নিতে পারেন ; ইত্যাদি তাঁরা বলে থাকেন। আমি জানি না। আমি কাউকে এ করতে দেখিনি। তবে বইতে এসব আছে। বইকে অবিশ্বাস করার আমাদের কোনও কারণ নেই।

হয়তো আমাদের কেউ কেউ এই জীবনেই এ করতে পারব। বিদ্যুৎ চমকের মত এ আসে আমাদের অতীত কাজের ফল হিসাবে। কে জানে এখানেই কিছু পুরানো যোগী আছেন কিনা যাঁদের সামান্য একটু করলেই গোটা কাজটা হয়ে যাবে। অভ্যাস করে দেখুন!

আপনারা জানেন ধ্যান কল্পনার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসে। আপনি উপাদানগুলির শুদ্ধির এইসব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যান—একটিকে আর একটির মধ্যে গলিয়ে দিয়ে, তারপর পরবর্তী উচ্চতরটিতে, তারপর মনে, তারপর আপনিই আত্মা।

আত্মা সর্বদা মুক্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা। অবশ্য ভগবানের অধীনে। অনেক ভগবান থাকতে পারেন না। এই মুক্ত আত্মাগুলি আশ্চর্য ক্ষমতাশালী, প্রায় সর্বশক্তিমান। কেউ ভগবানের মত ক্ষমতাশালী হতে পারে না। যদি কোনও বলে "আমি এই গ্রহকে এই দিকে চালাব," আর অন্য কেউ বলে "আমি একে ওই দিকে চালাব" তা হলেই বিভ্রান্তি।

আপনারা যেন ভুল করবেন না। আমি যখন ইংরেজিতে বলি "আমিই ভগবান" তার কারণ এর চেয়ে ভাল শব্দ নেই বলে। সংস্কৃতে ভগবান মানে পরম সত্তা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, অসীম আত্ম-জ্যোতির্ময় চেতনা। ব্যক্তি নয়। এ নৈর্ব্যক্তিক।

আমি কখনও রাম নই কিন্তু আমি নৈর্ব্যক্তিক। ধরুন বিরাট এক তাল কাদা আছে। সেই কাদা থেকে আমি একটি ছোট ইঁদুর গড়লাম, আর আপনি একটি ছোট হাতী গড়লেন। দুই-ই কাদা। দুটোই গলিয়ে ফেলুন। দুই-ই মূলত এক। "আমি ও আমার পিতা এক।"

আমি কোথাও থেমে যাই, আমার অল্প জ্ঞান আছে। আপনার একটু বেশি আছে ; আপনি আর একটা কোথাও থেমে যান। একটি আত্মা আছেন যিনি মহত্তম। তিনি হলেন ঈশ্বর, যোগের ঈশ্বর তিনিই হলেন একক। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি প্রতিটি হৃদয়ে বিরাজ করেন। দেহহীন। তাঁর দেহের প্রয়োজন হয় না। ধ্যান ইত্যাদি অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে আপনি যা পেতে পারেন, ধ্যানের মধ্যে দিয়ে আপনি ঈশ্বরে, যোগীশ্বরে পৌঁছাতে পারেন।

কোনও মহৎ আত্মা নিয়ে, অথবা জীবনের সামঞ্জস্য নিয়ে ধ্যান করলেও এই একই প্রাপ্তি হতে পারে। এগুলিকে বলে বস্তুগত ধ্যান। এতে আপনি কোনও বাইরেকার জিনিস, অথবা ভিতরের বা বাইরের কোনও বস্তুগত জিনিস নিয়ে ধ্যান শুরু করেন। লম্বা একটা বাক্য নিলে কোনও ধ্যান হয় না। সে কেবল পুনরাবৃত্তি দ্বারা মনটাকে স্থির করার চেষ্টা করা। ধ্যান মানে মনটাকে নিজের প্রতি ঘুরিয়ে ধরা। মন সমস্ত

[চিন্তা-তরঙ্গকে] থামিয়ে দেয়, আর জগত থেমে যায়। আপনার চেতনা প্রসারিত হয়। প্রতিবার ধ্যানের সঙ্গে আপনার প্রসার হতে থাকবে।...

আরও একটু কঠোর চেষ্টা করুন, আরও বেশি করে, তখন ধ্যান আসবে। আপনি দেহকে বা অন্য কিছুকে আর অনুভব করতে পারবেন না। সেই সময়ের পর যখন বেরিয়ে এলেন তখন আপনার জীবনে এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বিশ্রাম পেয়েছেন। এই একমাত্র উপায় যেভাবে আপনার শরীরকে আপনি আদৌ বিশ্রাম দিতে পারেন। গাঢ়তম নিদ্রাও আপনাকে এমন বিশ্রাম দেবে না। গাঢ়তম নিদ্রার মধ্যেও মন চঞ্চল হতে থাকে। কয়েক মিনিট থাকলেও আপনার মস্তিষ্ক প্রায় থেমে যায়। সামান্য একটু জীবনী শক্তি কেবল জেগে থাকে। দেহকে আপনি ভুলে যাবেন। আপনাকে টুকরো টুকরো করে কাটলে আপনি মোটেই টের পাবেন না। এতে এমন একটা আনন্দ পাবেন! একেবারে লঘু হয়ে যাবেন। এই সম্পূর্ণ বিশ্রাম আপনি ধ্যানে পাবেন।

তারপর বিভিন্ন বস্তু নিয়ে ধ্যান। এ হল মেরুদণ্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রের উপর ধ্যান। যোগীদের ধারণা মেরুদণ্ডে দুটি স্নায়ু আছে, নাম ইড়া ও পিঙ্গলা। খাত যেখান দিয়ে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী স্রোত বয়। ফাঁপা মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে বয়। যোগীরা দাবি করে এটি রুদ্ধ থাকে। ধ্যানের শক্তি দিয়ে খুলতে হয়। কর্মশক্তি নীচে পাঠিয়ে দিতে হয়, আর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। জগৎ তখন বদলে যাবে।

আপনার চারিদিকে হাজার হাজার দিব্য সত্তা রয়েছে। আপনি তাদের দেখতে পান না কারণ আমাদের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা কেবল এই বাইরেটা দেখতে পাই। এর নাম দেওয়া যাক ক। এই ক-কে আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী দেখি। বাইরের একটা গাছের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। একটা চোর এল, আর গুঁড়িকে কি দেখল? পুলিশ। বাচ্চাটা একটা মস্ত ভূত দেখল। প্রিয়ার জন্য তরুণ অপেক্ষা করছিল, সে কি দেখল? তার প্রিয়াকে। গাছের গুঁড়ি কিন্তু বদলায় নি। সে যা তাই-ই ছিল। এই হল স্বয়ং ভগবান, আমাদের বোকামির জন্য আমরা মানুষ হিসাবে, ধূলিকণা হিসাবে। মূক, দুর্দশাপন্ন হিসাবে দেখি।

যাদের একই রকম গঠন স্বভাবত তারা একত্র জড়ো হবে ও একই জগতে বাস করবে। অন্যভাবে বললে আপনি একই জায়গায় বাস করেন। সমস্ত স্বর্গ নরক এখানেই আছে। উদাহরণ স্বরূপ: বৃহৎ বৃত্তের কতকগুলি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করছে।...এক বৃত্তের মধ্যে এই সমতলে আমরা আরেকটা বৃত্তের একটা বিশেষ বিন্দুর সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে পারি। মনটা যদি কেন্দ্রবিন্দুতে চলে যায় তা হলে আপনি সব কটা সমতলে সচেতন হতে শুরু করেন। ধ্যানে কখনও কখনও আপনি আর একটা সমতলকে স্পর্শ করেন ও অপরাপর সত্তা, অশরীরী আত্মা ইত্যাদি দেখেন। ধ্যানের শক্তিতে আপনি সেখানে পৌছান। এই শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বদলে দিচ্ছে, পরিশুদ্ধ করছে। পাঁচ দিন ধ্যান অভ্যাস করলে আপনি [চেতনার] এই সব কেন্দ্রের ভিতর থেকে ব্যথা অনুভব করবেন, শ্রবণ

শক্তি [সূক্ষ্মতর হয়]। সেই কারণে সমস্ত ভারতীয় দেব-দেবীর ত্রিনয়ন থাকে। ওই হল মনশ্চক্ষু যা খুলে যায় ও আপনাকে আধ্যাত্মিক বস্তু দেখায়।

মেরুদণ্ডের এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে উঠে এই কুণ্ডলিনী শক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে বদলে দেয়, আর এই জগতকে আপনি আর এক দেখেন। এ হল স্বর্গ। আপনি কথা বলতে পারেন না। তারপর কুণ্ডলিনী নিম্নতর কেন্দ্রগুলিতে নেমে যায়। তখন আপনি আবার মানুষ যতক্ষণ সমস্ত কেন্দ্রগুলি পার হয়ে কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে না পৌঁছয়, পৌঁছলে সমস্ত দৃশ্য মিলিয়ে যায় ও আপনি···একটি অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু অনুভব করেন না। এখন আপনি ভগবান। তাঁর থেকে আপনি সমস্ত স্বর্গ, সমস্ত জগৎ তৈরি করতে পারেন। তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব। আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

ধর্মাচরণ

(১৯০০ সালের ১৮ই এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়ার আলামিডাতে প্রদত্ত ভাষণ)

আমরা অনেক বই, অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করি। শৈশব থেকে আমাদের নানারকম ভাবধারা জন্মায় এবং যখন তখন আমরা তার পরিবর্তনও করি। তত্ত্বগত ধর্ম বলতে কি বোঝায় তা আমরা বুঝি। আমরা মনে করি ব্যবহারিক ধর্ম বলতে কি বোঝায় তাও বুঝি। এখন আমি আপনাদের কাছে ব্যবহারিক ধর্ম বলতে আমি কি বুঝি তাই উপস্থিত করব।

ব্যবহারিক ধর্মের কথা আমরা চতুর্দিকেই শুনতে পাই এবং তার সব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাকে একটা ধারণায় পর্যবসিত করা যায়—তা হল অন্যান্য মানুষের প্রতি বদান্যতা। এই কি ধর্মের সব? এ দেশে রোজই আমরা ব্যবহারিক খ্রীষ্টধর্মের কথা শুনি—কোনও ব্যক্তি তার আশেপাশের মানুষদের জন্য কিছু ভাল করেছে। তাই কি সব?

জীবনের লক্ষ্য কি? ইহলোকই কি জীবনের লক্ষ্য? তার বেশি কিছু নয়? যা আছি আমরা কি কেবল তাই-ই থাকতে চাই, আর কিছু নয়? মানুষ কি যন্ত্র হবে, যা কোনও বাধাবিঘ্ন ছাড়া মসৃণভাবে চলে? বর্তমানে যা কিছু দুঃখকষ্ট সে সহ্য করছে তার কি কেবল তাই-ই পাওনা, সে কি আর কিছু চায় না?

বহু ধর্মেরই সর্বোচ্চ স্বপ্ন হল পার্থিব জীবন।··· মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেদিনের স্বপ্ন দেখছে যখন আর রোগ, ব্যাধি, দারিদ্র্য থাকবে না, অথবা কোনও রকমের দুঃখ থাকবে না। সব দিক থেকেই মানুষ সুসময় পাবে। সুতরাং ব্যবহারিক ধর্মের একমাত্র অর্থ হল "পথ সাফ কর! সুন্দর কর!" আমরা দেখব কিভাবে সকলে তা উপভোগ করে।

উপভোগই কি জীবনের লক্ষ্য? তাই যদি হয় তবে মানুষ হওয়াটাই একটা বিরাট ভুল হয়েছে। মানুষ কি কুকুর কিংবা বিড়ালের চেয়ে বেশি আগ্রহ নিয়ে খাদ্য উপভোগ করতে পারে? সার্কাসে গেলে দেখবেন বন্যজন্তুরা হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। ফিরে গিয়ে পাখি হয়ে যান।···মানুষ হয়ে তা হলে কি ভুলই না হয়েছে। কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগী হওয়ার জন্যই আমার এই হাজার হাজার বছরের সংগ্রাম? এত বছরের সংগ্রাম তবে বৃথাই গেল।

কাজেই লক্ষ্য করুন, ব্যবহারিক ধর্মের সাধারণ তত্ত্ব কোথায় নিয়ে যায়। বদান্যতা মহৎ। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি বলবেন এই-ই সব, তখন আপনি জড়বাদের খপ্পরে পড়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন। এ ধর্ম নয়। নাস্তিকতাবাদ থেকে ভাল কিছু নয়—বরঞ্চ একটু খারাপ। আপনারা ক্রিশ্চানরা অপর লোকের জন্য কিছু কাজ করা, হাস-পাতাল নির্মাণ ছাড়া বাইবেলে আর কি কিছুই পাননি? এই একজন দোকানদার, সে বলছে যিসাস দোকানটি কেমন ভাল চালাতেন! যিসাস কোনও সেলুন বা কোনও দোকান চালাতেন না, কোনও সংবাদপত্রেরও সম্পাদনা করতেন না। ওই ধরনের ব্যবহারিক ধর্ম ভাল, খারাপ নয়; কিন্তু তা হল কেবল কিণ্ডারগার্টেনের ধর্ম।

এ কোথাও নিয়ে যায় না। আপনি যদি ভগবানে বিশ্বাস করেন, যদি ক্রিশ্চান হন এবং রোজ বলেন "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক," ভেবে দেখুন তার অর্থ কি! আপনি প্রতি মুহূর্তে বলছেন "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক", আসলে বলতে চান "হে ভগবান, তুমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর।" অনন্ত তাঁর নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে চলেছেন। তিনি যদি ভুলও করে থাকেন আমি আপনি কি তার প্রতিকার করতে পারব! জগতের স্থপতিকে শেখাবে ছুতোর? তিনি জগতটাকে একটা নোংরা গর্ত করে রেখেছেন, আর আপনি তাকে সুন্দর জায়গা করে তুলবেন!

এ সবের লক্ষ্য কি? ইন্দ্রিয় কি কখনও লক্ষ্য হতে পারে? আনন্দ উপভোগ কি কখনও লক্ষ্য হতে পারে? এই জীবন কি আত্মার লক্ষ্য হতে পারে? যদি তাই-ই হয়, এক্ষুনি মরে যাওয়া ভাল। এ জীবন চাই না। তাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় যে সে শুধু একটা নিখুঁত যন্ত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে, তবে তার একমাত্র অর্থ হবে যে আমরা গাছপালা, পাথর ও ওই ধরনের কিছু হওয়ার দিকে ফিরে যাচ্ছি। কখনও শুনেছেন যে গরু মিথ্যা কথা বলছে? কিংবা গাছকে কখনও চুরি করতে দেখেছেন? ওগুলো নিখুঁত যন্ত্র। ওরা ভুল করে না। ওরা এমন এক জগতে বাস করে যেখানে সব কিছুই তৈরি।...

ধর্মের আদর্শ তাহলে কি যদি এ ব্যবহারিক না হতে পারে? আর এ নিশ্চয়ই তা হতে পারে না। এখানে আমরা রয়েছি কেন? মুক্তির জন্য, জ্ঞানের জন্য। নিজেদের মুক্ত করার জন্য আমরা জ্ঞান লাভ করতে চাই, তাই-ই আমাদের জীবন: মুক্তির জন্য এক সর্বজনিক চাহিদা। বীজ থেকে চারা জন্মায়, মাটি ফুঁড়ে আকাশের দিকে মাথা তোলে ...এর কারণ কি? পৃথিবীর জন্য সূর্যের অর্ঘ্য কি? আপনার জীবন কি? মুক্তির জন্য সেই এক সংগ্রাম। চারিদিক থেকে প্রকৃতি আমাদের দমন করতে চেষ্টা করছে, আর আত্মা চাইছে নিজেকে প্রকাশ করতে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম চলছে। মুক্তির জন্য এই সংগ্রামে বহু জিনিস নিষ্পিষ্ট হবে ও ভেঙে-চুরে যাবে। এই হল আপনাদের আসল দুঃখ। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ধুলো-ময়লা উড়বেই। প্রকৃতি বলে "আমি জয় করে নেব।" আত্মা বলে "আমাকে বিজয়ী হতেই হবে।" প্রকৃতি বলে "অপেক্ষা কর, তোমাকে শান্ত রাখার জন্য কিছু সুখ দেব।" আত্মা সামান্য সুখভোগ করে, মুহূর্তের জন্য মোহাবিষ্ট হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে মুক্তির জন্য চিৎকার করে। প্রতিটি বক্ষে যুগ যুগ ধরে যে শাশ্বত ক্রন্দন চলছে তা কি লক্ষ্য করেছেন? আমরা দারিদ্র্যের দ্বারা প্রতারিত হই। আমরা সম্পদশালী হই এবং সম্পদের দ্বারা প্রতারিত হই। আমরা অজ্ঞ। আমরা পড়ি ও শিখি, এবং জ্ঞান দ্বারা প্রতারিত হই। কোনও মানুষই কখনও তৃপ্ত হয় না। দুঃখের এই হল কারণ, কিন্তু তা সকল সুখেরও কারণ। তাই হল নিশ্চিত লক্ষণ। ইহলোক নিয়ে কি করে তৃপ্ত হবেন?...এই পৃথিবী যদি আগামী কাল স্বর্গেও পরিণত হয়, তাহলে আমরা বলব "এ নিয়ে যাও, আমাদের অন্য কিছু দাও।"

স্বয়ং অনন্ত ছাড়া অসীম মানবাত্মা কখনও তৃপ্ত হতে পারে না।...অসীম বাসনা কেবল অসীম জ্ঞানের দ্বারাই তৃপ্ত হতে পারে—তার কম কিছুতে নয়। অনেক পার্থিব

জীবন আসবে যাবে। তাতে কি আসে যায়? আত্মা বেঁচে থাকে ও চিরকাল প্রসারিত হয়। পার্থিব জীবনকে আত্মার মধ্যেই আসতে হবে। পার্থিব জীবনকে সাগরে বারিবিন্দুর মত আত্মাতে বিলীন হতে হবে। পার্থিব জীবনই কি আত্মার লক্ষ্য হবে? যদি আমাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে আমরা তাতে সন্তুষ্ট হব না। যদিও যুগ যুগ ধরে কবিদের এটাই ছিল মূলভাব, তাঁরা সর্বদাই আমাদের সন্তুষ্ট হতে বলেছেন। আর এখনও পর্যন্ত কেউই সন্তুষ্ট হয়নি। কোটি কোটি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আমাদের বলেছেন "নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাক", কবিরা এই গান গেয়েছেন। আমরা নিজেদের বলেছি "শান্ত হও, ও সন্তুষ্ট থাক", তবু তা হইনি। এ হল সেই শাশ্বত সত্তার অভিপ্রায় যে আমার আত্মাকে এ পৃথিবীর কিছুই সন্তুষ্ট করতে পারবে না, উপরে স্বর্গের কিছুও পারবে না, আর পাতালের কিছুও পারবে না। আমার আত্মার বাসনার সামনে নক্ষত্র ও পৃথিবী, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেবল একটা ঘৃণ্য ব্যাধি ছাড়া আর কিছু নয়। এই হল অর্থ। এই অর্থ যদি না হয় তা হলে সব কিছুই একটা অমঙ্গল। এই অর্থ যদি না হয়, এর প্রকৃত গুরুত্ব, এর লক্ষ্য যদি না বোঝেন, তাহলে প্রত্যেক বাসনাই অমঙ্গল। সমস্ত প্রকৃতি তার প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে দিয়ে একটি জিনিসের জন্যই চিৎকার করছে, তা হল নিখুঁত মুক্তি।

তা হলে ব্যবহারিক ধর্ম কি? ওই অবস্থায় পৌছান, অর্থাৎ মুক্তি, মুক্তিলাভ। আর এই জগৎ যদি ওই লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে তা হলে সব ঠিক। আর তা যদি না করে, যদি ইতিমধ্যে জমা হাজার হাজার আস্তরণের উপর আর একটা চাপাতে শুরু করে, তা হলে তা একটা অমঙ্গল হয়ে ওঠে। সম্পত্তি, শিক্ষা, সৌন্দর্য, অন্য সব কিছু যতক্ষণ আমাদের ওই লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে ততক্ষণ তার ব্যবহারিক মূল্য থাকে। মুক্তির ওই লক্ষ্যে পৌছতে যখন তারা আমাদের সাহায্য করে না, তখন তার রীতিমত বিপদ। ব্যবহারিক ধর্ম তা হলে কি? ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত জিনিসকে শুধু একটি লক্ষ্যের জন্যই, অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্যই ব্যবহার করুন। প্রত্যেকটি উপভোগকে, আনন্দের প্রতিটি কণাকে কিনতে হবে অসীম হৃদয় ও মনের সম্মিলিত মূল্যে।

এই পৃথিবীতে মঙ্গল অমঙ্গলের মোট যোগফলের দিকে একবার দেখুন। তা কি বদলেছে? যুগ যুগান্ত কেটেছে এবং যুগ যুগ ধরে ব্যবহারিক ধর্ম কাজ করেছে, প্রতি-বারেই পৃথিবী ভেবেছে যে সমস্যাটির সমাধান হবে। কিন্তু সমস্যাটি একই রয়ে গিয়েছে, বড় জোর তার রূপ বদলায়।...তা বিশ হাজার দোকানের মত যক্ষ্মা ও স্নায়ুরোগের ব্যবসা করে।...এ পুরানো বাতের মত: এক জায়গা থেকে তাড়াও, আর এক জায়গায় যাবে। একশ বছর আগে মানুষ পায়ে হাঁটত কিংবা ঘোড়া কিনত, এখন সে খুশি কারণ রেলে চড়ে; কিন্তু সে অসুখী কারণ তাকে বেশি কাজ করতে হয় ও বেশি উপার্জন করতে হয়। প্রতিটি যন্ত্র যা শ্রম বাঁচায় তা শ্রমের উপর আরও চাপ দেয়।

এই জগৎ, প্রকৃতি, অথবা তাকে যাই বলুন না কেন, তা সীমাবদ্ধ; তা কখনও সীমাহীন হতে পারে না। স্বয়ং অন্তপক্ষকে প্রকৃতি হতে গেলে তাকে স্থান, কাল ও কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা সীমিত হতে হবে। এনার্জি সীমাবদ্ধ।

আপনি তা এক জায়গায় ব্যয় করতে পারেন, অপর জায়গায় হারাবেন। মোট পরিমাণ সব সময়েই এক। কোথাও ঢেউ উঠলে অন্যত্র গহ্বর হবে। একটি জাতি ধনী হলে অন্যরা গরীব হবে। মঙ্গল ও অমঙ্গলের ভারসাম্য থাকে। যে লোক একটা মুহূর্তের তরঙ্গ শীর্ষে থাকে তার মনে হয় সবই ভাল; তলায় যে পড়ে সে বলে এ পৃথিবীর সবই খারাপ। কিন্তু যে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সে দেখে সবই ভগবানের লীলা। কেউ কাঁদে, কেউ হাসে। শেষোক্তরা আবার কাঁদবে ও প্রথমোক্তরা হাসবে আমরা কি করতে পারি? আমরা জানি আমরা কিছুই করতে পারি না।...

আমরা কল্যাণ করতে চাই তার জন্য আমরা কে কি করি? ক'জন করে? তাদের আঙুলে গোনা যায়। আমরা বাকিরাও কিছু ভাল করি, কারণ করতে বাধ্য হই।... আমরা থামতে পারি না। আমরা এগিয়ে চলি এখানে ওখানে ধাক্কা খেতে খেতে। আমরা কি করতে পারি? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই থাকবে, এই পৃথিবীও একই থাকবে। তা নীল থেকে পিঙ্গলে ও পিঙ্গল থেকে নীলে পরিবর্তিত হবে। এক ভাষা অপর ভাষায় অনূদিত হবে, এক গোছা অমঙ্গলের জায়গায় আর এক গোছা আসবে।... এক জনের ছয়, আর এক জনের আধ ডজন। জঙ্গলে আমেরিকান ইণ্ডিয়ান আপনার মত অধিবিদ্যার বক্তৃতা শুনতে পায় না। কিন্তু সে তার খাবার হজম করতে পারে। তাকে ক্ষত-বিক্ষত করুন, পরমুহূর্তে সে ঠিক হয়ে যাবে। আমার ও আপনার যদি একটু আঁচড়ে যায় তো আমরা ছ'মাসের জন্য হাসপাতালে যাই।...

জৈব-কাঠামো যত নিম্নস্তরের, ইন্দ্রিয়-সুখ তত বেশি। নিম্নতম জন্তু ও তাদের স্পর্শশক্তির কথা ভাবুন। সব কিছুই স্পর্শ। যখন মানুষের ক্ষেত্রে আসবেন তখন দেখবেন মানুষের সভ্যতা যত নিম্নস্তরের তাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা তত বেশি। জৈব-কাঠামো যত উচ্চস্তরের ইন্দ্রিয় সুখ তত কম। একটা কুকুর খাবার খেতে পারে, কিন্তু সে অধিবিদ্যা সম্পর্কে চিন্তা করার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। মনন মারফৎ আপনারা যে অপূর্ব আনন্দ লাভ করতে পারেন সে তার থেকে বঞ্চিত। ইন্দ্রিয়ের সুখ বিপুল। কিন্তু মনন-সুখ বিপুলতর। প্যারীতে যখন আপনি পঞ্চাশ পদের নৈশভোজে যান তা বাস্তবিকই সুখের। কিন্তু মানমন্দিরে তারার দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর আগম ও বিকাশ দেখা—একবার ভাবুন! এ সুখ নিশ্চয়ই আরও বড়। আমি জানি আপনারা খাওয়ার কথা ভুলে যাবেন। পার্থিব বস্তু থেকে আপনারা যা পান তা থেকে ওই সুখ নিশ্চয়ই অনেক বড়। আপনারা স্ত্রী, পুত্র, স্বামী সব ভুলে যাবেন; এই হল মননের সুখ। এটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা যে এ সুখ ইন্দ্রিয় সুখের চেয়ে মহত্তর। সর্বদাই আপনি বিপুলতর আনন্দের জন্য ক্ষুদ্রতরকে পরিত্যাগ করেন। এই-ই হল ব্যবহারিক ধর্ম—মুক্তিলাভ, সর্বত্যাগ। সব কিছু ত্যাগ কর!

নিম্নতরকে ত্যাগ করুন যাতে উচ্চতরকে পান। সমাজের ভিত্তি কি? নৈতিকতা, নীতিশাস্ত্র, বিধান। সব কিছু ত্যাগ করুন। প্রতিবেশীর সম্পত্তি দখলের, প্রতিবেশীকে ঠকানোর সকল প্রলোভন ত্যাগ করুন, দুর্বলের উপর অত্যাচার করার সকল সুখ, মিথ্যা কথা বলে অপরকে ঠকানোর সকল সুখ ত্যাগ করুন। নৈতিকতাই কি সমাজের ভিত্তি নয়? বিবাহ করা কি ব্যাভিচার ত্যাগ করা নয়? বন্যরা বিবাহ করে না।

মানুষ বিবাহ করে কারণ সে ত্যাগ করে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। সর্বত্যাগ করুন ! সর্বত্যাগ করুন ! আত্মত্যাগ করুন ! ত্যাগ করুন ! তবে শূন্যের জন্য নয়। অকারণে নয়। বরঞ্চ উচ্চতরকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু কে তা করতে পারে ? উচ্চতরকে না পাওয়া পর্যন্ত তা আপনারা পারেন না। আপনারা কথা বলতে পারেন। আপনারা সংগ্রাম করতে পারেন। আপনারা অনেক কিছু করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু উচ্চতরকে যখন পাবেন তখন সর্বত্যাগ আপনা থেকেই আসবে। তখন নিম্নতর আপনা থেকে সরে যাবে।

এই হল ব্যবহারিক ধর্ম। তা ছাড়া কি ? রাস্তা সাফ করা, হাসপাতাল তৈরি করা ? এই সর্বত্যাগের মধ্যেই কেবল তার মূল্য নিহিত আছে। আর এই সর্বত্যাগের কোনও অন্ত নেই। মুস্কিল হল লোকে এর একটা সীমা বেঁধে দিতে চায়—এই পর্যন্ত, আর নয়। কিন্তু সর্বত্যাগের কোনও সীমা নেই।

যেখানে ভগবান আছেন সেখানে আর কিছু নেই। যেখানে পার্থিব বস্তু সেখানে ভগবান নেই। এ দুই কখনও এক হতে পারে না। যেমন আলো আর অন্ধকার। খ্রীষ্টধর্ম ও তার গুরুর জীবন থেকে আমি তাই বুঝেছি। বৌদ্ধধর্মও কি তাই নয় ? হিন্দুধর্মও কি তাই নয় ? ইসলাম ধর্মও কি তাই নয় ? সকল মহর্ষি ও মহাগুরুদের শিক্ষাও কি তাই নয় ? কোন জগতকে পরিত্যাগ করতে হবে ? তা এখানে। তা আমার সঙ্গেই নিয়ে চলেছি। আমার নিজের দেহ। কেবল এই দেহের জন্য, এই দেহকে একটু সুন্দর রাখা ও একটু সুখ দেওয়ার জন্য আমি আমার প্রতিবেশীর গায়ে হাত দিই ; আমি অপরকে আঘাত দিই ও ভুল করি।...

মহৎ লোকদের মৃত্যু হয়েছে। দুর্বলদেরও মৃত্যু হয়েছে। দেবতাদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু—সর্বত্রই মৃত্যু। এই পৃথিবী হল অনাদি অতীতের এক কবরখানা। তথাপি আমরা এই দেহ আঁকড়ে থাকি : "আমি কখনও মরব না।" নিশ্চিত জেনেও আমরা তা আঁকড়ে রয়েছি। তার মধ্যেও একটা মানে আছে। ভুলটা হল আত্মাই যেখানে একমাত্র প্রকৃত অমর, সেখানে আমরা দেহ আঁকড়ে থাকি।

আপনারা সকলেই জড়বাদী, কারণ আপনারা বিশ্বাস করেন যে আপনারাই দেহ। কোনও লোক যদি আমায় জোর ঘুঁসি মারে আমি বলব আমি ঘুঁসি খেয়েছি। সে যদি আমায় মারে তো বলব, আমি মার খেয়েছি। আমি যদি দেহ না হই তা হলে এ রকম আমি বলব কেন ? আমি যদি বলি আমিই আত্মা তাতে কিছু তফাৎ হয় না। আপাতত আমি দেহ, আমি নিজেকে বস্তুতে পরিণত করেছি। এই কারণেই আমাকে দেহ বর্জন করতে হবে। আমি প্রকৃত যা তাতে ফিরে যেতে হবে। আমিই আত্মা ; আমিই সেই আত্মা (soul)—কোনও হাতিয়ার তাকে বিদ্ধ করতে পারে না, তরবারি তাকে কাটতে পারে না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, বাতাস তাকে শুকোতে পারে না। অজাত ও অসৃষ্ট, আদিহীন, অন্তহীন, মৃত্যুহীন, জন্মহীন ও সর্বত্র বিরাজমান—আমি তাই ; আর সব দুঃখ এই কারণেই আসে যে আমি নিজেকে ছোট একতাল কাদা মনে করি। আমি নিজেকে বস্তুর সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছি ও তার সব ফলভোগ করছি।

ব্যবহারিক ধর্ম হল পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করা। এই ভুল একাত্মতাকে বন্ধ করুন। এতে আপনারা কতদূর এগিয়েছেন? আপনারা দুহাজার হাসপাতাল, পঞ্চাশ হাজার রাস্তা বানিয়ে থাকতে পারেন; কিন্তু আপনারা যে আত্মা এই উপলব্ধি যদি না হয় তা হলে তাতে কি এসে গেল? আপনাদের কুকুরের মত মৃত্যু হয়; কুকুর যে অনুভূতি নিয়ে মরে আপনারাও তাই। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ও কাঁদে, কারণ সে জানে যে সে বস্তু মাত্র এবং তা গলে যাবে। আপনারা জানেন জলে, অন্তরীক্ষে, প্রাসাদে, কারাগারে মৃত্যু রয়েছে, নিশ্চিত্ত মৃত্যু—মৃত্যু সর্বত্র। কি আপনাকে নির্ভয় করে? যখন আপনার উপলব্ধি হয় যে আপনি হলেন সেই অনন্ত আত্মা, মৃত্যুহীন, জন্মহীন। মনে রাখবেন তত্ত্ব নয়। কেতাব পড়া নয়।...আমার প্রধান গুরু বলতেন তোতাপাখিকে সব সময়ে 'ভগবান ভগবান' বলতে শেখান খুব ভাল; কিন্তু বেড়াল এসে তার ঘাড় কামড়ে ধরলে সে ওসব বুলি ভুলে যায়।" আপনারা সর্বদা উপাসনা করতে পারেন, বিশ্বের সব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারেন, সেখানে যত দেবতা আছে তাদের পূজো করতে পারেন, আত্মাকে উপলব্ধি করতে না পারা পর্যন্ত কোনও মুক্তি নেই। মুখের কথা নয়, তত্ত্ববাগীশি নয়, তর্ক নয়, চাই উপলব্ধি। তাকেই আমি বলি ব্যবহারিক ধর্ম।

আত্মা সম্পর্কে এই সত্যটা গোড়ায় শুনতে হবে। যদি তা শুনে থাকেন তো সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। একবার তা করা হয়ে গেলে তা নিয়ে ধ্যান করুন। নিষ্ফল তর্ক আর নয়। একবার নিজের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মান যে আপনিই সেই অনন্ত আত্মা। তা যদি সত্যি হয় তা হলে আপনি যে দেহ তা বলা নিশ্চয়ই মূর্খতা। আপনিই পরামাত্মা, আর তা উপলব্ধি করতেই হবে। আত্মাকে নিজেকে আত্মা হিসাবেই দেখতে হবে। আত্মা এখন নিজেকে দেহ হিসাবে দেখছে। তা বন্ধ করতেই হবে। যে মুহূর্তে তা উপলব্ধি করতে শুরু করবেন তখন থেকে আপনি মুক্ত।

এই গ্লাসটা দেখছেন আর আপনারা জানেন যে এটা একটা মায়া মাত্র। কোনও বৈজ্ঞানিক আপনাদের বলবেন যে এটা হল আলো ও অনুকম্পন।...আত্মাকে দেখাই নিশ্চয়ই এ থেকে অপরিসীম বাস্তব, তাই নিশ্চয়ই একমাত্র প্রকৃত অবস্থায় দেখা একমাত্র প্রকৃত অনুভূতি, একমাত্র সত্য অন্তর্দৃষ্টি। 'এই সবই স্বপ্নমাত্র। এখন তা আপনারা জেনেছেন। শুধু প্রাচীন ভাববাদীরাই নন, আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীরাও আপনাদের বলবেন যে ওখানে আলো আছে। সামান্য একটু অনুকম্পনই সব তফাৎ করে দেয়।...

ভগবানকে দেখতেই হবে। আত্মাকে উপলব্ধি করতেই হবে, আর তাই হল ব্যবহারিক ধর্ম। খ্রীষ্ট যা প্রচার করেছিলেন আপনারা তাকে ব্যবহারিক ধর্ম বলেন না। "দরিদ্ররাই আত্মিক দিক থেকে সৌভাগ্যশালী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।" এটা কি একটা ঠাট্টা? কোন্ ব্যবহারিক ধর্মের কথা আপনারা ভাবেন? ভগবান রক্ষা করুন। "যাঁদের হৃদয় পবিত্র, তারাই সৌভাগ্যশালী কারণ তাঁরা ভগবানকে দেখবেন।" তার অর্থ কি রাস্তা সাফাই, হাসপাতাল তৈরি—এই সব? যখন পবিত্র

মনে করবেন তখন এ সবই ভাল কাজ। একজনকে বিশ ডলার দিয়ে নিজের নাম দেখার জন্য সানফ্রান্সিসকোর সমস্ত কাগজ কিনবেন না। আপনাদের নিজেদের বইতেই কি পড়েননি যে কেউ আপনাদের সাহায্য করবে না? গরীব, দুঃখী ও দুর্বলদের ভগবানকে পূজা করার মত করেই সেবা করুন। তা যদি করেন তবে ফল গৌণ। লাভের কথা না ভেবে ওই ধরনের কাজ করলে আত্মার উপকার হয়। আর এতেই স্বর্গরাজ্য।

স্বর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই আছে। তিনি এখানেই। তিনি সকল আত্মার পরমাত্মা। তাঁকে নিজের আত্মার মধ্যেই দেখুন। এই হল ব্যবহারিক ধর্ম। এই হল মুক্তি। আসুন, পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করা যাক এ বিষয়ে আমরা কে কত অগ্রসর: আমরা কতটা দেহ-উপাসক, আর কতটা ভগবানে, অর্থাৎ পরমাত্মায় সত্যিকারের বিশ্বাসী; নিজেকে আমরা কতটা আত্মা বলে মনে করি। এই-ই নিঃস্বার্থ। এই-ই সত্যিকারের উপাসনা। নিজেকে উপলব্ধি করুন। সেই হল একমাত্র করণীয়। নিজে যা তাই বলেই নিজেকে জানুন, অর্থাৎ অনন্ত আত্মা হিসাবে। এই হল ব্যবহারিক বা বাস্তববাদী ধর্ম। আর সবই অবাস্তব, কারণ আর সবই অদৃশ্য হবে। একমাত্র এই-ই কখনও অদৃশ্য হবে না। এ শাশ্বত। হাসপাতালগুলো ভেঙে পড়বে। রেলপথ প্রস্তুতকারকেরা সব মারা যাবে। পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, সূর্য মুছে যাবে। আত্মা চিরকাল বিরাজ করবে।

কোনও উচ্চতর জিনিসের, যে সব জিনিস ধ্বংস হবে তার পিছনে ছোটা...না যা অপরিবর্তনীয় তার পূজা করা? কোনটা বেশি বাস্তববাদী? পার্থিব বস্তু পাওয়ার জন্য জীবনের সকল কর্মশক্তি ব্যয় করা, আর সেগুলি আয়ত্ত করার আগেই মৃত্যু এল ও আপনাকে সব ছেড়ে যেতে হল?—যেমন সব যুদ্ধে বিজয়ী মস্ত রাজা মৃত্যু সন্নিকট হলে বলেছিলেন "সমস্ত বোয়েম ভর্তি জিনিসপত্র আমার সামনে সাজিয়ে দাও"; বলেছিলেন "বড় হীরেটা আমার কাছে নিয়ে এস।" বুকের উপর হীরেটা রেখে তিনি কেঁদেছিলেন। কাজেই কুকুরের মতই কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

মানুষ বলে "আমি বাঁচি।" সে জানে না যে মৃত্যুই তাকে দাসের মত জীবন আঁকড়ে থাকতে বাধ্য করে। সে বলে "আমি উপভোগ করি।" স্বপ্নেও বোঝে না যে প্রকৃতি তাকে শৃঙ্খলিত করেছে।

প্রকৃতি আমাদের সকলকে পিষে ফেলে। কত আউন্স আনন্দ পেলেন তার হিসাব রাখুন। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি আপনার মারফৎ তার ক্রিয়া করে যাবে এবং যখন আপনি মারা যাবেন তখন আপনার দেহ অন্য গাছপালা গজানোর কাজে লাগবে। তবু আমরা সর্বদা ভাবি যে আমরা নিজেরা আনন্দ পাচ্ছি। এইভাবেই চাকা ঘুরে চলে।

কাজেই আত্মাকে আত্মা হিসাবে উপলব্ধি করাই ব্যবহারিক ধর্ম। প্রত্যেকটা জিনিস ততটাই ভাল যতটা তা এই মহান ভাবধারায় পৌঁছে দিতে পারে। এই উপলব্ধিকে পেতে হবে ত্যাগের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা—সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্জন করা, বস্তুর সঙ্গে আমাদের বেঁধে রাখে যে শিকল তার গ্রন্থি ছেদন করা। "আমি পার্থিব বস্তুময়

জগৎ চাই না, ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব জীবন চাই না, উচ্চতর কিছু চাই।" এরই নাম ত্যাগ। তারপর ধ্যানের শক্তিতে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করুন।

আমরা প্রকৃতির আজ্ঞাধীন। বাইরে যদি শব্দ হয় আমাকে তা শুনতে হবে। কিছু যদি হতে থাকে আমাকে তা দেখতে হবে। বানরের মত। আমরা হাজার বানরের সমাবেশ, আমাদের প্রত্যেকে। বানরেরা অত্যন্ত কৌতূহলী। কাজেই আমরাও নিজেদের সামলাতে পারি না, আর একে "উপভোগ করা" আখ্যা দিই। ভাষা জিনিসটা অপূর্ব! আমরা নাকি জগতকে উপভোগ করছি! আমাদের উপভোগ না করে উপায় নেই। প্রকৃতি আমাদের তাই করাতে চায়। চমৎকার একটা শব্দ: আমি তা শুনছি। শোনা না শোনা যেন আমি ইচ্ছামত করতে পারি। প্রকৃতি বলে "দুঃখের গভীরে গিয়ে পড়।" সঙ্গে সঙ্গে আমি দুঃখে পড়ি।...আমরা ইন্দ্রিয় সুখ ও সম্পত্তির সুখের কথা বলি। একজন আমায় খুব বিদ্বান ভাবে। আর একজন মনে করে "ও একটা বোকা।" কিছু না জেনে এই অধঃপতন, এই দাসত্ব! এই অন্ধকার ঘরে আমরা পরস্পরে মাথা ঠোকাঠুকি করছি।...

ধ্যান কি? ধ্যান হল সেই শক্তি যা আমাদের এ সব প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেয়। প্রকৃতি আমাদের ডেকে বলতে পারে "দেখ, কি সুন্দর একটা জিনিস।" আমি তাকালাম না। তখন সে বলে "চমৎকার গন্ধ আসছে, শুঁকে দেখ!" আমি আমার নাককে বললাম "না, শুকোনা," নাক শুঁকল না। "ওহে চোখ, তাকিও না।" প্রকৃতি একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করল—আমার এক ছেলেকে মেরে ফেলল, তারপর বলল "ওরে হতচ্ছাড়া, এবার বসে কাঁদ! অধঃপাতে যাও!" আমি বললাম "আমার যাওয়ার দরকার নেই।" আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। আমাকে মুক্ত হতেই হবে। কখনও কখনও এ চেষ্টা করে দেখুন।...মুহূর্তেই আপনি প্রকৃতিকে বদলাতে পারেন। এখন আপনার নিজের মধ্যে যদি সে ক্ষমতা থাকত তা হলে তাই কি স্বর্গ, তাই কি মুক্তি হত না? এই হল ধ্যানের শক্তি।

একে কিভাবে আয়ত্ত করা যায়? এক ডজন ভিন্ন ভিন্ন পথে। প্রত্যেক মেজাজের নিজস্ব পথ থাকে। কিন্তু সাধারণ নীতি এই: মনকে আয়ত্তের মধ্যে আনুন। মন হ্রদের মত এবং তাতে যে নুড়ি পড়ে তার প্রত্যেকটাই ঢেউ তোলে। এই ঢেউগুলো দেখতে দেয় না আমরা আসলে কি! পূর্ণিমার চাঁদ হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু জলের উপরটা এত আলোড়িত যে সে প্রতিবিম্ব আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না। মন শান্ত হোক, প্রকৃতিকে ঢেউ তুলতে দেবেন না। শান্ত হয়ে থাকুন, তাহলে একটু পরে সে আপনাকে ছেড়ে দেবে। তখন আমরা জানতে পারব আমরা কি। ভগবান ইতিমধ্যেই সেখানে বিরাজমান কিন্তু মন খুব উত্তেজিত, সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের পিছনে ছুটছে। ইন্দ্রিয়গুলোকে বন্ধ রাখুন, আর চারদিকে পাক খেতে থাকবেন, ঘুরতে থাকবেন। যে মুহূর্তে আমি মনে করি যে আমি প্রস্তুত হয়েছি ও ভগবানের ধ্যান করব, অমনি আর এক মিনিটে আমার মন লণ্ডন চলে যাবে। মনকে যদি আমি সেখান থেকে টেনে বের করে নিই তবে নিউইয়র্কে অতীতে আমি যা করেছি তা ভাবার জন্য মন সেখানে চলে যাবে। ধ্যানের শক্তি দিয়ে এই সব থামাতে হবে।

ধীরে ধীরে ও ক্রমশ আমাদের নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এ একদিনের, বহু বছরের, এমন কি বহু জন্মের প্রশ্ন নয়। তাতে কিছু আসে যায় না। টানা-হেঁচড়া চালিয়ে রাখতে হবে। জ্ঞানত ও স্বেচ্ছামূলকভাবে এ টানা-হেঁচড়া চালাতে হবে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে আমরা এগোব। আমরা অনুভব করতে শুরু করব ও প্রকৃত সম্পদের অধিকারী হব, যা আমাদের কাছ থেকে কেউ নিয়ে নিতে পারে না।—এমন সম্পত্তি যা কেউ নিতে পারে না, কেউ ধ্বংস করতে পারে না, এমন আনন্দ যাকে কোন দুঃখ আর আঘাত করতে পারে না।

এত দিন আমরা অপরের উপর নির্ভর করেছি। যদি সামান্য কিছু সুখ পেয়ে থাকি আর সে লোক চলে যায়, আমার সুখ চলে গেল।…মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখুন: সুখের জন্য অন্য মানুষের উপর নির্ভরশীল! সমস্ত বিচ্ছেদই দুঃখ। তাই স্বাভাবিক। সুখের জন্য সম্পত্তির উপর নির্ভর করছেন? সম্পত্তির উত্থান-পতন আছে। স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরতা অথবা অপরিবর্তনীয় আত্মা ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভরতা আজ হোক কাল হোক, দুঃখ ডেকে আনবেই।

অসীম আত্মা ছাড়া আর সব কিছুই বদলাচ্ছে। পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্ত চলছে। আপনার নিজের মধ্যে ছাড়া আর কোনও চিরস্থায়িত্ব নেই। সেখানেই অসীম আনন্দ, অপরিবর্তনীয়। ধ্যান এমন একটি দরজা যা আমাদের সামনে আনন্দ মেলে ধরে। উপাসনা, যজ্ঞাদি ও পূজার অপরাপর সব রূপ ধ্যানের শিশু-বিদ্যালয় মাত্র। আপনি উপাসনা করুন, অর্ঘ্য দিন। একটা তত্ত্ব ছিল যে সব কিছুই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বাড়ায়। কতকগুলো শব্দের ব্যবহার, ফুল, মূর্তি, মন্দির, আরতির মত অনুষ্ঠান মানুষকে সেই মনোভাবে নিয়ে যায়। কিন্তু ওই মনোভাব সব সময়ে মানবাত্মারই মধ্যে আছে, অন্য কোথাও নয়। সব লোকেই তা করছে; কিন্তু তারা না জেনে যা করছে আপনি তা জেনে করুন। তাই-ই ধ্যানের ক্ষমতা। আপনার যা জ্ঞান আছে—তা এল কি করে? ধ্যানের শক্তি থেকে। নিজের অন্তর্লোক থেকে আত্মা জ্ঞান মন্থন করে। তার বাইরে আবার আর কি জ্ঞান ছিল? শেষ পর্যন্ত ধ্যানের এই ক্ষমতা দেহ থেকে আমাদের পৃথক করে, তখন আত্মা যা তাই বলেই নিজেকে জানতে পারে।—অজাত, মৃত্যুহীন ও জন্মহীন সত্তা। সেখানে আর দুঃখ নেই, আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ নেই, আর বিবর্তন নেই। আত্মা নিজেকে চিরকালের জন্য নিখুঁত ও মুক্ত বলে বুঝতে পারল।

আমরা কি বিশ্বাস করি

বিশ্বাস একটা সুন্দর অন্তর্দৃষ্টি এবং এটাই একমাত্র ব্যাপার যা মানসিক প্রশান্তিকে রক্ষা করতে পারে—এ বিষয়ে আমি তোমার সাথে একমত; কিন্তু এর মধ্যে একটি বিপদ নিহিত আছে যা কিনা ধর্মোন্মত্ততা সৃষ্টি করে এবং উন্নয়নে বাধা প্রদান করে।

জ্ঞানের তত্ত্ব ঠিক; কিন্তু এখানেও বিপদ আছে তা হল শুষ্ক বুদ্ধিজীবী হওয়ার প্রবণতা। প্রেম হল মহান ও উদার—কিন্তু অর্থহীন ভাবপ্রবণতার অন্তরালে তা নিমেষেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

সব বিষয়ের ঐক্য একান্তভাবে কাম্য। ঐক্যের প্রতীক ছিলেন রামকৃষ্ণ। এই ধরনের মহাপুরুষের সংখ্যা নগণ্য। অনুভূতির গভীরে তাঁর উপস্থিতি ও তার শিক্ষাকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হতে পারি। যদি আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সেই পূর্ণতায় পৌঁছুতে না পারে তাহলে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে যাতে একে অন্যকে উপলব্ধির জগতে নিয়ে যেতে পারি। তা হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মিলিত ঐক্য এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও ধর্মমতের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রগতি। ধর্মের অভীষ্ট ফল পেতে হলে—উৎসাহ প্রদান করা যথেষ্ট প্রয়োজন। সাথে সাথে ধর্মমতে বহুমুখীনতার বিপদ রোধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই বিপদ এড়িয়ে চলতে হবে। একটা সম্প্রদায়ের সব রকম আচার-আচরণ ও একটি সার্বজনীন ধর্মের বিস্তৃতিকে হৃদয়ে স্থাপন করতে হবে।

যদিও ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তবুও আমাদের মধ্যে তার উপস্থিতি সব সময় মনে রাখতে হবে এবং মানব চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। এই বিশ্বজগতের কোন চরিত্রই রামকৃষ্ণের মত এত পূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি। তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের বিচরণ করতে হবে। সাথে সাথে প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে ঈশ্বর, পরিত্রাতা, ধর্মগুরু, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক অথবা মহাপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে হবে। আমরা সামাজিক সাম্য বা অসাম্য প্রচার করছি না। কিন্তু আমরা মনে করি প্রত্যেক সত্তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে এবং প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার আছে।

আস্তিক, সর্বেশ্বরবাদী, অদ্বৈতবাদী, বহু দেবতায় বিশ্বাসী, অজ্ঞেয়বাদী অথবা নাস্তিক কারুর মতবাদকেই আমরা নাকচ করি না,—তার শিষ্য হওয়ার একমাত্র শর্ত হল হৃদয়কে উদারতায় আর গভীরতায় পূর্ণ করতে হবে।

আমরা কারও আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া কোন ব্যাপারেই কোন ধরনের নৈতিক শর্ত আরোপ করি না যতক্ষণ না তা অন্যের ক্ষতি করে।

পাপ—প্রগতিকে মন্দনায়িত করে অথবা অধঃপতনকে সাহায্য করে। অপর পক্ষে পুণ্য—প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে এবং ঐক্যের ছন্দ প্রতিধ্বনিত করে। সম্পূর্ণ নিজের রুচি অনুযায়ী জানার, পছন্দ করার এবং অনুসরণ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। উদারণ স্বরূপ—কারুর পছন্দ মাংস খাওয়া, কারুর বা পছন্দ

কল খাওয়া। প্রত্যেকের নিজস্ব রুচির পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে, কিন্তু অন্যের আচরণকে সমালোচনা করার অধিকারও তার থাকবে না। কারণ সমালোচনার মধ্যেই জন্ম নেয়—বিশৃঙ্খলার বীজ। একজন বিবাহিতা নারী এই প্রগতির সাগরে অনেক ব্যক্তিকেই সাহায্য করতে পারে, কিন্তু অন্যের কাছে সে বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। অবিবাহিত পুরুষের বিবাহিত পুরুষকে সমালোচনা করার কোন অধিকার নেই—এমনকি ভাইয়ের ওপরও নিজস্ব মতাদর্শ জোর করে চাপানোর কোন অধিকার নেই।

আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক সত্তাই মহান এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। প্রত্যেক আত্মাই অজ্ঞতার মেঘে আচ্ছন্ন এক একটি সূর্য, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মেঘের ঘনত্বের মধ্যে যে পার্থক্য তাই হল আত্মার সাথে আত্মার পার্থক্যের কারণ। আমরা বিশ্বাস করি যে এটাই হল সকল ধর্মের সচেতন অথবা অবচেতন ভিত্তি। বস্তুবাদী, বুদ্ধিজীবী অথবা আধ্যাত্মিক—যে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতেই সমগ্র মানবসমাজের প্রগতির ইতিহাসের এটাই হল একমাত্র ব্যাখ্যা। বিভিন্ন মতবাদে একই ঐক্যের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

এই মতবাদে আমরা বিশ্বাস করি কারণ এটাই হল বেদের মূলমন্ত্র। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক আত্মার কর্তব্য হল অন্য আত্মাকে ঈশ্বর মনে করে আচরণ করা। কোনক্রমেই তার ক্ষতিসাধন অথবা তার প্রতি ঘৃণা ও রাগ প্রদর্শন করা উচিত হবে না। এটা শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদেরই কর্তব্য নয়, সকল নারী-পুরুষেরই কর্তব্য।

আত্মার কোন লিঙ্গ নেই, নেই কোন জাত অথবা অসম্পূর্ণতা। বেদ, দর্শন, পুরাণ অথবা তন্ত্রের কোথাও বলা হয়নি যে আত্মার লিঙ্গ, ধর্মমত অথবা জাত আছে।

সমাজসংস্কারের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক।—এই কথা যারা বলেন তাদের সাথে আমরা একমত। কিন্তু তারা আমাদের সাথে একমত হবেন যখন আমরা তাদের বলি যে কোন সামাজিক নিয়মকানুন সূত্রায়িত করা ধর্মের কাজ নয়। বিভিন্ন সত্তার মধ্যে পার্থক্যকে উৎসাহিত করি, কারণ ধর্মের অভীষ্ট লক্ষ্য হল সব ধরনের সংঘাত ও অস্বাভাবিকতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা।

এই পার্থক্যের মধ্য দিয়ে আমরা সাম্য আর ঐক্যের অন্তিম শিখরে আরোহণ করতে পারব। তাহলে আমরা বলব—একই ধর্মের কথা বারবার বলা হয়েছে 'কাদা দিয়ে কখনও কাদা মোছা যায় না।' এই সুরে যেন একজন ব্যক্তি অধার্মিক হয়েই ধার্মিক হতে পারে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও ধর্মের অনুমোদনের ভিত্তিতেই সামাজিক নিয়মকানুন সৃষ্টি হয়। ধর্মের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হল সমাজের বিভিন্ন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। 'সমাজসংস্কার ধর্মের কাজ নয়'—এই কথা উচ্চারণ ভণ্ডামি এবং দম্ভমূলক। সত্যি কথা আমরা চাই ধর্ম যেন সমাজসংস্কারক না হয়, কিন্তু সাথে সাথে একথাও বার বার বলি

যে সমাজেরও ধর্মীয় আইন প্রণেতা হওয়ার কোন অধিকার নেই। নিজেকে নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখো তাহলেই দেখবে সব ঠিক আছে। শিক্ষা হল মানুষের পূর্ণতার প্রকাশ আর ধর্ম হল মানুষের স্বর্গীয় উপলব্ধির পূর্ণ প্রকাশ।

অতএব উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য হবে চলার পথের সমস্ত বাধা দূর করা। দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী কর যা আমি সব সময় বলি, দেখবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের কাজ হচ্ছে পথ বাধা-মুক্ত করা। অবশিষ্ট অংশ ঈশ্বর করবেন। সব সময় মনে রাখবে ধর্মের কারবার হল আত্মা নিয়ে। ধর্ম কখনই সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। মনে রেখো এটাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে অনিষ্ট সাধনে।

যেন একজন ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি জোর করে হস্তক্ষেপ করেছে—যখন সেই সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার করার জন্য আসল ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালায়—তখন ভুয়া ব্যক্তির নাকি কান্নার মতন হয় এই ঘটনাগুলিতে। তারাই মানবিক অধিকারের পবিত্রতার কথা ঘোষণা করে। প্রত্যেকটা সামাজিক ব্যাপারে বা অগণিত জনগণের দুর্দশা দূরীকরণের জন্য পুরোহিতরাই বা কি করেছে?

তুমি মাংসভোজী ক্ষত্রিয়দের কথা বলতে পার। আমিষ অথবা নিরামিষভোজী যাই বল না কেন? তারাই হল হিন্দুধর্মের সব সৌন্দর্য ও উদারতার প্রতীক। কে লিখেছিল উপনিষদ্? কে ছিল রাম? কে ছিল কৃষ্ণ? কে ছিল বুদ্ধ? জৈনদের গুরু তীর্থঙ্করই বা কে ছিলেন? যখন ক্ষত্রিয়রা ধর্ম প্রচার করেন, তখন তাঁরা তা প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। যখন ব্রাহ্মণরা কিছু লেখেন, তাকে নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন।

গীতা এবং ব্যাসের সূত্র পড়ো এবং অন্যকে তা পড়াও। গীতাতে নারী-পুরুষ, জাত-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মুক্তির পথ বর্ণনা করেছে। কিন্তু ব্যাসের সূত্রের মাধ্যমে দরিদ্র শূদ্রদের ঠকানো হয়েছে। ঈশ্বর কি তোমার মত একজন নির্বোধ? তাঁর করুণার স্রোতকে কি এক টুকরো মাংসের বাঁধ তৈরী করে বাধা দেওয়া যায়? ঈশ্বর কখনই একখণ্ড মাংসের সমতুল্য হতে পারে না!

আমার কাছ থেকে কিছু আশা কর না। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যা তোমাকে আমি বারবার বলেছি এবং লিখেছি যে ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র ভারতীয়রাই রক্ষা করতে পারে।

আমার প্রিয় যুবকবৃন্দ তোমরা এই নতুন মতাদর্শের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করছ।

অলৌকিক ঘটনাবলীকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে রামকৃষ্ণের জীবনালেখ্য অঙ্কন করার চেষ্টা কর। যে মতাদর্শের শিক্ষা তিনি দিয়েছেন তাঁর জীবনীতে যেন তারই প্রতিফলন ঘটে। শুধুমাত্র তাঁর কথাই—আমার কথা লিখ না এবং এমনকি কোন জীবিত ব্যক্তির কথাও নয়। প্রধান লক্ষ্য হবে বিশ্বের দরবারে তাঁর শিক্ষাকে উন্মোচিত করা। আমার একমাত্র কর্তব্য হল রত্নভাণ্ডারকে তোমাদের সামনে তুলে ধরা।

তোমাদের কাছে কেন উজাড় করে দিতে চাই? কারণ ভণ্ড, হিংসুক, দাসমনোভাবাপন্ন এবং ভীরু ব্যক্তি যারা শুধু জড়পদার্থের ওপর বিশ্বাসী, তাদের দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না, হিংসা—যা হল আমাদের জাতীয় চরিত্রের সর্বনাশের কারণ এবং দাস-মনোভাবের উৎস। এমন কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও এই মনোভাব দূরীকরণে অক্ষম।

আমার কথা ভাব যে তার সব কর্তব্য শেষ করে বিদায় নিয়েছে। ভেবে নাও যে সকল দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তেছে। তোমরা—আমার প্রিয় যুবকবৃন্দ এই কাজ সমাপ্ত করতে বদ্ধপরিকর। কর্তব্য করে যাও। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবে। আমার কথা ভেবো না। আমাকে দৃশ্যের অন্তরালে থাকতে দাও। নতুন মতাদর্শ প্রচার কর। নতুন মতবাদ, নতুন জীবনের কথা বল।

কোন আচার আচরণ অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে প্রচার কর না। কোন জাতের পক্ষে অথবা বিপক্ষে এমন কি কোন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধেও প্রচার করতে যেও না। উদার হৃদয়ে প্রচার কর—সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

হে আমার সাহসী যুবকবৃন্দ তোমাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক আশীর্বাদ।

চিঠিপত্র

[১]

C/o মিসেস ই. টটেন,
১৭০৮ ফার্স্ট স্ট্রীট
ওয়াশিংটন, ডি. সি.
২৭ অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস বুল,

মিঃ ফ্রেডারিক ডগলাসের কাছে দয়া করে যে পরিচয় পত্রটি দিয়েছেন তজ্জন্য অজস্র ধন্যবাদ। বালটিমোরে নিম্নশ্রেণীর এক হোটেলওয়ালার কাছে আমি যে খারাপ ব্যবহার পেয়েছি সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না। ব্যাপারটার জন্য দায়ী ক্রম্যান ভ্রাতারা। ওরা আমাকে ওরকম খারাপ হোটেলে কেন নিয়ে যাবে?

তারপর, সব জায়গার ন্যায় এখানেও আমাকে উদ্ধার করলেন আমেরিকান মেয়েরা, অতঃপর আমার সময়টা বেশ ভালোই কেটেছে।

ওয়াশিংটনে আমি মিসেস ই. টটেনের অতিথি; তিনি অধিবিদ্যায় পারদর্শী এখানকার একজন প্রভাবশালী মহিলা। তাছাড়া তিনি আমার এক চিকাগোর বন্ধুর ভাই-ঝি। কাজে কাজেই সব বেশ ঠিক ঠিক চলছে। এখানে মিঃ কলভিল এবং মিস ইয়ং-য়ের সঙ্গেও আমার দেখা হল।

আপনাকে আমার অনন্ত ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[২]

(ডাঃ নানজুণ্ডা রাওকে লেখা)

ইউ. এস. এ.
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার চমৎকার পত্রখানা এই মাত্র পেলাম। তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতে পেরেছ শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। তোমার বৈরাগ্যের শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেবতার কাছে উপনীত হবার পক্ষে ওইটিই প্রাথমিক প্রয়োজন। মাদ্রাজের প্রতি বরাবরই আমার বিরাট আশা, এখনো আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে মাদ্রাজ থেকেই জন্ম নেবে আধ্যাত্মিকতার ঢেউ এবং পরে তা সারা ভারতকে ভাসিয়ে নেবে। তোমার যাবতীয় শুভ কামনার দ্রুত সাফল্য কামনা করি; কিন্তু বৎস কতগুলি অসুবিধার কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ, কোনো ব্যাপারেই অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে পদক্ষেপ করতে নেই।

দ্বিতীয়তঃ, তোমার মা স্ত্রীর মতামত ও অনুভূতির প্রতি সম্মান দিতে হবে বৈকি। সত্য বটে, তুমি একথা অবশুই বলতে পার যে আমরা—রামকৃষ্ণর শিষ্যগণ সব সময় আমাদের পিতামাতার মতামতের প্রতি খুব বেশী শ্রদ্ধা দেখাইনি। আমি জানি, নিশ্চিত জানি যে, মহৎ কার্য সম্পাদন করা সম্ভব মহৎ আত্মত্যাগের দ্বারাই। আমি এ বিষয়েও নিশ্চিত যে, ভারতের জন্য প্রয়োজন তার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোন্নত সন্তানদের আত্মত্যাগ, আমার অকপট আশা—তুমি তাদেরই অন্যতম হবার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসে দেখবে মহামানবগণ মহৎ আত্মত্যাগ করে গেছেন আর তার কল্যাণ ভোগ করেছে সাধারণ মনুষ্য সমাজ। তোমার আপন মুক্তির জন্য যদি সর্বত্যাগীও হও, সে একটা মস্ত কিছু নয়। কিন্তু বিশ্বের কল্যাণের জন্য তুমি কি তোমার নিজের মুক্তিকেও জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছ? তাহলে ভেবে দেখ, তুমিই দেবতা। তোমাকে আমার উপদেশ—তুমি ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কর, অর্থাৎ কিছুকালের সমস্ত যৌন সংসর্গ বর্জন করে তোমার পিতার গৃহে বাস কর। এইটি হল "কুটি চাকা" স্তর। বিশ্বের কল্যাণের জন্য এই তোমার মহৎ আত্মত্যাগে তোমার পত্নীর সম্মতি আদায়ের চেষ্টা কর। তোমার যদি জলন্ত বিশ্বাস থাকে, যদি সর্বজয়ী প্রেম থাকে, যদি সর্বশক্তিশালী পবিত্রতা থাকে, তবে তুমি যে শীঘ্রই ব্রতে সাফল্য লাভ করবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বিস্তারের কাজে তোমার দেহ মন সমর্পণ কর, কর্মই হল প্রথম স্তর। যত্ন করে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর এবং ভক্তি অভ্যাস কর। কারণ তোমাকে মানব সমাজের এক মহান শিক্ষাদাতা হয়ে উঠতে হবে; আমার গুরু মহারাজ বলতেন, "আত্মহত্যার পক্ষে কলম-কাটা ছুরিই যথেষ্ট, কিন্তু অন্যকে হত্যা করতে হলে বন্দুক চাই, তলোয়ার চাই।" সময় পূরা হলে তোমার সুযোগ আসবে এই বিশ্ব সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাবার এবং তাঁর পুণ্য নাম প্রচার করার। তোমার সংকল্প সাধু এবং অতি উৎকৃষ্ট। তোমার পথ সুগম হোক, কিন্তু কোনো হঠকারী পদক্ষেপ নিয়ো না। প্রথমে কর্ম ও ভক্তিদ্বারা নিজেকে শুদ্ধ কর। ভারত দীর্ঘ দুঃখভোগ করেছে, দীর্ঘকাল পীড়িত হয়েছে আমাদের শাশ্বত ধর্ম। কিন্তু প্রভু করুণাময়। আর একবার তিনি তাঁর সন্তানগণের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, পতিত ভারতকে আর একবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে জেগে উঠবার। শ্রীরামকৃষ্ণর পদতলে বসেই ভারত জাগতে পারে। তাঁর জীবনী ও বাণী দূরে দূরান্তরে প্রচারিত করে দিতে হবে, যেন তা হিন্দু সমাজের প্রতি রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হতে পারে। কে করবে সে কাজ? কে তুলে নেবে রামকৃষ্ণর পতাকা এবং তাই নিয়ে অভিযান করবে বিশ্বকে উদ্ধার করার জন্য? নাম ও যশের, ধন সম্পদ ও সুখ-ভোগের সকল আশা ছেড়ে দিয়ে—এই পৃথিবীর ও অন্য পৃথিবীর সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অধঃপতনের গতিরোধ করবে কারা? কয়েকজন তরুণ ফাটলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদের তারা বলি দিয়েছে। তারা কয়েকজন মাত্র, এরকম আরো হাজার হাজার তরুণ আমরা চাই, জানি তারা আসবে। প্রভু তোমার মনে সেই ইচ্ছে জাগিয়েছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রভু যাকে নির্বাচিত

করেন তার জয় হোক। তোমার সংকল্প উত্তম, তোমার আশা উচ্চ, তোমার উদ্দেশ্য মহত্তম—অন্ধকারাচ্ছন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষকে তুমি প্রভুর আলোকে নিয়ে আসতে চাইছ।

কিন্তু বৎস, ত্রুটিগুলিও বিবেচনা করতে হবে। কোনো কাজে হঠকারিতা চলবে না। সাফল্যের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন শুদ্ধতা, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি প্রেম। তোমার তো সময় পড়ে রয়েছে, অশোভন ত্রস্ততার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি খাঁটি এবং অকপট হও তাহলে সবই ঠিক ঠিক হবে। তোমার মতো শত শত চাই আমরা—যারা সমাজে আবির্ভূত হবে বিস্ফোরণের মতো, যেখানেই তারা যাবে সেখানেই সঞ্চারিত করবে ধর্ম প্রেরণার প্রাণশক্তি এবং তেজ। তোমার যাত্রা অনুকূল গতি লাভ করুক।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩]

C/o জি. ডব্লু. হালে
চিকাগো, ইউ. এস. এ.

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

আমার কলকাতার গুরুভাইদের সঙ্গে তোমার কোনো পত্রালাপ আছে কি? তোমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে তো? বৈষয়িক ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটছে তো?…তুমি বোধ হয় শুনেছ, এক বছরের বেশী কাল ধরে আমেরিকায় আমি কী ভাবে হিন্দুধর্ম প্রচার করে চলেছি। এখানে আমার কাজ বেশ ভালো চলছে। যখনই পারবে এবং যতবার খুশি আমাকে চিঠি লিখো।

ভালবাসা জানবে
তোমাদের বিবেকানন্দ

[৪]

ইউ. এস. এ.
১৮৯৪

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

…সততাই শ্রেষ্ঠ পলিসি, অন্তিমে ধার্মিক ব্যক্তিই জয়ী হবেন।… বৎস, সর্ব সময় মনে রেখো, আমি যত ব্যস্তই থাকি না কেন, যত দূরেই থাকি না কেন, যত উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন লোকের সঙ্গে থাকি না কেন—আমার বন্ধুদের প্রত্যেকের কথা, সব থেকে অবনমিতদের কথাও সব সময় আমার মনে থাকে, সব সময় আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি, তাদের কল্যাণ কামনা করি।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫]

ব্রুকলিন
২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস বুল,

নিউ ইয়র্কে নিরাপদে পৌঁছেছি, ডিপোতে ল্যাণ্ডসবার্গ এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমি ব্রুকলিনে রওয়ানা হই, এখানে যথাসময়ে এসে পৌঁছেছি।

সন্ধ্যাটি কাটল চমৎকার। এথিক্যাল কালচারাল সোসাইটির কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আগামী রবিবার আমাদের বক্তৃতার কথা আছে। ডাঃ জেনস যথারীতি সহৃদয় ও সজ্জন ব্যবহার করেছেন, আর মিঃ হিগিনস বরাবরের মতোই প্র্যাকটিক্যাল। অন্যান্য শহরের তুলনায় এই নিউ ইয়র্কেই কেবল দেখছি, ধর্মের ওপর বেশী লোকের আগ্রহ; আর এখানে পুরুষের আগ্রহ নারীর অপেক্ষা বেশী কেন তা আমি জানি না।...

মিঃ হিগিনস আমাকে নিয়ে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন এই সঙ্গে তার একখানা কপি পাঠালাম। ভবিষ্যতে আরো পাঠাতে পারব আশা করি।

মিস ফার্মারের প্রতি এবং হোলি ফ্যামিলির সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি।

আপনার অনুগত
বিবেকানন্দ

[৬]

৫৪ ডব্লু ৩৩ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনার উপদেশ মায়ের মত, সেই জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি জীবনে এই উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারব।

আপনি ইতিপূর্বেই আমার জন্য এবং আমার কাজের জন্য যতখানি করেছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করব কী করে! এই বছর আরো অনেক কিছু করতে চেয়েছেন, তার জন্যও আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। অবশ্য আমার অকপট বিশ্বাস, এ বছর আপনার সব সাহায্য মিস ফার্মারের গ্রীণএকারের কাজে দান করা সঙ্গত। ভারত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে রয়েছে, এখনো সে পারবে অপেক্ষা করতে; পক্ষান্তরে যে কাজটি হাতে এসে পড়েছে। সাহায্যের ব্যাপারে তারই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

তাছাড়া, মনু বলেছেন, সৎ কাজের জন্যও অর্থ সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর পক্ষে সমীচীন নয়; আমি বোধ করতে শুরু করেছি—প্রাচীন মুনি ঋষিগণের উপদেশই যথার্থ। "আশাই সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক, নিরাশা সুখের আকর।" আশা অলীক বিষয়ের মতো। আমি তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করছি। এটা করব—ওটা করব, এমন সব বালসুলভ ধারণা আমার অতীতে ছিল।

"সর্ব বাসনা বর্জন কর, তাতে লাভ হয় শান্তি। তোমার না থাকে যেন শত্রু, না মিত্র; বাস কর একাকী। এমনি করেই আমরা পর্যটন করে চলব পর্বত থেকে পর্বতে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, প্রচার করব প্রভুর নাম—আমাদের থাকবে না মিত্র বা শত্রু, থাকবে না কোনো আনন্দ বা বেদনা, থাকবে না বাসনা থাকবে না ঈর্ষা, কোনো প্রাণীর অনিষ্ট আমরা করব না, কোনো প্রাণীর অনিষ্টের কারণও আমরা হব না।"

"উচ্চ নীচ কারও কাছ থেকে, ঊর্ধ্ব কিংবা অধঃ কোনো স্থান থেকে সাহায্য যাচ্ঞা করবে না। কোনো কিছুরই বাসনা করবে না—এই অপসৃয়মান জগৎ-দৃশ্যকে বিবেচনা কর, প্রত্যক্ষদর্শীরূপে এবং তাকে অপসৃত হতে দাও।"

সম্ভবত ঐ রকম উন্মত্ত বাসনার টানই আমাকে এ দেশে নিয়ে এসেছে। যে অভিজ্ঞতা আমার হল তার জন্য আমি প্রভুর কাছে ঋণী।

আমি এখন অত্যন্ত সুখী। মিঃ ল্যাণ্ডসবার্গে ও আমাতে খানিকটা ভাত ও মসুর বা বার্লি পাকিয়ে নিই, দুজনে নিরিবিলি আহার করি; কিছু পড়ি বা লিখি; জ্ঞান লাভেচ্ছু দরিদ্র লোকেরা এলে তাদের সঙ্গে দেখা করি; এভাবে জীবন কাটিয়ে নিজেকে এখন যতখানি বেশী সন্ন্যাসী বলে বোধ হচ্ছে আমেরিকায় এর আগে তেমনটা কখনো মনে হয়নি।

"সম্পদে বৈভবের মধ্যেই থাকে দারিদ্র্যের ভীতি, জ্ঞানেরই মধ্যে অজ্ঞানতার, সৌন্দর্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বার্ধক্যের ভয়, খ্যাতির মধ্যে ভয় নিন্দুকের, সাফল্যের মধ্যে ঈর্ষার ভয়, দেহের মধ্যেও থাকে মৃত্যুর ভীতি। এই পৃথিবীতে সব কিছুই ভয়ে ভরা। যিনি সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন একমাত্র তিনিই ভয়হীন।"

সেদিন গিয়েছিলাম মিস করবিনের সঙ্গে দেখা করতে, মিস ফারমার এবং মিস থার্সবিও সেখানে ছিলেন। আধ ঘণ্টা সময় বেশ ভালো কাটল। মিস করবিন চান আগামী রবিবার থেকে তার গৃহে আমি কিছু ক্লাস করি।

আমি আর এ সব কিছু চাই না। যদি ওসব এসে পড়ে তবে সে প্রভুর প্রসাদ, যদি না আসে তবে তাও প্রভুর প্রসাদ।

আবার বলি, আমার অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আপনার অনুগত সন্তান
বিবেকানন্দ

[৭]

৫৪, ডব্লু, ৩৩নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
২১ মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

আমাকে নিয়ে রমাবাঈ-এর দল যে কুৎসা প্রচার করে বেড়াচ্ছে তা শুনে আমি বিস্মিত। দেখছেন না মিসেস বুল—একটা মানুষ যেমন ভাবেই জীবন যাপন করুক না কেন, তার সম্পর্কে জঘন্যতম মিথ্যা আবিষ্কার করার লোকের অভাব কখনো হয় না? চিকাগোতে আমার বিরুদ্ধে এ রকম ব্যাপার রোজ ঘটতে দেখেছি। আর এই মহিলারা সেই একই শ্রেণীর, এরা খ্রীষ্টানদের মধ্যেও সেরা খ্রীষ্টান!… নীচের তলার ঘরে কিছু বক্তৃতার ব্যবস্থা করছি, পয়সা নিয়ে; শতখানেক লোক ধরবে, তাতে খরচটাও উঠে আসবে। ভারতে যে টাকা পাঠাতে হবে সেজন্য এখনই খুব ব্যস্ত হচ্ছি না। আমি অপেক্ষা করব। মিস ফারমার কি আপনার কাছে আছে? মিস পীকে কি চিকাগোয়? যোসেফাইন লকির সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে? মিস হ্যামলিন আমার প্রতি খুবই সদয়, আমাকে সাহায্য করার জন্য তিনি যথাসাধ্য করছেন।

আমার প্রভু বলতেন, হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সংজ্ঞা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবার পথে মস্ত অন্তরায়। এই সব প্রতিবন্ধ অতি দ্রুত আমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এইসব সংজ্ঞা ভেদের আর কোনো ভালো দিক নেই, এখন এগুলির প্রভাব অশুভ, আর তারই কুপ্রভাবে আমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তারাও দানবের ন্যায় আচরণ করে। আমাদের তাই কাজ কঠিন, আর সেই ভাবেই আমাদের সাফল্য অর্জন করতে হবে।

এই কারণেই একটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে আমার এত আগ্রহ। সংগঠনের নানা দোষ ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ও ছাড়া কোনো কাজ চলে না। এই ব্যাপারে, আমার ধারণা, আপনার সঙ্গে আমার মত পার্থক্য ঘটবে—একই সঙ্গে সমাজকেও কোনো আঘাত দেব না অথচ মহৎ কর্মও সাধন করব, এমনটা কখনো সম্ভব হয় না। অন্তরের অনুজ্ঞা মেনেই কাজ করতে হবে, যদি তা যথার্থ হয় কল্যাণকর হয় তবে সমাজ তার অনুবর্তী হবেই—হয়ত কর্মীর মৃত্যুর পরেও শতাব্দীর ব্যবধানে। দেহ মন প্রাণ দিয়ে আমাদের কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আর যতদিন না আমরা সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হব, একটিই মাত্র আইডিয়ার প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে পারব, ততদিন আমাদের আলোক লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়।

যারা মানব সমাজের কল্যাণ করতে চায় তাদের আপন আনন্দ ও বেদনা, নাম ও যশ, হাজারো স্বার্থ একত্র করে একসঙ্গে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে হবে, তারপর প্রভুর সমীপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সকল গুরু মহারাজগণই এই কথা বলেছেন এবং এইরূপ কাজ করেছেন।

গত শনিবার আমি মিস করবিনের বাড়িতে গিয়েছিলাম; বলে এসেছি আর

ক্লাস করতে পারব না। বিশ্বের ইতিহাসে কখনো কি দেখা গেছে যে ধনীরা কোনো মহৎ কাজ করেছে? সকল কর্মই—মহৎ কার্যও—সম্পাদিত হয় অন্তরের দ্বারা মেধার দ্বারা, টাকার থলির দ্বারা নয়।

আমার আইডিয়া, তার প্রতিই আমি অবিচল থাকব সারা জীবন—সাহায্য চাইব ভগবানের কাছে, আর কারও কাছে নয়! সাফল্যের এইটিই সার সূত্র। আমার বিশ্বাসএই ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে একমত। মিসেস থার্সবি ও মিসেস অ্যাডামসকে আমার ভালোবাসা জানাবেন।

চির কৃতজ্ঞ এবং স্নেহবদ্ধ আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৮]

৫৪ ডব্লু. ৩৩ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১১ এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

…আমি আগামীকাল কয়েকদিনের জন্য গ্রামে চলে যাচ্ছি, মিঃ লেগেটের সঙ্গে দেখা করব। আশা করি অমলিন হাওয়া বাতাস আমার শরীরের পক্ষে ভালো হবে।

এক্ষুনি এই বাড়ি ছেড়ে যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছি, খরচের অতিরিক্ত বোঝা ছাড়াও, এখনই এই বাড়ি বদল করাটা সমীচীন হবে না। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে গুছিয়ে নেব।

…এই সঙ্গে খেতড়ির মহারাজার চিঠিখানা পাঠালাম। কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসায় গর্জন তেল লাগানো সংক্রান্ত স্লিপটিও পাঠালাম। মিস হ্যামলিন আমাকে প্রচুর সাহায্য করে যাচ্ছেন। তাঁর প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় এবং আশা করি, অকপটও বটেন। "ঠিক ঠিক লোকের" সঙ্গে তিনি আমাকে পরিচিত করিয়ে দিতে চান। আমার ধারণা এ সেই "ধৈর্য রক্ষা করে থাক"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝি—প্রভু যাদের প্রেরণ করেন তারাই কেবল "ঠিক ঠিক লোক"। ওরকম লোকই আমাকে সাহায্য করতে পারে এবং সাহায্য করবে। অন্যান্যদের সম্পর্কে বলব—প্রভু তাদের সকলের সহায় হোন এবং আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন, এই আমার নিজের কোয়ার্টার নিজেই ব্যবস্থা করায় ফল কিছুই হবে না, কোনো মহিলাই এখানে পদার্পণ করবেন না। বিশেষ করে মিস হ্যামলিন বলেছিলেন, তিনি এবং তার "ঠিক ঠিক লোকেরা" এসব ব্যাপারের অনেক উর্ধ্বে, দীন হীন বাসস্থানে একাকী বাস করে যে

তেমন ব্যক্তির কাছে তারা কেউ যাবেন না বা তার বক্তৃতাও শুনবেন না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও "ঠিক ঠিক লোকেরা" এসেছিলেন ঠিকই, দিনে ও রাতে এসেছেন, এমন কি মিস হ্যামলিনও এসেছেন। হে প্রভু! তোমার প্রতি, তোমার করুণার প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করা মানুষের পক্ষে কত না কঠিন! শিব! শিব! কোথায় ঠিক লোক আর কোথায় বেঠিক মা? সবই তো তিনি! তিনিই ব্যাঘ্র ও মেষ, সাধু ও পাপীর মধ্যেও তিনি! তাঁতেই আমি আশ্রয় নিয়েছি, আমার দেহ মন আত্মা সমর্পণ করেছি। সারা জীবন আমাকে কোলে রেখে এখন কি তিনি আমাকে ত্যাগ করবেন? দেবতার করুণা না হলে সমুদ্রে এক বিন্দু বারি থাকবে না, গহন বনেও থাকবে না একটি পল্লব, কুবেরের ভাণ্ডারেও এক কণা রুটি। তাঁর ইচ্ছায় মরুতেও আসবে স্রোতস্বিনী, ভিখিরীরও বৈভব হবে। চড়ুই পাখির পতনও তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। এসব কি শুধু কথার কথা, মা, না কি বাস্তব সত্য জীবনের অভিজ্ঞতা?

"ঠিক ঠিক উপস্থাপনের" এই বিষয় নিয়ে বিবাদ ক্ষান্ত হোক। হে আমার শিব, তুমিই আমার যাথার্থ, আমার ভ্রান্তিও তুমি। প্রভু, সেই শৈশব কাল থেকে আমি তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি। আমি গ্রীষ্মমণ্ডলে বা মেরুপ্রান্তে, পর্বত-শিখরে অথবা সমুদ্রের গভীরে যেখানেই থাকি না কেন তুমি থাকবে আমার সঙ্গে। আমার স্থিতি —আমার জীবনের পথ প্রদর্শক—আমার আশ্রয়—আমার বন্ধু—আমার শিক্ষক—আমার দেবতা—আমার প্রকৃত আত্মা, তুমি আমাকে কখনো ত্যাগ করবে না, কখনো না। একথা আমি নিশ্চিত জানি। ওগো দেবতা, নিঃসঙ্গতার মধ্যে, বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে কখনো কখনো আমি দুর্বল হয়ে পড়ি; সেই দুর্বল মুহূর্তে আমার মানুষের সাহায্যের কথা মনে হয়। ভগবান তুমি আমাকে এই রকম দুর্বলতা থেকে রক্ষা কর, আমি যেন কখনো তোমার ছাড়া অন্য কারও সাহায্য না প্রার্থনা করি। কোনো লোক যদি অপর এক সৎ ব্যক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করে তবে সে কখনো বিশ্বাসঘাতকতায় পীড়িত হয় না, কখনো পরিত্যক্ত হয় না। সমগ্র সৎ ও কল্যাণের জন্মদাতা পিতা তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করবে? তুমি তো জান সারা জীবন আমি তোমার সেবক; তোমারই দাস। তুমি কি আমাকে ছেড়ে দেবে একটি খেলার সামগ্রীর মতো? অশুভের পথে আমাকে যাতে টেনে নেওয়া যায় সেই জন্য?

তিনি আমাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না, মা; এ আমি নিশ্চিত জানি।

আপনার চির অনুগত সন্তান
বিবেকানন্দ

[৭]

৫৪ ডব্লু, ৩৩ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
২৫ এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

গত পরশু মিসেস ফারমারের কাছ থেকে একখানা সহৃদয় পত্র পেলাম ; তার সঙ্গে একশত ডলারের একখানা চেক—বার বার হাউস বক্তৃতাবলীর দক্ষিণা। আগামী শনিবার তিনি আসছেন নিউ ইয়র্কে। তাঁর সার্কুলারে আমার নাম দেবার কথা অবশ্যই বলব ; তবে এখন গ্রীণএকারে আমি যেতে পারব না ; থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করেছি—জায়গাটা যেখানেই হোক না কেন। আমার এক ছাত্রী মিস ডুচারের একটি কটেজ আছে সেখানে, আমরা কয়েকজন নিরিবিলি শান্তিতে সেখানে বিশ্রাম যাপন করব। ক্লাসে যে সব মাল-মসলা পাচ্ছি তাই দিয়ে আমি জন কয়েক "যোগী" গড়ে তুলতে চাই ; গ্রীণএকারের ন্যায় কর্মমুখর খামার বাড়ি সে কাজের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়, অন্য জায়গাটি বরং এক প্রান্তে অবস্থিত এবং সেই কারণে অনুসন্ধিৎসু ঔৎসুক্য নিয়ে ওখানে কেউ যেতে চাইবে না।

জ্ঞানযোগ ক্লাসে যে ১৩০ জন ব্যক্তি এসেছিলেন মিস হ্যামলিন তাদের সকলের নাম লিখে রেখেছেন জেনে খুব খুশী হলাম। আরো ৫০ জন আসেন বুধবারের যোগ ক্লাসে এবং অতিরিক্ত ৫০ জন আসেন সোমবারের ক্লাসে। মিঃ ল্যাণ্ডসবার্গের কাছে সব নামই ছিল ; অবশ্য নাম থাক বা না থাক, তারা সবাই আসবেনই।…তারা না এলেও অন্যরা আসবেন ; এই ভাবেই চলবে—প্রভু নামের জয় হোক !

নাম লিখে রাখা তারপর নোটিশ দেওয়া—এসব বেশ শক্ত কাজ বড় কাজ সন্দেহ নেই, আমার হয়ে এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের উভয়ের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ যে, এ সব আমার দিকের অলসতার পরিণাম, তারই জন্য পরনির্ভরশীলতা—এবং সেটি নীতিবিগর্হিত ; আর আলস্যের পরিণতি সর্বদাই অশুভ। অতএব এখন থেকে ওসব কাজ আমি নিজেই করব।…

মিস হ্যামলিনের "ঠিক ঠিক লোকদের" যে কোনো একজনকে নিতে পারলে আমি অবশ্যই যারপরনাই আনন্দিত হব, কিন্তু দুঃখের বিষয় অমন কেউ একজনও এখন পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। শিক্ষকের কর্তব্যই হল "বেঠিক ব্যক্তিদের" শিখিয়ে "ঠিক ঠিক ব্যক্তিতে" পরিণত করা। বস্তুতঃ এই তরুণী মিস হ্যামলিন "নিউ ইয়র্কের ঠিক ঠিক লোকের" সঙ্গে পরিচিত করে দেবার যে আশা ও উৎসাহ আমায় দিয়েছেন, যে কার্যকর সাহায্য তিনি আমাকে দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁর প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞ। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এই সব কাজ কর্ম আমার নিজের হাতেই করা উচিত।…

মিস হ্যামলিন সম্পর্কে আপনি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন সে আমার অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আপনি তাকে সাহায্য করবেন জেনে আমি খুব আনন্দিত, বিশেষ

তার সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের অনুগ্রহে মানুষের মুখ দেখা মাত্র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে আমি প্রায় নির্ভুলভাবে তার চরিত্র বুঝতে পারি; আর তাই একথা বলছি—আমার ব্যাপারে আপনি যেমন খুশী যা খুশী করতে পারেন, আমি টু শব্দটি পর্যন্ত করব না;—আর মিস ফারমারের উপদেশ আমি সানন্দে গ্রহণ করব, ভূত-প্রেতের ব্যাপার যাই থাকুক না কেন। ভূত-প্রেতের পেছনে আমি দেখতে পাই একটি অপরিসীম প্রেম-পূর্ণ হৃদয়, প্রশংসনীয় উচ্চ অভিলাষের পাতলা আবরণে এখন তা আবৃত—কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যে এই আবরণও অপসৃত হতে বাধ্য। আমার ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে "বাঁদরামি" করতে এমন কি ল্যাণ্ডসবার্গকেও আমি অনুমতি দেব; কিন্তু তারপর আর নয়—একেবারে যতি চিহ্ন। এই কয়জন ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে সাহায্যের কথায় আমার ভয় হয়। এই পর্যন্তই বলতে পারি। আপনি আমাকে যে সাহায্য দিয়েছেন তার জন্যই নয়, পরন্তু আমার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই (আমার প্রভুর ভাষায় প্রেরণা থেকেই) আমি আপনাকে মা বলে বিবেচনা করি; আপনি আমাকে যে কোনো উপদেশ দেবেন আমি সর্বদা তা পালন করে চলব—কিন্তু এই সমস্তই থাকবে ব্যক্তিগত স্তরে। আপনি যখন কোনো মাধ্যম স্থির করবেন তখন আমি আমার নির্বাচনের স্বাধীনতা দাবি করব। এই মাত্র।

এই সঙ্গে ইংরেজ ভদ্রলোকের চিঠিটি পাঠালাম। মার্জিনে কিছু নোট করেছি হিন্দুস্থানী কথা বোঝাবার জন্য।

আপনার অনুগত সন্তান
বিবেকানন্দ

[১০]

৫৪ ডব্লু. ৩৩, নিউ ইয়র্ক
৭ মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

…ভারত থেকে একখানা সংবাদপত্র পেয়েছি; ও দেশ থেকে ডাঃ বারোজকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে বার্তা এসেছিল ডাঃ বারোজ তার জবাব দিয়েছেন, জবাবটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মিস থার্সবি সেটি আপনাকে পাঠাবেন। মাদ্রাজে একটি সভা হয়েছে আমেরিকানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য এবং আমাকে একটি অভিনন্দন প্রেরণের জন্য; সেই সভার সভাপতির কাছ থেকে গতকাল আর একখানা পত্র পেয়েছি।…এই ভদ্রলোক মাদ্রাজের প্রধান নাগরিক, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক; ভারতে এই পদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ।

নিউ ইয়র্কে আমি আর দুটি পাবলিক লেকচার দেব, তা হবে মর্ট মেমোরিয়াল বিল্ডিংয়ের উচ্চতর কক্ষে। এর প্রথমটি আগামী সোমবার; বিষয়ঃ ধর্মের বিজ্ঞান। পরেরটির বিষয়ঃ যোগের মূল নীতি।…ভারতের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে বইখানা কি

মিস হ্যামলিন আপনাকে পাঠিয়েছেন ? আমার ইচ্ছা আপনার ভাই বইখানা পড়ে দেখবেন ; তারপর তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন ভারতে ইংরেজ শাসনের অর্থ কী।

আপনার চির কৃতজ্ঞ সন্তান
বিবেকানন্দ

[১১]

৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩ নং স্ট্রীট,
নিউ ইয়র্ক
মে, ১৮৯৫, বৃহস্পতিবার

প্রিয় মিসেস বুল,

ক্লাস চলছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপস্থিতি প্রচুর হলেও ভাড়া যোগানোর পয়সাটাও উঠছে না। এই সপ্তাহটা দেখব, তারপর ছেড়ে দেব।

আমার এক ছাত্রী মিস ডুচার, থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ডস-এ তার বাড়িতে যাব এই গ্রীষ্মে। ভারত থেকে বেদান্ত বিষয়ে নানাবিধ বই এখন আমার কাছে পাঠানো হচ্ছে। থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ডসে থাকা কালে আমি বেদান্ত দর্শনের তিন পর্যায় বিষয়ে ইংরিজিতে একখানা বই লিখব আশা করছি, পরে হয়ত গ্রীণএকারে যেতে পারি। মিস ফারমার চাইছেন এই গ্রীষ্মকালে আমি ওখানে লেকচার দিই।

অমরত্ব বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দেব বলে প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ; এই মুহূর্তে সেই প্রবন্ধটি লিখতে খুব ব্যস্ত আছি।

আপনার
বিবেকানন্দ

[১২]

পারসি, নিউ হ্যামশায়ার
৭ জুন, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

শেষ পর্যন্ত এখানে মিঃ লেগেটের কাছে আসতে পেরেছি। জায়গাটি সৌন্দর্যে আমার দেখা সব জায়গার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কল্পনা করুন—এক বিশাল হ্রদ তাকে বেষ্টন করে আছে বিশাল অরণ্যাবৃত শৈলমালা, আর এই সব কিছুর মধ্যে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কী চমৎকার, কী শান্ত, কী নিথর ! শহরের কল-কোলাহল ব্যস্ততার পর এখানে এসে আমি কতটা আনন্দিত তা আপনি হয়ত কল্পনা করতে পারবেন।

এখানে এসে যেন নতুন জীবন পেলাম। একা একা চলে যাই বনমধ্যে, সেখানে গীতা পাঠ করি, আমি পরিপূর্ণ সুখী। দিন দশেকের মধ্যে এই স্থান ত্যাগ করব, অতঃপর যাব থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্কে। সেখানে ঘণ্টা ধরে ধ্যান করব, থাকব সম্পূর্ণ একাকী। ভাবতেও মন উঁচু হয়ে ওঠে।

বিবেকানন্দ

[১৩]

৫৪ ওয়েস্ট ৩৩নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
জুন, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

এই মাত্র বাড়ি ফিরেছি। সফরটিতে আমার খুব উপকার হয়েছে। গ্রাম পাহাড় এবং বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেটে মিঃ লেগেটের গ্রাম-বাড়ি আমার দারুণ ভালো লেগেছে। বেচারী ল্যাণ্ডসবার্গ এ বাড়ি থেকে চলে গেছে। ঠিকানাটাও কাউকে দিয়ে যায়নি। ল্যাণ্ডসবার্গ যেখানেই যাক ঈশ্বর যেন তার মঙ্গল করেন! এ জীবনে যে সামান্য কয়েকজন একনিষ্ঠ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে সে তাদেরই অন্যতম।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। একবার সংযুক্তি ঘটলে পরে তার বিযুক্তি আসবেই। আশা করি আমি একাকী কাজ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হব। মানুষের কাছে যত কম সাহায্য পাওয়া যাবে তত বেশী পাওয়া যাবে ভগবানের কাছে! এই মাত্র লণ্ডনের এক ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে পত্র পেলাম, ভদ্রলোক ভারতে বাস করেছেন, আমার দুই গুরুভাইয়ের সঙ্গে হিমালয়ে ছিলেন; তিনি আমাকে লণ্ডনে আসতে বলছেন।

আপনার
বিবেকানন্দ

[১৪]

(মিস আলবার্টা স্টারজেসকে লেখা)

১৯ ডব্লু ৩৮, নিউ ইয়র্ক
৮ জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলবার্টা,

নিশ্চিত জানি তুমি এখন তোমার সঙ্গীত শিক্ষায় মগ্ন। ইতিমধ্যে স্বরগ্রাম বিষয়ে ওয়াকিফহাল হয়ে উঠেছ আশা করি। এর পর যখন দেখা হবে তখন তোমার কাছ থেকে এ বিষয়ে তালিম নিতে পারলে খুব সুখী হব।

পারসিতে মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমাদের চমৎকার কেটেছে; মিঃ লেগেট একজন সাধু-সন্ত মানুষ, নয় কি?

আমার বিশ্বাস হোলিস্টারেরও জার্মানী খুব ভালো লাগছে। আশা করি, জার্মান শব্দ বিশেষ করে sch, t3, ts3 প্রভৃতি দিয়ে যা সুরু, তা উচ্চারণ করতে গিয়ে এবং নানা মিষ্টি আস্বাদ করতে গিয়ে তোমাদের কারও জিভের ক্ষতি হচ্ছে না।

জাহাজ থেকে তোমার মায়ের কাছে লেখা তোমার চিঠি আমি পড়েছি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমি খুব সম্ভব ইউরোপে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত আমি ইউরোপে যাইনি কখনো। যাই হোক, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে তা খুব বেশী পৃথক হবে না। এ দেশের আদব-কায়দা রীতিনীতিতে আমি তো ইতিমধ্যেই দুরস্ত হয়ে নিয়েছি।

পারসিতে খুব নৌকো বাইচ খেলতাম, তার দু একটি জিনিস আমি বেশ শিখে নিয়েছি। আণ্ট জো জো কে তার মিষ্টি স্বভাবের দাম দিতে হয়েছে—মাছি মশারা তাকে এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্কৃতি দিতে চায়নি। আমাকে ওরা এড়িয়েই গেছে মনে হয়, খুব গোঁড়া ধর্মপ্রাণ বলে বোধ হয় ওরা আমার মতো হিঁদেনকে ছুঁতেও চায়নি। তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে, পারসিতে আমি খুব গান গাইতাম, আর সেই গান সম্ভবত মশা মাছিদের ভয় পাইয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কী চমৎকার সব বার্চ গাছ ছিল। আমার মাথায় একটি আইডিয়া এসেছিল যে সেই গাছের বল্কল থেকে বই তৈরী করব এবং তোমার মা এবং খুড়িমার জন্য তাতে সংস্কৃত পদ্য লিখব—যেমন আমাদের দেশে প্রাচীন কালে করা হত।

আমার নিশ্চিত ধারণা আলবার্টা তুমি অচিরে অত্যন্ত বিদুষী মহিলা হয়ে উঠবে।

তোমাদের উভয়কে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

তোমাদের চির স্নেহবদ্ধ
স্বামী বিবেকানন্দ

[১৫]

c/o ই. টি. স্টার্ডি
হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম, রিডিং
ইংল্যাণ্ড
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

মিঃ স্টার্ডি এবং আমি চাইছি ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে—বুদ্ধিমান ও শক্তিমান কয়েকজনকে যোগাড় করতে, তাদের দিয়ে একটি সংস্থা গঠন করব; এই কারণেই আমাদের এগুতে হবে ধীর পদক্ষেপে। আমাদের সাবধান হতে হবে যাতে গোড়া থেকেই আমরা "খেপামি"তে না প্লাবিত হয়ে যাই। আপনি জানেন,

আমেরিকাতেও আমার এই পলিসিই ছিল। মিঃ স্টার্ডি ভারতে থেকেছেন, আমাদের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাদেরই মতো করে কিছুকাল জীবন যাপন করেছেন। লোকটি দারুণ কর্মঠ, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতে তার প্রচুর জ্ঞান।·· ···এ পর্যন্ত সব ভালোই চলছে।···আমি চাই তিনটি জিনিস—পবিত্রতা, অধ্যবসায় এবং কর্মশক্তি; এরূপ গুণসম্পন্ন জন ছয়েক লোকও যদি এখানে পাই তাহলেই আমার কাজ চলবে। এই রকম কিন্তু লোক পাবার সম্ভাবনা আমার আছে।

বিবেকানন্দ

[১৬]

রিডিং, ইংল্যাণ্ড
২৪ সেপ্টেম্বর, '৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

মিঃ স্টার্ডিকে সংস্কৃত শিক্ষায় সাহায্য করা ছাড়া এখনো এখানে চোখে পড়ার মত কোনো কাজ আমি করিনি।···মিঃ স্টার্ডি চাইছেন, ভারতে আমার গুরু-ভাইদের মধ্য থেকে একজন সন্ন্যাসীকে এখানে নিয়ে আসি, যাতে আমি আমেরিকায় চলে গেলে সে তাঁকে সাহায্য করতে পারে। একজন কাউকে পাঠাবার জন্য ভারতে চিঠি দিয়েছি।···এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। পরবর্তী তরঙ্গের জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি। আমার নীতি হল: "কিছু এড়িয়ে যেয়ো না, যাজ্ঞাও কোরো না কিছু; প্রভু যা প্রেরণ করেন তার জন্য অপেক্ষা করে থাকো।"···আমার লেখার গতি ধীর, কিন্তু হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ।

শুভেচ্ছা সহ আপনাদের
বিবেকানন্দ

[১৭]

(মিসেস এফ. এইচ. লেগেটকে লেখা)

C/o. ই. টি. স্টার্ডি
হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম, রিডিং
ইংল্যাণ্ড
অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় মা,

আপনি আপনার সন্তানকে ভুলে যাননি তো? এখন কোথায় আছেন আপনি? তাঁতে কোথায়, ছেলেমেয়েরা বা কোথায়? আপনার বেদীতে আরাধনারত সেই সন্ত'র

খবর কী? জো জো নিশ্চয় এত শীঘ্র "নির্বাণ" লাভ করছে না; কিন্তু তার গভীর নীরবতাকে মস্ত "সমাধি'' বলেই মনে হচ্ছে।

আপনি কি চলার পথে? আমার এদিকে ইংল্যাণ্ডে খুব ভালো লাগছে। আমি আর আমার বন্ধু দর্শন নিয়েই বেঁচে আছি, একটুখানি মারজিন রাখা আছে আহার ও ধূমপানের জন্য। দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ এবং সেই বিষয়ক সব কিছু ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই আমাদের কাছে।

হোলিস্টার তার লম্বা ফুল প্যান্ট পরে বেশ জেন্টলম্যান হয়ে উঠেছে বোধ হয়, আর আলবার্টা শিখছে জার্মান ভাষা।

এখানে ইংরেজরা বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ কালা আদমীদের আদৌ ঘৃণা করে না। রাস্তায় আমাকে কেউ কোনো আওয়াজও দেয় না। কখনো কখনো আমার মনে হয় আমার মুখমণ্ডল কি শ্বেতকায় হয়ে গেল! কিন্তু আরশিতে সত্য ফুটে ওঠে। তবু এখানকার এরা কত বন্ধুভাবাপন্ন।

তার ওপর যে সকল ইংরেজ নারী ও পুরুষ ভারতকে ভালোবেসেছেন তাঁরা তো হিন্দুদের চেয়েও বেশী হিন্দু। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে এখানে আমি খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে রান্না করা পর্যাপ্ত সব্জি খেতে পাচ্ছি। কোনো ইংরেজ যদি কোনো একটা জিনিষে হাত দেয় তবে সে তার শেষ পর্যন্ত যাবে। গতকাল দেখা হল জনৈক অধ্যাপক ফ্রেজারের সঙ্গে, উনি এখানকার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। অর্ধেক জীবন তিনি ভারতে কাটিয়েছেন। প্রাচীন চিন্তাধারা এবং প্রাচীন প্রজ্ঞায় তিনি এমনই আচ্ছন্ন যে ভারতের বাইরে কোনো কিছুকে তিনি আমলই দিতে চান না!! আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে চিন্তাশীল অনেক ইংরেজ নরনারী মনে করেন—হিন্দু বর্ণ প্রথাই সমাজ সমস্যার একমাত্র সমাধান। এরকম চিন্তা ভাবনা যাদের মাথায় তারা সোশ্যালিস্টদের এবং অন্যান্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কতটা ঘৃণা করে তা হয়তো আপনি কল্পনা করতে পারবেন!! আর এখনকার পুরুষেরা—তাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত—ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে অসাধারণ আগ্রহ পোষণ করে, এরকম নারীর সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। আমেরিকার তুলনায় এখানে নারীর কর্মক্ষেত্র অনেক সঙ্কীর্ণতর। এ যাবৎ আমার সব কিছু ভালোই চলেছে। নতুন আর কিছু ঘটলে আমি আপনাকে জানাব।

পরিবারের কর্তা, রাণীমা, জো জো এবং খোকাখুকুদের আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ
আপনাদের বিবেকানন্দ

[১৮]

রিডিং, ইংল্যাণ্ড
৪ অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয়—,

…পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় সকল প্রতিবন্ধ অতিক্রম করতে পারে। সকল মহৎ কার্যই ধীরগতি হতে বাধ্য।…

ভালবাসাসহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১৯]

রিডিং
৬ অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

…মিঃ স্টার্ডির সঙ্গে মিলে আমি পর্যাপ্ত টীকা ভাষ্য সমেত ভক্তি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বই অনুবাদ করছি; সেটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এই মাসে আমাকে লণ্ডনে দুটি বক্তৃতা দিতে হবে। আর সেইডেনহেডে একটি। এর ফলে কিছু ক্লাস এবং বৈঠকী বক্তৃতার পথ খুলে যাবে। আমরা খুব বেশী সোর করতে চাই না, হৈ চৈ না করে অগ্রসর হতে চাই।…

শুভেচ্ছা সহ আপনার
বিবেকানন্দ

[২০]

লণ্ডন
২১ নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

বুধবার ২৭ তারিখে 'ব্রিটানিক' জাহাজ যোগে আমি যাত্রা করব। এ যাবৎ এই স্থানে কাজ খুবই সন্তোষজনক হয়েছে। আগামী গ্রীষ্মকালে চমৎকার কাজ হবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে।…

ভালোবাসা সহ আপনার
বিবেকানন্দ

[২১]

আর. এম. এস. "ব্রিটানিক"
বৃহস্পতিবার সকালবেলা
৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলবার্টা,

গতকাল সন্ধ্যায় তোমার সুন্দর পত্রখানা পেয়েছি। আমাকে যে স্মরণ রেখেছ সে তোমার সহৃদয়তা। "স্বর্গীয় জুটিকে" দেখতে যাব শীঘ্রই। তোমাকে তো আগেই বলেছি, মিঃ লেগেট একজন সন্ত ব্যক্তি; তোমার মা জন্ম থেকেই সম্রাজ্ঞী, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্রাজ্ঞী হয়েও তাঁর অন্তঃকরণ কিন্তু মুনি-ঋষির ন্যায়।

আলপস পর্বতমালা তোমার এত ভালো লাগছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশী। সে নিশ্চয়ই অতি চমৎকার। এই রকম স্থান বিশেষেই মানুষের আত্মা সর্বদা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লাভ করে। আধ্যাত্মিক শক্তিতে দুর্বল হলেও সে দেহের স্বাধীনতা কামনা করে। লণ্ডনে সুইটজারল্যাণ্ডের এক তরুণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে আমার ক্লাশে আসত। লণ্ডনে আমি বিপুল সাফল্য লাভ করেছি, কোলাহলে ভরা শহরটা তেমন ভালো না লাগলেও ওখানকার লোকদের আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তোমাদের দেশে আলবার্টা জান, গোড়াতে বেদান্ত-চিন্তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে অজ্ঞান "পাগলা খেপারা"; এই রকম পরিচয়ের ফলে যে অসুবিধা সৃষ্টি হয় তার মধ্য দিয়ে আমাকে কষ্টে পথ করে নিতে হবে। তুমি হয়ত লক্ষ্য করেছ, আমেরিকায় উঁচু শ্রেণীর খুব কম নরনারীই আমার ক্লাশে যোগ দিয়েছে। আবার আমেরিকার এই উঁচু শ্রেণীর মানুষই ধনাঢ্য, তাদের সব সময়টাই কাটে সম্পদ উপভোগে এবং ইউরোপীয়দের অনুকরণ প্রয়াসে। পক্ষান্তরে ইংল্যাণ্ডে বেদান্ত চিন্তাধারা প্রচলিত করেছেন দেশের শিক্ষিত বিদ্বান লোকেরা, আর ইংল্যাণ্ডের উঁচু শ্রেণীর বহু লোক আছেন যাঁরা গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাই তুমি শুনে হয়ত অবাক হবে, আমি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে জমি অনেকখানিই তৈরী পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমেরিকার তুলনায় ইংল্যাণ্ডে আমার কাজের প্রভাব বেশী হবে। এর সঙ্গে যদি ইংরেজ চরিত্রের অসাধারণ অনমনীয়তা যোগ কর তবে ফলটা কী দাঁড়ায় তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। এই থেকে বুঝতে পারছ যে আমি ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে আমার মতামত প্রচুর বদলে ফেলেছি, একথা সানন্দে স্বীকার করছি। জার্মানীতে কাজ এর চেয়েও ভালো হবে সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আগামী গ্রীষ্মে আমি আবার আসব ইংল্যাণ্ডে। ইতিমধ্যে কাজের ভার বেশ উপযুক্ত লোকের হাতেই থাকবে। জো জো আমেরিকার ন্যায় এখানেও আমার সঙ্গে সমান দয়ালু নিঃস্বার্থ অকপট বন্ধুর আচরণ করেছে; বস্তুত তোমাদের পরিবারের প্রতি আমার ঋণের সত্যিই সীমা নেই। তোমাকে ও হোলিস্টারকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাই। কুয়াশার দরুন জাহাজ এখন নোঙর করে আছে। পার্সার দয়া করে আমাকে একটি পুরো কেবিন দিয়েছে। ওরা ভাবে প্রত্যেকটি হিন্দুই এক একটি রাজা,

এই ভেবেই ওরা সবিনয়ী হয়—যখন টের পাবে এই রাজা কপর্দকশূন্য তখন মোহ ভাঙবে !!

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ
তোমাদের বিবেকানন্দ

[২২]

২২৮ ওয়েস্ট, ৩৯ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনার পত্রে আমাকে যে আহ্বান জানিয়েছেন সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ। দশদিন অতি ক্লান্তিকর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর গত শুক্রবার আমি এখানে এসে পৌছেছি। সমুদ্র খুবই বিক্ষুব্ধ ছিল, এবং জীবনে এই সর্বপ্রথম 'সমুদ্র পীড়ায়' আমি বড় কষ্ট পেলাম।...ইংল্যাণ্ডে কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুকে রেখে এসেছি; আগামী গ্রীষ্মকালে আবার ওখানে যাব এই আশায় তাঁরা আমার এখনকার অনুপস্থিতিকালে সেখানে কাজ চালাবেন। এখানে আমি কী প্রণালীতে কাজ করব তা এখনো স্থির হয়নি। ইতিমধ্যে একবার ডেট্রয়েট এবং চিকাগোতে ঘুরে আসবার ইচ্ছে আছে। তারপর ফিরব নিউ ইয়র্কে। সাধারণের কাছে প্রকাশ্য বক্তৃতা দেওয়াটা একেবারে ছেড়ে দেব ভাবছি; আমার পক্ষে সব থেকে ভালো দেখছি টাকাকড়ির সংস্রব সম্পূর্ণ বর্জন করা—সে পাবলিক লেকচার মারফৎই হোক আর প্রাইভেট ক্লাশ মারফৎই হোক। পরিণামে তাতে কাজের ক্ষতি হয়, আর তাতে খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে আমি এই নীতিতেই কাজ করেছি, লোকেরা স্বেচ্ছায় যে অর্থ সংগ্রহ করেছিল তাও প্রত্যাখ্যান করেছি। মিঃ স্টার্ডি ধনী ব্যক্তি, বড় বড় হল বক্তৃতার বেশীর ভাগ খরচ তিনিই বহন করেছেন—বাকীটা আমি। এতে ভালো ফল হয়েছে। একটি খারাপ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, ধর্মের হাটেও চাহিদার চেয়ে বেশী মাল যোগানো ঠিক নয়। চাহিদা যেটুকু শুধু ততটুকুই যোগান দিতে হবে। লোকে যদি আমাকে চায় তবে বক্তৃতার ব্যবস্থাও তারাই করবে। ওসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মিসেস অ্যাডামস এবং মিস লকির সঙ্গে পরামর্শ করার পর আপনি যদি মনে করেন আমার পক্ষে চিকাগোয় এসে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া কার্যকর হবে, তবে আমাকে লিখে জানাবেন। টাকাকড়ির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে অবশ্যই।

আমার ধারণা বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ও স্ব-স্বাধীন গ্রুপ গঠনই সমীচীন। তারা নিজেদের কাজ নিজেদের মত করুক, যত ভালোভাবে পারে করুক। আমার নিজের

কথা বলতে পারি—আমি কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হতে চাই না। আশা করি আপনার শরীর ও মন বেশ ভালো আছে।

ভগবদাশ্রিত আপনার
বিবেকানন্দ

[২৩]

২২৮ ডব্লু ৩৯ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

…সেক্রেটারির চিঠি পেয়েছি। অনুরোধ অনুযায়ী হারভার্ড ফিলসফিক্যাল ক্লাবের কাছে সানন্দে বক্তৃতা দেব। অসুবিধা হল: একাগ্রতা নিয়ে লেখা শুরু করেছি; কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক লেখা শেষ করতে চাই; আমি চলে যাবার পর এগুলি হবে কাজের বনিয়াদ। যাবার আগে অতি দ্রুত চারখানা ছোট বই সমাপ্ত করে যেতে চাই।

এ মাসে চারটি রবিবারের বক্তৃতার নোটিশ বেরিয়েছে। ব্রুকলিনে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের বক্তৃতাবলীর আয়োজন করছেন ডাঃ জেনস ও অন্যান্যরা।

শুভেচ্ছা সহ আপনার
বিবেকানন্দ

[২৪]

(মিস এস. ফারমারকে লেখা)

নিউ ইয়র্ক
২৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় বোন,

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নষ্ট হয় না, এখানে আমরা মৃত্যুর মধ্যেও জীবনেই বাস করি। এইখানে প্রতিটি চিন্তাই বেঁচে থাকে—সে চিন্তা গোপন বা প্রকাশিত চিন্তা হোক, সে চিন্তা সদর রাস্তার ভিড়ের মধ্যেই করা হোক বা আদিম অরণ্যের নিবিড় নিভৃতির মধ্যেই করা হোক; আসলে সে চিন্তা যদি সত্যিই চিন্তা হয় তাহলে তা বেঁচে থাকবে। এই চিন্তারাশি ক্রমাগত রূপ লাভ করার চেষ্টা করছে, যে পর্যন্ত এই রূপ লাভ না হচ্ছে তারা অভিব্যক্ত হবার জন্য সচেষ্ট হবেই, দমিত করে দেবার শত চেষ্টাতেও তারা মরে যাবে না। কিছুই বিনষ্ট করা যায় না—যে সকল চিন্তারাশি অতীতে অশুভ

সাধন করেছে তাও রূপলাভের প্রয়াসী, পুনঃ পুনঃ প্রকাশের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে পরিশেষে পরিপূর্ণ সৎ চিন্তায় পরিণতি লাভ করতে চাইছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে বহু ভাবরাশি বিদ্যমান আছে যা বর্তমানে অভিব্যক্তি লাভে সচেষ্ট। এই নতুন চিন্তা অনুযায়ী আমাদের দ্বৈতবাদের ভাবনা পরিত্যাগ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে ভালো ও মন্দের সার কল্পনাকে এবং এই চিন্তা দমনের উৎকট ধারণাকে। আমাদের শিক্ষণীয় হল : বিনাশ নয়, উচ্চতর লক্ষ্য নির্দেশই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম। আমরা এর দ্বারা এই শিক্ষা পাচ্ছি যে, এই বিশ্ব মন্দ ও ভালোর সমষ্টি নয়, এর উপাদান হল ভালো, আরো ভালো এবং তার চেয়েও ভালো। পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হবার পূর্বে তা থামে না। এতে শিক্ষা হয় যে কোনো পরিস্থিতিই একেবারে নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয়। সুতরাং সে প্রত্যেক প্রকারের মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তাকেই তার স্ব স্ব অবস্থানে গ্রহণ করে, এবং কোনো নিন্দার কথাটিও উচ্চারণ না করে বলে—এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে ভালোই হয়েছে, এখন আরো ভালো করার সময় এসেছে। প্রাচীনকালে যাকে কল্পনা করা হত মন্দের পরিবর্জন, এই নবশিক্ষানুসারে তাকে বলা হয় মন্দের রূপান্তর পরিগ্রহ এবং ভালো হতে আরো ভালো করার চেষ্টা। সর্বোপরি এই শিক্ষার মর্ম এই : আমরা পেতে চাইলে দেখব স্বর্গরাজ্য পূর্ব হতেই বিদ্যমান ; মানুষ দেখতে চাইলেই দেখতে পাবে, তার মধ্যে আগে থাকতেই পূর্ণতা এসেছে।

গত গ্রীষ্মকালে গ্রীনএকারের সভাগুলির অমন আশ্চর্য সাফল্যের কারণ এই নবচিন্তা গ্রহণের মানসিকতা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তোমাদের মধ্যেই তা প্রকাশলাভের অমন উপযুক্ত মাধ্যম পেয়েছিল ; কারণ, স্বর্গরাজ্য পূর্ব হতেই বিদ্যমান— এই নবচিন্তার সর্বোন্নত শিক্ষার বনিয়াদে তোমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলে।

এই ভাবটিকে জীবনে বাস্তব করে তুলে একটি উদাহরণ স্থাপনের উপযুক্ত আধার-রূপে তুমি প্রভুর দ্বারা মনোনীত ও আদিষ্ট হয়েছ ; এই আশ্চর্য কর্মে যে তোমাকে সাহায্য করবে সে প্রভুরই সেবা করবে।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ বলেছেন, যে প্রভুর সেবকদের সেবা করে, প্রভুর শ্রেষ্ঠ পূজারী সেই। তুমি প্রভুর সেবিকা, তোমার দেবানুপ্রাণীত ব্রত উদ্‌যাপনের কার্যে, যে কোনো স্থানেই থাকি না কেন, কৃষ্ণের শিষ্য হিসাবে সর্বপ্রকার সেবা দান করতে পারলে নিজেকে আমি কৃতার্থ জ্ঞান করব, মনে করব এই সেবা দ্বারা আমি তাঁরই পূজা করছি।

তোমার চির স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[২৫]

নিউ ইয়র্ক
২৫ জানুয়ারি, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

স্টার্ডির কাছে লেখা আপনার চিঠিখানা আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিঠিখানা লিখে আপনি খুবই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন। আমার ভয় হচ্ছে এ বছর আমার কাজের চাপ বেশী হচ্ছে, চাপটা টের পাচ্ছি। খানিকটা বিশ্রামের খুব দরকার হয়ে পড়েছে। তাই আপনার কথা মত বোস্টনের কাজটা মার্চ মাসের শেষাশেষি ধরাই ভালো। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে আমি ইংল্যাণ্ড রওয়ানা হব।

খুব অল্প টাকায় ক্যাটসকিলে বড় বড় প্লটে জমি পাওয়া যেতে পারে। ১০১ একরের একটি প্লট আছে, দাম মাত্র ২০০ ডলার। টাকাটা আমার আছে, কিন্তু আমি নিজের নামে জমিটা কিনতে পারছি না। এই দেশে আপনিই একমাত্র বন্ধু আছেন যাঁর ওপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। আপনি সম্মতি দিলে আপনার নামে জমিটা কিনব। গ্রীষ্মকালে ছাত্ররা ওখানে যাবে, যেমন খুশী কটেজ বা ক্যাম্প তৈরী করবে এবং ধ্যান অভ্যাস করবে। পরে অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলে তারা কিছু একটা গড়ে তুলতে পারবে। আপনি এখনই আসতে পারছেন না, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। এ মাসের শেষ সানডে লেকচার হবে আগামীকাল। আগামী মাসের প্রথম রবিবারে ব্রুকলিনে একটি বক্তৃতা হবে; বাকী তিনটি হবে নিউ ইয়র্কে—আর সেই দিয়েই আমি এ বছরের :মত নিউ ইয়র্কের বক্তৃতামালা সমাপ্ত করব।

আমার সাধ্যমত কাজ করেছি। তার মধ্যে সত্যের কোনো বীজ থাকলে তা অঙ্কুরিত হবেই। অতএব কোনো ব্যাপারেই আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। এদিকে বক্তৃতা করে করে আর ক্লাস নিয়ে নিয়ে আমি ক্লান্তও হয়ে পড়েছি। এখন ইংল্যাণ্ডে কয়েকমাস কাজের পরে চলে যাব ভারতে, সেখানে কয়েক বছরের জন্য অথবা চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ আত্মগোপন করব। আমি যে একজন অলস স্বামী হয়ে থাকিনি সে বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার। একটি নোট বুক আমার আছে, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছে। সাত বছর আগে তাতে লেখা হয়েছিল দেখছি,—"এবার একটি নিভৃত স্থান খুঁজে নিতে হবে, সেখানে শুয়েই মরব!" তবু এই সকল কর্মই বাকী থেকে গেছে। আশা করি সবই গুছিয়ে আনতে পেরেছি। আশা করি এই সব প্রচারকার্য থেকে, নতুন নতুন সৎ বন্ধন সমষ্টি থেকে প্রভু আমায় মুক্তি দেবেন।

"যদি তুমি জেনে থাক যে একমাত্র অস্তিত্ব আত্মা, আর অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তবে কার জন্য কিসের বাসনায় তুমি নিজেকে হয়রান করছ?" এই সব ভালো করার যাবতীয় ধারণা যে আমার মাথায় এসেছে সে শুধু মায়া, এখন ওসব ভাবনা আমার মাথা থেকে বিদায় নিচ্ছে। আমি এখন ক্রমান্বয়ে বেশী করে নিঃসংশয়

হচ্ছে যে, আত্মার শুদ্ধিকরণ ছাড়া—আত্মাকে জ্ঞানলাভের জন্য উপযুক্ত করে তোলা ছাড়া কর্মের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ভালো আর মন্দ নিয়ে এই জগৎ-সংসার নানা আকারে প্রকারে অগ্রসর হয়ে চলবে। শুধু শুভ ও অশুভ নতুন নতুন সংজ্ঞা নতুন নতুন আধার গ্রহণ করবে। আমার আত্মার আকাঙ্ক্ষা শুধু শান্তি আর নিরুপদ্রব চিরশান্তি।

"একাকী থাক, একাকী জীবন যাপন কর। যে একা, অন্যের সঙ্গে তার কখনো সংঘাত হয় না।—সে কারও উপদ্রব ঘটায় না, কারও উপদ্রবও তাকে সহ্য করতে হয় না।" আঃ, আমার কি আকুল আকাঙ্ক্ষা! আমার ছিন্নবাস, মুণ্ডিত মস্তক, বৃক্ষতলে নিদ্রা যাওয়া আর ভিক্ষালব্ধ অন্নে আহার—এই সব কিছুর জন্য আমার কী যে আকুল আকাঙ্ক্ষা! ভারতই পৃথিবীর একমাত্র স্থান, যেখানে হাজারো দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও, আত্মা লাভ করে তার স্বাধীনতা, তার দেবতাকে। পাশ্চাত্যের এই সকল জাঁকজমক শুধু অসার দম্ভ মাত্র, আত্মার বন্ধন মাত্র। জগৎ সংসারের এই অসার দম্ভের প্রকৃতি এখন যত প্রবলভাবে উপলব্ধি করেছি, জীবনে আর কখনো তেমন করে তা বুঝতে পারিনি। প্রভু সকলের বন্ধন চূর্ণ করুন—সকলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করুক—এই আমার সতত প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ

[২৬]

ইণ্ডিয়ানা এভিনিউ
চিকাগো, ইল.
৬ এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনার সহৃদয় পত্র যথাসময়ে পাওয়া গেছে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ প্রীতি বিনিময় হয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েকটি ক্লাসও করেছি। আরো কয়েকটি ক্লাস করব, তারপর বৃহস্পতিবার রওয়ানা হব।

মিস অ্যাডমসের অনুগ্রহে এখানে সব কিছুরই সুব্যবস্থা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান, অত্যন্ত ভালো।

গত দুইদিন ধরে আমি একটু জ্বরে ভুগছি। তাই লম্বা চিঠি লিখতে পারছি না। বোস্টনের সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি।

আপনাকে নমস্কার জানাই।

বিবেকানন্দ

[২৭]

১২৪ ই. ৪৪নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১৪ এপ্রিল ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

…বোম্বাই থেকে একখানা চিঠি নিয়ে একটি অদ্ভুত লোক আমার কাছে এসেছে। ব্যবহারিক যন্ত্রবিদ্যার জ্ঞান আছে লোকটির; এই দেশে ছুরি কাঁচি তৈরী এবং অন্যান্য লোহার জিনিস উৎপাদনের কারখানা দেখতে তার অসামান্য আগ্রহ।… তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; তবু লোকটি যদি বদমাসও হয় তাহলেও আমার দেশবাসীর মধ্যে এর মতো সাহস এবং অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজ আমি আনতে চেষ্টা করব। যাতায়াতের ভাড়া দেবার মত অর্থ তার কাছে আছে।

তার চরিত্রের অকপটতা খুব সাবধানে পরীক্ষা করে আপনি যদি সন্তুষ্ট হন তবে তার এই সব কারখানা দেখবার সুযোগ করে দেবেন। আশা করি লোকটি প্রতারক নয়, তাই আরো আশা করি আপনি তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।

নমস্কারান্তে আপনার
বিবেকানন্দ

[২৮]

৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোড, লণ্ডন
৩০ মে, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

…গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্স মূলারের সঙ্গে আমার প্রীতিপূর্ণ সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি অতি সাধু ব্যক্তি, বয়স সত্তর বছর হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে তরুণ বলে মনে হয়, মুখমণ্ডলে একটি রেখা মাত্র নেই। ভারত ও বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর যে অনুরাগ আমার বোধ হয় তার অর্ধেকও নেই। তার ওপর তিনি আবার যোগেরও অনুরাগী, তাতেও তাঁর বিশ্বাস আছে। দলবাজদের অবশ্য তিনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না।

সর্বোপরি, রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি তাঁর সম্মান বোধ অপরিসীম; "নাইন্টিনথ সেঞ্চুরি" পত্রে তিনি তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লিখেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশ্বের কাছে তাঁকে পরিচিত করার জন্য আপনারা কী করছেন?" গত বহু বছর ধরে রামকৃষ্ণ তাঁকে মোহিত করেছেন। সংবাদটি কি দারুণ ভালো নয়?…

এখানে কাজ ধীরে ধীরে কিন্তু অব্যাহত গতিতে চলছে। আমাকে পাবলিক লেকচার সুরু করতে হবে আগামী রবিবার থেকে।

চির সকৃতজ্ঞ ও স্নেহবদ্ধ আপনার
বিবেকানন্দ

[২৯]

৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোড
লণ্ডন, এস. ডব্লু.
৫ জুন, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

রাজযোগ বইখানা খুব চমৎকার চলছে। সারদানন্দ শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রে যাবে।

যাকে আমি ভালোবাসি এমন কারও আইনজীবী হওয়া আমার পছন্দ নয়, যদিও আমার পিতা ছিলেন আইনজীবী। আমার প্রভু এর বিরোধী ছিলেন; আমার বিশ্বাস্ যে পরিবারে কয়েকজন আইনজীবী আছে তাকে পস্তাতে হবেই। আমাদের দেশে আইনজীবীদের ছড়াছড়ি; বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শত শত আইনজীবী শিক্ষিত হয়ে বের হয়। অথচ আমাদের জাতির প্রয়োজন সাহসী পুরুষ, প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রতিভা। তাই তো আমি চাই মহীন ইলেকট্রিসিয়ান হোক। সে যদি জীবনে ব্যর্থও হয় তবু আমার এই সান্ত্বনা থাকবে যে, সে চেষ্টা করেছে মহৎ হতে, দেশের কাজে লাগতে।···একমাত্র আমেরিকাতেই পরিবেশের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা প্রত্যেক মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীকে স্ফূর্ত হতে সাহায্য করে।···আমি চাইছি সে নির্ভয় হোক, সাহসী হোক, এবং নিজের ও নিজ জাতির জন্য নতুন পথ নির্মাণে সচেষ্ট হোক। ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার ভারতে নিজের ভাত করে নিতে পারবে।

ভালোবাসা জানবেন।

আপনার বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

আমেরিকায় একটি ম্যাগাজিনের বিষয় নিয়ে গুডউইন এই ডাকেই আপনাকে একটি চিঠি দেবে। আমার মনে হয় কাজ চালু রাখার জন্য ও রকম একটা কিছু দরকার, তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যাপারটি সক্রিয় রাখবার জন্য আমি অবশ্যই যথাসাধ্য সাহায্য করব :···আমার ধারণা খুব সম্ভব সে সারদানন্দর সঙ্গে চলে আসবে।

বি

[৩০]

(মিঃ ফ্রান্সিস এইচ লেগেটকে লেখা)

৬৩, সেণ্ট জর্জেস রোড
লণ্ডন, এস. ডব্লু.
৬ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় ফ্রাঙ্কিন সেনস,

···আটলান্টিকের এপারে আমার সব কিছু বেশ ভালোই চলছে।

সানডে লেকচারগুলি বেশ সফল হয়েছে, ক্লাসও। মরশুম সমাপ্ত, আমিও অতি ক্লান্ত। মিস মুলারের সঙ্গে এখন সুইটজারল্যাণ্ড সফরে বের হব। গলসওয়ার্দি পরিবারের সহৃদয়তার সীমা নেই। জো তাদের এদিকে টেনেছিল চমৎকার। জোর কার্যকৃতি এবং শান্ত পদ্ধতিকে আমি খুবই প্রশংসা করি। সে একটি চমৎকার নারী রাষ্ট্রনায়ক। সে একটি রাজত্ব চালাতে পারে। মানুষের মধ্যে এমন শক্তি অথচ সৎ সহজ কাণ্ডজ্ঞান আমি খুব কমই দেখেছি। আগামী শরৎকালে আমি ফিরব এবং আমেরিকায় কাজকর্ম সুরু করব।

পরশু রাতে মিসেস মার্টিনের বাড়িতে এক পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম; তার সম্বন্ধে জো-র কাছ থেকে তুমি নিশ্চয় অনেক খবরই জানতে পেরেছ।

যা হোক, ইংল্যাণ্ডে কাজ চলছে নীরবে, কিন্তু নিশ্চিত গতিতে। প্রায় প্রতি দুজনে একজন নারী বা পুরুষ আমার কাছে এসে কাজের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হাজারো দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আইডিয়া প্রচারের পক্ষে মস্ত বড় বাহন। আমি এই যন্ত্রের মধ্যস্থলে আমার আইডিয়া স্থাপন করব, নিশ্চয় জানি তাহলেই তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য সকল মহৎ কাজেরই গতি শ্লথ, বাধা-বিপত্তিও বহু, বিশেষতঃ আমরা হিন্দুরা একটি পরাজিত জাতি। তথাপি, সেই কারণেই ব্যাপারটা কার্যকরও হবে, কারণ আধ্যাত্মিক ভাবধারা পদানতদের কাছ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। ইহুদীরা তাদের আধ্যাত্মিক ভাবধারাতেই রোম সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তুমি জেনে খুশী হবে আমিও প্রতিদিন ধৈর্যের সঙ্গে, এবং সর্বোপরি সহানুভূতি নিয়ে আমার পাঠ শিক্ষা করছি। মনে হয় শক্তি মদমত্ত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও আমি দেবত্ব দেখতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় এসে পৌঁছাচ্ছি যখন কোনো শয়তানের অস্তিত্ব থাকলে তাকেও ভালোবাসতে পারব।

যখন আমার বয়স বিশ বছর তখন ছিলাম আপোসহীন, সহানুভূতিহীন এক অন্ধ ফ্যানাটিক। কলকাতার রাস্তার যে দিকে থিয়েটার আছে সেদিক দিয়েই হাঁটতাম না। আজ তেত্রিশ বছর বয়সে আমি বারবনিতাদের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতে পারি, আর তাদের নিন্দায় একটি কথাও আমার মুখে উচ্চারিত হবে না। এ কি অধঃপতন? না কি আমি প্রসারিত হয়ে উঠছি সার্বজনীন প্রেমে, যে সার্বজনীন প্রেমেই আছেন ভগবান? তাছাড়া আমি একথাও শুনেছি, যে ব্যক্তি চতুর্দিকে অশুভকে না দেখে সে সৎ কাজও করতে পারে না—এক ধরনের অদৃষ্টবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমি ওরকম দেখি না। অথচ আমার কাজের ক্ষমতা বিপুলভাবে বাড়ছে এবং ক্রমেই তা বেশী বেশী ফলপ্রসূ হচ্ছে। কোনো কোনো দিন আমার এক ধরনের ভাবাবেশ দেখা দেয়। আমার মনে হয় প্রত্যেককে আমি আশীর্বাদ করি, প্রত্যেককে এবং প্রত্যেক জিনিসকে আমি প্রেমে আলিঙ্গন করি; স্পষ্ট বুঝতে পারি, অশুভ আসলে একটা ভ্রান্তি মাত্র। এখন আমার সেই রকম একটি মুড, ফ্রান্সিস ভাই; আমার প্রতি তোমার ও মিসেস লেগেটের সহৃদয় ভালোবাসার কথা ভেবে সত্যি সত্যি আমার চোখ থেকে জল ঝরছে। ধন্য সেদিন

যেদিন আমি জন্মলাভ করেছিলাম। এখানে আমি কত না দয়া কত ভালোবাসা না পেয়েছি ; যে অনন্ত প্রেমের অবতার আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমার সকল কার্যকলাপকে সামলেছেন, সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক (দোহাই, ভয় পেয়ো না) ; তাঁরই হাতের পুতুল ছাড়া আমি আর কী, কী-ই বা ছিলাম ? তাঁরই সেবায় আমি সর্বস্ব দান করেছি, ছেড়েছি আমার প্রিয়জনদের, আমার আনন্দ আমার জীবন দান করেছি। তিনিই আমার প্রিয় খেলার সাথী, আমি তাঁর লীলাসঙ্গী। এই বিশ্বসংসারে কোনো যুক্তি-পরম্পরার বালাই নেই। আর তাঁকে বাঁধতে পারে কোন যুক্তি তর্ক ? লীলাময় তিনি, খেলার সর্ব অংশ জুড়েই তিনি এই হাসি অশ্রুর খেলা খেলছেন ! জো যেমন বলে, মস্ত মজা, সবই কৌতুক।

এই বিশ্ব কৌতুকময়, আর সব থেকে কৌতুককর তিনি—অনন্ত প্রেমের যিনি আকর। কৌতুক, নয় কি ? ভ্রাতৃত্ব অথবা খেলার সাথী যাই বল—আসলে এ যেন জগতের এই ক্রীড়াক্ষেত্রে আমোদে আহ্লাদে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এক স্কুল ভর্তি ছেলেমেয়েদের। তাই নয় কি ? কাকে প্রশংসা করব, নিন্দা করব কার ? এ তো সব তাঁরই খেলা। লোকে চায় ব্যাখ্যা, কিন্তু তাঁকে কী করে ব্যাখ্যা করা যায় ? তাঁর তো কোনো মগজই নেই, কোনো যুক্তি বিচারের তিনি ধার ধারেন না। ছোটখাট মাথা আর বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে আমাদের তিনি ভুলিয়ে রাখছেন, কিন্তু এবার তিনি আমাকে অসতর্ক পাবেন না।

এতদিন আমি দু-একটি বিষয় শিখেছি : যুক্তি-তর্ক, শিক্ষা-দীক্ষা, কথা-বার্তা সব কিছু অতিক্রম করেই আসে অনুভূতি, সব কিছুর ঊর্ধ্বে "প্রেম", "প্রেমাস্পদ"। ওগো সাকি, পূর্ণ কর পানপাত্র—আমরা প্রেম মদিরা পান করে মত্ত হয়ে যাব।

তোমারই পাগল
বিবেকানন্দ

[৫১]

৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোড, লণ্ডন
এস. ডব্লু.
৮ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

ইংরেজরা অতিশয় উদার প্রাণ। সেদিন সন্ধ্যায় মাত্র তিন মিনিট সময়ের মধ্যে আমার ক্লাস থেকে ১৫০ পাউণ্ড উঠল ; আগামী হেমন্তকালে কাজ চালানোর জন্য যে নতুন কোয়ার্টার হবে তার বাবদ এই টাকা তোলা। চাইলে সেই এক স্থানে তৎ-ক্ষণাৎ তারা ৫০০ পাউণ্ডও তুলে দিত ; কিন্তু আমরা ধীরে চলতে চাই, হুড়মুড় করে গিয়ে খরচের মধ্যে পড়তে চাই না। কাজ চালাবার জন্য এখানে বহু বাহু পাওয়া যাবে, এখানে এরা ত্যাগধর্মও খানিকটা বোঝে—ইংরেজ-চরিত্রের এই গভীরতা আছে।

শুভেচ্ছা সহ আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৩২]

সাস ফ্রে, সুইটজারল্যাণ্ড
২৫ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

অন্তত আগামী দুই মাসের জন্য আমি বিশ্বসংসারকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চাই, অতি কঠোর সাধনা করতে চাই। সেই হবে আমার বিশ্রাম।... পর্বতমালা আর তুষার মিলে আমার ওপর সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ একটি প্রভাব ফেলেছে; এখন যা ঘুম হচ্ছে দীর্ঘকাল এত ভাল ঘুম আমার হয় নি।

সকল বন্ধুবান্ধবদের আমার ভালবাসা।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৩৩]

(লালা বদ্রী শাহ্‌কে লেখা)

C/o ই. টি. স্টার্ডি
হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম
রিডিং
৫ অগস্ট, ১৮৫৬

প্রিয় শাহ্‌জী,

আপনার সহৃদয় অভিনন্দনের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। আমার একটি বিষয় জানবার আছে; আমি যে খবরটি জানতে চাই তা যদি আপনি দয়া করে জানিয়ে দেন তবে বিশেষ বাধিত হব।

আলমোড়ায় কিংবা বরং তার কাছেপিঠে আমি একটি মঠ স্থাপন করতে চাই। শুনেছি জনৈক মিঃ র‍্যামজে আলমোড়ার কাছে এক বাংলোয় বাস করতেন, আর সেই বাংলো ঘিরে এক বাগিচা ছিল। তা কি ক্রয় করা যায়? দাম কত? যদি কেনা না যায় তবে সেটি কি ভাড়া নেওয়া যেতে পারে?

আলমোড়ার কাছে আপনার কি উপযুক্ত একটি স্থানের কথা জানা আছে যেখানে বাগান-ঘেরা একটি মঠ আমি গড়ে তুলতে পারি? একটি অন্তত পাহাড় চূড়া আমার নিজের জন্য রাখতে চাই।

আশা করি শীঘ্র জবাব পাব। আপনাকে এবং আলমোড়ায় আমার সকল বন্ধু-বান্ধবদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাই।

বিবেকানন্দ

[৩৪]

লুকার্নে, সুইটজারল্যাণ্ড
২৩ অগস্ট, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনার শেষ চিঠিখানা কাল পেয়েছি। ইতিমধ্যে আপনার প্রেরিত ৫ পাউণ্ডের রসিদ পেয়ে থাকবেন। আপনি কিসের সদস্য হবার কথা বলছেন বুঝলাম না। কোনো সমিতির সদস্য-তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। এ বিষয়ে স্টার্ডির নিজের কী মত আমার তা জানা নেই। আমি এখন সুইটজারল্যাণ্ডে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি; এখান থেকে যাব জার্মানীতে, তারপর ইংল্যাণ্ডে, পরের শীতে যাব ভারতে। সারদানন্দ ও গুডউইন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাল কাজ করছে জেনে খুব খুশী হলাম। আমার নিজের কথা বলতে পারি, কোন কাজের বাবদেই উক্ত ৫০০ পাউণ্ডের ওপর আমার কোনো দাবি নেই। আমি মনে করি আমার খাটুনি যথেষ্ট হয়েছে। এখন আমি অবসর নেব। ভারত থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি, তিনি আগামী মাসে আমার সঙ্গে যোগ দেবেন। আমি তো কাজ সুরু করে দিয়েছি, এখন অন্যান্যরা তা চালিয়ে যাক। দেখতে তো পাচ্ছেন, কাজটা চালু করার জন্য আমাকে কিছু সময়ের জন্য টাকাকড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি স্পর্শ করতে হল। এখন আমি নিশ্চিত, আমার কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে; এখন আর আমার বেদান্ত বিষয়ে বা পৃথিবীর অন্য কোনো দর্শনের বিষয়ে, এমন কি কাজের বিষয়েও কোনো আগ্রহ নেই। আমি বিদায় নেবার জন্য তৈরী হচ্ছি, আর এই জগৎসংসারে, এই নরকে ফিরব না। এমন কি এই কাজের আধ্যাত্মিক উপকারের দিকটার ওপরও আমার অরুচি ধরে আসছে। মা আমাকে তাঁর কাছে অবিলম্বে টেনে নিন! যেন আর কখনো ফিরে আসতে না হয়। এই সব কাজকর্ম, এই সব উপকার সাধন প্রভৃতি শুধুই চিত্তশুদ্ধির সাধন মাত্র। আমার তা যথেষ্ট হয়ে গেছে। জগৎ চিরকাল, অনন্তকাল ধরে জগৎই থাকবে। আমরা যে যেমন তেমনভাবেই তাকে দেখে থাকি। কে কাজ করে? কারই বা কাজ? জগৎসংসার কিছু নেই। এই সবই স্বয়ং ভগবান। ভ্রান্তিবশে আমরা তাকেই বলি জগৎসংসার। এখানে আমি নাই, তুমি নাই, আপনি নাই—আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রভু—একমেব অদ্বিতীয়ম্। সুতরাং এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি আর কোনো সংস্রব রাখতে চাই না। এ আপনার অর্থ। যা আসবে যেমন আসবে আপনি তা ইচ্ছামত খরচ করবেন। আপনাদের কল্যাণ হোক।

প্রভুপদাশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

ডাঃ জেনসের কাজের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে; আমি তাকে সে কথা লিখেছি। গুডউইন এবং সারদানন্দ যদি আমেরিকায় কাজের গতি বাড়াতে

পারে তবে তাদের কাজ সফল হোক। তারা কোনোভাবেই আমার কাছে বা স্টার্ডির কাছে বা অন্য কারও কাছে বাঁধা পড়ে নেই। গ্রীনএকারের প্রোগ্রামে একটি মারাত্মক ভুল আছে; তাতে ছাপানো হয়েছে যে, সারদানন্দ ওখানে আছে স্টার্ডির সদয় অনুমতিক্রমে (ইংল্যাণ্ড থেকে ছুটি পাবার অনুমতি)। স্টার্ডি হোক আর যেই হোক, একজন সন্ন্যাসীকে অনুমতি দেবার সে কে? স্টার্ডি নিজে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। এ জন্য সে দুঃখও প্রকাশ করেছে। ব্যাপারটা নিছক মূঢ়তা। তাছাড়া আর কিছু নয়। এতে স্টার্ডিরই অপমান; খবরটা ভারতে পৌঁছুলে আমার কাজের পক্ষে তা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠত। সৌভাগ্যক্রমে আমি সব বিজ্ঞপ্তি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নর্দমায় নিক্ষেপ করেছি; ভাবছি, এটা কি সেই বহু বিদিত "ইয়াঙ্কি" চাল নাকি যাঁর কথা বলে ইংরেজরা খুব আমোদ পায়। এমন কি আমিও পৃথিবীতে কোনো একজন সন্ন্যাসীরই প্রভু নই। যে কাজটা তাদের ভালো লাগে তারা তাই করেন, যদি আমি তাদের সাহায্য করতে পারি, ভালো—এইটুকুই তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমি পারিবারিক বন্ধনরূপ লোহার শেকল ভেঙেছি—এখন ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণশৃঙ্খল পরতে পারব না। আমি মুক্ত, সর্বদাই মুক্ত থাকব। আমার ইচ্ছা, সকলেই মুক্ত হোক—বাতাসের মতো মুক্ত। যদি নিউ ইয়র্ক বা বোস্টন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনো স্থান বেদান্তচর্চা করতে চায় তবে তাদের উচিত বৈদান্তিকদের সাদরে গ্রহণ করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তাদের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। আমার কথা বলতে পারি, আমি তো প্রায় অবসর গ্রহণ করেই নিয়েছি। জগৎমঞ্চে আমার অভিনয় শেষ করেছি।

বি

[৫৫]

(মিস হ্যারিয়েট হালেকে লেখা)

এয়ারলি লজ, রিজওয়ে গার্ডেন্স
উইম্বল্ডেন, ইংল্যাণ্ড
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় বোন,

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে এইমাত্র তোমার স্বাগত সংবাদটি পেলাম। "আইবুড়ীদের আশ্রমে" সুখ ভোগের বিষয়ে তুমি যে শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তনের কথা ভেবেছ তা জেনে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। তুমি এখন ঠিকই বুঝেছ—মানুষের শতকরা নব্বই জনের পক্ষে বিবাহই জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য। আর যে মুহূর্তে এই চিরন্তন সত্যটি মানুষ শিখে নেবে ও তা মেনে চলতে প্রস্তুত হবে, যখন মানতে শিখবে যে পরস্পরের দোষ ত্রুটি সহ্য করে জীবনের ক্ষেত্রে আপোস করে চলাই রীতি—তখনই তারা পরিপূর্ণ সুখের জীবন যাপন করতে পারবে।

প্রিয় হ্যারিয়েট, বিশ্বাস কর—'সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন' একটি স্ববিরোধী কথা। অতএব সবকিছু যে সর্বোচ্চ আদর্শের সমস্তরের হবে না সেটা আমাদের ধরেই নিতে হবে। এইটি জেনে সর্বক্ষেত্রে সব কিছুকেই যথাসম্ভব ভালোভাবে গ্রহণ করতে হবে। আমি তোমাকে যতটুকু জানি তাতে আমার ধারণা, তোমার মধ্যে এমন প্রভূত সুসংযত শক্তি আছে যা ক্ষমা ও সহনশীলতায় পূর্ণ; অতএব আমি নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি যে তোমার বিবাহিত জীবন খুবই সুখের হবে।

তোমাকে এবং তোমার বাগ্‌দত্ত বরকে অজস্র আশীর্বাদ জানিয়ে এই কামনা করি—ভগবান যেন তাকে একথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে রাখেন যে, তোমার ন্যায় সুচরিতা, বুদ্ধিমতী, প্রেমময়ী ও সুন্দরী স্ত্রী লাভ করে সে অতি সৌভাগ্যশালী হয়েছে। আমি এত শীঘ্র আটলান্টিক পাড়ি দিতে পারব বলে মনে হয় না। যদিও তোমার বিবাহ দেখবার সাধ আমার দারুণ।

এমতাবস্থায় আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায় হল আমাদের একখানা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা—"এই জীবনে সমস্ত কার্যলাভে তোমার স্বামীকে সাহায্য করে তুমি তার ঐকান্তিক প্রেমের অধিকারিণী হও; তারপর পৌত্র-পৌত্রীদের দেখা হয়ে গেলে, জীবনের নাটক যখন সমাপ্ত হয়ে আসবে তখন যেন তোমরা অনন্ত সেই সচ্চিদানন্দ-সাগর লাভে পরস্পরকে সাহায্য করতে পার—যে সাগরের জলস্পর্শে সকল বিভেদ দূর হয়ে যায় এবং আমরা সকলে একাত্ম হই।"

"তুমি সারা জীবন ভর উমার মতো শুদ্ধ পবিত্র নিষ্কলুষ হও—আর তোমার স্বামী যেন উমাগত প্রাণ শিবেরই মতো হয়।"

তোমার স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[৩৬]

c/o মিস মুলার,
এয়ারলি লজ, রিজওয়ে গার্ডেন্স
উইম্বলেডন, ইংল্যাণ্ড
৭ অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় জো জো,

আবার সেই লণ্ডন, আর ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে। সহজাত প্রবৃত্তি বশে আমি চারদিকে সেই পরিচিত মুখখানা খুঁজে ফিরছিলাম, যে মুখে কখনো নিরুৎসাহের রেখাপাত মাত্র হত না, যা কখনো পরিবর্তিত হত না, যা সর্বদা প্রফুল্ল থেকে আমাকে শক্তি ও সাহস দিয়ে সাহায্য করত। আজ লণ্ডনে এসে কয়েক সহস্র মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও সেই মুখখানিই আমার মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল। অতীন্দ্রিয় ভূমিতে দূরত্ব আবার কী? যা হোক, তুমি তো চলে গেছ তোমার শান্তি ও বিশ্রামের নীড়ে। আমার ভাগ্যে সদাবর্ধমান কর্মের তাণ্ডব। তবু তোমার শুভেচ্ছা আমার সঙ্গে সঙ্গেই

ফিরছে। তাই নয় কি? আমার স্বাভাবিক প্রবণতা হল কোনো নির্জন পর্বতগুহায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা, কিন্তু পিছন থেকে অদৃষ্ট আমাকে সদাই সম্মুখপানে ঠেলছে, আর আমিও এগিয়ে চলেছি। অদৃষ্টের গতি কে রোধ করতে পারে?

"যারা সদা আনন্দময় ও সর্বদা আশাবাদী তারাই ধন্য, কেননা তাদের স্বর্গরাজ্য লাভ হয়ে গেছে"—যীশুখ্রীষ্ট তাঁর Serm on the Mount-এ এমন একটি উক্তি কেন করলেন না? আমার বিশ্বাস তিনি ওরকম উক্তি করেছিলেন, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। তিনিই বিশাল বিশ্বের সমস্ত দুঃখ বেদনা আপন অন্তরে বহন করেছেন; তিনিই বলেছেন, সাধুর মন শিশুর অন্তঃকরণের ন্যায়। আমার তাই মনে হয়, তাঁর হাজারো উক্তির মধ্যে একটিকেই মাত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ মনে রাখা হয়েছে।

আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রায় সবাই এসেছিলেন—গলসওয়ার্দি পরিবারেরও একজন, অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যা এসেছিলেন। খুবই অল্প সময়ের নোটিস, তাই মিসেস গলসওয়ার্দি আসতে পারেন নি। আমাদের এখন একটি হল্ হয়েছে, বেশ বড় সড় হল্, তাতে প্রায় ২০০ কিংবা তারও বেশি লোক ধরে। একটি বড় কর্নারও আছে, সেখানে লাইব্রেরি করা হবে। এখন আমাকে সাহায্য করার জন্য ভারত থেকে আগত আর একজন লোকও সঙ্গে রয়েছে।

সুইটজারল্যাণ্ড আমার চমৎকার লেগেছে, জার্মানীও। অধ্যাপক ডুয়েসেন খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন—আমরা একই সঙ্গে লণ্ডনে এসেছি, এখানে প্রচুর আমোদ করা গেছে। অধ্যাপক ম্যাক্স মূলারও খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। মোট কথা, ইংল্যাণ্ডের কাজ বেশ পাকা হচ্ছে—বিদ্বান পণ্ডিতগণের সহানুভূতি দেখে মনে হয় কাজটা বেশ শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করছে। আমি সম্ভবত এই শীতকালে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে নিয়ে ভারতে যাব। আমার নিজের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

এবার বল, holy family-র খবর কী? আমার স্থির বিশ্বাস, সব কিছুই খুব চমৎকার চলছে। এতদিনে তুমি নিশ্চয় ফক্সের কথা শুনেছ। তার জাহাজে চাপবার আগের দিন আমি বলেছিলাম যে, যতদিন না পর্যন্ত সে প্রচুর টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করছে ততদিন সে ম্যাবেলকে বিয়ে করতে পারবে না! এই কথা বলে বোধ হয় তাঁকে খুবই মনমরা করে দিয়েছি। ম্যাবেল কি এখন তোমার কাছেই আছে? তাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। তোমার বর্তমান ঠিকানাটিও আমাকে দিয়ো।

মা কেমন আছেন? আমার স্থির বিশ্বাস ফ্র্যাঙ্কিন সেন্স বরাবরের মতোই সেই একই খাঁটি সোনার মতো আছে। আলবার্টাও নিশ্চয় যথারীতি তার সঙ্গীত নিয়ে আর ভাষা-শিক্ষা নিয়ে মেতে আছে, খুব হাসছে নিশ্চয় এবং রোজ একরাশ করে আপেল খাচ্ছে? হ্যাঁ ভালো কথা, আমি ইদানীং ফল বাদাম প্রভৃতি খেয়েই বেঁচে আছি। আমার শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে তা বেশ খাপ খাচ্ছে মনে হয়। যদি কখনো সেই কোন দেশে "জমি" আছে যার সে বৃদ্ধ ডাক্তার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তবে তাকে তুমি এই গোপন খবরটি দিতে পার। আমার মেদ অনেকখানি কমে গেছে। যেসব দিন বক্তৃতা থাকে সেসব দিনে পেটভরে খেতে হয়। হলিস কেমন

আছে? তার চেয়ে মিষ্ট স্বভাবের ছেলে আমি কখনো দেখিনি—সমগ্র জীবন যেন তার কল্যাণময় হয়।

শুনছি তোমার বন্ধু কোলা নাকি জরথুষ্ট্রের দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করছে—তার ভাগ্য নিশ্চয় খুব অনুকূল হচ্ছে না। তোমাদের মিস অ্যানড্রিজ এবং আমাদের যোগানন্দর কী খবর? z z z গোষ্ঠীর এবং মিসেস (নাম ভুলে গেছি)-এর খবর কী? শুনছি নাকি অর্ধেক জাহাজ বোঝাই হয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, মহমেডান এবং আরো সব ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে! আর আরো একদল মহাত্মা-সন্ধানী ও ধর্মপ্রচারক নাকি ভারতে ঢুকেছে। ভালো কথা। ভারত ও মার্কিম যুক্তরাষ্ট্র এই দুটি দেশই দেখছি ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত স্থান। কিন্তু জো সাবধান; বিধর্মীদের (heather) কলুষ অতি মারাত্মক। আজ রাস্তায় দেখা হল মাদাম স্টার্লিং-এর সঙ্গে। তিনি আর আমার বক্তৃতা শুনতে আসেন না; তার পক্ষে ভালোই। অতিরিক্ত দর্শন কখনো ভালো হতে পারে না। সেই মহিলার কথা তোমার মনে আছে? প্রতি সভাতেই তিনি আসতেন এত দেরী করে যে একটি কথাও শুনতে পেতেন না; তারপর মিটিং শেষ হতে না হতে আমাকে পাকড়াও করতেন, আমাকে অতঃপর কেবলই বক বক করতে হত— শেষে ক্ষুধার তাড়নায় আমার পেটের মধ্যে যেন এক ওয়াটারলুর যুদ্ধ লেগে যেত। তিনি এসেছিলেন। এরা সবাই, এবং আরো অনেকেই আসছেন। এ একটি বেশ আনন্দের বিষয়।

এখন অনেক বেশী রাত হয়ে যাচ্ছে। অতএব গুড নাইট জো। (নিউ ইয়র্কেও কি কেতাদুরস্ত আদব কায়দা মেনে চলতে হয়?) ভগবান চিরকাল তোমার মঙ্গল করুন।

"মানুষের সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা এক নিখুঁত আকৃতি গড়তে চাইলেন যার অতুল সৌষ্ঠব সৃষ্টির সর্বোত্তম নিদর্শনকেও অতিক্রম করে যাবে; এই মনে বর স্রষ্টা আপন প্রবল ইচ্ছার শক্তিতে সমস্ত সুন্দর উপাদান জড় করে আপন অন্তরে তা তিল তিল করে সাজালেন; তারপর চিত্রের ন্যায় সব উপাদান জুড়ে জুড়ে গড়ে তুললেন একটি আদর্শ নিখুঁত আকৃতি। এই আকৃতি জীবন পেলে যেমন হয় তারও রূপ সেই রকম।"

এ তোমারই বর্ণনা জো জো; আমি এর সঙ্গে শুধু যোগ করতে চাই—সৃষ্টিকর্তা ঐ একই রূপ ও আকৃতির সঙ্গে আরো দিলেন মহত্ত্ব, পবিত্রতা এবং অন্য সব গুণ, এবং তখন তাতে তৈরী হল জো।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

আমি এই চিঠি লিখছি মিসেস এবং মিঃ সেভিয়ারের ফ্ল্যাটে বসে, তাঁরা তোমাকে শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাচ্ছেন।

বি

[৩৭]

এয়ারলি লজ, রিজওয়ে গার্ডেন্স
উইম্বলেডন, ইংল্যাণ্ড
৮ অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় মিস. এস. ই. ওয়ালডো,

… সুইটজারল্যাণ্ডে আমি বেশ ভালো বিশ্রাম লাভ করেছি; অধ্যাপক পল ডুয়েসেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশ প্রগাঢ় হয়েছে। ইউরোপের কাজকর্মই অন্য সব কিছুর চাইতে আমার কাছে সন্তোষজনক হয়ে উঠছে, ভারতে এর প্রভাবও পড়ছে প্রচুর। লণ্ডনে আবার ক্লাস সুরু হল, আজ তার উদ্বোধনী বক্তৃতা। এখন আমার জন্যই একটি হল্ পেয়েছি, তাতে দুই শতাধিক লোক ধরে।…

তুমি ইংরেজদের স্থৈর্যের কথা অবশ্যই জান; সব জাতের মধ্যে তাদেরই পারস্পরিক ঈর্ষা সব থেকে কম, আর সেই কারণেই সারা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য। ক্রীতদাসের হীনতা ছাড়াও আজ্ঞানুবর্তী কী করে হওয়া যায়—আইনানুবর্তী থেকেও কত বেশী স্বাধীন হওয়া যায়, তার রহস্য সমাধান তারাই করতে পেরেছে।

র—নামক যুবকটি সম্বন্ধে আমি খুবই কম জানি। সে বাঙালী, কিছুটা সংস্কৃত পড়াতে পারে। তুমি তো আমার দৃঢ় মতের কথা জান। যে কাম-কাঞ্চনের মোহ জয় করতে পারেনি আমি তাকে বিশ্বাস করি না। তাকে দিয়ে তাত্ত্বিক বিষয়-সমূহের চর্চা করাতে পার, কিন্তু তাকে রাজযোগ কিছুতেই শেখাতে দিয়ো না—নিয়মিত চর্চায় শিক্ষিত না হয়ে তা করতে গেলে বিপদ হবে। সারদানন্দর সম্বন্ধে বলা যায়: আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠতম যোগীর আশীর্বাদ তার প্রতি রয়েছে—তার ক্ষেত্রে কোনো বিপদ নেই। তুমি নিজে কেন শিক্ষা দিতে সুরু করছ না?…এই ছোকরা র—এর চেয়ে দর্শনজ্ঞান তোমার হাজার গুণ বেশী আছে। ক্লাসে নোটিশ পাঠাও এবং নিয়মিত লেকচার ও কথন-ব্যবস্থার প্রচলন কর।

হাজারজন হিন্দু, এমন কি আমার গুরুভাইও আমেরিকায় কৃতকার্য হলে আমি যতখানি খুশী হব তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী হব তোমাদের মধ্যে একজন কাউকেও আরম্ভ করতে দেখলে। "মানুষ সর্বত্রই জয় সাফল্য লাভ করতে চায়, কিন্তু পরাজয় কামনা করে শিষ্য ও সন্তানের কাছে।"…জ্বালাও জ্বালাও! চারিদিকে জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও!

অফুরন্ত ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ
বিবেকানন্দ

[৫৮]

উইম্বলেডন
৮ অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

...জার্মানীতে অধ্যাপক ডুয়েসেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। কিয়েলে আমি তাঁর অতিথি ছিলাম; লণ্ডনে আমরা এক সঙ্গেই এসেছি, এখানে দেখা-সাক্ষাৎও বেশ আনন্দের হয়েছে।... ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যাবলীর নানাবিধ শাখার সম্পর্কেই আমার বেশ সহানুভূতি আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি মনে করি আমাদের কাজের নির্দিষ্ট রূপ ব্যাখ্যা অবশ্য প্রয়োজন। আমাদের বিশেষ শাখার কাজ হল বেদান্ত প্রচার। অন্যান্য কাজে সাহায্য করা এই প্রধান আদর্শের অনুষঙ্গ মাত্র। আশা করি সারদানন্দর মনে এই ধারণাটি আপনি বেশ ভালো করে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্স মূলারের প্রবন্ধটি কি আপনি পড়েছেন? ইংল্যাণ্ডে কাজ-কর্মের গতি বেশ অনুকূল। এখানে কাজকর্ম বেশ জনপ্রিয় হয়েছে, লোকে তার মূল্য স্বীকারও করেছে।

আপনার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৫৯]

(মিস মেরী হালেকে লেখা)

১৪ গ্রে কোট গার্ডেন্স
ওয়েস্ট মিনস্টার, লণ্ডন
ইংল্যাণ্ড
১ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মেরী,

"সোনা, রূপা, এসব কিছুই আমার নেই; তবে যা আমার আছে তা তোমায় মুক্ত হস্তে দান করছি"—সেটি এই জ্ঞান: স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের রৌপত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, স্ত্রীর স্ত্রীত্ব—এক কথায় প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রভু। অনাদিকাল থেকে এই প্রভুকেই আমরা বহির্জগতের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি; এই চেষ্টার ফলেই আমাদের কল্পনা থেকে বেরিয়ে আসছে এই সব "অদ্ভুত" সৃষ্টি, যথা—স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, মন, দেহ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্ররাজি, জগৎ, ভালোবাসা, ঘৃণা, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি, এবং ভূত, প্রেত, কিন্নর, গন্ধর্ব, দেবতা, ঈশ্বর, ইত্যাদিও।

প্রকৃত কথা এই, প্রভু রয়েছেন আমাদের ভিতরেই, এবং আমরাই আসলে তিনি—সেই শাশ্বত দ্রষ্টা, সেই যথার্থ অহম্—যাঁকে কখনোই ইন্দ্রিয়গোচর করা যেতে পারে না

এবং যাঁকে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়গোচর করার এই সব চেষ্টা শুধু সময় ও ধীশক্তির বৃথা অপব্যবহার মাত্র।

জীবাত্মা যখন একথা বুঝতে পারে তখনই সে এই জগৎ পরিকল্পন ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং তখন সে ক্রমান্বয়ে বেশী করে আপন অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ—এতে শারীর-বিবর্তন যেমন একদিকে হ্রাস পেতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি মন উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে উন্নীত হতে থাকে। পৃথিবীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠতম আত্মিক। 'মনুষ্য' কথাটি সংস্কৃত 'মনস্' থেকে উদ্ভূত; সুতরাং তার অর্থ মননশীল প্রাণী, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সীমাবদ্ধ প্রাণী নয়। ধর্মতত্ত্বে এরই আখ্যা দেওয়া হয়েছে নিবৃত্তি। সমাজ-গঠন, বিবাহ প্রথার প্রবর্তন, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি—এই সবই নানা প্রকারের ত্যাগ বৃত্তি। আমাদের সকল প্রকার সামাজিক জীবন বলতে বোঝায় ইচ্ছাশক্তির সংযম, তৃষ্ণা ও বাসনাসমূহের সংযম। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায় সে সব একই বিষয়ের নানা ধারা এবং স্তর। তার মূল কথা বাসনা বা কল্পিত 'আমি'র বিসর্জন; এই যে নিজের অন্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার প্রবণতা, পাত্রকে বিষয়ভূত করার এই যে প্রয়াস—সেসব একেবারে পরিত্যাগ করা। এই আত্মসমর্পণের বা ইচ্ছাশক্তি নিবৃত্তির সর্বাপেক্ষা সহজ এবং অনায়াসসাধ্য পথ প্রেম, ঘৃণা তার বিপরীত।

সাধারণ মানুষকে নানারূপ স্বর্গ, নরক ও আকাশের ঊর্ধ্বলোক নিবাসী শাসনকর্তার কাহিনী বা কুসংস্কার দ্বারা ভুলিয়ে ভালিয়ে এই একটি লক্ষ্য—আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানীরা কুসংস্কারের বশবর্তী না হয়ে বাসনা বর্জনের দ্বারা জ্ঞাতসারেই এই পথ অবলম্বন করে থাকেন।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গ বা খ্রীষ্টান পুরাণোক্ত ভূ-স্বর্গের অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের কল্পলোকেই, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বর্গ আমাদের হৃদয়ে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। কস্তুরী মৃগ মৃগনাভির গন্ধের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বৃথা ব্যস্ত হওয়ার পর শেষে আপন শরীরেই তার অস্তিত্বের সন্ধান পাবে।

বাস্তব জগৎ সর্বদাই ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে; আর মৃত্যুরূপ ছায়াও চিরদিন এই পার্থিব জীবনের অনুসরণ করবে; আর জীবন যত দীর্ঘ হবে তত দীর্ঘায়ত হবে এই ছায়াও। সূর্য যখন ঠিক আমাদের মাথার ওপরে তখনই কেবল আমাদের ছায়া পড়ে না; তেমনি যখন দেখা যায় ঈশ্বর, শুভ ও অন্যান্য সব কিছু রয়েছে আমাতেই, তখন আর অমঙ্গল থাকে না। বস্তুজগতে প্রত্যেক টিপটির সঙ্গে পাটকেলটিও চলে—প্রত্যেক ভালোটির সঙ্গে মন্দটিও আছে ছায়ার মতো। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে সমস্তরের অবনতিও সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। তার কারণ, ভালো ও মন্দ দুটি পৃথক জিনিস নয়, দুটি একই, এদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।

আমাদের জীবন নির্ভর করে অপর উদ্ভিদ, প্রাণী বা জীবাণুর মৃত্যুর উপর। আর প্রতিনিয়ত একটি ভুল করি—ভালো জিনিসকে আমরা মনে করি ক্রমবর্ধমান, কিন্তু মন্দ জিনিসটার পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলে ভাবি। তা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করে বসি

যে প্রত্যহই কিছু কিছু করে মন্দের ক্ষয় হবে এবং তারপর এমন এক সময় আসবে যখন কেবলমাত্র ভালোটিই অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি ভ্রমাত্মক, কারণ তা মিথ্যা সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতে যদি ভালোটিই বেড়ে চলছে, তাহলে মন্দটিও বাড়ছে। আমার জাতের লোক সাধারণের অপেক্ষা আমার নিজের বাসনা বরাবরই বেশী। তাদের চেয়ে আমার আনন্দরাশি অনেক বেশী, আবার দুঃখবেদনাও লক্ষগুণ বেশী তীব্র। যে দেহ গঠনের সাহায্যে তুমি ভালোর সামান্যতম স্পর্শ অনুভব করতে পার তাই আবার তোমাকে মন্দের অতি ক্ষুদ্র অংশটুকু পর্যন্ত অনুভব করাচ্ছে। একই স্নায়ুতন্ত্রী আনন্দ ও বেদনা উভয়রূপ অনুভূতিই বহন করে, একই মনে দুয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। জগতের উন্নতি বলতে যেমন অধিক সুখভোগ বোঝায় তেমনি তা অধিক দুঃখভোগও বোঝায়। এই যে জীবন-মৃত্যু, ভালো-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞানের সংমিশ্রণ তারই নাম মায়া বা প্রকৃতি। অনন্তকাল ধরে তুমি এই জগৎজালের মধ্যে সুখের অন্বেষণ করে বেড়াতে পার; তাতে সুখ অনেক পাবে বটে, কিন্তু বহু দুঃখও পাবে। শুধু ভালোটি পাব, মন্দটি পাব না—এমন আশা বালসুলভ মূঢ়তা মাত্র। দুইটি পথ খোলা আছে: এক, জগৎ যেমন আছে তাকে তেমন ভাবেই গ্রহণ করার আশা ত্যাগ করে মাঝে মধ্যে একটু আধটু সুখের লোভে জগতের সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করে যাওয়া। অন্যটি—সুখকে দুঃখেরই অপর মূর্তি জ্ঞান করে তার অন্বেষণ পরিহার করে শুধু সত্যেরই অনুসন্ধান করা। এ ভাবে যারা সত্যের অনুসন্ধান করতে সাহসী হয় তারাই সেই সত্যকে সদা বিদ্যমান দেখতে পায় এবং সেই সত্যকে আপনার মধ্যে অবস্থিত বলে দেখতে সমর্থ হয়। তখনই আমরা বুঝতে পারি—সেই একই সত্য কিরূপে আমাদের বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই আপেক্ষিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা আরও বুঝি যে, সেই সত্য আনন্দস্বরূপ এবং তা ভালো ও মন্দ এই দুই রূপে জগতে প্রকাশিত; তার সঙ্গে সেই যথার্থ সত্তাকেও জানি। যা জগতে জীবন ও মৃত্যু এই উভয়রূপেই আত্মপ্রকাশ করছে।

এই ভাবেই আমরা অনুভব করতে পারি যে, জগতের বিভিন্ন ঘটনা-পরম্পরা একটি অদ্বিতীয় সৎ-চিৎ-আনন্দ সত্তার দুই বা বহু ভাগে বিভক্ত প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তা আমার এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ। একমাত্র এই অবস্থাতেই মন্দ না করেও ভালো কাজ করা সম্ভব হয়; কারণ এইরূপ আত্মা জানতে পেরেছেন, ভালো ও মন্দ এই দুইটি কোন উপাদানে গঠিত, অতএব ভালো ও মন্দ তখন তাঁর আয়ত্তাধীন। এই মুক্ত আত্মা তখন ভালো মন্দ যা খুশী তাই বিকাশ করতে পারেন। তবে আমরা জানি, তিনি কেবল ভালো কার্যই সম্পাদন করেন। এরই নাম "জীবন্মুক্তি"—অর্থাৎ শরীর বিদ্যমান অথচ তা মুক্ত। এটাই বেদান্ত দর্শনের এবং অন্য সমস্ত দর্শনের লক্ষ্য।

মানবসমাজ পর্যায়ক্রমে চার বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়: পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই যেমন আছে গরিমা তেমনি ত্রুটিও আছে। পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে একটি প্রচণ্ড সঙ্কীর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়; তাদের এবং তাদের বংশধরদের অধিকার রক্ষার জন্য চারিদিকে

নানা বিধি-নিষেধের বেড়া দেওয়া হয়; তারা ব্যতীত বিদ্যাশিক্ষার বা বিদ্যাদানের অধিকার কারও থাকে না। এ যুগের মাহাত্ম্য এই, এ যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এখন অপরকে শাসন করতে হয় বুদ্ধিবলে, তাই এখন পুরোহিতগণও মনের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হন।

ক্ষত্রিয় শাসন খুবই নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী শাসন, কিন্তু ক্ষত্রিয়রা অমন অনুদার সঙ্কীর্ণমনা নন। তাছাড়া, ক্ষত্রিয় যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

তারপর বৈশ্য শাসন যুগ। তার ভেতরে ভেতরে রক্তশোষণকারী নিষ্পেষণের ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—এ বড় ভয়াবহ! এই যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে, পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। বৈশ্যযুগ ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষাও বেশী উদার, কিন্তু এই সময় থেকেই আরম্ভ হয় সংস্কৃতির অবনতি।

সর্বশেষে শূদ্র শাসন যুগের আবির্ভাব ঘটবে; এই যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ যুগে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার ঘটবে; অসুবিধা: হয়ত সংস্কৃতি সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায় যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় যুগের সভ্যতা সংস্কৃতি, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ —এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ তাদের দোষত্রুটি থাকবে না, তাহলে সেই হবে একটি আদর্শ রাষ্ট্র। কিন্তু সে কি সম্ভব হবে?

প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে; তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সোনা অথবা রূপো, কোনটির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে কী কী অসুবিধা ঘটবে তা আমি বিশেষ জানি না কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরো গরীব এবং ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান ঠিকই বলেছেন, "আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হতে রাজী নই।" রূপোর ভিত্তিতে সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবন সংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে। আমি একজন সমাজতন্ত্রী, এই মতবাদ নির্ভুল বলেই যে আমি সমাজবাদী তা নয়, আমি সমাজবাদী এই কারণে যে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।'

অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। আর কিছুর জন্য না হলেও অন্তত জিনিসটির অভিনবত্বের জন্যও শূদ্রযুগকে একবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখ দুঃখটা যাতে সকলের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভক্ত হতে পারে—তা-ই ভালো। জগতে ভালো ও মন্দের সমষ্টি সমানই থাকবে, তবে নতুন নতুন প্রণালীতে এই দেয়ালটি এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে স্থানান্তরিত হতে পারবে, এই পর্যন্ত।

এই দুঃখময় জগতে প্রত্যেক হতভাগ্যকেই একবার সুখ ভোগ করে নিতে দাও; তাহলেই তারা সকলে কালক্রমে এই তথাকথিত সুখভোগের পর এই অসার জগৎ প্রপঞ্চ, সরকার ও শাসনব্যবস্থা এবং তার নানা জটিলতা পরিহার করে প্রভু স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

তোমরা সকলে আমার ভালোবাসা জানবে।

তোমার চিরবিশ্বস্ত ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[৪০]

গ্রেকোট গার্ডেন্স
ওয়েস্ট মিনস্টার, লণ্ডন. এস. ডব্লু
১৩ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

...খুব শীঘ্র, সম্ভবত ১৬ ডিসেম্বর আমি ভারতে রওয়ানা হচ্ছি। আমেরিকায় আবার আসবার আগে আর একবার ভারত ঘুরে আসার অভিপ্রায় আমার প্রবল। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের জনকয়েক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে যাবার সঙ্কল্প করেছি; সেই কারণে আমার হাজার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভারতে যাবার পথে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব নয়।

ডাঃ জেনস বাস্তবিকই খুব চমৎকার কাজ করছেন। আমার প্রতি এবং আমার কাজের প্রতি তিনি যে বিপুল সাহায্য এবং সহৃদয়তা দান করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।...এখানে কাজের সুন্দর অগ্রগতি হচ্ছে।

আপনি জেনে খুশী হবেন, রাজ-যোগ প্রথম সংস্করণ সবটাই বিক্রী হয়ে গেছে; আরো কয়েকশত কপির অর্ডার আছে।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৪১]

(লালাবদ্রী শাহ্‌কে লেখা)

৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট
লণ্ডন, এস. ডব্লু.
২১ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় লালাজী,

৭ জানুয়ারি নাগাদ আমি মাদ্রাজ পৌঁছুব; কয়েকদিন সমতলে কাটিয়ে আলমোড়ায় আসব মনে করছি।

আমার সঙ্গে তিনজন ইংরেজ বন্ধু রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুইজন—মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আলমোড়াতেই বসবাস করবেন। জানেন তো, তাঁরা আমার শিষ্য; এখন তাঁরা হিমালয়ে আমার জন্য একটি মঠ তৈরী করে দেবেন। এই জন্যই একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে দেবার কথা আপনাকে বলেছিলাম। একটি পুরো পাহাড় আমাদের চাই, তাতে তুষার মৌলীর শোভা দেখা যাবে, এই গোটা জিনিসটাই হবে আমাদের। স্থান নির্বাচন করতে এবং মঠ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে অবশ্যই সময় লাগবে। ইতিমধ্যে আমার বন্ধুদের জন্য আপনি কি একখানা ছোট বাংলো দেখে দিতে পারেন? বাংলোতে তিনজন লোকের স্থান সঙ্কুলান হওয়া চাই। তবে খুব বড় বাংলোর দরকার নেই। আপাতত ছোট একটি হলেই চলবে। আমার বন্ধুরা আলমোড়ার এই বাংলোতে বাস করবেন, তারপর মঠের স্থান এবং মঠ নির্মাণের ব্যবস্থাদি দেখাশুনা করে নিতে পারবেন।

আমার এই পত্রের জবাব দেবার দরকার নেই, কারণ আপনার উত্তর এখানে পৌঁছুবার পূর্বেই আমি ভারতের পথে যাত্রা করব। মাদ্রাজে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে টেলিগ্রাম করে জানাব।

আপনাদের সকলকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাই।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৪২]

(মিস মেরী ও হ্যারিয়েট হালেকে লেখা)

৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট
লণ্ডন, এস. ডব্লু.
২৮ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় বোনেরা,

...ভারত যাত্রার প্রাক্কালে তোমাদের কাছে কয়েক ছত্র লেখার খুব প্রেরণা এল। ইংল্যাণ্ডে কাজ দারুণ সাফল্য লাভ করেছে। আমেরিকানদের ন্যায় অত চাকচিক্য ইংরেজদের নেই; কিন্তু একবার তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলে চিরকাল তা তোমারই হয়ে থাকবে। আমি ধীরে ধীরে সাফল্য অর্জন করেছি; আশ্চর্য এই যে, মাত্র ছয় মাস সময়ের মধ্যে ১২০ জনের স্থায়ী ক্লাস সংগঠন করা সম্ভব হয়েছে, তাছাড়াও পাবলিক লেকচার তো আছেই। এখানে প্রত্যেকে—প্র্যাকটিক্যাল ইংরেজ—কাজই বোঝে। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইন আমার সঙ্গে ভারতে চলেছেন ওখানে কাজ করার জন্য এবং সেই কাজে তাদেরই আপন অর্থব্যয়ের জন্য! ওই একই রকম কাজ করতে প্রস্তুত এমন লোক এখানে আরো অনেক আছে; পদমর্যাদাসম্পন্ন নারী ও পুরুষ—একবার সন্দেহাতীত বিশ্বাস জন্মালে

আইডিয়ার জন্য তারা সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত। সর্বোপরি ভারতে আমার "কাজ" আরম্ভ করার জন্য অর্থসাহায্যও পাওয়া গেছে, এবং আরো পাওয়া যাবে। ইংরেজদের সম্পর্কে আমার ধারণার সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, অন্য সকল জাতের চেয়ে ইংরেজদের প্রতিই কেন প্রভুর বেশী আশীর্বাদ। এরা অবিচলিত, মজ্জায় মজ্জায় একনিষ্ঠ, অনুভূতির গভীরতা এদের অসাধারণ; বাইরে খানিকটা ঔদাসীন্যের কাঠিন্য আছে, সেইটি একবার ভাঙলে আসল মানুষটির সন্ধান পাওয়া যায়।

এবার আমি কলকাতায় একটি এবং হিমালয়ে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে চলেছি। হিমালয়ের কেন্দ্রটি হবে ৭০০০ ফুট উঁচুতে একটি গোটা পাহাড় জুড়ে— গ্রীষ্মকালে অনুষ্ণ, শীতকালে ঠাণ্ডা। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ওখানে বাস করবেন, এই কেন্দ্রটি হবে ইউরোপীয় কর্মীদের জন্য; আগুনের মতো গরম সমতলে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়ে তাদের আমি মেরে ফেলতে চাইনে। আমার প্ল্যান হল বেশ কিছু হিন্দু ছেলেকে প্রতিটি সভ্য দেশে পাঠানো ধর্মপ্রচারের জন্য—আর বিদেশ থেকে নারী ও পুরুষ কর্মী সংগ্রহ করা ভারতে কাজ করার জন্য। এই রকম করে ভালো বিনিময়ের ব্যবস্থা হতে পারে। তারপর কেন্দ্রগুলি স্থাপনের পর আমি সেই Book of Job-এর ভদ্রলোকের মতো এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বেড়াব।

ডাক ধরতে হবে, অতএব এইখানে শেষ করছি। আমার ক্ষেত্রে সবই উন্মুক্ত হয়ে উঠছে। আমি আনন্দিত, জানি—তোমরাও। তোমাদের অফুরন্ত সুখ ও মঙ্গল কামনা করি।

অনন্ত ভালোবাসা সহ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

ধর্মপালের খবর কী? সে কী করছে? তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো।

বি

[৪৩]

১৪ গ্রেকোট গার্ডেন্স
ওয়েস্ট মিনস্টার, লণ্ডন
এস, ডব্লু.
৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলবার্টা,

জো জো-র কাছে ম্যাবেলের লেখা একখানা চিঠি তোমাকে পাঠালাম এই সঙ্গে। এর ভেতরকার সংবাদটি আমি খুব উপভোগ করেছি, আমার বিশ্বাস তুমিও করবে।

এখান থেকে ১৬ তারিখে আমি ভারত যাত্রা করব, স্টীমার ধরব নেপলসে। অতএব ইটালীতে থাকব কয়েকদিন, দিন তিন চারেক রোমে থাকব। তোমার সঙ্গে দেখা করে বিদায় গ্রহণ করতে পারলে খুব সুখী হব।

ইংল্যাণ্ড থেকে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার আমার সঙ্গে ভারতে যাবেন, ইটালীতে অবশ্যই তাঁরা আমার সঙ্গে থাকবেন। গত গ্রীষ্মে তুমি তাঁদের দেখেছ।

বছর খানেকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এবং সেখান থেকে ইউরোপে ফিরে আসবার ইচ্ছা রাখি।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ
বিবেকানন্দ

[৪৪]

৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট
লণ্ডন
৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনার দানের বদান্যতার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। একেবারে সুরুতেই এক হাঁড়ি টাকা নিয়ে নিজেকে আমি ভারগ্রস্ত করতে চাই না; কাজ যেমন যেমন অগ্রসর হবে তেমন তেমন অর্থ ব্যয় করতে পেলেই আমি খুশী হব। ক্ষুদ্র আকারে কাজ সুরু করাই আমার মত। এখনো আমি কিছুই জানি না। ভারতে কর্মস্থলে উপনীত হয়ে জানতে পারব কতদূর কী করা যায়। আমার কী কী প্ল্যান আছে এবং তা বাস্তব করে তুলবার জন্য কী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে ভারত থেকে আপনাকে চিঠি দেব। আমি রওয়ানা দেব ১৬ তারিখে, ইটালীতে কয়েকদিন কাটিয়ে নেপলস থেকে জাহাজ ধরব।

মিসেস ভহানকে, সারদানন্দকে এবং ওখানকার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের আমার ভালোবাসা জানাবেন। আপনার সম্বন্ধে বলতে পারি—আপনাকে আমি সর্বদাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে বিবেচনা করেছি, সারা জীবন তাই করব।

ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনা সহ
আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৪৫]

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ফ্র্যাঙ্কিন সেন্স,

তাহলে গোপাল নারী আকার ধারণ করলেন !* স্থান ও কাল বিবেচনায় এইটিই ঠিক হয়েছে। সারা জীবনে কল্যাণ তার চিরস্থায়ী হোক। তোমরা তার পথ চেয়ে ছিলে, তার জন্য তোমাদের আকুলতার সীমা ছিল না, এখন সে সারা জীবনের জন্য তোমার ও তোমার স্ত্রীর কাছে একটি আশীর্বাদের ন্যায়। এ ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র সংশয় নেই।

আমার খুব সাধ হচ্ছে, যদি আমেরিকায় আসতে পারতাম ! তাহলে অন্তত "প্রাচ্যের মুনি-ঋষিগণ পাশ্চাত্যের শিশুর জন্য উপহার নিয়ে আসার" রূপকটি বাস্তব হত। হৃদয় ওখানেই রয়েছে আশীর্বাদ এবং কল্যাণ কামনা নিয়ে; আর তুমি তো জান, দেহের চেয়ে মনের শক্তি বেশী।

এই মাসের ১৬ তারিখে আমি রওয়ানা হচ্ছি, জাহাজ ধরব নেপলসে। রোমে আলবার্টার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে। হোলি ফ্যামিলির প্রতি অজস্র ভালোবাসা জানাই।

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪৬]

হোটেল মিনার্ভা
ফ্লোরেন্স
২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলবার্টা,

আগামী কাল আমরা রোমে পৌঁছুব। যখন রোমে পৌঁছুব তখন অনেক রাত হয়ে যাবে, তাই আমি সম্ভবত তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব আগামী পরশু। আমরা থাকব হোটেল কন্টিনেন্টালে।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদসহ
বিবেকানন্দ

*এখানে একটি মেয়ের কথা বলছেন, স্বামীজী আশা করেছিলেন ছেলে হবে। গোপাল—বালক কৃষ্ণ।

[৮৭]

রামনাদ
৩০ জানুয়ারি, ১৮৯৭

প্রিয় মেরী,

আমার ক্ষেত্রে সব দেখি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। সিংহলের কলম্বোতে নেমেছি, সেখান থেকে রামনাদ পর্যন্ত আমার যাত্রাপথ সম্পূর্ণটাই যেন এক বিশাল মিছিল—অসংখ্য লোকের মেলা, আলোকসজ্জা, মানপত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। রামনাদ হল ভারতীয় মহাদেশের প্রায় সর্বদক্ষিণ অংশ; এখন আমি সেখানেই আছি রামনাদের রাজার অতিথি হয়ে। যেখানে আমি অবতরণ করেছি সেখানে চল্লিশ ফুট উঁচু একটি মনুমেণ্ট তৈরী করা হচ্ছে। রামনাদের রাজা "His most Holiness"কে যে মানপত্র দিয়েছেন তা অতি সুন্দর সোনার তৈরী একটি বিরাট কাসকেটে রক্ষিত ছিল। মাদ্রাজ ও কলকাতা যেন প্রত্যাশায় কাঁপছে, মনে হচ্ছে আমাকে সম্মান জানানোর জন্য যেন সারা দেশ উঠে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই দেখছ মেরী, আমি প্রায় আমার অদৃষ্টের উচ্চতম শিখরে উঠেছি। কিন্তু তবু মন যেতে চাইছে নিরিবিলি শান্তির পানে, বিশ্রাম, শান্তি ও স্নেহের মধ্যে চিকাগোয় যে দিনগুলো কাটিয়েছি সেই দিকে। তাই তো তোমাকে এখন এই চিঠি লিখছি। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ, শান্তিতে আছ। লণ্ডন থেকে আমার লোকজনদের কাছে লিখেছিলাম, তারা যেন ডাঃ বারোজকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। তারা তাঁকে দারুণ সংবর্ধনা জানিয়েছে, কিন্তু তিনি বিশেষ কোনো রেখাপাত করতে পারেননি—সে আমার দোষ নয়। কলকাতার লোক খুবই শক্ত চীজ! এখন শুনছি, বারোজ আমার সম্বন্ধে নানা কথা ভাবছেন! এই তো দুনিয়া।

মা, বাবা ও তোমাদের সবাইকে জানাই আমার অজস্র ভালোবাসা।

তোমার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৪৮]

আলমবাজার মঠ
কলকাতা
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,

ভারতে দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য সারদানন্দ ২০ পাউণ্ড পাঠাচ্ছে। কিন্তু তার নিজ গৃহে যখন দুর্ভিক্ষ প্রথমে তার ত্রাণ করা প্রয়োজন বলেই আমার মনে হয়েছে। অতএব টাকাটা সেইভাবেই কাজে লাগানো হল।

লোকে যেমন বলে, আমার এখন মরবারও সময় নেই; সারা দেশ জুড়ে চলছে

মিছিল আর সমাবেশ, বাদ্যভাণ্ড এবং আরো নানা রকম সংবর্ধনার ব্যবস্থা ; আমি প্রায় মর মর। জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়া মাত্র আমি ছুটে যাব পাহাড়ে। কেমব্রিজ কনফারেন্স থেকে এবং ব্রুকালিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকেও মানপত্র পেয়েছি। ডাঃ জেন্সের পত্রে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত অ্যাসোসিয়েশন থেকে যে মানপত্রের কথা হয়েছিল তা এখনো এসে পৌঁছোয়নি।

ডাঃ জেন্স একটি চিঠি দিয়েছেন ; আপনাদের কনফারেন্সের ধারায় ভারতে কাজ চালানোর জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। এদিকে আমি ক্লান্ত, অতিশয় ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম না পেলে আর ছয় মাসও আমি বাঁচব কিনা জানি না।

এবারে আমার দুইটি কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—একটি মাদ্রাজে, অন্যটি কলকাতায়। মাদ্রাজের লোকদের গভীরতাও বেশী, একনিষ্ঠতাও বেশী ; আমার ধারণা প্রয়োজনীয় অর্থ ওরা মাদ্রাজ থেকেই তুলতে পারবে। কলকাতার লোকেরা (অভিজাত) মূলত হুজুগে, দেশপ্রেমের প্রেরণায় তাদের যত উৎসাহ, তাদের সহানুভূতি কখনো বাস্তব রূপ নেবে না। পক্ষান্তরে দেশে এমন লোক বহু আছে যা নির্মম এবং ঈর্ষাপরায়ণ, যারা আমার কাজ লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য কোনো চেষ্টাই বাদ রাখবে না।

কিন্তু আপনি জানেন, বিরোধিতা যত প্রবল হবে, আমার ভেতরকার দানব তত বেশী জাগ্রত হবে। দুইটি কেন্দ্র—একটি সন্ন্যাসীদের জন্য; অন্যটি মেয়েদের জন্য—স্থাপন না করে মরে গেলে আমার কর্তব্য সম্পূর্ণ হবে না।

ইংল্যাণ্ড থেকে আমি ৫০০ পাউণ্ড নিয়ে এসেছি, প্রায় ৫০০ পাউণ্ড পাওয়া যাবে মিঃ স্টার্ডির কাছ থেকে, এর সঙ্গে আপনার টাকাটাও যুক্ত হলে দুটি কেন্দ্র স্থাপন করতে পারব তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং আমি মনে করি যত শীঘ্র সম্ভব আপনার টাকাটা পাঠানো উচিত। সব থেকে নিরাপদ উপায় হল আমেরিকার কোনো ব্যাঙ্কে একসঙ্গে আপনার এবং আমার নামে টাকাটা জমা দেওয়া, যাতে আমাদের মধ্যে যে কোনো একজন তা তুলতে পারি। টাকাটা কাজে লাগাবার আগেই আমি যদি মরে যাই তাহলেও আপনি সবটা তুলতে পারবেন এবং আমার অভিপ্রেত কাজে তা লাগাতে পারবেন। তার ফলে, আমার মৃত্যু ঘটলেও আমার নিজের লোক-জনেরা ঐ টাকা নিয়ে যা খুশী করতে পারবে না। ইংল্যাণ্ডের টাকাটাও একইভাবে মিঃ স্টার্ডির ও আমার যুক্ত নামে ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে।

সারদানন্দকে আমার ভালোবাসা এবং আপনার প্রতি আমার অনন্ত ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনার
বিবেকানন্দ

[৪৯]

দার্জিলিঙ
২৮ এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রিয় মেরী,

কয়েকদিন আগে তোমার সুন্দর পত্রখানা পেয়েছি। গতকাল এসেছে হ্যারিয়েটের বিবাহের কার্ড। ঈশ্বর সুখী দম্পতির কল্যাণ করুন।

আমাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য এই আমার সমগ্র দেশ যেন একপ্রাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক স্থানে শত সহস্র লোক জয়ধ্বনি করছে, রাজারা আমার গাড়ি টানছে, রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় তোরণ, তাতে জ্বলজ্বল করছে নানা নীতিবাক্য, এই রকম সব ব্যাপার !!! এই সকল ঘটনা সংকলিত হয়ে শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে, তুমি তার একখানা কপি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইংল্যাণ্ডে কঠোর পরিশ্রমের চাপে তার আগেই আমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন দক্ষিণ ভারতের গরমে এই প্রচণ্ড পরিশ্রম আমাকে সম্পূর্ণ কাবু করে ফেলেছে। অতএব ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে আমাকে চলে আসতে হল দার্জিলিঙ শৈলাবাসে। এখন আমি অনেকটা ভালো বোধ করছি। আলমোড়ায় আরো এক মাস থাকলে পূর্ণ আরোগ্য লাভ হবে। ভালো কথা, ইউরোপে আসবার একটি সুযোগ এবার হারালাম। রাজা অজিত সিং এবং আরো কয়েকজন রাজা আগামী শনিবার ইংল্যাণ্ড যাত্রা করছেন। তাঁরা খুবই চেষ্টা করেছিলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনই আমার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের কোনো প্রস্তাব ডাক্তাররা আমলই দিতে চান না। সুতরাং খুব বিরক্ত হয়েই আমি প্রস্তাবটি বাতিল করতে বাধ্য হলাম, ওটি তোলা রইল ভবিষ্যতের জন্য।

আশা করি, ইতিমধ্যে ডাঃ বারোজ আমেরিকায় পৌঁছেছেন। বেচারী! তিনি এখানে এসেছিলেন অতিরিক্ত গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য, তার অনিবার্য পরিণতি হল—কেউ তার কথা শুনল না। অবশ্য এখানে সবাই তাকে সুন্দর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে; তা সম্ভব হয়েছিল আমার চিঠির দৌলতে। কিন্তু আমি তো তার মাথায় মগজ ঢুকিয়ে দিতে পারি না! অধিকন্তু তাকে একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ বলেও মনে হয়। শুনলাম, আমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে জাতীয় আনন্দ উৎসব দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আসলে তোমাদের উচিত ছিল আর একটু বুদ্ধিমান কাউকে পাঠানো; ডাঃ বারোজের উদাহরণ পেয়ে হিন্দুমনে ধর্মমহাসভা সম্পর্কে একটা হাস্যকর ধারণাই সৃষ্টি হয়েছে। অধিবিদ্যা বিষয়ে জগতের কোনো জাতই হিন্দুদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না; অথচ মজার কথা হল, খ্রীষ্টানদের দেশ থেকে যারাই এখানে আসে তাদেরই মান্ধাতার আমলের একটা মূঢ় ধারণা থাকে দেখা যায়, তারা মনে করে—যেহেতু খ্রীষ্টানেরা ধনবান ও শক্তিমান এবং হিন্দুরা তা নয় সেই কারণেই খ্রীষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর উত্তরে হিন্দুরা বলে, এবং ঠিকই বলে, সেইজন্যই তো হিন্দুধর্ম ধর্ম, এবং খ্রীষ্টানধর্ম আদৌ কোনো ধর্ম নয়; কারণ

এই পাশব জগতে পাপেরই কেবল জয়জয়কার, পুণ্যের সর্বদা নির্বাসন। দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা যতই অগ্রসর হোক না কেন, অধিবিদ্যা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা নিতান্ত শিশুমাত্র। বস্তুগত বিজ্ঞানবোধ ঐহিক সমৃদ্ধি বিধান করতে পারে মাত্র, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান আনে অনন্ত জীবন। যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তথাপি আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আনন্দ অধিকতর তীব্র এবং তা মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর বস্তুবাদের নির্বুদ্ধিতা থেকে দেখা দেয় প্রতিযোগিতা, অনাবশ্যক উচ্চাভিলাষ, এবং পরিণামে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত মৃত্যু।

দার্জিলিঙ একটি মনোরম স্থান, মাঝে মাঝে যখন মেঘদের মর্জি হয় তখন এখান থেকে দেখা যায় ২৮১৪৬ ফুট উঁচু কাঞ্চনজঙ্ঘার গরিমা; আর কাছের একটি পাহাড় চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০২ ফুট উঁচু গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন লাভ করা যায়। আর এখানকার অধিবাসীরা—তিব্বতী, নেপালী এবং সর্বোপরি সুন্দরী লেপচা রমণীরা—সবাই ছবির মতো সুন্দর। চিকাগোর এক কলস্টন টার্নবুলকে কি তুমি জানো? আমার ভারতে পৌঁছানোর কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি এখানে এসেছিলেন। আমাকে নাকি তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছিল, ফলে হিন্দুরা সকলেই তাঁকে খুব পছন্দ করে ফেলেছিল। জো-র খবর কী? মিসেস অ্যাডামস, সিস্টার যোসেফাইন, আর আর সব বন্ধুবান্ধবদের কী খবর? আমাদের প্রিয় মিলরা কোথায়? ধীরে কিন্তু নিশ্চিন্ত গতিতে পিষে চলেছে? আমি ভেবেছিলাম হ্যারিয়েটকে তার বিবাহে কিছু প্রীতি-উপহার পাঠাব, কিন্তু তোমাদের শুল্কের চাপ যা ভয়ানক তাতে উপস্থিত সেটা স্থগিত রাখতে হচ্ছে। সম্ভবত তাদের সঙ্গে ইউরোপে শীঘ্রই আমার দেখা হবে। তোমার বিয়ের প্রস্তাব পাকা হয়েছে শুনলে আমি অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দিত হতাম, এবং আধ ডজন কাগজ ভর্তি করে একখানা চিঠি লিখে আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতাম।...

আমার চুল গোছায় গোছায় পাকতে সুরু করেছে, সারা মুখমণ্ডলে চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে; মেদ হ্রাসের ফলে আমার বয়স যেন আরো কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। এখন আমি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রোগা হয়ে যাচ্ছি। কারণ এখন আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে শুধুমাত্র মাংস খেয়ে,—রুটি নয়, ভাত নয়, আলু নয়, এমনকি আমার কফিতে একটু চিনিও নয়!! একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে বাস করছি, পরিবারের সকলেই নিকারবোকার পরে, স্ত্রীলোকেরা অবশ্য নয়! আমিও নিকারবোকার পরে আছি। তুমি খুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে যদি আমাকে দেখতে পার্বত্য হরিণের মতো পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে কিংবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ী রাস্তায় চড়াই উৎরাই পার হতে।

সমতলে আমার জীবন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল, এখানে আমি বেশ ভালো আছি। সমতলে থাকতে রাস্তায় আমার পা টি বাড়াবার উপায় ছিল না—অমনি লোকের ভীড় লেগে যেত!! নামযশটা শুধুই সুখ ও আনন্দের ব্যাপার নয়!! আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি, তা পেকেও যাচ্ছে। এতে বেশ গণ্যমান্য চেহারা এনে দেয়,

এবং আমেরিকান কুৎসাকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়! ওগো শ্বেতশ্মশ্রু, কত কিছুই না তুমি ঢেকে রাখতে পার, তোমার জয় হোক, ধন্য পরমেশ্বর!

ডাকের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এবার তাই শেষ করছি। তোমার দেহ ও মন যেন ভালো থাকে, তোমার যেন অশেষ কল্যাণ হয়।

বাবা, মা এবং তোমরা সকলে আমার ভালোবাসা জানবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫০]

আলমোড়া
১ জুন, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

অবগমং কুশলং তত্রত্যানাং বার্ত্তাঞ্চ সবিশেষাং তব পত্রিকায়াম্। মমাপি বিশেষোঽস্তি শরীরস্য; সবিশেষঃ জ্ঞাতব্যঃ ভিষগ্‌প্রবরস্য শশিভূষণস্য সকাশাৎ। ব্রহ্মানন্দেন সংস্কৃতয়া এব রীত্যা চলত্বধুনাং শিক্ষা; যদি পশ্চাৎ পরিবর্ত্তনমর্হে তদপি কারয়েৎ। সর্ব্বেষাং সম্মতিং গৃহীত্বা তু করণীয়মিতি ন বিস্মৃতব্যম্।

অহমধুনা আলমোড়ানগরস্য কিঞ্চিদুত্তরং কস্যচিদ্ বণিজ উপবনোপদেশে নিবসামি। সম্মুখে হিমশিখরাণি হিমালয়স্য প্রতিফলিত দিবাকরকরৈঃ পিণ্ডীকৃত-রজতানীব ভাতি প্রীণয়ন্তি চ। অব্যাহতবায়ুসেবনেন মিতেন ভোজনেন সমধিকব্যায়াম-সেবয়া চ সুদৃঢ়ং সুদৃশ্যং চ সঞ্জাতং মে শরীরম্। যোগানন্দঃ খলু সমধিকমস্বস্থ ইতি শৃণোমি। আমন্ত্রয়ামি তমাগন্তুমত্রৈব। বিভেত্য সৌ পুনঃ পার্ব্বত্যাৎ জলাৎ বায়োশ্চ। "উষিত্বা কতিপয়ানি দিবসানি অত্রোপবনে যদি ন ভবেৎ বিশেষঃ ব্যাধেঃ গচ্ছ ত্বং কলিকাতায়াম্" ইত্যহমস্য তমলিখম্। যথাভিরুচি করিষ্যতি। অচ্যুতানন্দঃ প্রতিদিনং সায়াহ্নে আলমোড়া-নগর্য্যাং গীতাদিশাস্ত্রপাঠং জনানাহূয় করোতি। বহুনাং নগর-বাসিনাং স্কন্দাবারস্থানাং সৈন্যানাঞ্চ সমাগমোঽস্তি তত্র প্রত্যহম্। সর্ব্বানসৌ প্রীণাতি চেতি শৃণামি।

"যাবানর্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকস্য যো বঙ্গার্থঃ ত্বয়া লিখিতঃ নাসৌ মন্মতে সমীচীনঃ।

"সতি জলপ্লাবিতে উদপানে নাস্তি অর্থঃ প্রয়োজনম্" ইতি অস্যার্থঃ—বিষমোঽয়ং উপন্যাসঃ, কিং সংপ্লুতোদকে সতি জীবানাং তৃষ্ণা বিলুপ্তা ভবতি? যদ্যেবং ভবেৎ প্রাকৃতিকো নিয়মঃ জলপ্লাবিতায়াং ভূমৌ জলপানং নিরর্থকং—কাচিদপি বায়ুমার্গেণ অথবা অন্যেন কেনাপি গূঢ়েনোপায়েন জীবানাং তৃষ্ণানিবারণং স্যাৎ, তদাঽসৌ অপূর্ব্বঃ অর্থঃ সার্থকঃ ভবিতুমর্হেৎ নান্যথা।

শংকর এবাবলম্বনীয়ঃ।
ইয়মাপি ভবিতুমর্হতি—

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকায়ামপি ভূতলে যাবানুদপানে অর্থঃ তৃষ্ণাতুরাণাং (অল্পমাত্র জলমলং ভবেদিত্যর্থঃ)—"আস্তাং তাবজ্জলরাশিঃ, মম প্রয়োজনম্ স্বল্পোঽপি জলে

সিদ্ধতি"—এবং বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু অর্থঃ প্রয়োজনম্। যথা সংপ্লুদোদকে পানপাত্রপ্রয়োজনম্ তথা সর্ব্বেষু বেদেষু জ্ঞানমাত্রপ্রয়োজনম্।

ইয়মপি ব্যাখ্যা অধিকতরং সন্নিধিমাপন্না গ্রন্থকারাভিপ্রায়স্য—

উপপ্লাবিতায়ামপি ভূতলে, পানায় উপাদেয়ং পানায় হিতং জলমেব অন্বিষন্তি লোকা নান্যৎ। নানাবিধানি জলানি সন্তি ভিন্নগুণধর্ম্মাণি, উপপ্লাবিতয়া অপি ভূমেস্তারতম্যাৎ। এবং বিজানন্ ব্রাহ্মণোঽপি বিবিধজ্ঞানোপপ্লাবিতে বেদাখ্যে শব্দসমুদ্রে সংসারতৃষ্ণানিবারণার্থ তদেব গৃহ্নীয়াৎ যদলং ভবতি নিঃশ্রেয়সায়। ব্রহ্মজ্ঞানং হি তৎ। ইতি—

শং সাশীর্ব্বাদং বিবেকানন্দস্য

[অনুবাদ]

প্রিয় শুদ্ধানন্দ,

ওখানে সব বেশ ভালো চলছে—তোমার পত্রে এই কথা জেনে এবং সব খবর বিস্তারিত পড়ে খুশী হলাম। আমারও স্বাস্থ্য এখন অপেক্ষাকৃত ভালো; বাকীটা ডাঃ শশীভূষণের কাছে জেনে নিয়ো। ব্রহ্মানন্দর সংশোধিত পদ্ধতিতেই শিক্ষণকার্য উপস্থিত মত চলুক, যদি ভবিষ্যতে পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তবে তা করে নেবে। কিন্তু কখনো বিস্মৃত হয়ো না যে কাজটা করতে হবে সকলের সম্মতি নিয়ে।

আমি এখন বাস করছি এক বণিকের বাগানবাড়িতে; জায়গাটা আলমোড়ার কিছুটা উত্তরে অবস্থিত। আমার সম্মুখে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ সকল, তাতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত, দেখাচ্ছে যেন স্তূপীকৃত রজত, দেখে হৃদয়মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মুক্ত বায়ু সেবন করে, পথ্যের নিয়ম রক্ষা করে এবং প্রচুর ব্যায়াম করে আমি এখন দেহে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেছি। কিন্তু শুনলাম, যোগানন্দ খুব অসুস্থ। আমি তাকে এখানে আসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কিন্তু সে আবার পাহাড়ী জল-হাওয়াকে ভয় পায়। তাকে আজ লিখলাম, "কয়েকদিন এই বাগানে এসে থাকো, যদি দেখ কোনো উপকার হচ্ছে না, তাহলে কলকাতায় ফিরে যেতে পারবে।" এখন তার যা অভিরুচি তাই করবে।

আলমোড়ায় অচ্যুতানন্দ প্রতি সন্ধ্যায় লোক জড় করে এবং তাদের গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করে শোনায়। শহরের বহু অধিবাসী এবং ছাউনির সৈন্যরাও ওখানে রোজ আসে। জানলাম, সবাই তার প্রশংসা করছে।

'যাবানর্থ' ইত্যাদি শ্লোকের তুমি যে বাংলা ব্যাখ্যা দিয়েছ তা আমার মতে সমীচীন হয়নি। সেই ব্যাখ্যাটি এই রকম, "দেশ যখন জলে প্লাবিত হয় তখন পানীয় জলের আর কী প্রয়োজন?" প্রাকৃতিক নিয়ম যদি এরকম হয় যে, কোনো স্থান প্লাবিত হলে জলপান নিরর্থক হয়ে যায়, তখন বায়ুপথে বা অন্য কোনো গুপ্ত উপায়ে স্বতঃই তৃষ্ণা দূরীভূত হয়ে যায়—তাহলেই ঐ অদ্ভুত ব্যাখ্যার মানে হতে পারে, অন্যথা নয়। বস্তুত শঙ্করের ব্যাখ্যাই অনুসরণ করা উচিত। অথবা এইভাবে তার ব্যাখ্যা

করতে পারে : সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত হলে তৃষ্ণাতুরের নিকট অতি ক্ষুদ্র জলাশয়ও কাজের হয় (অর্থাৎ সামান্য একটু জলও তার প্রয়োজন মেটায়, যেন তৃষ্ণার্ত বলে, "থাকুক বিরাট জলরাশি, সামান্য একটু পানীয় জল হলেই আমার কাজ চলবে"।) ; জ্ঞানী ব্রাহ্মণের কাছে তেমনই প্রয়োজন সমগ্র বেদগ্রন্থ। যখন সারা দেশ জলপ্লাবিত হয় তখন তৃষ্ণাতুরের প্রয়োজন তৃষ্ণা নিবারণের জলটুকু মাত্র, তার বেশী নয় ; তেমনি সমগ্র বেদগ্রন্থে প্রয়োজন জ্ঞানের আলোকটুকু।

এখানে আর একটি ব্যাখ্যাও দেওয়া যাচ্ছে, গ্রন্থকার যা বলতে চান এতে তা আরো ভালোভাবে প্রকাশ পায় : সমস্ত স্থান জলপ্লাবিত হলে মানুষ কেবল পানের জন্য আহরণীয় পানের যোগ্য জলেরই অন্বেষণ করে, অন্য জলের নয়। নানা রকমের জল আছে—সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত হওয়া সত্ত্বেও—মাটির স্তরের প্রকারভেদ অনুযায়ী জলেরও প্রকার এবং প্রকৃতির পার্থক্য ঘটে থাকে। কৌশলী ব্রাহ্মণও তেমনি জ্ঞানের শতধারা প্লাবিত, বেদ নামে খ্যাত বিরাট শব্দ সমুদ্র থেকে সেই অংশটুকুই আহরণ করবেন যাতে সংসারের দারুণ তৃষ্ণা দূর হয় এবং যা মুক্তি দান করার শক্তি ধারণ করে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই তা করতে সক্ষম।

আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা সহ
তোমাদের বিবেকানন্দ

[৫১]

আলমোড়া
৩ জুন, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোবল,

...আমার কথা বলতে হলে, আমি বেশ পরিতৃপ্ত। আমি দেশের বহু লোককে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি, তাই আমি চেয়েছিলাম। এখন যা কিছু সব আপন পথে চলুক, কর্ম তার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা লাভ করুক। এই জগতে আমার আর কোনো বন্ধন নেই। আমি জীবন দেখেছি, তার সবটাই আত্মভূত—স্বার্থের জন্য জীবন, স্বার্থের জন্য প্রেম, স্বার্থের জন্য সম্মান, সব কিছুই স্বার্থের জন্য। অতীতের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করি, দেখতে পাই আমি এমন কোনো কাজ করিনি যা স্বার্থের জন্য—এমন কি আমার কোনো অপকর্মও স্বার্থ প্রণোদিত নয়। তাই আমি পরিতৃপ্ত ; যা কিছু করেছি সবই মহৎ এবং উৎকৃষ্ট—এরকম অবশ্য আমার বোধ হয় না ; কিন্তু জগৎটা এত ক্ষুদ্র, সংসার এত জঘন্য, জীবনটা এত নীচ—এই ভেবে আমার হাসি পায়, অবাক লাগে যে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়েও মানুষ কী করে এই স্বার্থের পেছনে, এই হীন ও জঘন্য পুরস্কারের পেছনে ছুটতে পারে।

এই হল সত্য। আমরা আটকে পড়েছি ফাঁদে, যত তাড়াতাড়ি তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। আমি সত্য দর্শন করেছি—এখন দেহটা জোয়ার ভাঁটায় যত ভেসে বেড়াক, তাতে কী আসে যায় ?

আমি এখন যেখানে বাস করছি সে একটি মনোরম পর্বতোদ্যান। উত্তরে প্রায় সমস্ত দিকচক্রবাল জুড়ে স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গসমূহ আর নিবিড় বনরাজি। এখানে তেমন শীত নেই, গরমও বেশী নয়। সকাল ও সন্ধ্যা আশ্চর্য প্রীতিপ্রদ। সারা গ্রীষ্মকালটা এখানেই থাকার ইচ্ছে আছে, বর্ষা সুরু হলে সমতলে নেমে যাব এবং কাজে লাগব।

আমি জন্মলাভ করেছিলাম বিদ্যাচর্চার জীবন যাপনের জন্য—লোকালয় ও কর্ম কোলাহল হতে দূরে নিভৃতে বইপত্র নিয়ে পড়ে থাকারই প্রবণতা আমার। কিন্তু জগন্মাতার ইচ্ছা অন্যরূপ—কিন্তু প্রবণতাটি ঠিকই আছে।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৫২]

মঠ*
১৯ অগস্ট, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,

·· আমার স্বাস্থ্য তেমন ভালো যাচ্ছে না, যদিও খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছি, তথাপি আগামী শীতের পূর্বে আমার স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পাব বলে মনে হয় না। জো-র একখানা পত্রে জানলাম, আপনারা উভয়ে ভারতে আসছেন। আপনাদের ভারতে পেলে আমি যে যারপরনাই আনন্দিত হব সে কথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু গোড়াতেই জেনে রাখা ভালো, এ দেশটি সারা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর জায়গা; বড় বড় শহর ছাড়া অন্য কোথাও ইউরোপীয়দের উপযোগী সুখ সুবিধার কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

ইংল্যাণ্ড থেকে খবর পেলাম, মিঃ স্টার্ডি অভেদানন্দকে পাঠাচ্ছেন নিউ ইয়র্কে। মনে হচ্ছে, আমাকে ছাড়া ইংল্যাণ্ডের কাজ চালানো অসম্ভব। এখন কেবল একখানা ম্যাগাজিন বার করে মিঃ স্টার্ডি তা চালাবেন। এই মরশুমেই আমি ইংল্যাণ্ডে আসবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু বাধা পেলাম ডাক্তারদের বোকামিতে। ভারতের কাজ ঠিক চলছে।

ঠিক এখনই কোনো আমেরিকান বা ইউরোপীয়ান এখানে এসে বিশেষ কিছু করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না, এখানকার জলবায়ু সহ্য করা যে কোনো পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষেই খুব কষ্টকর হবে। অসাধারণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অ্যানি বেস্যাণ্ট কেবল থিয়সফিস্টদের মধ্যেই তার কাজ করতে পারছেন; এদেশে ম্লেচ্ছদের যেমন নানারকম সামাজিক অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অসম্মান ভোগ করতে হয় তার থেকে তাই তাঁরও রেহাই নেই। এমনকি গুডউইন পর্যন্ত মাঝে মাঝে ক্ষেপেওঠে, তখন

* মনে হয় চিঠিখানা আম্বালা থেকে লেখা

তাকে সামাল দিতে হয়। গুডউইন বেশ ভালো কাজ করছে ; অবশ্য সে পুরুষ মানুষ, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে তার বাধা নেই। কিন্তু এদেশে পুরুষের সমাজে মেয়েদের কোনো স্থান নেই, ভারতে মেয়েরা কেবল মেয়েদের মধ্যেই কাজ করতে পারে। যে সকল ইংরেজ বন্ধু এখানে এসেছেন এ পর্যন্ত তাঁরা কোনো কাজে লাগেননি, ভবিষ্যতেও তাঁদের দ্বারা কিছু হবে কিনা জানি না। এসব কথা জেনেও কেউ যদি চেষ্টা করে দেখতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন।

সারদানন্দ যদি আসতে চায় তো চলে আসুক ; আমার স্বাস্থ্য যেহেতু ভেঙে গেছে, তাই এই মুহূর্তে সে এলে কাজ কর্ম গুছিয়ে নেবার ব্যাপারে সে আমার অনেক কাজে লাগবে। মিস মার্গারেট নোবল নাম্নী এক ইংরেজ তরুণী এখানকার অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্য ভারতে আসতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তিনি চান এই অভিজ্ঞতা নিয়ে গিয়ে স্বদেশে ভারতের জন্য কাজ করবেন। আমি তাকে লিখেছি, আপনারা লণ্ডন হয়ে এলে তিনি যেন আপনাদের সঙ্গে আসেন। মস্ত অসুবিধার কথা এই, দূর থেকে আপনারা কখনো এখানকার অবস্থা সম্যক বুঝতে পারবেন না। দুইটি দিকের ধরন এমনই স্বতন্ত্র যে আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড থেকে তার কোনো ধারণা করাই সম্ভব নয়।

মনে মনে একটি ধারণা নিয়ে নেবেন যেন আপনারা আফ্রিকার কোনো অভ্যন্তর প্রদেশে যাত্রা করছেন ; তারপর যদি উৎকৃষ্টতর কিছু পেয়ে যান, তবে সেটা বেশ একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হবে।

সতত আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৫৩]

(মাস্টার মহাশয়কে লেখা)

C/o লালা হংসরাজ
রাওয়ালপিণ্ডি
অক্টোবর, ১৮৯৭

প্রিয় ম—,

বেশ হচ্ছে বন্ধু—এখন তুমি ঠিক কাজে হাত দিয়েছ। ঠিক ভাই, আত্মপ্রকাশ কর! সারা জীবন নিদ্রায় অতিবাহিত করলে চলবে না ; সময় বয়ে যাচ্ছে। সাবাস! ঐ তো পথ।

তোমার পুস্তক প্রকাশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শুধু ঐ আকারে বই প্রকাশের খরচ পোষাবে কিনা তাই ভাবছি।...তা লাভ হোক বা না হোক, ঘাবড়ে যেয়ো না।

দিনের আলো তো দেখুক। এজন্য তোমার ওপর অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হবে, ততোধিক আসবে অভিশাপ—অবশ্য জগৎ সংসারের ধারা এই রকমই বরাবর!

এইটেই সময়।

ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫৪]

(মারগারেট ই. নোবল বা সিসটার নিবেদিতাকে লেখা)

আলমোড়া
২০ মে, ১৮৯৮

প্রিয় মার্গট,

…কর্তব্যের কোনো শেষ নেই। আর পৃথিবীটা অত্যন্ত স্বার্থপর।

মনের স্ফূর্তি বজায় রেখো।"সৎ কর্মের কর্মী কখনো ব্যর্থ হয় না"।…

তোমাদের চির বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

[৫৫]

(নৈনিতালের মহম্মদ সরফরাজ হুসেনকে লেখা)

আলমোড়া
১০ জুন, ১৮৯৮

প্রিয় বন্ধু,

আমি আপনার পত্র পেয়ে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছি। এ কথা জেনে যারপরনাই আনন্দিত হলাম যে, আমাদের অজ্ঞাতসারে ভগবান আমাদের মাতৃভূমির জন্য অপূর্ব সব আয়োজন করছেন।

আমরা তাকে বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা হল, ধর্মের ও চিন্তার সর্বশেষ কথা অদ্বৈতবাদ; কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদের অবস্থান থেকেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে। আমার বিশ্বাস, তাই ভাবি সুশিক্ষিত মানব সাধারণের ধর্ম। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক আগে হিন্দুরা এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছে বলে দাবি করতে পারে, কারণ তারা হিব্রু কিংবা আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকে যা আপন আত্মা বলে জ্ঞান করে

এবং তার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করে সেই ব্যবহারিক বেদান্ত হিন্দুদের মধ্যে কখনো সার্বজনীন পুষ্টিলাভ করেনি।

পক্ষান্তরে, আমার অভিজ্ঞতা হল—যদি কোনো ধর্মমত কখনো মোটের ওপর এই রকম বৈশিষ্ট্য ও সাম্য অর্জন করে থাকে তবে তা ইসলাম ধর্ম।

অতএব আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, বেদান্তের মতবাদ যতই কেন না সুন্দর এবং আশ্চর্যজনক হোক, ব্যবহারিক ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট তা মূল্যহীন হয়েই থাকবে। আমরা মানবজাতিকে এমন একটি অবস্থায় নিয়ে যেতে চাই যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই; অথচ এই কাজটি করা সম্ভব বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই। মানবজাতিকে এই সত্যটি শেখাতে হবে যে সকল ধর্মমত আসলে একটি মাত্র ধর্মের, সেই একত্বরূপের বিবিধ প্রকাশ মাত্র, অতএব প্রত্যেকেই তাঁর উপযোগী মতটিকেই বেছে নিতে পারেন।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের, বেদান্ত মস্তিষ্ক এবং ইসলাম দেহের সংযোগই একমাত্র আশা।

আমি মানসচক্ষে দেখছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ নিয়ে এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদ করে মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছেন।

ভগবান আপনাকে মানবজাতির, বিশেষ করে আমাদের অতি দরিদ্র জন্মভূমির সাহায্যের জন্য এক মহান হাতিয়ার রূপে গড়ে তুলুন, এই আমার সতত প্রার্থনা।

ভবদীয় স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৫৬]

কাশ্মীর
২৫ অগস্ট, ১৮৯৮

প্রিয় মার্গট,

গত দু মাস যাবৎ আমি অলস জীবন যাপন করছি। ভগবানের সংসারে সৌন্দর্যরাশির আড়ম্বরের যা পরাকাষ্ঠা হতে পারে তারই মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির এই আপন উদ্যানে—যেখানে পৃথিবী, বাতাস, ভূমি, ঘাস, গুল্মরাজি, তরুশ্রেণী, পর্বতমালা, তুষাররাশি, এবং দৃশ্যমান নরদেহে কেবল ভগবানেরই সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত—তারই ভেতরে মনোহর ঝিলামের বুকে নৌকোয় করে মন্দ গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছি। এই নৌকোই আমার ঘরবাড়ি। আমার এখন প্রায় কিছুই নেই—এমন কি দোয়াত-কলমও না থাকার মত। যখন যেমন চলছে আহার করে নিচ্ছি—ঠিক যেন এক রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল্ -এর ছাঁচে ঢালা জীবন! ··

কাজের চাপে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ো না। ওতে কোনো লাভ নেই ; সর্বদা মনে রাখবে—"কর্তব্য হচ্ছে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায়, তার জলন্ত রশ্মি মানুষের জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করে"। সাধনার শৃঙ্খলার পক্ষে তার সাময়িক প্রয়োজন আছে ; তার অতিরিক্ত হলে সে এক রুগ্ন স্বপ্ন মাত্র। আমরা হাত লাগাই বা না লাগাই, জগতের কাজ আপন গতিতে চলতেই থাকবে। আমরা শুধু ভ্রান্তিবশেই নিজেদের ভেঙেচুরে ফেলি। এক জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা আছে যা চরম নিঃস্বার্থতার মুখোস পরে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সর্বপ্রকার অন্যায়ের কাছে নতমস্তক হয়ে তা পরিণামে অপরের অনিষ্টই করে থাকে। নিজেদের নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে অপরকে স্বার্থপর করে তোলার কোনো অধিকার আমাদের নেই ; আছে কি ?…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫৭]

মঠ, বেলুড়
১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয়—,

…মা-ই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে, সে সকল তাঁরই বিধানে।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫৮]

(মিসেস অলিবুলকে লেখা)

বৈদ্যনাথ, দেওঘর
২৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয় ধীরা মাতা,

আমি যে আপনার সহযাত্রী হতে পারব না তা আপনি আগেই জেনেছেন। আপনার সঙ্গে যাবার মত শারীরিক বল সংগ্রহ করতে পারছি না। বুকে জমা সর্দি লেগেই আছে, তারই ফলে আমি ভ্রমণে অক্ষম। এখানে সেরে উঠব বলে মোটের ওপর আশা রাখি।

জানতে পারলাম, আমার ভগ্নী গত কয়েকবছর যাবৎ বিশেষ সঙ্কল্প নিয়ে নিজের মানসিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে ; বাংলায় প্রাপ্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যা কিছু জানা সম্ভব—বিশেষ করে অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে—সে সবই শিখেছে, আর সেই শিক্ষার

পরিমাণও বড় কম নয়। ইতিমধ্যে সে ইংরিজী ও রোমান হরফে নিজের নাম সই করতে শিখেছে। এক্ষণে তাকে অধিকতর শিক্ষাদান বিশেষ মানসিক পরিশ্রম সাপেক্ষ, সুতরাং সে কাজ থেকে আমি বিরত হয়েছি। আমি শুধু বিনা কাজে সময় কাটাতে চেষ্টা করছি, এবং জোর করেই বিশ্রাম নিচ্ছি।

এ যাবৎ আপনার প্রতি আমার কেবল ভালবাসাই ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরায় মনে হচ্ছে, মহামায়া আপনাকে আমার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত করেছেন; সুতরাং এখন ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রগাঢ় বিশ্বাস! এখন থেকে আমি নিজের জীবন ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে মনে করব, আপনি মায়ের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, সুতরাং সকল দায়িত্বভার নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে আপনার মারফৎ জগন্মাতা যে নির্দেশ দেবেন তাই মেনে চলব।

শীঘ্রই ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পারব এই আশা করে পত্র শেষ করছি।

আপনার চির স্নেহবদ্ধ সন্তান
বিবেকানন্দ

[৫৯]

মঠ
১১ এপ্রিল, ১৮৯৮

প্রিয়—,

…দুই বছরের শারীরিক যন্ত্রণা আমার বিশ বছরের আয়ু হরণ করেছে। তা হোক, কিন্তু আত্মার তো পরিবর্তন হয় না; হয় কি? আপনভোলা সেই আত্মা তো রয়েছে একই ভাবে বিভোর হয়ে, সেই তীব্র আকুলতা এবং একাগ্রতা নিয়ে সে তো একই ভাবে রয়ে গেছে।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬০]

রিজলি
৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস বুল,

…জগন্মাতাই সব ভালো জানেন। আমার সম্বন্ধে এই তো সব কথা।…

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৬১]

রিজলি
১ নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মার্গট,

…মনে হচ্ছে তোমার মনে কী এক বিষাদ ছায়া ফেলেছে। ঘাবড়াবার কারণ নেই, কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। যাই হোক, জীবন তো অনন্ত নয়। তার জন্য আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। জগতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও সাহসী, দুঃখ যন্ত্রণা তাদেরই বিধিলিপি; এর প্রতিকার হয়ত সম্ভবপর, তবু যতদিন না সেই প্রতিকার হচ্ছে ততদিন সেই ভাবী বহুযুগ পর্যন্ত এই জগতে দুঃখ যন্ত্রণার ব্যাপারটা একটি স্বপ্নভঙ্গের শিক্ষারূপেও গ্রহণীয়। আমার স্বাভাবিক সজ্ঞান অবস্থায় নিজের দুঃখ যন্ত্রণাকে আমি সানন্দেই বরণ করি। এ জগতে কাউকে না কাউকে দুঃখভোগ করতেই হবে; প্রকৃতির কাছে বলিপ্রদত্ত যারা হয়েছে আমিও তাদের একজন—এই জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬২]

নিউ ইয়র্ক
১৫ নভেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয় মার্গট,

…মোটের ওপর আমার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। এই রকম নার্ভাস ধরনের শরীর কখনো মহাসঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, আবার কখনো বা অন্ধকারে বিলাপ করে মরে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬৩]

১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনি ঠিকই ধরেছেন; আমি নিষ্ঠুর, খুবই বাস্তবিক। আর আমার মধ্যে কোমলতা প্রভৃতি যা আছে সে আমার ত্রুটি। এই কোমলতা, এই দুর্বলতা যদি আমার মধ্যে আরো কম, অনেক কম থাকত! কিন্তু হায়! আমার যত দুঃখভোগ তা ঐ দুর্বলতা

থেকে। ভালো কথা, মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের ওপর কর চাপিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করে দিতে চায়; সেও আমারই দোষ। কারণ আমিই একটি ট্রাস্ট ডীড করে মাঠটিকে পাবলিকের সম্পত্তি করে দিই নি। মধ্যে মধ্যে ছেলেদের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করে থাকি, সেজন্য আমি খুব দুঃখিত। অবশ্য তারা একথাও জানে যে, সংসারে সবার চেয়ে আমিই তাদের বেশী ভালোবাসি। দৈবের সহায়তা হয়ত আমি পেয়েছি, সত্য; কিন্তু উঃ, তার প্রতিটি বিন্দুর জন্য আমাকে কত পরিমাণেই না রক্ত মোক্ষণ করতে হয়েছে!! তা না পেলে আমি হয়ত অধিকতর আনন্দিত হতাম এবং আমার আরো ভালো হত। বর্তমানে অবস্থা খুবই তমসাচ্ছন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমাকে প্রাণ দিতে হবে, আমি হাল ছাড়ব না কিছুতেই—এই কারণেই ছেলেদের ওপর মেজাজ খারাপ করি। আমি তাদের যুদ্ধ করতে বলছি না, বলছি তারা যেন আমার যুদ্ধে বাধা না দেয়।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু ওঃ, এখন আমি চাই ছেলেদের মধ্যে অন্তত একজন আমার পাশে দাঁড়াক এবং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুক! আপনি কোনকিছু ভেবে হয়রান হবেন না। ভারতে কিছু একটা করতে হলে আমার উপস্থিতি আবশ্যক। এখন আমার স্বাস্থ্যও অনেকটা ভালো আছে। সম্ভবত সমুদ্রের হাওয়ায় আরো খানিকটা উন্নতি হবে। যাহোক, এবার আমেরিকায় বন্ধুবান্ধবদের উত্যক্ত করা ছাড়া আমি আর কিছু করিনি। আশা করি পাথেয় ব্যাপারে জো আমাকে সাহায্য করবে, আর মিঃ লেগেটের কাছেও আমার কিছু টাকা আছে। ভারতেও কিছু অর্থ সংগ্রহের আশা এখনো রাখি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদের সঙ্গে আমি এখনো দেখা করিনি। হাজার পনের টাকা সংগ্রহের আশা রাখি, তাহলে পঞ্চাশ হাজার পূর্ণ হবে; তারপর একটি ট্রাস্ট ডীড করতে পারলে মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সও কমবে। যদি টাকা সংগ্রহ করতে নাও পারি তাহলেও আমেরিকায় নিরর্থক বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করতে করতে মরে যাওয়াও ভালো। আমার জীবনের ভুলগুলি বড় বটে, তবে তার প্রত্যেকটির কারণ অতিরিক্ত ভালোবাসা। এখন ভালোবাসাকে কী ঘৃণাটাই না করি! আর ভক্তি! যদি আমার বিন্দুমাত্র ভক্তি না থাকত! যদি বাস্তবিক নির্বিকার ও হৃদয়হীন অদ্বৈতবাদী হতে পারতাম! অবশ্য আমার এ জীবন শেষ। পরজন্মে তা চেষ্টা করে দেখব। আমার দুঃখ এই যে—বিশেষত বর্তমানে—আমার বন্ধুবান্ধব আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ অপেক্ষা অপকারই বেশী পেয়েছে। যে শান্তি ও নিঃসঙ্গতা খুঁজছি তা আমার কপালে জুটল না।

বহু বছর পূর্বে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আর ফিরব না। এ দিকে আমার ভগ্নী আত্মহত্যা করল, সে সংবাদ পৌঁছুল আমার কাছে, আর এই আমার দুর্বল হৃদয় তখন সেই শান্তির সম্ভাবনা থেকে আমাকে বিচ্যুত করল! এই আমার দুর্বল হৃদয়ই আমাকে ভারতের বাইরে টেনে এনেছে—যাদের ভালোবাসি তাদের সাহায্যের অন্বেষণেই আজ আমি বিদেশবাসী। আমি শান্তির অন্বেষণ করেছি, কিন্তু ভক্তির যেখানে অধিষ্ঠান সেই হৃদয় আমাকে শান্তি পেতে দিল না।

সারা জীবন শুধু সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম। বেশ, এই যখন আমার বিধিলিপি, তবে তাই হোক; তবে যত শীঘ্র এর শেষ হয় ততই মঙ্গল। লোকে বলে আমি নাকি খুব আবেগপ্রবণ, কিন্তু অবস্থাটার কথা একবার ভাবুন দেখি!!! আপনি আমাকে কত না ভালোবাসেন, আমার প্রতি আপনার দয়ার শেষ নেই, আর আমি সেই আপনারই বেদনার কারণ হয়েছি। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে—তার আর অন্যথা নেই। এখন আমি গ্রন্থি ছেদন করতে চাই, হয় তা করব, নয়ত সেই চেষ্টায় মরব।

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

জগন্মাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সানফ্রান্সিস্কো হয়ে ভারতে যাবার পাথেয় আমি জো-র কাছে ভিক্ষে করে নেব। যদি সে তা দেয় তবে অবিলম্বে জাপান হয়ে যাত্রা করব। সময় লাগবে একমাস। মনে হয় ভারতে আমি কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারব; সেখানে তা দিয়ে কাজ চালানো যাবে, হয়ত কিছুটা উন্নতিও করা যাবে—অন্তত যে গোলমেলে অবস্থায় এখন তা আছে সেই অবস্থায়ই তো রেখে যেতে পারব। শেষ সময়টা বড়ই তমসাবৃত, বড়ই আগোছাল হয়ে আসছে; অবশ্য অমনটা হবে বলে আমার ধারণা ছিল। ভাববেন না আমি এক মুহূর্তও হাল ছেড়ে দেব। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান যদি আমাকে তাঁর ছাকড়া গাড়ির ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আপনার চিঠি পেয়ে এখন আমি যতটা প্রফুল্ল আছি এমনটি বহু বছর ছিলাম না—ওয়াহ গুরু কি ফতেহ্? গুরুজীর জয় হোক!! হাঁ, যে অবস্থাই আসুক না কেন, জগৎসংসার আসুক, আসুক নরক, দেবতারা আসুন, আসুন জগন্মাতা—আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, হার মানব না। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাবণ তিনজন্মের পর মুক্তি লাভ করেছিলেন! জগন্মাতার সঙ্গে সংগ্রাম তো গৌরব গরিমার বিষয়।

আপনার এবং আপনার স্বজনবর্গের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক। আমি যতটুকুর যোগ্য, আপনি আমার জন্য তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী করেছেন।

ক্রিশ্চিন ও তুরীয়ানন্দকে আমার ভালোবাসা জানাই।

বিবেকানন্দ

[৬৪]

৪২১, ২১ নং স্ট্রীট, লস এঞ্জেলস
২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মার্গট,

সত্যি সত্যি আমি বৈদ্যুতিক চিকিৎসা প্রণালীতে (magnetic healing) ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছি! মোট কথা আমি বেশ ভালোই আছি। আমার দেহের

কোনো যন্ত্র কখনোই বিগড়ে যায় নি—যা কিছু গোলযোগ সে নার্ভাসনেস এবং ডিসপেপসিয়ার কারণে।

এখন আমি রোজ মাইলের পর মাইল হাঁটি—সে আহারের পূর্বে বা পরে যে কোনো সময়েই হোক। আমি এখন ভালো আছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালো থাকব।

এখন চাকা ঘুরছে, জগন্মাতা তা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কাজ যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন তিনি আমায় ছাড়ছেন না—এই হচ্ছে গূঢ় ব্যাপারটি।

দেখ ইংল্যাণ্ড কেমন এগিয়ে চলছে। এখনকার এই রক্তারক্তির পর সেখানকার লোক শুধু 'যুদ্ধ, 'যুদ্ধ' 'যুদ্ধ' আওয়াজের চেয়ে বড় ও উন্নত ব্যাপার ভাববার সময় পাবে। সেই আমাদের সুযোগ। তখন আমরা তাড়াতাড়ি উদ্যোগ নিয়ে দলে দলে ওদের ধরব, তারপর ভারতের কাজ পুরোদমে চালিয়ে দেব।

আমি প্রার্থনা করি, ইংল্যাণ্ড যেন কেপ কলোনী হারায়, তাহলে সে তার সমস্ত শক্তি ভারতে কেন্দ্রীভূত করতে পারবে। এই সব অন্তরীপ এবং শৈলান্তরীপ ইংল্যাণ্ডের কোনো কাজে আসবে না, ওতে খানিকটা মিথ্যা অহংকার মাত্র স্ফীত হতে পারে, আসলে ওতে ইংল্যাণ্ডের ব্যয় হয় প্রচুর অর্থ ও রক্ত।

চারদিকের অবস্থা আশাপ্রদ হয়ে উঠছে। অতএব প্রস্তুত হও। চার ভগ্নী এবং তোমার প্রতি অজস্র ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি।

বিবেকানন্দ

[৬৫]

লস এঞ্জেলস
ক্যালিফোর্নিয়া
২৪ জানুয়ারি, ১৯০০

প্রিয় মার্গট,

যে বিশ্রাম ও শান্তি আমি কামনা করছি তা কোনোদিনই পাওয়া যাবে না বলেই আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার মারফৎ জগন্মাতা অন্যের—অন্তত আমার দেশের কিছু লোকের—উপকার করছেন; এই কথা মনে করলে আত্মত্যাগ হিসেবেও ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা সহজ হয়। আমরা সকলেই আপন আপন পদ্ধতিতে আত্মত্যাগ করে চলেছি। মহাপূজা চলছেই; এ এক মহৎ আত্মোৎসর্গ—এই উপলব্ধি ছাড়া এই পূজার অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। যারা স্বেচ্ছায় এই আত্মোৎসর্গ করে তারা প্রভূত বেদনা থেকে অব্যাহতি পায়। যারা প্রতিরোধ করতে যায় তাদের ভগ্ন চূর্ণ করে আত্মসমর্পণ করানো হয়, সেই হেতু তাদের দুঃখভোগও হয় অনেক বেশী। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬৬]

C/o মিস মীড
৪৪৭ ডগলাস বিল্ডিং
লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার—তারিখের পত্র আমার কাছে পাসাডেনায় আজ পৌঁছেছে। এখন বুঝলাম, চিকাগোয় তোমার সঙ্গে জো-র দেখা হয়নি। অবশ্য এখনো নিউ ইয়র্ক থেকে তাদের কোনো সংবাদ পাই নি।

ইংল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত এক বাণ্ডিল ইংরেজী সংবাদপত্র পেলাম, খামের ওপরে লেখা এক লাইনের শুভেচ্ছা আমার প্রতি, স্বাক্ষর আছে এফ. এইচ. এম.। অবশ্য কাগজগুলিতে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই। আমি মিস মুলারকে একখানা চিঠি দিতাম, কিন্তু ঠিকানা জানি না; তাছাড়া তাকে পাছে ভয় পাইয়ে দিই এমন একটি সঙ্কোচও আমার আছে।

ইতিমধ্যে মিসেস লেগেট একটি প্ল্যান চালু করেছেন: প্রত্যেকের কাছ থেকে একবছরের চাঁদা ১০০ ডলার করে নেওয়া হবে, দশবছর চলবে এই চাঁদা নেওয়া—আমাকে সাহায্য করার জন্য; নামের তালিকার শীর্ষে মিসেস লেগেট স্বয়ং—১৯০০ সালের জন্য তার চাঁদা ১০০ ডলার; তার পরে এমনি আরো ২ জন এখানকারই অধিবাসী। অতঃপর মিসেস লেগেট আমার সকল বন্ধুবান্ধবদের পত্র লিখে প্রত্যেককে এতে যোগ দিতে বললেন। মিসেস মিলারকে এরকম পত্র দেবার ব্যাপারে আমি খুব লজ্জিত বোধ করেছি—কিন্তু আমার জানার পূর্বেই তিনি পত্র দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পত্রের জবাবে মিসেস হালের কাছ থেকে বেশ ভদ্র কিন্তু শুষ্ক পত্র এসেছে; মেরীর হাতে লেখা এই পত্রে বলা হয়েছে তারা ওরকম ভাবে চাঁদা দিতে অক্ষম, তবে সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি তাঁদের প্রীতির কথাও জানানো হয়েছে। আমার ধারণা মিসেস হালে এবং মেরী অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার আদৌ কোনো দোষ ছিল না!!

মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে জানতে পারলাম, কলকাতায় নিরঞ্জন খুব অসুস্থ। জানি না ইতিমধ্যে তার দেহান্ত হয়েছে কিনা। কিন্তু আমি এখন সবল আছি। মার্গট, মানসিকভাবে এমন শক্তিশালী আগে কখনো বোধ করিনি। আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেছে। এখন আমি সন্ন্যাসী জীবনের অনেকটা কাছ কাছি এগুচ্ছি। সারদানন্দর কাছ থেকে দুই সপ্তাহ যাবৎ কোনো খবর পাই নি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ শুনে খুশী হলাম; ভালো মনে কর তো ওগুলি আবার নতুন করে লেখ; কোনো প্রকাশক পেলে এগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ কর, আর বিক্রয় করে কিছু লাভ হলে তা তোমার কাজের জন্য নাও। ও থেকে আমি কিছুই চাইনে।

এখানে আমার কাছে কয়েকশত ডলার আছে। আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি

স্যানফ্রান্সিস্কোতে, সেখানে আরো খানিকটা সুবিধা করতে পারব আশা করি। মেরীর সঙ্গে এর পরে যখন তোমার দেখা হবে তাকে বোলো মিসেস হ্যালেকে বছরে ১০০ ডলার করে দেবার প্রস্তাব বিষয়ে আমার কিছুই হাত ছিল না। আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

হাঁা, তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে, ভয় কোরো না—সে টাকা আসতে হবে। আর যদি না আসে তাতেই বা কী যায় আসে? একটি পথ অন্য আর একটির মতোই উপযোগী। জগন্মাতাই ভালো জানেন। জানি না, শীঘ্র পূর্বদিকে যাচ্ছি কিনা। যদি সুযোগ পাই তবে অবশ্যই যাব ইণ্ডিয়ানায়।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি খুব ভালো, তাতে অবশ্যই যোগদান করবে; আর তুমি মাধ্যম হয়ে যদি ভারতীয় নারীদের কতগুলি সমিতিকে তার সঙ্গে যোগ দেওয়াতে পার তবে তো আরো ভালো।···

আমাদের পক্ষে অবস্থার উন্নতি দেখা দেবেই, কিচ্ছু ভেবো না। যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র আমরা যাব ইংল্যাণ্ডে, সেখানে বৃহৎ কাজের চেষ্টা করব। তুমি কী মনে কর? আমি কি মাদার সুপিরিয়রকে লিখব? তাহলে তার ঠিকানা আমাকে জানাও। তিনি কি তোমাকে কিছু লিখেছেন? ধৈর্য ধর, স্টার্ডিরা এবং "স্যাকীরা" সকলেই এসে জড়ো হবে।

তুমি তোমার পাঠ শিক্ষা করছ—আমি তো তাই চাই। আমিও শিক্ষা গ্রহণ করছি। যে মুহূর্তে আমরা উপযুক্ত হয়ে উঠব তখনই দেখবে জনবল এবং অর্থবল প্রবাহিত হতে থাকবে। অবশ্য এই মুহূর্তে আমার নার্ভাসনেস আর তোমার আবেগ মিলে সব কিছুই ভণ্ডুল করে দিতে পারে। অতএব জগন্মাতা আমার স্নায়ু ঠাণ্ডা করুন এবং তোমাকে বাস্তব বুদ্ধি দিন—তারপর আমরা সুরু করব যাত্রা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবার একের পর এক বৃহৎ আকারে সুফল ঘটতে থাকবে। প্রাচীন দেশের ভিৎ এবার আমরা কাঁপিয়ে তুলব।

···আমি অত্যন্ত ধীর স্থির হয়ে উঠছি—যা কিছুই ঘটুক, আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। এইবার যে কাজে লাগা যাবে তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ কার্যকর হবে, একটিও বৃথা যাবে না—এইটিই আগামী অধ্যায়।

ভালোবাসা সহ
বিবেকানন্দ

[৬৭]

স্যানফ্র্যান্সিস্কো
৪ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি আর কাজ করতে চাই না। আমি এখন শান্তি ও বিশ্রামের জন্য লালায়িত। স্থান ও কালের জ্ঞান আমার আছে; কিন্তু আমার কর্মফল আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে

—কাজ, শুধু কাজ। আমরা যেন গোরুর পালের মতো চলেছি কসাইখানায়—আর বেত্রতাড়িত গোরু যেমন পথের ধারের ঘাস এক এক খাবলা তুলে খায় আমাদের অবস্থাও তেমনি। আর এই হচ্ছে আমাদের কর্ম—আমাদের ভয়, ভয়—যা থেকে সমস্ত দুঃখ ব্যাধি প্রভৃতির সূত্রপাত। নার্ভাস হয়ে এবং ভয়পীড়িত হয়ে আমরা অন্যের ক্ষতি করি। আঘাত করতে ভয় পেয়ে আরো বেশী আঘাত করে বসি। পাপকে পরিহার করার শত চেষ্টা করে আমরা সেই পাপের গ্রাসেই পড়ি।

আমাদের চারপাশে কত না অসার ছেলেমানুষি আমরা জড়ো করে তুলি! তাতে আমাদের কোনো উপকারই হয় না, ওর ফলে আমরা এগিয়ে যাই সেই দুঃখ-যন্ত্রণারই দিকে যাকে আসলে আমরা পরিহারই করতে চাই।...

আঃ, যদি একেবারে ভয়হীন, দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া হওয়া যেত!...

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬৮]

স্যানফ্র্যান্সিস্কো
২৫ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি এখন পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভালো আছি, এবং ক্রমশই আমার বলবৃদ্ধি হচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার বোধ হয়, শীঘ্রই মুক্তি আসবে; অনুভব করি, গত দুবছরের দুঃখ-যন্ত্রণা বহু দিক দিয়েই আমাকে প্রভূত শিক্ষা দিয়েছে। ব্যাধি এবং দুর্ভাগ্য পরিণামে আমাদের কল্যাণই করে থাকে, যদিও সেই মুহূর্তে মনে হয় বুঝি বা চিরকালের জন্যই ডুবে গেলাম।

আমি যেন ঐ অসীম নীল আকাশ; মাঝে মাঝে মেঘরাশি আমাকে ঢেকে ফেলতে পারে, কিন্তু আসলে আমি সেই অনন্ত নীল আকাশই।

এখন আমি সেই শাশ্বত শান্তির আস্বাদের জন্য লালায়িত, যা আমার এবং প্রত্যেকের প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত। এই দেহের অনিত্য আধার, এই সুখদুঃখের বৃথা স্বপ্ন—এ সবের কী মূল্য আছে?

আমার স্বপ্ন ভাঙছে! ওঁ তৎ সৎ!

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬৯]

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট
স্যানফ্র্যান্সিস্কো
২৮ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মার্গট,

তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। যদি লেগে থাকতে পারি তবে অবস্থা ফিরবেই। আমার স্থির বিশ্বাস, তোমার যত টাকা লাগবে তা এখানে বা ইংল্যাণ্ডে পাবে।

আমি খুব খাটছি, যত বেশী খাটছি ততই ভালো বোধ করছি। স্বাস্থ্য খারাপ হবার ফলে আমার যে একটি বিশেষ উপকার হয়েছে তা নিশ্চয়। এখন আমি সত্যিই বুঝতে পারছি অনাসক্তি মানে কি। আশা করি শীঘ্রই সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে উঠতে পারব।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করে একটিমাত্র বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি; আর একটি যে দিক আছে তা হল মুহূর্তের মধ্যে কোনো বিষয় থেকে অনাসক্ত হওয়া; এই দ্বিতীয়টিও প্রথমটির মতোই সমান কঠিন—কিন্তু এদিকে আমরা প্রায় কোনো মনোযোগই দিই না।

এই আসক্তি ও অনাসক্তির ক্ষমতা যখন সমভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে মানুষ তখনই হয়ে ওঠে মহৎ এবং সুখী।

মিসেস লেগেট ১০০০ ডলার দান করেছেন জেনে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। অপেক্ষা কর, তিনি কাজের উপযোগী হয়ে উঠছেন। রামকৃষ্ণর কাজে তাঁর একটি মহৎ ভূমিকা পালন করার আছে, তা তিনি জানতে পারুন বা নাই পারুন।

তুমি অধ্যাপক গেডিসের যে বিবরণ লিখেছ তা পড়ে বেশ আনন্দ পেলাম; একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বিষয়ে জো বেশ একটি মজার বিবরণ দিয়েছে। সব বিষয়ই এখন আমাদের অনুকূল হতে সুরু করেছে।...

আমার এই চিঠি তুমি চিকাগোয় পাবে মনে হয়।...

মিস সুটারের বিশেষ বন্ধু সুইস যুবক ম্যাক্স গেজিকের কাছ থেকে একখানা সুন্দর পত্র পেয়েছি। মিস সুটারও তার ভালোবাসা জানিয়েছেন; আমার কাছে জানতে চেয়েছেন কবে আমি ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি। ওঁরা লিখেছেন অনেকেই সে খবর জানতে চাইছে।

সব জিনিসকেই আবর্তনের মধ্য দিয়ে আসতে হবে—বীজ থেকে গাছ হতে গেলে তাকে কিছুকাল মাটির নীচে পড়ে পচতে হবে। গত দুই বছর ছিল মাটির নীচে পড়ে পচবার সময়। মৃত্যুর করাল গ্রাসে পড়ে যখনই আমি ছটফট করেছি তারপরই সমগ্র জীবন যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই রূপ একবারের ঘটনা আমাকে নিয়ে এল রামকৃষ্ণর কাছে, আর একবারের ঘটনা আমাকে প্রেরণ করল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। তাই সব থেকে বৃহৎ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এখন তা

অন্তর্হিত। আমি এখন এমন শান্ত সমাহিত যে তাতে সময়ে সময়ে আমার নিজেরই আশ্চর্য বোধ হয়!! আমি এখন প্রতি সকাল সন্ধ্যায় খাটি, যখন যা খুশী খাই, রাত বারোটায় শুই—কিন্তু কী তোফা ঘুম!! এমন ঘুমোবার ক্ষমতা পূর্বে আমার কখনো ছিল না।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ
বিবেকানন্দ

[১০]

আলমোড়া
ক্যালিফোর্নিয়া
১৮ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

এইমাত্র আমি তোমার ও মিসেস বুলের স্বাগত পত্র পেলাম। তা লণ্ডনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মিসেস লেগেট নিশ্চিত আরোগ্যের পথে চলেছেন শুনে বিশেষ আনন্দিত হলাম।

মিঃ লেগেট সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জেনে খুব দুঃখিত হলাম।

তবে আরো গোলমাল যাতে না সৃষ্টি হয় সেই ভেবে আমি নীরব থাকছি।

তুমি তো জান আমার ধরন-ধারণ অতি কর্কশ কঠোর, একবার মেজাজ খারাপ হলে অ—কে আমি এমন জ্বালাতন করব যে তার মনের শান্তি লোপ পাবে।

তাকে এক পত্র লিখে এই কথাটি মাত্র জানিয়েছি যে, মিসেস বুল সম্বন্ধে তার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কাজকর্ম সব সময়ই কঠিন। আমার জন্য তুমি একটু প্রার্থনা কর জো, যেন আমার সব কাজ শেষ হয়, যেন আমার সমগ্র আত্মা জগন্মাতাতে বিলীন হয়। জগন্মাতার কাজ তিনিই বুঝবেন।

আবার লণ্ডনে আসতে পেরে তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছ—পুরাতন সব বন্ধু-বান্ধব, তাদের সবাইকে আমার ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ো।

আমি ভালো আছি, মানসিক ভাবে খুবই ভালো। দেহ থেকে আত্মার বিশ্রামের কথাটাই এখন বেশী করে অনুভব করছি। যুদ্ধে জয় ও পরাজয় দুইই ঘটেছে। এখন আমি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছি, মহান মুক্তিদাতার জন্য এখন অপেক্ষা করে রয়েছি।

"শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।"

আসলে জো, আমি সেই পূর্বের বালকটিই আছি যে দক্ষিণেশ্বরে বটবৃক্ষের তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐটিই আমার আসল প্রকৃতি; আর এই যে সব কাজকর্ম, পরের উপকার ইত্যাদি, এ সব ওপর থেকে জোর

করে চাপানো। এখন আমি আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনছি ; সেই কণ্ঠস্বর আমার আত্মাকে রোমাঞ্চিত করে তুলছে। আমার বন্ধন সব ভেঙে যাচ্ছে—প্রেম মরে যাচ্ছে, কাজকর্ম সব বিস্বাদ লাগছে—জীবনের জৌলুষ সরে গেছে। শুধু মাত্র প্রভুর কণ্ঠস্বর আমাকে আহ্বান করছে।—"আমি আসছি প্রভু, আমি আসছি।" "মৃতের সৎকার মৃতেরাই করুকগে।"—"আমি আসছি, হে আমার প্রেমাস্পদ প্রভু, আমি আসছি।"

হ্যাঁ, আমি আসছি। সম্মুখে আমার নির্বাণ। মাঝে মাঝে তা অনুভব করি—সেই অসীম অনন্ত শান্তি সমুদ্র, এতটুকু বাতাস বা একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ পর্যন্ত সে শান্তি ভঙ্গ করছে না।

আমি যে জন্মেছিলাম তাতে আমি আনন্দিত, এত যে দুঃখভোগ করেছি তাতেও আমার আনন্দ, মস্ত বড় বড় ভুল করেছি তাতেও আমি আনন্দিত, এখন যে শান্তিতে ডুব দিতে চলেছি আমার তাতেও আনন্দ। আমি কাউকে বন্ধনে ফেলে রেখে যেতে চাই না, আমি কোনো বন্ধন গ্রহণ করছি না। আমার এই দেহ অন্ত হয়ে আমার মুক্তি আসুক অথবা দেহ থাকতে থাকতেই আমি মুক্ত হই, সেই পুরাতন লোকটি চলে গেছে, চিরকালের জন্য চলে গেছে, সে আর ফিরে আসবে না! শিক্ষাদাতা, পথপ্রদর্শক, গুরু, নেতা, আচার্য চলে গেছেন ; পড়ে আছে সেই বালকটি, সেই শিষ্য, প্রভুর পদাশ্রিত সেই সেবক।

তুমি বুঝতে পারছ কেন আমি অ—র ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। কারো ব্যাপারে নাক গলানোর আমি কে, জো? বহু দিন হল নেতৃত্বের স্থান আমি ছেড়ে দিয়েছি—গলা চড়াবার কোনো অধিকার আমার নেই। এই বৎসরের আরম্ভ থেকে ভারতের কোনো কাজে আমি কোনো আদেশ দিই নি। তুমি তা জান। অতীতে তুমি ও মিসেস বুল আমার জন্য যা করেছ সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ। তোমাদের চির কল্যাণ হোক! স্রোতে গা ভাসিয়ে যখন থেকেছি সেই সময়টাই আমার মধুরতম মুহূর্ত ; এখন আবার সেই রকম গা ভাসান দিয়েছি। ঊর্ধ্বে দিবাকর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, কত স্থির কত শান্ত ;—আর আমিও অসারভাবে প্রবাহিনীর উষ্ণ বক্ষে হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলেছি! একটুও হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত শান্তি ও নিস্তব্ধতা আবার ভেঙে যায়! এই অদ্ভুত ও শান্তি সব কিছুকে মায়া বলে বুঝিয়ে দেয়!

ইতিপূর্বে আমার কর্মের পেছনে ছিল উচ্চাভিলাষ, প্রেমের পেছনে ছিল ব্যক্তিত্ব বিচার, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে থাকত ভয়ভাব, আর নেতৃত্বের ভেতর আসত প্রভুত্বস্পৃহা! এখন সে সব বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আমি গা ভাসিয়ে চলেছি। মহামায়া, আমি আসছি! আসছি মা! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ—সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে আমি আসচি ; আমার আর কোনো ভূমিকা নেই, এখন আমি একজন দ্রষ্টা মাত্র।

আঃ কী স্থির প্রশান্তি! চিন্তা ভাবনাগুলিও যেন আমার হৃদয়ের কোন এক

দূর, অতিদূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে আসছে ধীরে ধীরে। তারা যেন দূরাগত মৃদু বাক্যালাপের মতো। আর শান্তি—সব কিছুতে মধুর গভীর শান্তি। মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার পূর্ব মুহূর্তে যেমন মনে হয়—যখন সব জিনিসকে দেখায় ছায়ার মতো, যেন অবাস্তব—তখন ভয় থাকে না, অনুরাগ থাকে না, কোনো ভাবাবেগ থাকে না। এ শান্তি সম্পূর্ণ একলারই অনুভব করার, চারদিকে চিত্র আর মূর্তির মেলা তার মধ্যে একলা।—আমি আসছি! প্রভু, আমি আসছি!

জগৎ সংসারের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাকে সুন্দর বা কুৎসিৎ কিছুই বোধ হচ্ছে না, যেন কতগুলি ইন্দ্রিয়ানুভূত সংবেদন—যা কোনো ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে না। আঃ জো, এ কী বিপুল শান্তি! যা কিছু দেখছি সবই ভালো, সবই সুন্দর; আমার কাছে সব কিছুর ভালো-মন্দের সুন্দর-অসুন্দরের আপেক্ষিক তারতম্য দূর হয়ে যাচ্ছে—এই সব কিছুর মধ্যে সকলের আগে স্থান গ্রহণ করছে আমার এই দেহ। ওঁ তৎ সৎ!

আশা করি, লণ্ডনে ও প্যারিসে তোমাদের সকলের জীবনে বড় বড় ঘটনা ঘটবে। শরীর ও মনের নব আনন্দ লাভ হোক তোমাদের, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হোক।

তুমি ও মিসেস বুল আমার অনন্ত ভালোবাসা জেনো।

তোমাদের বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

[৭১]

নিউ ইয়র্ক
২০ জুন, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

…এবার মনে হচ্ছে জগন্মাতা পুনরায় দয়া করছেন, এবং চক্র আবার ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠছে।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৭২]

নিউ ইয়র্ক
২ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

…আমি তো সর্বদাই বলি, জগন্মাতাই জানেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। নেতা হওয়া বড় কঠিন কাজ। সমষ্টির পদতলে তার সর্বস্ব, আপন সত্তাকে পর্যন্ত নেতাকে বিসর্জন দিতে হবে।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৭৩]

৬ প্লাস-দে-জেতাৎ উনি
প্যারিস
২৫ অগস্ট, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

এইমাত্র তোমার চিঠি আমার কাছে পৌছল। তোমার সহৃদয় মনোভাবের জন্য অজস্র ধন্যবাদ।

মঠ থেকে মিসেস বুল যাতে তার টাকা তুলে নিতে পারেন আমি তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েছিলাম; তিনি এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না, তদুপরি এখানে ট্রাস্ট দলিল দস্তখতের জন্য পড়েছিল, এই অবস্থায় এখানকার ব্রিটিশ কনসালের অফিসে গিয়ে আমি তা যথাবিহিত এক্সিকিউট করিয়ে নিয়েছি; এখন তা ভারতের পথে।

এখন আমি মুক্ত, এই কাজে আমি নিজের আর কোনো ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি পদ থেকেও আমি ইস্তফা দিয়েছি।

এখন মঠ ইত্যাদি রামকৃষ্ণর আমি ছাড়া অন্যান্য সাক্ষাৎ-শিষ্যদের হাতে গেল। এখন সভাপতি পদ ব্রহ্মানন্দর—তারপর পদটি যাবে প্রেমানন্দর কাছে, তারপর আর একজনের কাছে একের পর এক এইভাবে যাবে।

আমার ওপর থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল তাতে আমি আনন্দিত, আমি এখন সুখী। ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সাফল্যের মধ্য দিয়ে ২০ বৎসর ধরে আমি রামকৃষ্ণর সেবা করেছি। এখন আমি চিরকালের জন্য অবসর নিলাম, বাকী জীবন নিজের জন্যই কাটাব।

আমি আর কারও প্রতিভূ নই, কারও নিকট দায়ীও নই। এতদিন আমার বন্ধুবান্ধবদের প্রতি যেন একটা ব্যারামের মতো ছিল একটা বাধ্যবাধকতাবোধ। ভালো করে ভেবে দেখেছি, আমি কারও নিকট ঋণী নই; হিসাব করে দেখছি, প্রাণ পর্যন্ত পণ করে আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করে উপকারের চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার প্রতিদানে পেয়েছি গালমন্দ, অনিষ্ট চেষ্টা, বিরক্তি এবং জ্বালাতন। এখানে এবং ভারতে প্রত্যেকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।

তোমার চিঠি এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে যেন আমি তোমার নতুন বন্ধুদের সম্পর্কে ঈর্ষ্যান্বিত। কিন্তু চিরকালের জন্য তোমার একথা জেনে রাখা উচিত যে, আমার অন্য যে দোষই থাক, জন্ম থেকেই আমি লোভশূন্য, ঈর্ষ্যাহীন এবং কর্তৃত্ব লিপ্সা শূন্য।

আমি পূর্বেও তোমাকে কোনো নির্দেশ দিইনি, এখন তো আর কাজের ব্যাপারে আমি কেউ নই, অতএব এখন আমার কোনো নির্দেশই দেবার নেই। আমি কেবল এইটুকু জানি: যতদিন তুমি সর্বান্তঃকরণে জগন্মাতার সেবা করবে ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিত করবেন।

তুমি কোন্ কোন্ বন্ধু করলে সে ব্যাপারে আমার কখনো কোনো ঈর্ষা

হয়নি। কোনো ব্যাপারের সঙ্গে মিশেছে বলে আমার গুরুভাইদের আমি কখনো সমালোচনা করি নি। তবে আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পাশ্চাত্যদেশীয় লোকদের এই একটি বৈশিষ্ট্য আছে— তারা নিজেরা যেটা ভালো মনে করে সেইটে অপরের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে ; ভুলে যায় যে একজনের পক্ষে যেটা ভালো অন্যজনের পক্ষে সেটা ভালো নাও হতে পারে। এই কারণে আমার ভয় হয়, তোমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যেদিকে ঝুঁকবে তুমি হয়ত সেই ভাব অন্যের মধ্যে জোর করে তা ঢোকাতে চাইবে। কেবল এই কারণেই আমি কখনো কখনো কোনো বিশেষ প্রভাব ঠেকাবার চেষ্টা করেছি, আর কিছু নয়।

তুমি স্বাধীন, তোমার নিজের যা পছন্দ তাই বেছে নাও, নিজের কাজ নিজেই ঠিক করে নাও।...

বন্ধু হোক আর শত্রু হোক, সকলেই জগন্মাতার হাতের যন্ত্র, আনন্দ বা বেদনার মধ্য দিয়ে আমাদের কর্ম সাধনে তারা সাহায্য করছে। সুতরাং জগন্মাতা তাদের সকলের কল্যাণ করুন।

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

তোমাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৭৪]

প্যারিস
২৮ অগস্ট, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

এই তো জীবন—শুধুই খেটে মর, আর খেটে মর ; আর তাছাড়া আমাদের কী-ই করার আছে ? খাটো, শুধু খাটো ! যা হোক কিছু একটা ঘটবে—একটা কিছু পথ খুলে যাবে। যদি তা না হয়—সম্ভবতঃ তা কোনো দিনই হবে না—তাহলে, তাহলে, তখন কী হবে ? আমাদের সব প্রয়াসই তো, অন্ততঃ সাময়িকভাবে, সেই চরম পরিণতি স্বরূপ মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার উদ্যম ! কিন্তু আহ্, হে মৃত্যু, তোমাকে বাদ দিয়ে জগতের কোন কাজটা বা হত ! তুমি সর্বক্ষত পরিপূরক, হে মৃত্যু !

ঈশ্বরের অপার করুণা—এই অস্তিমান জগৎ সংসার বাস্তব নয়, চিরন্তন নয় !! ভবিষ্যৎই বা এর চেয়ে ভালো হবে কী করে ? সে তো বর্তমানেরই ফলস্বরূপ—অতএব তা তো বর্তমানেরই অনুরূপ হবে, যদি তার চেয়ে খারাপ না হয় !

স্বপ্ন, আহা স্বপ্ন ! স্বপ্ন দেখে চল ! স্বপ্ন, স্বপ্ন প্রহেলিকাই এই জীবনের হেতু, আবার তার মধ্যেই প্রতিবিধান। স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্ন ! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্ন শেষ কর !

আমি ফরাসী ভাষা শিখতে চেষ্টা করছি, এখানে—র সঙ্গে কথা বলছি। অনেকে

এর মধ্যেই প্রশংসা সুরু করেছেন। সারা পৃথিবীকে বল এই অন্তহীন গোলকধাঁধার কথা, অদৃষ্টের এই সীমাহীন উত্থানপতনের কথা—যার সূত্রাগ্র কেউ বের করতে পারে না, অথচ প্রত্যেকে অন্ততঃ তখনকার মত মনে করে যে সে তা বের করে ফেলেছে, আর তাতে অন্ততঃ তার নিজের তৃপ্তি হয় এবং কিছুকালের জন্য সে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে ; তাই নয় কি ?

যাহোক, এখন সব বড় বড় কাজ করতে হবে ! কিন্তু বড় কাজের জন্য মাথা ঘামায় কে ? ছোট কাজই বা করা হবে না কেন ? একটি অপরটিরই মতো ভালো। ছোট ছোট কাজের মধ্যেও মহত্ব আছে, গীতা সেই শিক্ষাই দেয়—ধন্য সে প্রাচীন গ্রন্থ !!…

শরীরের বিষয়ে চিন্তা করার খুব একটা সময় আমার ছিল না। কাজেই তা ভালোই আছে ধরে নিতে হবে। এখানে কিছুই চিরদিন ভালো থাকে না। মাঝে মাঝে অবশ্য সেকথা আমরা ভুলে যাই ; সেইটিই ভালো থাকা এবং ভালো করা।…

ভালো হোক মন্দ হোক, এখানে আমরা নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় করে চলেছি। স্বপ্ন যখন ভেঙে যাবে, যখন রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যাব, তখন এই সব কিছু নিয়ে প্রাণ খোলা হাসি হাসব—কেবল এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৭৫]

[মিসেস ফ্র্যান্সিস লেগেটকে লেখা]

৬ প্লাস-দে-জেতাং উনি, প্যারিস
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্রিয় মা,

এখানে এই বাড়িতে আমরা পাগলদের এক সম্মেলন করলাম।

নানা দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিল : দক্ষিণে ভারত থেকে, উত্তরে স্কটল্যাণ্ড থেকে, আর দুপাশে ঠেকান দিয়েছিল ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা।

সভাপতি নির্বাচন করতে গিয়ে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল ; ডাঃ জেমস (অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস) অবশ্য ছিলেন, কিন্তু বিশ্বের সমস্যাবলী সমাধান করার অপেক্ষা তার আপন দেহের ফোস্কার সমস্যার প্রতিই নজর ছিল বেশি ; সেই ফোস্কা পড়িয়েছিলেন মিসেস মেল্টন (সম্ভবতঃ তিনি একজন ম্যাগনেটিক হীলার)।

আমি জো-র (যোসেফাইন ম্যাকলয়েড) নাম প্রস্তাব করেছিলাম ; কিন্তু সে, তার নতুন গাউন আসেনি বলে, রাজী হল না—বরং চলে গেল এক কোণে, সুবিধাজনক স্থান থেকে সব দৃশ্য দেখবে বলে।

মিসেস (ওলি) বুল প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মার্গট (সিস্টার নিবেদিতা) আপত্তি

জানিয়ে বললে, এই মিটিংটা এক কম্পেয়ারেটিভ ফিলসফির ক্লাসে পরিণত হতে চলেছে।

আমরা যখন এই রকম একটা মুস্কিলের মধ্যে পড়েছি, তখন কোণ থেকে চট করে উঠে দাঁড়াল একটি বেটে খাটো প্রায় গোলকার এক ব্যক্তি; কোনো ভূমিকা না করে সে বললে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে—শুধু সভাপতি নির্বাচনের সমস্যা নয়, জীবনের সমস্যাই মিটবে যদি আমরা সকলে সূর্য দেবতা ও চন্দ্র দেবতার পূজোয় লেগে যাই। সে পাঁচ মিনিটে তার বক্তৃতা শেষ করল; আর তা অনুবাদ করতে সেখানে উপস্থিত তার শিষ্যের লাগল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ইতিমধ্যে শুরুটি সেই বৈঠকখানায় কার্পেট জড়ো করে স্তূপীকৃত করে ফেলেছে, বলছে সেই মুহূর্তে সে, 'অগ্নির দেবতার' ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করবে।

সেই সঙ্কট সময়ে জো বাধা দিয়ে বলতে লাগল সে তার বৈঠকখানাকে আগুনে বিসর্জন দিতে দেবে না। এই কথা শুনে ভারতীয় সাধু তার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানতে লাগল—যাকে সে মনে করেছিল অগ্নিপূজার খাঁটি সমর্থক তারই কিনা এই আচরণ! সাধু একেবারে ত্যক্তবিরক্ত।

সেই সময় ফোস্কা শুশ্রূষা এক মিনিট স্থগিত রেখে ডাঃ জেমস বললেন, তাঁকে যদি মেণ্টনীয় ফোস্কার বিবর্তন বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যস্ত না থাকতে হত তাহলে অগ্নি দেবতা এবং তার ভ্রাতাদের সম্বন্ধে তিনি কিছু কৌতূহলোদ্দীপক কথা শোনাতে পারতেন। তবে হঁ্যা, তার গুরু হার্বার্ট স্পেনসার আগে থাকতে যেহেতু বিষয়টির অনুসন্ধান করেন নি সেই কারণে তিনিও 'গোল্ডেন সায়লেন্স' মেনে চলবেন, কোনো কথাই বলবেন না।

দরজার কাছ থেকে একজন বলে উঠল, "চাটনিই আসল জিনিস"। সবাই ফিরে তাকিয়ে দেখলাম—মার্গট। সে বললে, "হঁ্যা চাটনি। চাটনি এবং কালী, তাতেই জীবনের সব বাধা বিপত্তি দূর হয়ে যাবে, তাতেই সব অশুভ গিলে খাওয়া সহজ হবে, এবং যা কিছু ভালো আমরা উপভোগ করতে পারব।" বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে গেল; জানিয়ে দিল যে সভাস্থলে এক পুরুষ প্রাণী তার বক্তৃতায় বাধা দিয়েছে। অতএব সে কিছুতেই আর বক্তৃতা করবে না। এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই যে, শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন পুরুষ মানুষ জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল, একজন মহিলার প্রতি ন্যায়সঙ্গত সম্মান সে প্রদর্শন করেনি; মার্গট নিজে নরনারীর সমানাধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী, তবু সে জানতে চায়, নারীর প্রতি কেন সেই লোক যথাযোগ্য সম্মান দেখাল না। তখন সভার সকলে একসঙ্গে বলতে লাগল, সবাই তার কথা অখণ্ড মনোযোগে শুনেছে এবং যথাযোগ্য মর্যাদা তাকে দিয়েছে—কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। মার্গট জানাল এই সাংঘাতিক দলে তার কোনো কাজ নেই; এই বলে সে বসে পড়ল।

অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন বোস্টনের মিসেস ব্লুল; তিনি বলতে লাগলেন দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার সৃষ্টি হল কেমন করে শুধু নরনারীর সম্পর্ক বুঝতে না পারার দরুন। তিনি বললেন, "আসল লোকদের প্রকৃত অনুধাবনটায় সব রোগের সত্যিকারের

দাওয়াই, তারপর লাভ করতে প্রেমে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতায় ও মাতৃত্বে মুক্তি, ভ্রাতৃত্ব, পিতৃত্ব, দেবত্ব, স্বাধীনতায় প্রেম এবং প্রেমে স্বাধীনতা, যৌনজীবনের আসল আদর্শকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা।"

এই কথায় ঘোরতর আপত্তি জানাল স্কটল্যাণ্ডর ডেলিগেট; সে বলল, শিকারী ছাগপালের পেছনে ছুটেছে, ছাগপাল ছুটেছে রাখালের পেছনে, রাখাল কৃষকের পিছনে, কৃষক মেছোকে সাগরে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, এখন আমরা চাইছি তাকে সমুদ্রতল থেকে তুলতে, চাইছি সে এখন কৃষককে আক্রমণ করুক, কৃষক আক্রমণ করুক রাখালকে, সে ওকে এবং ও তাকে; এইভাবে জীবনের জাল সম্পূর্ণ হবে এবং আমরাও সকলে সুখী হব। একে -এই ছোটাছুটির ব্যাপারটা বেশি দূর চালাতে দেওয়া হল না। এক মুহূর্তে প্রত্যেকে নিজের পায়ে খাড়া, আমরা শুধু কতগুলি কণ্ঠস্বর শুনে বিভ্রান্ত হতে লাগলাম: "সূর্য দেবতা ও চন্দ্র দেবতা", "চাটনি এবং কালী", "প্রকৃত উপলব্ধি, যৌনজীবন, মাতৃত্ব উর্ধ্বে তুলে ধরবার স্বাধীনতা", "কখনও না, মৎস্যজীবীকে সমুদ্র-তীরে ফিরে যেতেই হবে" ইত্যাদি। এ মতাবস্থায় জো ঘোষণা করলে সে এখনকার মত আপাততঃ শিকারী হতে চাইছে, যদি সব আবোল তাবোল না বন্ধ করা হয় তবে সে সবাইকে বাড়ীর বার করে দেবে।

তখনই সব গোলমাল থামে এবং ঘরে শান্তি আসে। আমিও আপনাকে তাড়াতাড়ি সব কথা লিখে জানাচ্ছি।

আপনাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৭৬]

৬ প্লাস দে জেতাং উনি
প্যারিস, ফ্রান্স
১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্রিয় আলবার্টা,

আমি আজ সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই আসছি, রাজকুমারী (সম্ভবতঃ প্রিন্সেস ডেমিডফ) এবং তার ভ্রাতার সঙ্গে দেখা হলে অবশ্যই খুশী হব। কিন্তু সেখানে জায়গাটা খুঁজে পেতে যদি আমার খুব বিলম্ব হয় তাহলে বাড়িতে আমাকে একটি শোবার জায়গা দিতে হবে।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১১]

মঠ, বেলুড়
১১ই ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

আমি পরশু রাত্রিতে এসেছি। কিন্তু হায়! আমার তাড়াহুড়ো করে আসায় কোন লাভ হল না।

কয়েকদিন আগে বেচারী ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। এইভাবে দুজন মহৎ ইংরেজ জীবন দান করলেন আমাদের জন্য—আমাদের, হিন্দুদের জন্য। যদি শহীদব্রত বলে কিছু থাকে তাহলে তা তো এই। এই মাত্র মিসেস সেভিয়ারকে চিঠি দিলাম—তাঁর কী সিদ্ধান্ত জানবার জন্য।

আমি ভালো আছি, এখানে সব ভালোই চলছে—সব দিক দিয়েই। আমার এই তাড়াহুড়ো ক্ষমা কোরো। দীর্ঘতর পত্র লিখব শীঘ্রই।

চির সত্যাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১৮]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৯ ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

মহাদেশসমূহের ওপার থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলছে, কেমন আছ? এতে তুমি অবাক হচ্ছ না? বস্তুতঃ আমি হচ্ছি ঋতুর সঙ্গে বিচরণকারী একটি বিহঙ্গ। আনন্দমুখর ও কর্মচঞ্চল প্যারিস, প্রাচীন গম্ভীর কনস্টাণ্টিনোপল, চাকচিক্যময় ক্ষুদ্র এথেন্স, পিরামিড শোভিত কাইরো—সব পেছনে ফেলে এসেছি, এখন আমি এখানে—গঙ্গার তীরে মঠে আমার ঘরে বসে লিখছি। চতুর্দিকে কী শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যালোকে নাচছে, ক্বচিৎ দু একখানা মালবাহী নৌকোর দাঁড় ফেলবার শব্দে সেই স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙে যাচ্ছে। এখানে এখন শীতকাল, কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্ন বেশ গরম এবং উজ্জ্বল। এ হল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতের মতো। সর্বত্র সবুজ ও স্বর্ণের সমাবেশ, ঘাস যেন মখমলের মতো। অথচ বাতাস শীতল, নির্মল এবং প্রাণ-জুড়ানো।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৭৯]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৬ ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

এই ডাকে তোমার চিঠি এল। সেই সঙ্গে মা এবং আলবার্টার চিঠিও। আলবার্টার বিদ্বান বন্ধু রুশদেশ সম্বন্ধে যা বলছেন সে প্রায় আমার ধারণারই অনুরূপ। চিন্তাধারার একটি মুস্কিল অবশ্য আছে: সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষে কি রুশভাবে ভাবিত হওয়া সম্ভব?

আমার পৌঁছবার পূর্বেই প্রিয় মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর সৎকার করা হয়েছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর তীরে, সম্পূর্ণ হিন্দু আচার রীতিতে। ব্রাহ্মণগণ তাঁর পুষ্পমাল্যে আবৃত্ত দেহ বহন করে এনেছিলেন আর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছিল ব্রহ্মচারী বৃন্দ।

আমাদের আদর্শে এরই মধ্যে দুজন শহীদ হলেন। এর ফলে প্রিয় পুরাতন ইংল্যাণ্ড এবং তার বীর সন্তানরা আমার আরো প্রিয় হয়ে উঠেছে। ইংল্যাণ্ডের সর্বোত্তম শোণিত ধারায় জগন্মাতা যেন ভবিষ্যৎ ভারতের বৃক্ষশিশুকে বারিসিঞ্চিত করছেন। জগন্মাতার জয় হোক!

প্রিয় মিসেস সেভিয়ার অবিচলিত আছেন। তিনি আমাকে প্যারিসের ঠিকানায় যে চিঠি দিয়েছিলেন তা এই ডাকে ফিরে এল। আগামী কাল আমি যাব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমাদের প্রিয় এই সাহসী নারী ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করুন!

আমি নিজে শান্ত এবং দৃঢ় রয়েছি। আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনায় আমাকে বিচলিত করতে পারে নি; এখনো জগন্মাতা আমার মনোভঙ্গ হতে দেবেন না।

এখন শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানটি খুবই মনোরম হয়ে উঠেছে। অনাবৃত তুষার ঘেরা হিমালয় দেখতে এখন আরো মনোহর হবে।

মিঃ জনস্টন নামে যে যুবকটি নিউ ইয়র্ক থেকে রওয়ানা হয়ে এসেছিল সে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেছে, এখন সে আছে মায়াবতীতে।

টাকাটা সারদানন্দর নামে মঠে পাঠিয়ে দিয়ো, আমি তো পাহাড়ে চলে যাচ্ছি।

ওরা ওদের সাধ্য মত ভালোই কাজ করেছে; তাতে আমি খুশী আছি। স্নায়বিক দুর্বলতার দরুন যে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলাম তার জন্য এখন নিজেকে বেকুব বলে মনে হচ্ছে।

ওরা বরাবরের মতোই সৎ এবং বিশ্বস্ত আছে। ওদের স্বাস্থ্যও ভালো আছে। মিসেস বুলকে এসব কথা লিখে জানিয়ো; তাঁকে বোলো তিনিই সব সময় ঠিক বলেছেন, ভুল হয়েছে আমারই। সেজন্য আমি তাঁর কাছে লক্ষ বার ক্ষমা চাইছি।

তাঁকে এবং ম-কে অগাধ ভালোবাসা জানাচ্ছি।

সমুখে পিছনে আমি তাকাই
দেখি সব কিছু আছে ঠিকই।

যবে গভীর বিষাদে টলমল
তবু আত্মার জ্যোতি জলজল।

এম-কে, মিসেস সি—কে, প্রিয় জে. বি.-কে আমার ভালোবাসা, আর জো তোমাকে প্রণাম।

বিবেকানন্দ

[৮০]

মঠ, বেলুড়
৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০১

প্রিয় নিবেদিতা,

আমরা সবাই কাজ করি একটু একটু করে—অন্ততঃ এই আদর্শের ক্ষেত্রে তো বটেই। স্প্রীংটি তো আমি চেপে রাখতেই চেষ্টা করি, কিন্তু যে কী ঘটে যায়—তখন সেই স্প্রীংয়ের এক বোঁ বোঁ শোঁ শোঁ আওয়াজ; আর যাবে কোথায়!—ব্যাস্, ভাবা, চিন্তা করা, স্মরণ করা, লেখা, আঁচড় কাটা—সব কিছু চলতে থাকে!

হ্যাঁ বর্ষার কথা—বর্ষা ঝেঁপে এসেছে পূর্ণবেগে, যেন এক মহা প্লাবন; ঢল, ঢল আর ঢল, দিনরাত শুধু ঝরছে তো ঝরছেই। নদী ফুলছে, ভেসে যাচ্ছে দুই কূল; দীঘি পুকুর সব জলে জলে টাইটম্বুর। মঠভূমিতে দাঁড়ানো বর্ষার জল নিকাষের জন্য একটি গভীর নর্দমা কাটা হচ্ছে, সেই কাজে খানিকটা সাহায্য করে এইমাত্র আমি ফিরলাম। কোনো কোনো জায়গায় বর্ষার জল কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে যায়। আমার সেই বিশালকায় সারসটি, এবং হংস-হংসীরাও মহা উল্লাসে মেতে আছে। পোষা কৃষ্ণ সারসটি মঠ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে বার করতে আমাদের কয়েকটা দিন খুব উৎকণ্ঠায় কেটেছে। খুবই দুঃখের কথা, আমার একটি হাঁস কাল মারা গেছে। এক সপ্তাহেরও বেশি সে শ্বাসকষ্টে ভুগেছে। আমাদের এক রসিক বৃদ্ধ সাধু বলছিলেন, "মশায়, যখন জলে বৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দি লাগে, ব্যাঙেরাও হাঁচতে থাকে এই কলিযুগে তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই!"

একটি রাজহাঁসের পালক খসে যাচ্ছিল। আর কোনো প্রতিকার না জানা থাকায় একটা টবে জলের সঙ্গে একটু কার্বলিক এসিড মিশিয়ে তাতে কয়েক মিনিটের জন্য তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভেবেই নিয়েছিলাম—হয় সে সেরে উঠবে নয় মরবে। তা হাঁসটি এখন ভালো আছে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

The Math, Belur
7th Sept., 1901

Dear Nivedita,

We all work by bits, that is to say, in this cause. I try to keep down the spring, but something or other happens, and the spring gose whirr, and there you are—thinking, remembering, scribbling, scrawling, and all that !

Well, about the rains—they have come down now in right earnest, and it is a deluge, pouring, pouring, pouring night and day. The river is rising, flooding the banks ; the ponds and tanks have overflowed. I have just now returned from lending a hand in cutting a deep drain to take off the water from the Math grounds. The rain-water stands at places some feet high. My huge stork is full of glee, and so are the ducks and geese. My tame antelope fled from the Math and gave us some days of anxiety in finding him out. One of my ducks unfortunately died yesterday. She had been gasping for breath more than a week. One of my waggish old monks says, "Sir, it is no use living in this Kali-Yuga when ducks catch cold from damp and rain, and frogs sneeze !"

One of the geese had her plumes falling off. Knowing no other method, I left her some minutes in a tub of water mixed with mild carbolic, so that it might either kill or heal ; and she is all right now.

Yours etc.,
Vivekananda

বক্তৃতা

প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্বামীজীর প্রথম জনসভা

[১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি বিকেলে কলম্বোর হিন্দুসমাজ স্বামীজীকে যে অভ্যর্থনায় বরণ করেন নীচে সেই স্বাগত ভাষণটি দেওয়া হল।]

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

কলম্বো শহরের হিন্দুদের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আমরা সবিনয়ে আপনাকে এই দ্বীপে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে চাই। পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের মহান অভিযান শেষে স্বদেশের পথে আপনাকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রথম সুযোগ লাভের সৌভাগ্য আমাদেরই।

আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলিকে আপনি শোনালেন হিন্দু আদর্শের সার্বজনীনতার কথা, সকল ধর্মমতের ঐকতান, প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মার আধ্যাত্মিক প্রেরণা যা প্রীতির সঙ্গে ঈশ্বর অভিমুখে সকলকেই আকর্ষণ করেছে। যুগে যুগে মহাপুরুষদের পবিত্র পদচারণায় ভারতভূমি পবিত্রতর হয়েছে, বহু ভাগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও যাঁদের মহান আবির্ভাব ও উদ্দীপনা ভারতকে জগতের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে চিহ্নিত করেছে, আপনি তাঁদের দেওয়া সত্যের বাণী এবং পথনির্দেশের কথা পাশ্চাত্যকে শিখালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত এরূপ একজন মহাপুরুষের অনুপ্রেরণা এবং আপনার আত্মনিবেদিত প্রাণের ঐকান্তিক উৎসাহের প্রতি ও ভারতের আধ্যাত্মিক প্রতিভার জীবন্ত সংস্পর্শে আসার অমূল্য সৌভাগ্যলাভের জন্য যেমন পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ ঋণী, তেমন মোহনীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার দেশ থেকে প্রদত্ত আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের মূল্যায়ন স্বদেশের অসংখ্য মানুষের মনকে উজ্জীবিত করার জন্যও ঋণী।

আপনার মহৎ কর্ম ও আদর্শ স্থাপনের ফলে মানবতা এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। সজীব উজ্জ্বল চিত্রণে আপনি আমাদের মাতৃভূমিকে উজ্জ্বলতর করেছেন। আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কৃপায় আপনার ও আপনার কর্মের অগ্রগতি যেন অব্যাহত থাকে।

শ্রদ্ধা—নমস্কারান্তে
আপনার বিশ্বস্ত
কলম্বো শহরের হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষে
পি. কুমারস্বামী
সিংহল বিধান সভার সদস্য, সভার সভাপতি
ও
এ. কুলবীর স্বামী, সম্পাদক

কলম্বো, জানুয়ারি, ১৮৯৭

[কলম্বো শহরের হিন্দু অধিবাসীদের অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজী বলেন এই মনোভাব প্রকাশ কোন বড় রাজনীতিক, কোন বীর যোদ্ধা অথবা কোন ধনী কোটিপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয় বরং একজন ভিখারী হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এর দ্বারা ধর্মের প্রতি হিন্দু মনের প্রবণতাই প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ধর্মকে জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড হিসাবে গুরুত্ব আরোপের উল্লেখ করে বললেন, এই অভ্যর্থনা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন ব্যাপার নয়, বরং একটি মহান আদর্শের স্বীকৃতি।

১৬ জানুয়ারি ১৮৯৭, সন্ধ্যায় ফ্লোরাল হলে প্রকাশ্য সভায় স্বামীজী নিম্নোক্ত ভাষণটি দিলেন।]

আমি পাশ্চাত্যে যা কিছু সামান্য কাজ করেছি, তা আমাদের প্রিয় পবিত্রতম মাতৃভূমি থেকে প্রবাহিত আনন্দ, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদপূত পথ অনুসরণের ফল, আমার নিজের কোন সহজাত শক্তির ফল নয়। পাশ্চাত্যে নিঃসন্দেহে কিছু ভাল কাজ হয়েছে। বিশেষ করে আমার পক্ষে যা ছিল সম্ভবত ভাবাবেগপ্রসূত, পরে তাই স্থির বিশ্বাস, শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনে পরিণত হয়েছে। আগে আমিও আর সব হিন্দুর মত ভাবতাম, মাননীয় সভাপতি যা আপনাদের নিকট উল্লেখ করলেন, যে, এই সেই পুণ্যভূমি—কর্মভূমি। আজ এখানে দাঁড়িয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আমি ঘোষণা করতে পারি, হ্যাঁ, এ কথা সত্য। এই পৃথিবীতে যদি কোন একটিমাত্র দেশ পুণ্যভূমির পবিত্রতা দাবি করতে পারে, যে দেশ কর্মফল হেতু আত্মা ও কর্মের সম্পর্ক মূল্যায়নের ক্ষেত্র, যে দেশ প্রতিটি ঈশ্বরমুখী আত্মার শেষ আবাসস্থল, যে দেশ নম্রতা, সহৃদয়তা, শুদ্ধতা ও সহিষ্ণুতার লক্ষ্যে মানবসভ্যতার চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে, সর্বোপরি গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও আধ্যাত্মিকতার দেশ—সে হল এই ভারতভূমি। কোন্ সুদূর প্রাচীনকাল থেকে এখানকার ধর্মীয় গুরুগণ বারংবার পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক সত্যের শুদ্ধ সনাতন জলধারার প্লাবন ঘটিয়ে চলেছেন, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দুনিয়ার দিকে দিকে এখান থেকেই দার্শনিক তত্ত্বের জোয়ার বয়ে গিয়েছে। আবার এখান থেকেই জগতের জড়বাদী সভ্যতার আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটানোর স্রোত প্রবাহিত হবে। কারণ, জড়বাদের যে জ্বলন্ত আগুন অন্যান্য দেশগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরের গভীরে জ্বলছে, একমাত্র এখানকার প্রাণ-সঞ্জীবনী ধারাতেই তার নিবৃত্তি হতে পারে। বন্ধুগণ! বিশ্বাস করুন, তাই হতে চলেছে।

অনেক কিছু দেখার পর এই আমার অভিজ্ঞতার আলো এবং যাঁরা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠ করেছেন, তাঁরাও এসব বিষয়ে জ্ঞাত আছেন। আমাদের মাতৃভূমির নিকট এই পৃথিবীর ঋণ অপরিমেয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে অন্য কোন জাতির নিকট পৃথিবী এতখানি ঋণী নয়, যতখানি ঋণী সহিষ্ণু এবং নিরীহ হিন্দু জাতির নিকট। যদিও 'নিরীহ হিন্দু' কথাটি কখনো কখনো তীব্র ধিক্কারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবু এই দুটি শব্দের
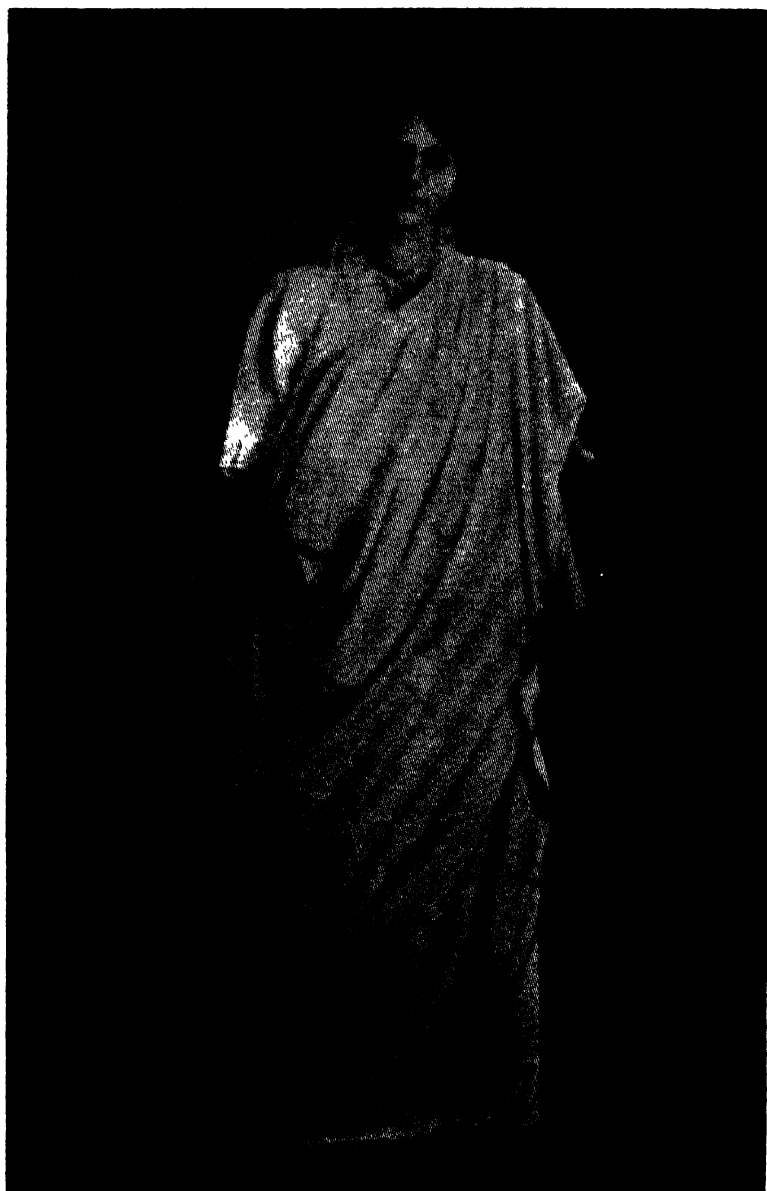
ভগিনী ক্রিস্টিন

শ্রীমতী জে. এইচ. সেভিয়ার

ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার

মাদ্রাজে শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে—ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭।
বাম থেকে দক্ষিণে দাঁড়িয়ে—আলাসিঙ্গা পেরুমল, জে. জে. গুডউইন, জনৈক।
চেয়ারে বসে—জনৈক, শিবানন্দ, বিবেকানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ ও সদানন্দ।
মাটিতে বসে—(দ্বিতীয়) বিলিগিরি আয়েঙ্গার ও (চতুর্থ) নানজুণ্ডা রাও।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ কলকাতায় শোভাবাজার রাজবাড়িতে সংবর্ধনা সভা

অন্তরালে আছে এমন এক গভীর প্রচ্ছন্ন সত্য, যা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কারণ, এই 'নিরীহ হিন্দু'-ই ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য সন্তান। সভ্যতার উন্মেষ জগতের অন্য অন্য অংশেও ঘটেছে। প্রাচীন যুগে ও আধুনিক কালে শক্তিধর বড় বড় জাতিগুলি থেকে মহান সব ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। প্রাচীন যুগে ও আধুনিক কালে এক জাতি থেকে আর এক জাতির মধ্যে আশ্চর্য সব তত্ত্বের প্রচার হয়েছে; প্রাচীনযুগে এবং আধুনিক কালে জাতীয় জীবনের বেগবতী প্রবাহ মহান সত্য ও শক্তির বীজ বহন করে নিয়ে গেছে পৃথিবীর দেশে দেশে। কিন্তু লক্ষ্য করবেন, বন্ধুগণ, এর সবকিছুই ঘটেছে যুদ্ধের হুঙ্কার ও রণোন্মত্ত সেনাবাহিনীর অভিযানের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি অভিপ্রায়কে সিক্ত হতে হয়েছে রক্তের প্লাবনে, প্রতিটি উদ্দেশ্যকে এগোতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তপিচ্ছিল পথে। শক্তিমদমত্ত প্রতিটি শব্দ লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্মভেদী হাহাকার, অনাথ অসহায়ের করুণ ক্রন্দন আর বিধবার অশ্রুজলে সিক্ত। প্রধানত এই শিক্ষাই দিয়েছে অন্যান্য জাতিগুলি; কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে ভারত অতিবাহিত করে চলেছে তার শান্তিপূর্ণ জীবন। গ্রীসের যখন অস্তিত্ব ছিল না, রোম যখন চিন্তার অতীত, আধুনিক ইউরোপের অরণ্যচারী পূর্বপুরুষেরা যেদিন নিজেদের শরীর নীলবর্ণে রঞ্জিত করতে অভ্যস্ত, সেই যুগেও ভারতের জীবন কর্মমুখর। তারও আগে ইতিহাস যখন নীরব, সেই সুদূর অতীতের অন্ধকার-ময় দিনগুলিতে কাহিনীও যখন দৃষ্টিহীনতায় আচ্ছন্ন, সেদিন থেকে আজ অবধি ভারত থেকে একের পর এক ভাবতরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে, যার প্রতিটি শব্দ সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাদমণ্ডিত। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরা কখনো বিজয়ীর অহংকার অর্জন করার চেষ্টা করিনি এবং সেই শুভবুদ্ধির ফলেই আজ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছি।

গ্রীক যোদ্ধাদের 'পদভারে কম্পিত মেদিনী'—এমনও একদিন ছিল। সেই বিপুল শক্তি আজ পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত, সেই প্রাচীন গ্রীসও আর নেই। এমন একসময় ছিল যখন রোমীয় ঈগল পৃথিবীর যা কিছু গ্রহণযোগ্য সবার উপরেই তার ডানা ঝাপটেছে, সর্বত্র অনুভূত হয়েছে, রোমের ক্ষমতা মানবসভ্যতার উপর চেপে বসেছে। রোমের নামে কেঁপে কেঁপে উঠেছে পৃথিবী। কিন্তু আজ তার ক্যাপিটোলাইন পর্বত ধ্বংসস্তূপে পরিণত, একদা সিজার-শাসিত কেন্দ্রগুলিতে আজ মাকড়সা জাল বুনে চলেছে। অনুরূপ আরও আরও গৌরবোদ্ধত জাতির উত্থান পতন এবং কিছু সময়ের জন্য কলঙ্কিত জাতীয় জীবনে স্ফীতকায় অহংকারের শাসন ও শেষ পরিণাম জলের বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যাওয়া, ইতিহাসে এসব পরিচয় আছে। এইভাবে এইসব জাতি দাগ কেটে গেছে মানবসভ্যতার বুকে। কিন্তু আমরা আজও বেঁচে আছি। এমনকি আজ যদি স্বয়ং মনু ফিরে আসতেন ভারতে, তিনি নূতন কোন দেশে এসে পড়েছেন ভেবে বিভ্রান্ত হতেন না। কারণ, সেই হাজার হাজার বছরের একই নিয়ম-কানুন রয়েছে এখানে সুচিন্তিত সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী; বহুকালের বিচার-বুদ্ধি ও বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে সেই সব রীতিনীতি চিরন্তন রূপে প্রতিভাত। যত দিন গেছে জাতির জীবনে

দুর্ভাগ্যের আঘাত নেমে এসেছে একের পর এক, কিন্তু তা শুধু আরও শক্তি, আরও অবিচল স্থিরতার উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করেছে। পৃথিবী ঘুরে এসে আমার এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে, আপনারা বিশ্বাস করুন, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান উৎসস্বরূপ যে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সঞ্চালিত হয় তা এইখানে, তা এইখানে।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের পক্ষে বিচিত্র কাজকর্মের মধ্যে ধর্ম অন্যতম কাজ মাত্র। তাদের আছে রাজনীতি, সামাজিক জীবনের আনন্দ, অর্থের বিনিময়ে যা কিছু কেনা যায় অথবা শক্তির সাহায্যে যা কিছু অর্জন করা যায়, যা কিছু ইন্দ্রিয়-ভোগ্য; কিন্তু এইসব বিচিত্র কর্মমুখিতা এবং এইসব সন্ধানবৃত্তি যাতে আছে ভোঁতা ইন্দ্রিয়গুলোকে আরও একটু শান দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি—কিন্তু এর মধ্যে ধর্মের স্থান অতি সামান্যই। কিন্তু ভারতে ধর্মই জীবনের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য। তোমাদের মধ্যে কজন চীন-জাপান যুদ্ধের খবর রাখো? হয়তো খুব কম লোকই জানে। ক'জন খবর রাখে যে, পশ্চিমী সমাজ-ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাতে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রচেষ্টা চলছে। সামান্য কিছু লোক হয়ত এ খবর রাখে। কিন্তু আমি বিস্মিত যে, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসম্মেলনে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী যোগ দিয়েছিল, এ খবর এদেশের একজন সাধারণ কুলিও রাখে। এর দ্বারা বোঝা যায়, বাতাস কোন দিকে বইছে, বোঝা যায় জাতীয় জীবনের শেকড় কোথায়। আমি দ্রুত-বিশ্বপর্যটনকারীদের লেখা বই পড়তুম, বিশেষ করে যেগুলি বিদেশীদের লেখা। এসব বইতে প্রাচ্য-বাসীদের অজ্ঞতার বিষয়ে প্রচুর বিলাপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি দেখেছি, এগুলির আংশিক সত্য এবং আংশিক অসত্যও। যদি তুমি ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স অথবা জার্মানীর কোন চাষীর কাছে জানতে চাও সে কোন দলের লোক, তাহলে সে র‍্যাডিক্যাল অথবা রক্ষণশীল দলের লোক কিনা অথবা সে কাকেই বা ভোট দিতে চায় একথা বলতে পারবে। যদি আমেরিকাবাসী হয়, বলতে পারবে সে রিপাব্লিকান অথবা ডেমোক্রাট দলের লোক কিনা। এমনকি অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তার কিছু কিছু জানা আছে। কিন্তু তুমি যদি তাকে ধর্মের বিষয়ে কিছু জানতে চাও, সে শুধু তার গির্জায় যাওয়ার কথা এবং সে নিজে কোন্ শ্রেণীভুক্ত লোক, শুধু এইটুকুই বলতে পারবে। এইমাত্র তার জ্ঞানের পরিধি এবং সে মনে করে যে, এটাই যথেষ্ট।

কিন্তু ভারতবর্ষে যদি একজন সাধারণ চাষীকে প্রশ্ন করা হয়, সে রাজনীতি সম্পর্কে কিছু জানে কি না, সে জবাব দেবে, 'সে আবার কী!' সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বা পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে তার কিছুই জানা নেই। এসব কথা সে জীবনে কোনদিন শোনেনি। সে শুধু কঠিন পরিশ্রম করে নিজের রুজি রোজগার করে। কিন্তু তাকে যদি তার ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে সে বলবে, 'দেখ বন্ধু, এটা আমার কপালেই চিহ্নিত।' ধর্মবিষয়ে সে দু-একটি ভাল ইঙ্গিতও দিতে পারে। এই হল আমার অভিজ্ঞতা। এই আমাদের জাতির জীবন।

প্রতিটি স্বতন্ত্র মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি মানুষের আছে নিজস্ব বিকাশের পদ্ধতি। আমরা, হিন্দুরা বলে থাকি, মানুষের জীবন তার অনন্ত পূর্বজন্মের

কর্মানুসারে নির্দিষ্ট। এ জগতে তাকে তার অতীত জন্মসমূহের কর্মফল নিয়েই আসতে হয়, যে অনাদি অতীত রচনা করে তার বর্তমান জীবনের ভূমিকা, আবার যে বর্তমানের গর্ভে থাকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম। তাই দেখা যায়, প্রতিটি মানুষের একটা বিশেষ প্রবণতা থাকে, যেন তার বেঁচে থাকার জন্য একটা বিশেষ লক্ষ্যে তাকে চলতেই হবে। একথা একজন মানুষের পক্ষে যেমন সত্য, যে কোন একটি জাতির পক্ষেও তেমন সত্য। প্রত্যেক জাতির চরিত্রের বিশেষ প্রবণতা ও বিশেষ উদ্দেশ্য দেখা যায় এবং তার সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এ জগতে তাকে কাজ করে যেতে হয়।

আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য কোনদিনই রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠতা বা সামরিক শক্তি অর্জনের পক্ষে নয়, কোনদিন তা ছিলও না। আর, জেনে রাখো, কোনদিনই তা হবে না। কিন্তু আমাদের আরও মহৎ উদ্দেশ্য আছে; জাতীয় জীবনের সবটুকু আধ্যাত্মিক প্রতিভাকে একটি শক্তির আধারে সুরক্ষিত, অক্ষুণ্ণ ও সঞ্চিত করে রাখা, তারপর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে সারা পৃথিবীতে সেই সংরক্ষিত শক্তির প্লাবন ঘটিয়ে দেওয়া। পারসিক, গ্রীক, রোমান, আরব অথবা ইংরেজরা পৃথিবী জয়ের জন্য তাদের সৈন্যবাহিনীর অভিযান পরিচালনা করুক, রচনা করুক বিভিন্ন জাতির মিলনসূত্র, তবু ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মশক্তি নব নব পথে জগতের অন্যান্য জাতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে প্রস্তুত থাকবে। মানবসভ্যতার সামগ্রিক উন্নতির জন্য হিন্দুর শান্ত মস্তিষ্ক অবশ্যই তার ভূমিকা পালন করে যাবে, কারণ, আধ্যাত্মিক আলোকই জগতে ভারতের দান।

অতীতের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখি, যখনই কোন প্রবল পরাক্রান্ত জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে, সেই সঙ্গে বহির্জগৎ থেকে প্রায়-বিচ্ছিন্ন ভারতকেও তার নিঃসঙ্গ একাকীত্ব ঘুচিয়ে সেই বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছে। আর, যখনই তা ঘটেছে, তখনই প্রয়োজন হয়েছে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গের বন্যাস্রোত। এই শতকের সূচনায় বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার প্রাচীন পারসিক থেকে একজন তরুণ ফরাসী কৃত ল্যাটিন ভাষায় বেদের যে অনুবাদ পাঠ করেছিলেন তা খুব নির্ভরযোগ্য নয়, তবু বলেছিলেন, "সারা পৃথিবীতে উপনিষদের মত এমন হিতকারী, এমন উন্নত গ্রন্থ আর নেই। এই গ্রন্থ জীবিতাবস্থায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, শান্তি দেবে মৃত্যুর মুহূর্তেও।" এই বিখ্যাত দার্শনিক ভবিষ্যৎ উক্তি করেছিলেন এই বলে, "গ্রীক সাহিত্যের নবজাগরণ ইউরোপের চিন্তাজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার চেয়েও এক ব্যাপক শক্তিশালী আবর্তন অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে জগতের মানুষ।" আজ শোপেনহাওয়ারের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। জাগ্রত দৃষ্টিসম্পন্ন সেইসব ব্যক্তি যাঁরা পাশ্চাত্যবাসীদের মনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, যাঁরা চিন্তাশীল ও বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে অনুসন্ধান রাখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ভারতীয় চিন্তা তার ধীর বিরামহীন পরিব্যাপ্তি দ্বারা

কিভাবে জাগতিক ছন্দ, অগ্রগতি, ধরনধারণ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন সাধন করতে চলেছে।

এছাড়া আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি। আমরা কখনও আমাদের চিন্তাধারার প্রসারের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র অথবা তলোয়ারের সাহায্য গ্রহণ করিনি। জগতে ভারতের দান ও মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাবকে প্রকাশ করতে পারে এমন কোন উপযুক্ত শব্দ ইংরেজী ভাষায় যদি থাকে তবে তা হল fascination বা আকর্ষণ। এই আকর্ষণ হঠাৎ ঘটে না, বরং অদৃশ্য থেকে মানুষের মনোজগতে তার ক্রিয়া শুরু করে। অনেকের নিকট ভারতীয় চিন্তাধারা, ভারতীয় রীতিনীতি, ভারতীয় প্রথাসমূহ, ভারতীয় দর্শন প্রথম দৃষ্টিপাতেই বিতৃষ্ণার কারণ হতে পারে, কিন্তু তাঁরা যদি অধ্যবসায়ের সঙ্গে এগুলি পাঠ করেন ও ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন, তবে তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বুই জনকেই মুগ্ধ হতে হবে। সকালবেলার নম্র শান্ত শিশিরবিন্দুর অদৃশ্য অশ্রুত অথচ বিস্ময়কর ফলদানের মতো এই ধীর স্থির সহিষ্ণু আধ্যাত্মিক জাতি চিন্তাজগতে নিঃশব্দে তার কাজ করে চলেছে।

আবার ঘটতে চলেছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আধুনিক বিজ্ঞানের উগ্র আবিষ্কারগুলির প্রচণ্ড আঘাতের ফলে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসসমূহের শক্ত বনিয়াদ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে স্বমতের অনুগামী করার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় এ যাবৎ যেসব দাবি উপস্থাপিত করেছিল, সেগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর মতো শূন্যে বিলীন হওয়ার পথে। আজ যখন আধুনিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা বা অতীত যুগের তথ্যাদি আবিষ্কারের ফলে সব রকম প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীলতা হাতুড়ির কঠিন আঘাতে চীনে-মাটির বাসনের ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, এদিকে পশ্চিমী দুনিয়ায় জ্ঞানীগুণীদের ধর্ম-সংক্রান্ত সবকিছুর উপর নিদারুণ অবজ্ঞার জন্য অজ্ঞান মূর্খদের হাতে ধর্মের বন্ধনদশা, এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনমানসের ব্যাকুল ধর্মবাসনার প্রদর্শক ভারতীয় দর্শন, যার মহত্তম সত্যাদর্শের মধ্যে সর্বসাধারণের বাস্তব ধর্মবোধ নিহিত, আজ জগতের পাদপ্রদীপের আলোতে উপস্থিত। অসীম বিশ্বের একত্ব, নৈর্ব্যক্তিকতা, শাশ্বত আত্মার অবিচ্ছিন্ন গতিধারা ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত মহিমা প্রভৃতি বিস্ময়কর তত্ত্বসমূহ আজ স্বভাবতই ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রাচীন সম্প্রদায়গুলির ধারণা ছিল যে, এই পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র কর্দমাক্ত গর্ত আর সময় শুরু হয়েছে মাত্র সেদিন থেকে। অনন্ত প্রসারিত কাল স্থান ও কারণের মহিমান্বিত তত্ত্ব ও সর্বোপরি মানবাত্মার অক্ষয় গরিমার বিষয়, যা শুধু আমাদেরই প্রাচীন পুঁথিপত্রে লিপিবদ্ধ ও যা মানুষের ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসাকে চিরকালই পরিচালিত করেছে। যখন আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ ও শক্তির নিত্যতা ইত্যাদি তত্ত্বগুলির প্রচণ্ড আঘাতে পৃথিবীর সবরকম অপরিণত ঈশ্বরতত্ত্বের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তখন মানবাত্মার অনবদ্য অবদান ঈশ্বরের অলৌকিক বাণীস্বরূপ বেদান্তের অপূর্ব, যুক্তিগ্রাহ্য, উদার ও উন্নত ভাবধারা অপেক্ষা কৃষ্টিসম্পন্ন আর কিছু মানবসমাজের শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে?

এই সঙ্গে একথাও আমি বলতে চাই যে, ধর্ম অর্থে এখানে আমি বোঝাতে চেয়েছি আমাদের আদর্শের মৌলিকতা, তার পটভূমি ও যে ভিত্তির উপর আমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সেইগুলি। ধর্মের অতি সূক্ষ্ম গঠনপ্রণালী, সামাজিক প্রয়োজনে শত শত বছর ধরে যে তুচ্ছবিষয়গুলি সম্প্রসারিত হয়েছে, তুচ্ছ আচার-বিচার, নানারকম প্রথা এবং সমাজকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্ষুদ্র যুক্তিতর্ক ইত্যাদি 'ধর্ম' এই সংজ্ঞার মধ্যে স্থান লাভ করতে পারে না। আমরা জানি আমাদের শাস্ত্রে দু'রকম সত্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে। একটি চিরকালীন সত্য—যা মানুষ ও তার আত্মার স্বরূপ, আত্মা ও ঈশ্বরের সম্পর্ক, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব প্রভৃতি এবং সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে পরিকল্পিত বিকাশ ও আবর্তনশীল যুগপ্রবাহ সম্পর্কে অপূর্ব তত্ত্ব প্রভৃতির চিরন্তন আদর্শসমূহ প্রকৃতিগত নিখিল বিশ্বসৃষ্টির সর্বব্যাপী নিয়মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অপর তত্ত্বটির মধ্যে আছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পরিচালন পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সমষ্টি। এগুলি শ্রুতির অন্তর্গত নয়, স্মৃতি বা পুরাণের অন্তর্গত। আমাদের মূল আদর্শগত তত্ত্বের সঙ্গে এগুলির কোন সম্পর্ক নেই। এমন কি আমাদের নিজেদের জাতির মধ্যেও এইসব ছোট ছোট নিয়ম পদ্ধতির নিয়ত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এক যুগের বিধান অন্য যুগে প্রযোজ্য নয়, কারণ যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে পূর্বেকার বিধানগুলিরও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। যুগে যুগে মহান ঋষিরা আবির্ভূত হন, নূতন পরিবেশ ও কালের উপযোগী নূতন প্রথা ও আচার-ব্যবহারের নির্দেশ দান করেন। মানুষ, ঈশ্বর ও জগতের অসীম মহৎ উত্তরণের পথে বিপুল বিস্তৃত ধ্যান-ধারণার অপূর্ব তত্ত্বসমূহের বিরাট আদর্শ ভারতেই জন্মলাভ করেছে। "আমার দেবতা সত্য, তোমার দেবতা মিথ্যা" পরে "লড়াই করে এর ফয়সালা করা যাক"—এই কথা বলে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা উপজাতীয় দেবতার জন্য একমাত্র ভারতেই মানুষ কোনদিন যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাকে কেন্দ্র করে লড়াই বাধিয়ে দেওয়ার ধারণা এদেশের মানুষের কোনদিনই ছিল না। মানুষের অক্ষয় মহিমার ভিত্তির উপর স্থাপিত হাজার হাজার বছর আগেকার মহান আদর্শগুলি মানবজাতির কল্যাণের জন্য আগেও যেমন অখণ্ডনীয় ছিল, আজও ঠিক তাই আছে। যতদিন আমরা স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে জন্ম নেব এবং নিজ নিজ শক্তির সাহায্যে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিতে সচেষ্ট থাকব, ততদিন ভারতের মহান আদর্শগুলি অব্যাহত থাকবে।

সবার উপরে ভারত জগৎকে কি দিতে পারে? বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা লক্ষ্য করে আমরা দেখতে পাই, শুরু থেকেই প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজের নিজের দেবতা ছিল। এরা যখন নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ থেকেছে তখন এই সব দেবতাদের একটি সাধারণ নামে অভিহিত করা হোত; যেমন ছিল বেবিলনের সব দেবতা। বেবিলনীয়রা অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাদের দেবতাদের ডাক হোত 'বল' (Baal) এই সাধারণ নামে, যেমন ইহুদীদের ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন দেবতার একটি সাধারণ নাম ছিল 'মোলক' (Moloch)। এই সঙ্গে দেখা গিয়েছে, এদের মধ্যে কোন একটি শ্রেণী যদি

অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে প্রাধান্য অর্জন করতে পারত তাহলে সেই শ্রেণীর রাজাকে সব শ্রেণীর রাজা বলে স্বীকার করে নেওয়ার দাবি উপস্থাপিত হোত। খুব স্বাভাবিক কারণে প্রধান শ্রেণীর দেবতাকেও আর সব শ্রেণীর দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস মাথা তুলে দাঁড়াত। বেবিলনীয়রা বলত যে, আর সব দেবতা নিকৃষ্ট, 'বল মেরোডাক' সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'মোলক ইয়াভে'ই আর সব মোলক দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এই দাবি ছিল ইহুদীদেরও। শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আসন নির্ণয়ের মীমাংসা হোত যুদ্ধক্ষেত্রে। একই সমস্যা আমাদের দেশেও ছিল। ভারতেও দেবতাদের পরস্পরের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠতা অর্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু ভারত তথা জগতের মহাসৌভাগ্য যে, সব কোলাহল ও বিভ্রান্তির কুয়াশা ভেদ করে এক অমোঘ বাণীর মধ্যে ধ্বনিত হল সেই সুর "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—অর্থাৎ একমাত্র তিনিই বিদ্যমান, মুনি-ঋষিরা তাঁকে নানা নামে অভিহিত করেন। একথা ঠিক নয় যে, শিব বিষ্ণু অপেক্ষা বড়, এমনও নয় যে বিষ্ণুই সব, শিব কিছুই নয়। শিব বা বিষ্ণু অথবা আরও একশো নামে ডাকা হলেও তিনি সেই এক ঈশ্বর। এ শুধু নামের বিভিন্নতা, তিনি এক অভিন্ন। এই কটি কথার মধ্যে আছে সমগ্র ভারতের ইতিহাসের ছবি। একই মূলতত্ত্ব প্রবল শক্তিতে ও ভাষায় বারংবার উচ্চারিত হয়েছে ভারতের বিস্তৃত ইতিহাসের পাতায়। যতদিন না এই মূলতত্ত্ব প্রতিটি রক্তবিন্দুর সঙ্গে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে জাতির রক্তে মিশে জীবন গঠনের অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে, ততদিন বারবার ঘোষিত হয়েছে এই তত্ত্ব। এক অপূর্ব সহিষ্ণু দেশে রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমি, সাদরে অন্য ধর্ম অন্য সম্প্রদায়কেও স্থান দিতে পেরেছে তার উদার বুকে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈরাশ্যজনক পরস্পরবিরোধিতা সত্ত্বেও সহাবস্থানের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্যের অস্বাভাবিকতা এদেশে দেখা দেখা যায়, তার ব্যাখ্যা উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। তুমি একজন দ্বৈতবাদী আর আমি একজন অদ্বৈতবাদী হতে পারি, তুমি নিজেকে ঈশ্বরের এক চিরন্তন সেবক, আর আমি নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন মনে করতে পারি, তবুও আমরা যে সাচ্চা হিন্দু এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। এটা কি করে সম্ভব? আবার সেই কথা "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—একমাত্র তিনিই বিদ্যমান, মুনি-ঋষিরা তাঁকে নানা নামে অভিহিত করেন। হে আমার স্বদেশবাসী, আর সবকিছুর ওপর পৃথিবীকে আমরা এই মহান সত্যটুকু শেখাব। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে নাসিকা কুঞ্চিত করে অন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিক আখ্যা দিয়ে কটাক্ষ করে থাকে। আমি এটা দেখেছি; অথচ তাদের নিজেদের মগজ কতটা গোঁড়ামিতে ভরে আছে, এটা তারা কোনদিনই ভেবে দেখেনি। প্রায় সবস্থানেই এই ধরনের গুরুতর গোঁড়ামি ও মানসিক সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাদের ধারণা, মূল্যবান যা কিছু তাদেরই এক্তিয়ারে, ধনদৌলত অর্থ উপার্জনের আরাধনাই জীবনের একমাত্র সাধনা; যেটুকু পার্থিব সম্পদ তাদের দখলে, তাই একমাত্র বিবেচ্য, আর সব বাজে। যদি কেউ মাটি দিয়ে যা হোক একটা কিছু বানাতে পারে, অথবা আবিষ্কার করতে পারে একটা কল (machine), তাহলে মূল্যবান আর সবকিছুর উর্ধ্বে এটিই প্রশংসা প্রাপ্য। শিক্ষা

দীক্ষা সত্ত্বেও জগৎ জুড়ে এই ব্যাপারই চলছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার এখনও অনেক বাকি, আর সভ্যতার শুরু তো হয়নি কোথাও বলতে গেলে। এখনও মনুষ্যজাতির শতকরা নিরানব্বই দশমিক ন' ভাগ কমবেশি আদিম অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয়ে বইতে পড়া অথবা শোনা গেলেও, প্রকৃতপক্ষে এগুলির অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। শতকরা নিরানব্বই জন এসব ব্যাপারে চিন্তা করে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর যেসব দেশে আমি গিয়েছি, তার প্রায় প্রতিটিতেই দেখেছি, ধর্মের নামে কী অত্যাচারই না চলছে! শিক্ষণীয় নূতন কিছুর বিরুদ্ধে সেই চিরকেলে আপত্তি এখনও প্রবল। জগতে কোথাও যদি সহিষ্ণুতা ও ধর্মের প্রতি সহানুভূতি এখনও থাকে, তবে তা আমাদের দেশ এই আর্যভূমি ছাড়া আর কোথায় আছে? এখানে ভারতীয়রা মুসলমানদের মসজিদে ও খ্রীশ্চানদের গীর্জা তৈরি করে দেয়, যা আর কোথাও নেই। তুমি যদি অন্য দেশে গিয়ে মুসলমান বা ভিন্ন ধর্মের লোকেদের তোমার জন্য একটি মন্দির তৈরি করে দিতে বলো, তাহলে সাহায্যের নমুনা কেমন বুঝতে পারবে। তারা বরং তোমার তৈরী মন্দিরটাই ভেঙে দেবে, এমনকি তোমাকেও শেষ করে দিতে পারে। যে উদার শিক্ষা জগতের পক্ষে আজ চূড়ান্ত প্রয়োজন তা হল ভারতের সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির আদর্শ। 'মহিম্নঃ স্তোত্রে' এই কথাগুলি পাওয়া যাবে—"ভিন্ন ভিন্ন নদী ভিন্ন ভিন্ন পর্বত থেকে নির্গত হয়ে সরল অথবা কুটিল যে পথেই বয়ে যাক্ না কেন, তাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল সমুদ্র; হে শিব, নানা মত ও পথের মানুষ সরল অথবা কুটিল যে পথে চলুক না কেন, তাদের একমাত্র লক্ষ্য তুমি।" কেউ কেউ সোজা, কেউ কেউ বাঁকা পথ ধরে যেতে পারে, কিন্তু সকলকে শেষে সেই এক ঈশ্বরের নিকট পৌছতে হবে। একমাত্র তখনই তোমার শিবভক্তির সম্পূর্ণতা, যখন তাঁকে তোমরা শুধু শিবলিঙ্গে নয় সর্বত্র বিরাজমান দেখবে। যিনি হরিভক্ত, যিনি সকল জীব ও সকল জন্তুর মধ্যে হরিদর্শন করেন, তিনিই মহাজ্ঞানী। তুমি যদি প্রকৃতই শিবভক্ত হও, তবে সকল বস্তু ও জীবের মধ্যে তুমি তাঁকে দর্শন করবে। তোমরা নিশ্চয়ই জেনো, যে কেউ যে কোন নামে বা যে কোন ভাবে অর্চনা করুক না কেন, সব তাঁরই অর্চনা, তাঁরই উপাসনা। কাবার দিকে নতজানু হয়ে অথবা কেউ যদি গীর্জা বা বুদ্ধমন্দিরে নতজানু হয়ে উপাসনা করেন, অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে তিনি তাঁরই উপাসনা করেন। যে কোন নামের উদ্দেশে, যে কোন আকারে অঞ্জলি দেওয়া হোক্ না কেন, সকলের একমাত্র প্রভু, সকল আত্মার একমাত্র আত্মা সেই তাঁরই পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া। তোমার আমার অপেক্ষা জগতের প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁর জানার সীমা অনেক বেশি ভাল। একথা অসম্ভব যে, পৃথিবী থেকে সব ব্যবধান ঘুচে যাবে। এ তো থাকবেই। বৈচিত্র্যহীন জীবন তো জীবনের থেমে যাওয়া। চিন্তাজগতে পার্থক্যহেতু সংঘাত থেকে জ্ঞান, গতিময়তা, সবকিছুরই উৎপত্তি। জগতে পার্থক্য থাকবে, থাকবে প্রতিবাদের যোগ্য অসংখ্য বিষয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পরস্পরকে ঘৃণা করতে হবে, কিংবা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন আছে।

অতএব, একদিন আমাদের এই মাতৃভূমিতে যে মৌলিক সত্যের উদাত্ত ঘোষণা

হয়েছিল, আজ আবার আমাদের সেই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে, সেই সত্য পৃথিবীকে নুতন করে শোনাতে হবে। কেন? কারণ, আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে এই সত্যের প্রবহমান গতি শুধুমাত্র পুঁথিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। যে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন, একমাত্র আমাদের দেশেই প্রতিদিনের জীবনে এই সত্য ঘটে চলেছে। আর সবাইকে এইভাবেই আমাদের শিক্ষা দিতে হবে। উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য আরও অনেক কিছু ভারত দিতে পারে, তবে সেসব শুধুমাত্র বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য। জাতি বর্ণ মত নির্বিশেষে, নারী পুরুষ শিশু নির্বিচারে, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই ভারতের নম্রতা, অমায়িকতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের গুণাবলী গ্রহণ করতে পারে।—"তোমাকে যে নামেই ডাকি না কেন, তুমি সেই এক।"

বেদান্তবাদ

[শ্রীলঙ্কার অন্তর্ভুক্ত জাফ্‌নার হিন্দু জনসাধারণ স্বামী বিবেকানন্দকে যে স্বাগত ভাষণ জানান নিম্নে তার উদ্ধৃতি দেওয়া হল]

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী
শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

সিংহলের হিন্দু অধিবাসীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল জাফ্‌নার হিন্দুধর্মভুক্ত অধিবাসী আমরা, আমাদের দেশে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে লঙ্কাদ্বীপের এই অংশ পরিদর্শনে সম্মত হয়েছেন, এজন্য আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা দু' হাজার বছরেরও আগে দক্ষিণ ভারত থেকে এদেশে এসে বসবাস করেছিলেন, সঙ্গে এনেছিলেন তাঁদের ধর্ম। এই ধর্ম প্রতিপালনের ব্যাপারে জাফ্‌নার তামিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতাও তাঁরা পেয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তামিল রাজাদের সরকার পর্তুগীজ ও ডাচ্‌দের দ্বারা অপসারিত হওয়ায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল, প্রকাশ্য পূজা উপাসনাদির উপর জারি করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা, দুটি বহু বিখ্যাত স্মৃতিতীর্থসহ পবিত্র মন্দির-গুলিকে অত্যাচারীরা নিষ্ঠুর হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। এই সব জাতি আমাদের পূর্বপুরুষদের মাথায় খ্রীশ্চানধর্ম জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়ার ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের পুরাতন বিশ্বাস দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ছিলেন এবং সেই বিশ্বাসের মহত্তম উত্তরাধিকার আমাদের অর্পণ করে গিয়েছেন। এখন ইংরেজ শাসনের অধীনে বিরাট ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন ঘটেছে শুধু নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির পুনরুদ্ধারও সম্ভব হয়েছে।

আপনি বেদে উদ্‌ঘাটিত সত্যের আলো ধর্ম-মহাসম্মেলনে পৌছে দিলেন, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে ভারতের পবিত্র তত্ত্ববিদ্যার সত্য মহিমা প্রচার করে এবং পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সত্যাদর্শের পরিচয় ঘটিয়ে পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে নিয়ে এলেন; আমাদের ধর্মের প্রয়োজনে আপনার এই মহান ও নিরাসক্ত কষ্ট স্বীকারে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বস্তুতান্ত্রিক যুগ যখন বিশ্বাসের অধঃপতন ও আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা শুরু হয়েছে, তখন আপনি আমাদের প্রাচীন ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন, এজন্যও আপনাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনার ঋণ স্বীকার করার মত প্রকাশযোগ্য ভাষা আমাদের নেই। আপনি পশ্চিমের জনসাধারণকে শেখালেন আমাদের ধর্মের উদারতা ও বিদ্বান মানুষদের মনে এই প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেন যে, পাশ্চাত্য দর্শনে যা কল্পিত, প্রাচ্য দর্শনে তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য নিহিত।

পাশ্চাত্যে আমাদের ধর্মের জন্য আপনার শুভ উদ্দেশ্যের সার্থকতা ও ঐকান্তিক

অনুরাগযুক্ত শ্রমের সাফল্য আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করে আমরা অন্তরে আনন্দ অনুভব করেছি। পাশ্চাত্যের বিদ্যাবুদ্ধির, নৈতিক ক্রমোন্নতির ও ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসার পীঠস্থানগুলি থেকে সংবাদপ্রচারের মাধ্যমে সমাজের ধর্মীয় সাহিত্যে আপনার মূল্যবান অবদানের সপ্রশংস উল্লেখ আপনার বিরাট ও মহান অবদানেরই স্বীকৃতি।

বেদই যে সব আধ্যাত্মিক সত্য ও জ্ঞানের ভিত্তি, এ বিষয়ে আমরা, যারা আপনার সঙ্গে একই মত পোষণ করি, আজ আমাদের এই দেশ পরিদর্শনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং এই আশা পোষণ করি যে বিভিন্ন উপলক্ষে আপনাকে আরও বহুবার আমাদের মধ্যে পাওয়ার সুযোগ পাব।

ঈশ্বর আপনার মহান পরিশ্রমকে সাফল্যের মুকুট-ভূষিত করেছেন, তিনি আপনার দীর্ঘজীবন ও আপনার পরম ধর্মীয় উদ্দেশ্য অব্যাহত রাখার জন্য বীর্যবান প্রাণশক্তি দান করুন!

শ্রদ্ধা-নমস্কারান্তে।

আপনার বিশ্বস্ত

জাফ্‌নার হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষে ঃ

স্বামীজীর বক্তব্য

একটিমাত্র বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের পূর্ণ বিশ্লেষণের পক্ষে বিষয়টি অতি বৃহৎ এবং সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সুতরাং, আমি যত সরল ভাষায় সম্ভব ধর্মের প্রধান প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আজকাল যে রীতি অনুযায়ী আমরা নিজেদের 'হিন্দু' নামে অভিহিত করে থাকি, তার সব অর্থই মূল্যহীন; যেহেতু যারা একদিন ইন্দাস্ (সংস্কৃত ভাষায় সিন্ধু) নদীর অন্তুতীরে বসবাস করত এই শব্দটি কেবল তাদেরই বোঝাত। হিন্দু শব্দটি প্রাচীন পারসিকদের উচ্চারণ বিকৃতি; সিন্ধুর অপর পারে যারা বাস করেছিল তাদের সবাইকে তারা হিন্দু বলতো। এই ভাবেই শব্দটি এসেছে, আর মুসলমানদের শাসনকালে আমরা নিজেরাই শব্দটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি। অবশ্য, এই শব্দটি ব্যবহার করলে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করি না, যদিও এটি তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তোমরা লক্ষ্য করে থাকতে পার, আধুনিক কালে সিন্ধুর এপারে যারা বাস করছে, তারা প্রাচীনকালের মত একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই, এই শব্দটি কেবল হিন্দুদেরই বোঝায় না, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন এবং আরও যারা ভারতবর্ষে বাস করে তাদেরও বোঝায়। আমি এখানে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না। তাহলে কোন্ শব্দ ব্যবহার করব? আর আর শব্দের মধ্যে হয় আমরা 'বৈদিক' শব্দটি (যারা বেদের অনুগামী) অথবা তার চেয়েও ভাল হয়, যদি 'বৈদান্তিক' শব্দটি (যারা বেদান্তের অনুগামী) ব্যবহার করি। পৃথিবীর বড় বড় সব ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট ধর্মপুস্তকের আনুগত্য স্বীকার করে, যেহেতু, তারা বিশ্বাস করে, তাদের গ্রন্থগুলি ঈশ্বর স্বয়ং অথবা কোন অতি-প্রাকৃত শক্তির বাণী, যা তাদের ধর্মের ভিত্তি রচনা করেছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক মনীষীদের মতে সব ধর্মগ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদের বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব, বেদ সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণার প্রয়োজন আছে।

যে পুঞ্জীভূত শব্দমালাকে বেদ বলা হয়, তা কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির উক্তি নয়। আমাদের মতে বেদ শাশ্বত, এর কোন নির্দিষ্ট তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি, কোনদিনই সম্ভব হবে না। একটি বিশেষ বিষয় তোমাদের মনে রাখতে বলি, পৃথিবীর আর সব ধর্ম দাবি করে যে, তাদের ধর্মগ্রন্থ স্বয়ং ঈশ্বর, দেবদূত অথবা ঈশ্বর প্রেরিত বার্তাবহদের বাণী, সে দিক থেকে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু হিন্দুদের দাবি এই যে, বেদ অন্য কোন প্রমাণের নিকট ঋণী নয়, নিজেই নিজের প্রমাণ, বেদ চিরন্তন ঈশ্বরের জ্ঞান। বেদ লিখিত নয়, সৃষ্ট নয়, কালের আদি অন্তহীন সীমায় প্রসারিত সৃষ্টির মত অনন্ত অমর। ঈশ্বরের জ্ঞানের মত এরও শুরু নেই, শেষ নেই। বেদের অর্থ এই জ্ঞানকে জানা। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বেদান্ত নামক জ্ঞানসমষ্টির আবিষ্কর্তা। এই জ্ঞান তাঁরা নিজেদের চিন্তার সাহায্যে সৃষ্টি করেন নি, প্রত্যক্ষ করেছেন। যখনই শোনা যায়, বেদের কোন বিশেষ অংশ বিশেষ কোন ঋষির বিচার, কখনো মনে করো না যে, ঐ অংশটি তাঁরই রচনা অথবা তাঁর মনের সৃষ্টি। যে ভাবসমষ্টি এই বিশ্বজগতে অনাদিকালের বুকে লিপিবদ্ধ, তিনি মাত্র তার আবিষ্কারক। ঋষিগণই আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কর্তারূপে পরিগণিত।

কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড :এই দুটি ভাগে বেদ মূলত বিভক্ত। কর্মকাণ্ডে আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলি ও জ্ঞানকাণ্ডের আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের উল্লেখ আছে। কর্মকাণ্ডের মধ্যে বহুবিধ যাগযজ্ঞ হোম ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ থাকলেও পরে যুগোপযোগী নয় বলে ঐগুলির মধ্য থেকে অনেক কিছুই বর্জন করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য অংশ কোন না কোন ভাবে এখনও চলছে। কর্মকাণ্ডের প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে সাধারণ মানুষ, ছাত্র, গৃহী, সন্ন্যাসী এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ কম-বেশি আজও পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়ে আসছে। বেদের দ্বিতীয় ভাগ আমাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশ সংবলিত জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ বেদের শেষভাগ, সারমর্ম, শেষ লক্ষ্য 'বেদান্ত'। বেদান্ত বা উপনিষদই বেদতত্ত্বের সারাংশ। ভারতের সব সম্প্রদায়, যেমন—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদীবা শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত যে কোন সম্প্রদায় হোক্ না কেন তাদের সকলকে বেদের এই উপনিষদ অংশ স্বীকার করতে হবে। নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তারা উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু এর প্রাধান্য তাদের গ্রাহ্য করতেই হবে। এইজন্য আমরা 'বৈদান্তিক' বা বেদান্তবাদী শব্দ 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করতে চাই। ভারতের সব রক্ষণশীল দার্শনিককেই বেদান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করতে হয়েছে। আজকাল আমাদের ধর্মের কোন কোন অংশ অমার্জিত ও তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অযৌক্তিক মনে হলেও আরও গভীরে বিচার করলে দেখা যাবে তাদের ভাবধারার সন্ধান উপনিষদের মধ্যেই আছে। উপনিষদ জাতির মর্মের গভীরে এতদূর বিস্তৃত যে, কোন অমার্জিত শাখার উপাসনা-পদ্ধতি তোমরা অনুসন্ধান করলে বিস্মিত হবে,—উপনিষদের রূপকময় উদাহরণ বা তত্ত্বগুলি কখনো কখনো তাদের ধর্মে প্রতীকি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। উপনিষদের মহান আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবধারা আজ আমাদের পূজাগৃহে প্রতীকের মধ্যে রূপান্তরিত। আমাদের ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ বেদান্তে রূপকভাবে বর্ণিত ভাবধারা থেকেই এসেছে, আর এই ভাবধারা জাতির সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রতীকরূপে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে।

বেদান্তের পর স্মৃতি। যদিও স্মৃতি মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদের রচিত গ্রন্থ, তবু এগুলির যাথার্থ্য বেদেরই আশ্রিত, যেহেতু স্মৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সেই রকমই যে রকম সম্পর্ক অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তাদের ধর্মগ্রন্থগুলির। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেভাবে রচিত হয়েছে, সেভাবে বিচার করলে স্মৃতিও বিশেষ কয়েকজন মহাজ্ঞানীর রচনা, একথা আমরা স্বীকার করি। স্মৃতিই শেষ কথা নয়। স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু যদি থাকে, যা বেদান্তের বিরোধী তবে তা বাতিল বলে গণ্য করা হবে, তার যাথার্থ্য হবে মূল্যহীন। আবার দেখা যায়, এক যুগ থেকে আর এক যুগে স্মৃতির রূপান্তর ঘটেছে ; যেমন, কোন স্মৃতি সত্যযুগে, কোন স্মৃতি ত্রেতাযুগে, কোন স্মৃতি দ্বাপরযুগে, কোন স্মৃতি কলিযুগের ক্ষেত্রে উপযোগী। একদিন যে অবস্থা অপরিহার্য ছিল তার রূপান্তরের সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবাধীন জাতের রীতিনীতি ও প্রথা ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য ; যেহেতু সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাগুলি স্মৃতির কর্তৃত্বাধীন, তাই

সময় থেকে সময়ান্তরে স্মৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। এই কথাটি বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য। বেদান্তের ধর্মীয় আদর্শগুলি অপরিবর্তনীয়। কেন? মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার শাশ্বত নীতির উপর সেগুলির প্রতিষ্ঠা। তার পরিবর্তন হতে পারে না। আত্মা, স্বর্গারোহণ প্রভৃতি তত্ত্বগুলির কখনো পরিবর্তন হবে না। হাজার হাজার বছর আগে ঐ তত্ত্বগুলির যে মূল্য ছিল, এখনও তাই, লক্ষ লক্ষ বছর পরেও একই থাকবে। কিন্তু যে সকল ধর্মীয় কার্যকলাপ সামাজিক পরিস্থিতি ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সেগুলিরও পরিবর্তন হতে বাধ্য। কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ নিয়ম মঙ্গলদায়ক এবং সত্য হলেও অন্য সময় তা নাও হতে পারে। তাই, দেখা যায়, কোন একটি খাদ্যবস্তু কোন বিশেষ সময়ে গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলেও অন্য সময় ঐ খাদ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, যে সময় ঐ খাদ্যবস্তু গ্রহণের উপযোগী ছিল, পরে জলবায়ুর পরিবর্তন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য স্মৃতি ঐ খাদ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থা করেছেন। স্বাভাবিক কারণে যদি আধুনিক কালে আমাদের কোন সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা যায়, তাহলে মুনি-ঋষিরা এসে পথের নির্দেশ দেবেন, কিন্তু কোন কারণেই আমাদের ধর্মের মূল সত্যাদর্শের এক ফোঁটাও পরিবর্তন হবে না, সেগুলি পূর্বের মতই অব্যাহত থাকবে।

তারপর পুরাণের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। পুরাণ পাঁচটি গুণ সমন্বিত। ইতিহাস, সৃষ্টিবিষয়ক তত্ত্ব, প্রতীকের সাহায্যে দার্শনিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় ইত্যাদি পুরাণের বিষয়বস্তু। বেদোক্ত ধর্মকে জনপ্রিয় করার জন্যই পুরাণের সৃষ্টি। বেদের ভাষা এত প্রাচীন যে খুব কমসংখ্যক পণ্ডিতের পক্ষে এর সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। পুরাণ লিখিত হয়েছিল তৎকালীন জনগণের ভাষায়, যাকে আমরা আধুনিক সংস্কৃত বলে থাকি। বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য নয়, বরং এগুলির লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষ, যারা দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণে ছিল অপারগ। সাধারণ মানুষের বাস্তব বোধগম্যতার জন্য সাধু, রাজা, মহাপুরুষদের কাহিনী ও জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ইত্যাদি পুরাণে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের ধর্মের চিরন্তন আদর্শের বিশদ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুনি-ঋষিরা এইসব বিষয়ের সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

এরপর আরও শাস্ত্র আছে—তন্ত্রশাস্ত্র। এগুলি কিছু কিছু বিষয়ে প্রায় পুরাণেরই অনুরূপ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থে কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হোম যজ্ঞ ইত্যাদি পুরাতন ধারণাগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাও আছে।

এইসব গ্রন্থই হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। এত বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ যে জাতির মধ্যে প্রচলিত এবং যে জাতি তার বৃহত্তম অংশ দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার চর্চায় উৎসর্গ করেছে (কেউ বলতে পারে না কত হাজার বছর ধরে) সেই জাতির মধ্যে এতগুলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন যে আরও হাজার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল না, আশ্চর্যের বিষয়। এই সম্প্রদায়গুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে প্রচুর পার্থক্য আছে। এদের মধ্যেকার পার্থক্য ও ধর্মীয় ব্যাপারের বিস্তৃত বর্ণনার সময় আমাদের নাই, বরং যেসব সাধারণ ভিত্তি প্রতিটি হিন্দুর পক্ষে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য সম্প্রদায়গুলির সেইসব অপরিহার্য নীতিগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

প্রথমেই ধরা যাক সৃষ্টির কথা। এই যে সৃষ্টি, প্রকৃতি, মায়া এগুলি অশেষ অসীম। এমন নয় যে কোন একটি বিশেষ দিনে কোন একজন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করে দিলেন আর তারপর থেকেই তিনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এ কখনো হতে পারে না। সৃষ্টির গতি চলমান। তার কাজ চিরকাল চলে আসছে, ঈশ্বরের আরাম নেই। গীতার সেই অংশটুকু স্মরণ করতে বলি, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমি যদি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করি, বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।" সেই সৃষ্টিশক্তি যা আমাদের চারপাশে কাজ করে চলেছে, যদি এক সেকেণ্ডের জন্য থেমে যায়, তবে সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমন সময় কখনো ছিল না যখন নিখিল বিশ্বজগতে শক্তি তার ক্রিয়ায় মগ্ন ছিল না। অবশ্য কালচক্রের নিয়মে শেষে একদিন প্রলয় আসে। 'Creation' শব্দটির যথার্থ অনুবাদ 'সৃষ্টি' নয়, বরং Projection অর্থাৎ অভিক্ষেপ বা কর্মপরিকল্পনা বলাই সঙ্গত। ইংরেজী ভাষায় Creation বলতে 'শূন্য থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি',—'অনস্তিত্বের অস্তিত্বে পরিণতি' এই মতবাদ এতই কাঁচা যে এই কথা বিশ্বাস করতে বলে আমি তোমাদের অসম্মান করতে চাই না। আমাদের শব্দ Projection—অভিক্ষেপ বা কর্মপরিকল্পনা। সমগ্রভাবে সকল সময় বিরাজমান প্রকৃতি একসময় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে শেষে মিলিয়ে যায়, কিছু সময় বিশ্রামের পর পূর্বের অবস্থাতে আবার ফিরে এসে আবার সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং সেই মিলন, সেই ক্রমান্বয় প্রকাশের বিচিত্র খেলা কিছুকাল চলতে থাকে আগের মতই। তারপর সূক্ষ্মতর হতে হতে সম্পূর্ণ লীন হয়ে গিয়ে আবার সেই একই প্রকাশিত হওয়ার পালা চলে। এইভাবে সম্মুখে এবং পশ্চাতে তরঙ্গায়িত অনাদিকালের স্রোতধারায় স্থান কাল ও কার্যকারণ-সমন্বিত প্রকৃতির খেলা চলতে থাকে। সুতরাং, সৃষ্টি একদিন শুরু হয়েছিল, একথা বলা চরম নির্বুদ্ধিতা। এর আরম্ভ বা শেষ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠার অবকাশ নেই। আমাদের শাস্ত্রে যেখানে সৃষ্টির শুরু বা শেষ এই কথার উল্লেখ থাকে, তোমরা মনে রেখো, এটি যুগের শুরু বা শেষ এই অর্থে ব্যবহৃত, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কে এই স্রষ্টা? ঈশ্বর। সাধারণ অর্থে ইংরেজীতে 'God' বলতে যা বোঝায়, আমার সঙ্গে তার পার্থক্য যথেষ্ট। ইংরেজীতে এর চেয়ে উপযুক্ত শব্দ আর নেই। বরং আমি সংস্কৃত 'ব্রহ্মন্' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাই। তিনিই সব কিছু বিশ্বমায়ার সাধারণ হেতু। তিনি চিরন্তন, চিরশুদ্ধ, চিরজাগ্রত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, করুণাময়, সর্বত্র বিদ্যমান, নিরাকার ও অখণ্ড। তাঁর সৃষ্টি এই জগৎ। তিনি যদি সকল সময় জগৎ সৃষ্টি করতে থাকেন, তবে দুটি সংস্কার উদ্ভূত হয়। আমরা জগতে পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাই। কেউ জন্ম থেকেই সুখী, কেউ জন্ম থেকেই অসুখী; কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র। এর দ্বারা বৈষম্যই বোঝায়। এখানে নিষ্ঠুরতাও আছে, যেহেতু, মৃত্যুই জীবনের ধর্ম। এখানে এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে, প্রতিটি মানুষ নিজ স্বার্থে তার নিজের ভাইকে পরাজিত করার কৌশল করে। আমাদের এই দুনিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নিষ্ঠুরতা, আতঙ্ক আর দিবারাত্রির বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসে ভরে আছে। এই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে তো ঈশ্বর নিষ্ঠুরের চেয়েও মন্দ, মানুষের কল্পিত শয়তান অপেক্ষা নিষ্ঠুরতর। বেদান্তের মতে এই পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্যের দায়িত্ব ঈশ্বরের নয়। তবে কে দায়ী? আমরা

নিজেরাই। মেঘ থেকে সব জমির উপর সমান বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু যে ভূমি সযত্নলালিত, বৃষ্টিপাতের উপকার সেই ভূমিরই প্রাপ্য, আর, যে ভূমি অযত্নলালিত, অকর্ষিত বৃষ্টির সুফল থেকে তার বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। ঈশ্বরের করুণা অসীম, অপরিবর্তনীয়—আমরা নিজেরাই এই পার্থক্য সৃষ্টির কারণ। তাহলে কেউ জন্ম থেকে সুখী, আর কেউ অসুখী,—এই বৈষম্যের ব্যাখ্যা কি করে সম্ভব? এই পার্থক্য নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের সৃষ্টি নয়। না এ জন্মের নয়, তাদের অতীত জন্মের কৃতকর্মের পরিণামই এ জন্মের পার্থক্যের হেতু।

এবার আমরা দ্বিতীয় তত্ত্বটি আলোচনা করব। এই তত্ত্ব সম্পর্কে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলে একমত পোষণ করেন। আমরা সকলে স্বীকার করি জীবন অশেষ। এ ঠিক নয় যে শূন্য থেকে হঠাৎ সৃষ্ট হয়েছে জীবন। কারণ, তা হতেই পারে না। এরূপ জীবনের কোন সার্থকতাই নেই। যা কিছু হোক, সময়ে যার শুরু, সময়ের সীমাতেই তার সমাপ্তি। গতকাল যে জীবনের শুরু আগামীকালই তার শেষ, অর্থাৎ জীবনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। জীবনের অস্তিত্ব আগে থেকেই চলে আসছে। এসব বিষয়ে এখন আর খুব বেশি সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন নাই; যেহেতু আধুনিক যুগের বিজ্ঞান বস্তুজগতের নানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমাদের শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বগুলির স্পষ্টতর ব্যাখ্যার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই অসীম অতীত কর্মের ফলমাত্র। কোন শিশুই এ জগতে কবিদের সুন্দর বর্ণনার মত প্রকৃতির হাত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা সৃষ্টির বালক নয়, বরং তার অনন্ত অতীত জীবনের কর্মফলস্বরূপ বোঝা বা দায়িত্ব। ভালই হোক আর মন্দই হোক, সে তার পূর্বজীবনের কর্মফল ভোগ করতে আসে। পার্থক্যের সৃষ্টি এইখানেই এবং এই হল কর্মের নিয়ম। আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাগ্য রচনা করে চলেছি। পূর্বনির্দিষ্ট ভাগ্য-সংক্রান্ত মতবাদ এই বিধানের দ্বারাই খণ্ডিত এবং এই তত্ত্ব ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করে। আমরা, শুধু আমরাই আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, আর কেউ নয়। কার্য ও কারণের মূলে আমরাই। অতএব, আমরা স্বাধীন। আমি যদি সুখী না হই, আমি নিজেই তার কারণ এবং এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ইচ্ছা করলে আমি নিজেকে সুখী করে নিতে পারি। যদি আমি অসৎ অপবিত্র হই, তাও আমার নিজের সৃষ্টি, ইচ্ছা করলে আমি নিজেকে সৎ ও পবিত্র করে নিতে পারি। মানুষের ইচ্ছাশক্তি সকল সকল পরিবেশ ও অবস্থার উর্ধ্বে যেতে পারে। মানুষের প্রবল, বিরাট, অনন্ত ইচ্ছাশক্তি ও অবাধ মনের নিকট প্রাকৃতিক শক্তিসহ সব শক্তিকেই নত ও বশীভূত এমনকি দাসে পরিণত হতে হবে। কর্মবিধানের এই ফল।

এর পরের প্রশ্ন স্বভাবতই আত্মা সম্পর্কে। আত্মা কি? শুধুমাত্র শাস্ত্র পড়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না, যদি না আত্মাকে জানতে পারি। ভারত এবং ভারতের বাইরেও বাহ্যপ্রকৃতির গবেষণার সাহায্যে সেই অসীমের আভাস পেতে চেষ্টা করা হয়েছে, এবং আমরা সকলেই জানি, তার পরিণামও হয়েছে শোচনীয় পরাজয়। সেই অসীম সত্তার আভাস লাভ করা তো দূরের কথা, জড়জগৎ সম্পর্কে আমরা যতই

চর্চা করতে থাকি, ততই আরও জড়বাদী হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ি। বস্তুগত জগতের বিষয়ে আমাদের ব্যবহার যত বাড়তে থাকবে যে সামান্য ধর্মভাবটুকু পূর্বে ছিল, তাও নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং বাহ্যজগতের পথে আধ্যাত্মিকতা ও সর্বোচ্চ সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যাবে না, যেহেতু হৃদয় ও আত্মার পথ ধরেই তার আগমন। বহির্জগতের ক্রিয়াকলাপ সেই অসীম ও অনন্ত সম্পর্কে আমাদের কোন শিক্ষাই দিতে পারে না, একমাত্র অন্তর্জগৎই তা দিতে পারে। অন্তরাত্মার মধ্যে আত্মানুসন্ধানের সাহায্যে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবাত্মা সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও কতকগুলি বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন। আমরা সকলেই স্বীকার করি জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মা অমর এবং প্রতি আত্মার মধ্যে সর্বশক্তি, সুখ, পবিত্রতা, সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞতা বিরাজ করে। এই প্রধান তত্ত্বটি আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে সে দুর্বল অথবা দুষ্ট, বড় অথবা ছোট যাই হোক্ না কেন, তার মধ্যে আছে সেই সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ আত্মার অস্তিত্ব। আত্মার কোন পার্থক্য নেই, যা আছে তা প্রকাশের বৈচিত্র্য। আমার ও একটি ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে তফাৎ কেবল প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে; মূলতঃ সে আর আমি এক, যেহেতু সে আমার ভাই, তারও যে আত্মা, আমারও সেই আত্মা। এই মহত্তম তত্ত্বের শিক্ষাদাতা ভারত। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কথা বলা হয়ে থাকে, ভারতে এই ভ্রাতৃত্ববোধ সর্বজাগতিক; কেবল মানুষই নয়, সকল প্রাণী, এমনকি ছোট্ট পিঁপড়েটি পর্যন্ত আমাদের দেহের অংশ। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, "সেই ঈশ্বর সকল শরীরে বিরাজ করেন, একথা জেনে পণ্ডিত ব্যক্তিরা জীবমাত্রকেই ঈশ্বররূপে পূজা করবেন।" এই জন্যই ভারতে দরিদ্র মানুষ, প্রাণিসমূহ ও প্রত্যেকের প্রতি এবং প্রতিটি বিষয়ে এত দয়ার মনোভাব। আত্মা সম্পর্কে আমাদের ঐকমত্যের সাধারণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এটিও একটি।

এবার স্বভাবতই আমাদের আলোচনা ঈশ্বরতত্ত্বের দিকে এসে পড়ে। যারা ইংরেজী ভাষায় পড়াশুনা করে তারা প্রায়ই 'Soul' এবং 'Mind' এই দুটি শব্দ নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। আমাদের 'আত্মা' আর ইংরেজী 'Soul' এই দুটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা যাকে মানস বা মন বলি, পাশ্চাত্যের লোকেরা তাকেই বলে 'Soul'। প্রায় ত্রিশ বছর আগে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে আত্মা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ, তার আগে তারা কিছুই জানতো না। শরীর অবস্থিত এখানে, মন তারও পরে, তবুও মন এবং আত্মা এক নয়। মন অতি ক্ষুদ্র কণিকা সমন্বয়ে গঠিত সূক্ষ্ম শরীর মাত্র; জন্ম থেকে মৃত্যু—এবং এইভাবেই মন চলমান। কিন্তু মনেরও পিছনে আছে মানুষের আত্মা, যা স্বয়ংক্রিয়। 'আত্মা' অর্থে 'Soul' অথবা 'Mind' শব্দের অনুবাদ যথাযথ নয় বলে আমরা 'আত্মা' শব্দ অথবা পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের আখ্যা অনুযায়ী 'Self' শব্দটি ব্যবহার করব। তোমরা যে শব্দই ব্যবহার কর না কেন, একথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে, আত্মা মন এবং দেহ থেকে পৃথক এবং এই আত্মা সূক্ষ্ম শরীররূপ মনকে সঙ্গে নিয়ে জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়। যখন সময় আসে আত্মার সর্বজ্ঞ-

লাভ হয় ও পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে সকল ভূমিকার সমাপ্তি ঘটে, তখন তার এই জন্ম-মৃত্যুর লীলাও স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর মুক্ত আত্মা ইচ্ছা করলে মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে সঙ্গে রাখতে পারে অথবা চিরকালের মত ত্যাগ করে অনন্ত স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করতে পারে। আত্মার শেষ লক্ষ্য মুক্তি। আমাদের ধর্মের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। আমাদের মধ্যে স্বর্গ এবং নরকের কথাও আছে, কিন্তু এগুলি চিরন্তন পর্যায়ে পড়ে না, যেহেতু স্বর্গ-নরকের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনুসারে তা হবার নয়। যদি স্বর্গের অস্তিত্ব বলে কিছু থেকে থাকে, তবে তা অধিকতর সুখ ও ভোগসহ আমাদের এই ইহলোকেরই বড় আকারের পুনরাবৃত্তি মাত্র; কিন্তু তা আত্মারই ক্ষতির কারণ। এই ধরনের স্বর্গ অনেকগুলি আছে। যে সব ব্যক্তি ফলের প্রত্যাশা নিয়ে সৎকাজ করেন, তাঁরা মৃত্যুর পর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের মত এইরকম কোন একটি স্বর্গে জন্মলাভ করেন। এইসব দেবতাগণ বিশেষ বিশেষ পদমর্যাদার পরিচয়-জ্ঞাপক নাম। তাঁরাও মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন, তারপর সৎকাজের ফলে দেবত্বে উন্নীত হয়েছেন; এবং তোমরা যে ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম পড়ে থাক সেগুলি একই ব্যক্তির নাম নয়। হাজার হাজার ইন্দ্র থাকতে পারেন। নহুষ একজন মহৎ রাজা ছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর ইন্দ্রত্ব লাভ ঘটেছিল। এটি একটি পদমর্যাদা। কারণ, কোন একটি উন্নত আত্মা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব লাভ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ পদে থাকেন, তারপর তাঁর মৃত্যু হয় ও মানুষ হয়ে তিনি আবার জন্মলাভ করেন। কারণ, মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠতম। কোন কোন দেবতা আরও উন্নত হয়ে স্বর্গসুখ উপভোগের সব আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু যেমন এই জগতের বিপুলসংখ্যক মানুষ ধনসম্পদ, পদ, ভোগসুখের প্রবল স্রোতে ভেসে যায়, তেমন অধিকাংশ দেবতাও অনুরূপ কারণে স্রোতের প্লাবনে ভেসে যান এবং স্বর্গে সৎকর্মের ফল শেষ হলেই আবার তাঁদের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অতএব, এই পৃথিবীরূপ কর্মভূমি থেকেই আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি। স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।

তাহলে আমরা কি পেতে চাই? মুক্তি—স্বাধীনতা। আমাদের শাস্ত্রমতে স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম আসনে বসেও তুমি প্রকৃতির অধীন, বিশ হাজার বছর রাজত্ব করলেই বা কি যায় আসে? যতদিন তুমি শরীররূপ ধারণ করে আছ, ততদিন তোমাকে সুখের দাসত্ব করে যেতে হবে, যতদিন তোমার উপর স্থান কালের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে ততদিন এই দাস হয়েই থাকতে হবে। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই লক্ষ্য। তোমার পায়ের তলায় প্রকৃতিকে অবজ্ঞায় পদদলিত করে তারও ঊর্ধ্বে মুক্তমহিমায় চলে যেতে হবে। তারপর আর জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। সুখ নেই, অতএব দুঃখও নেই। এটি একটি অব্যক্ত অক্ষয় সবকিছুর অতীত পরম আনন্দময় অবস্থা। অসীম আনন্দের অতি ক্ষুদ্র কণিকা, এখানে আমরা যাকে সুখ ও মঙ্গল বলে থাকি, আর, সেই অসীম আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মা কামগন্ধহীন, লিঙ্গহীন। আত্মা পুরুষ কি স্ত্রী আমরা বলতে পারি না।

কাম আশ্রয় করে দেহকে। আত্মার মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য নিরূপণ করার ধারণা ভ্রমাত্মক, যেহেতু এই ধারণা শরীর সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আত্মার বয়স পরিমাপ করা যায় না, সেই চির পুরাতন, চিরকালই এক। এই আত্মা কি করে পৃথিবীর সংসারে এল ? আমাদের শাস্ত্রে একটি ছাড়া এর উত্তর নাই। সকল বন্ধনের কারণ অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার কারণেই পৃথিবীর এই সংসারে আমরা আবদ্ধ; অন্ধকার দূর করে জ্ঞান আমাদের ওপারে নিয়ে যায়। জ্ঞানই বা কি করে পাব ? ভালবাসা ভক্তির মধ্যে ভগবানের আরাধনা ও সবকিছুকেই ভগবানের মন্দির জ্ঞান করার মধ্যে। তিনি সকলের মধ্যেই আছেন। এইভাবে প্রগাঢ় প্রেমের দ্বারা জ্ঞানের আবির্ভাব হবে, অজ্ঞান দূরে চলে যাবে, সব বন্ধন টুটে যাবে এবং আত্মারও মুক্তি লাভ হবে।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ভগবানের দুটি রূপের বর্ণনা আছে। একটি দৈহিক বা সগুণ, আর একটি নৈর্ব্যক্তিক বা নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণা এই যে, তিনি সর্বব্যাপী, স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং সবকিছু ধ্বংস বা প্রলয়ের রক্ষাকর্তাও তিনি। তিনি বিশ্বচরাচরের শাশ্বত পিতা ও মাতা, আবার, তিনি আমাদের আত্মা থেকে চিরস্বতন্ত্র। তাঁর নিকটে এলে ও তাঁর উপাস্যলোকে বাস করলে মুক্তি। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক বা নির্গুণ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এসব বিশেষণযুক্ত বর্ণনা অতিরিক্ত ও অযৌক্তিক বোধে পরিত্যক্ত। যিনি নির্গুণ ও সর্বব্যাপী তাঁকে জ্ঞানী বলা যায় না, যেহেতু জ্ঞান সাধারণ মানুষের মনের বিষয়। তাঁকে চিন্তাশীলও বলা যায় না; চিন্তা অক্ষমের প্রক্রিয়া মাত্র। তাঁকে বিচারশীল বলা যায় না, কারণ, বিচার দুর্বলের পরিচয়। তাঁকে স্রষ্টাও বলা যায় না, কারণ, বদ্ধ অবস্থার মধ্যে না হলে কেউ সৃষ্টি করে না। তাঁর কিসের বন্ধন ? আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কাজ করে না। তাঁর কিসের আকাঙ্ক্ষা ? অভাব পূরণের লক্ষ্য ছাড়াও কেউ কাজ করে না। তাঁর কিসের অভাব ? বেদে তাঁর উদ্দেশে 'He' অর্থাৎ 'তিনি' শব্দটি ব্যবহার না করে 'It' অর্থাৎ 'তদাত্মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, তিনি শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকে যেন মানুষের মত একটি অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য—এরূপ বোঝাত। 'It' বা 'তদাত্মা' নৈর্ব্যক্তিক, নির্গুণ এবং শব্দটির প্রয়োগ তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা প্রচারের জন্য। এই মতবাদকে বলা হয় 'অদ্বৈতবাদ'।

এই নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ? আমাদের ও তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এক ও অভিন্ন। জগতের সবকিছুরই মূল সেই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার প্রকাশ আমরা প্রত্যেকে এবং আমাদের দুঃখ কষ্টের উদ্ভব সেই অসীম নির্গুণ সত্তা থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র গণ্য করার জন্য। এই অপূর্ব নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে একাত্মবোধ থেকেই মুক্তি সম্ভব। সংক্ষেপে আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্পর্কে এই দু' রকম ধারণা আছে।

কটি মন্তব্যের এখানে খুবই প্রয়োজন আছে। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদের ধারণা থেকে যে কোন নীতিশাস্ত্রের মতবাদ পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির মধ্যে এই সত্য সুদূর প্রাচীনকাল থেকে প্রচারিত হয়ে আসছে যে, সব মানুষকে নিজের মত ভালবাসবে। ভারতবর্ষে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্যের সীমা

না রেখে বলা হয়েছে সবাইকে অর্থাৎ সকল প্রাণীকেই ভালবাসবে। কেউ যুক্তি দেখিয়ে বলতে পারে না কেন অন্যান্য প্রাণীকেও নিজের মত ভালবাসা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। এর সূত্র পাওয়া যেতে পারে নির্গুণ ব্রহ্মবাদের মধ্যে; তুমি যখন বুঝতে পারবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক, সব জীবনের লক্ষ্য অভিন্ন; কাউকে আঘাত করার অর্থ যে নিজেকেই আঘাত করা, কাউকে ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। তাইলেই আমরা বুঝতে পারব, কেন অন্যকে আঘাত করা অনুচিত। অতএব, যথার্থ নীতিজ্ঞানের যুক্তি নির্গুণ ব্রহ্মবাদের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। এবার ঈশ্বরের প্রশ্ন এর মধ্যে এসে যায়। আমি বুঝি, সগুণ ঈশ্বরভাব থেকে কী অপূর্ব প্রেমের সৃষ্টি হয়। আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি, বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন মানুষের উপর ভক্তির ক্ষমতা ও কার্যকরী প্রভাব। কিন্তু এখন আমাদের দেশে এত বেশী চোখের জল নয়, বরং শক্তির প্রয়োজন। বিপুল শক্তির আকর নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এলে সবরকম কুসংস্কার থেকে মুক্ত মানুষ নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সজ্ঞান ঘোষণা করতে পারে "জগতে আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। কে আমাকে ভীত করতে পারে? প্রকৃতির নিয়মকেও আমি পরোয়া করি না। মৃত্যু আমার কাছে রসিকতা মাত্র।" সেই অনন্ত, শাশ্বত, অমর আত্মা—যার মহিমময় ভিত্তির উপর মানুষের অধিষ্ঠান, সেই আত্মা কোন অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হয় না, বাতাসে শুষ্ক হয় না, আগুনে দগ্ধ হয় না, জলে দ্রব হয় না,—সেই জন্ম-মৃত্যুহীন অনন্ত আত্মা যার আরম্ভ নেই, শেষও নেই, যার বিরাট মহিমার নিকট সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাবলী সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত মনে হয়, স্থান-কালের প্রশ্ন শূন্য অস্তিত্বহীন হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই মহিমান্বিত আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তবেই শক্তি অর্জন সম্ভব। তুমি নিজেকে যে ভাব গ্রহণ করবে, তাই হবে। যদি দুর্বল ভাব, দুর্বল; যদি শক্তিমান ভাব, শক্তিমান; যদি অপবিত্র ভাব, অপবিত্র; যদি পবিত্র ভাব, তবে তুমি পবিত্র। এর দ্বারা আমরা নিজেদের দুর্বল ভাবতে শিখি না, বরং নিজেদের বীর্যবান, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ভাবতে শিখি। এই প্রাণসত্তার প্রকাশ হয়তো আমার দ্বারা এখনও সম্ভব হয়নি, কিন্তু এগুলি আমার মধ্যেই আছে। আমারই মধ্যেই আছে সব জ্ঞান, সব শক্তি, সব পবিত্রতা এবং সব স্বাধীনতা। তবে কেন আমি এগুলি প্রকাশ করতে পারি না? কারণ, এতে আমার বিশ্বাসের অভাব। বিশ্বাসের জোরে এর প্রকাশ অবশ্যই একদিন ঘটতে বাধ্য। অদ্বৈতবাদ থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করে থাকি। তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের শিশুকাল থেকে তেজস্বিতা শেখাও; দুর্বলতা নয়, আচার-অনুষ্ঠান নয়, তেজস্বিতা। সাহসে ভর করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক, সব কিছু জয় করার, সবকিছু সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করুক। সবার আগে মহিমময় আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুক। বেদান্ত ছাড়া এই উপদেশ আর কোথাও নেই। ঈশ্বর প্রেম আরাধনা ইত্যাদি বিষয় অন্যান্য ধর্মের মত বেদান্তেও যথেষ্ট পরিমাণ আছে, কিন্তু আত্মা সম্পর্কে এইভাব সত্যিই অপূর্ব জীবনদায়ক। এই বিরাট তত্ত্ব একদিন সারা জগতের ভাবধারায় বিপ্লব সৃষ্টি করবে এবং বস্তুজগতের জ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সক্ষম হবে।

আমি আমাদের ধর্মের তথা নীতিসমূহের প্রধান বিষয়গুলি এতক্ষণ তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এগুলির বাস্তব রূপায়ণ সম্পর্কে আর কিছু কথা বলার আছে। আমরা দেখেছি, ভারতে পরিস্থিতি অনুসারে বহুসংখ্যক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অবশ্যই সম্ভব, কার্যত তা আছেও, এবং বিচিত্র ব্যাপার এই যে, এই সম্প্রদায়-গুলি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ করে না। শৈব সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে জাহান্নমে যাওয়ার কথা বলে না, বৈষ্ণবরাও শৈবকে একথা বলে না। শৈব বলে, "আমার পথ আমার, তোমার পথ তোমার; শেষে একদিন আমাদের সকলকে এক জায়গায় মিলতে হবে।" সকলেরই একথা জানা আছে। একেই বলে ইষ্টতত্ত্ব। ঈশ্বর আরাধনার নানারকম পথের কথা প্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃত। এও স্বীকৃত যে বিভিন্ন প্রকৃতির জন্য নিয়ম পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি আবশ্যক। ঈশ্বরলাভের জন্য যে নিয়ম তোমার পক্ষে খাটে, তা আমার জন্য নয়, বরং তাতে আমার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একই রাস্তায় প্রত্যেককে চলতে হবে, এ ধারণা ক্ষতিকর, অর্থহীন ও সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। যদি প্রত্যেক মানুষ একই ধর্মমত পোষণ করে ও একই পথ অনুসরণ করে, তবে জগতের পক্ষে সেটা হবে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। সব ধর্ম ও চিন্তার বিলুপ্তি ঘটবে। বৈচিত্র্যই জীবনের মূল। বৈচিত্র্যের মৃত্যু হলে সৃষ্টিরও সমাধি হয়ে যাবে। যতদিন চিন্তাজগতে বৈচিত্র্য থাকবে আমাদের অস্তিত্বও ততদিন অটুট এবং বৈচিত্র্য বা পার্থক্যহেতু বিরোধের কোন প্রয়োজন নেই। তোমার চলার পথ তোমার পক্ষে খুবই ভাল, কিন্তু আমার পক্ষে নয়। একইভাবে, আমার চলার পথ আমার পক্ষে ভাল হলেও, তোমার পক্ষে নয়। সংস্কৃতে আমার এই পথের নাম আমার 'ইষ্ট'। মনে রেখো, জগতে অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ইষ্ট আছে। কিন্তু আমরা যখন দেখি অন্য দেশের লোকেরা এসে বলছে, 'এইটি একমাত্র রাস্তা', এবং ভারতে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তখন আমাদের না হেসে উপায় থাকে না। ভিন্ন পথে ঈশ্বরের অনুগামী ভাইদের যারা ধ্বংস করতে চায়, তাদের মুখে প্রেমের বুলি বেমানান। তাদের ভালবাসার খুব একটা দাম নেই। যারা অন্যকে তার নিজের পথে চলতে দিতে নারাজ, তারা কি করে প্রেম ভালবাসার কথা বলে? এর নাম যদি প্রেম হয়, তবে ঘৃণা কাকে বলে? পৃথিবীর কোন ধর্মের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই, তারা খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ অথবা যে কোন অবতারকে উপাসনা করার কথা মানুষকে বলুক না কেন। হিন্দুরা সাদর আহ্বান জানিয়ে বলে, "ভাই, আমি তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু আমাকেও আমার পথে চলতে দিতে হবে। আমার পথই আমার ইষ্ট। সন্দেহ নেই, তোমার পথ খুবই ভাল, কিন্তু আমার পক্ষে সে পথ মারাত্মক। কোন্ খাদ্য আমার উপযোগী আমার নিজের অভিজ্ঞতাই সে কথা বলে দিতে পারে, একদল ডাক্তার তা পারে না। সুতরাং, আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কোন্ পথ আমার পক্ষে সর্বোত্তম।" ইষ্টই আমার লক্ষ্য, তাই আমরা বলি, যদি কোন মন্দির, প্রতীক অথবা মূর্তি তোমার মধ্যেকার দেবত্বকে জাগাতে সাহায্য করে, তবে তাই করো। তুমি যদি চাও, দু'শো মূর্তি গড়ে নাও। যদি কোন বিশেষ

ক্রিয়া বা আচার-অনুষ্ঠান তোমার দিব্য উপলব্ধি অর্জনে সাহায্য করে, তবে তাই করো। যে কোন ক্রিয়া, যে কোন মন্দির, যে কোন উৎসব অনুষ্ঠান যদি তোমাকে ঈশ্বরের সামীপ্যলাভে সাহায্য করে, তবে সর্ব উপায়ে যত শীঘ্র সম্ভব ঐ সকল পথ গ্রহণ করো। কিন্তু পথের বিভিন্নতা নিয়ে বিরোধ করো না। যখনই তা করবে, ঈশ্বর অভিমুখে না গিয়ে পিছিয়ে পড়বে, তলিয়ে যাবে পশুত্বের দিকে।

আমাদের ধর্মের কিছু উদ্দেশ্য আছে। এই ধর্ম সকলকে কাছে পেতে চায়, কাউকে বাদ দিতে চায় না। যদিও আমাদের জাতিপ্রথা, প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। জাতির রক্ষাকবচ হিসাবে এই সব নিয়মকানুনের প্রয়োজন ছিল; যেদিন আর আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজন থাকবে না, এগুলির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে। আমার বয়স যত বাড়ছে, তত সেই প্রাচীন নিয়মকানুনগুলি সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল হচ্ছে। এমন একদিন ছিল যখন আমি ব্যর্থ অকেজো মনে করতাম, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এগুলির কোন একটিকেও অমঙ্গলজনক মনে করতে আমার সংশয় উপস্থিত হয়। যে শিশু গতকাল জন্মেছে এবং আগামী পরশু যার মৃত্যু নির্ধারিত, সে যদি এসে আমাকে আমার সব পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বলে, আর আমি যদি তার উপদেশে কর্ণপাত করে সবকিছু ত্যাগ করে বসি, তাহলে আমিই একটি নির্বোধ, আর কেউ নয়। বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের উদ্দেশে যে সব উপদেশ আসতে শুরু করেছে, তা এই ধরনেরই। এইসব পণ্ডিত-মূর্খদের বলো, তোমাদের কথা সেদিন শুনব, যেদিন তোমরা নিজেরা একটা স্থায়ী সমাজ গঠন করতে পারবে। দুদিনের জন্যও কোন একটা ভাব অবলম্বন করে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকতে পার না, ঝগড়া করে ব্যর্থ হও; তোমরা জন্মাও বসন্তের দেওয়ালী পোকার মত, আবার তাদেরই মত পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা যাও। তোমরা বুদ্বুদের মত ওঠ, আর বুদ্বুদের মত ফেটে পড়। আগে আমাদের মত একটা স্থায়ী সমাজ গঠন কর, আগে এমন আইন ও নিয়মকানুন তৈরী কর, যেগুলি বহু শতাব্দীর উজ্জ্বলতায় বেঁচে থাকবে। কেবল তখনই তোমাদের সঙ্গে এইসব বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত, বন্ধু, তোমরা চপল বালকের চেয়ে বেশী কিছু নও।

আমাদের ধর্মবিষয়ে যা বলার ছিল, তা বলেছি। আমি তোমাদের আজকাল-কার একটি জরুরী প্রয়োজনের কথা বলে শেষ করব। এই কলিযুগের একটি মহৎ কর্ম মহাভারতের মহান রচয়িতা বেদব্যাসের জয় হোক! তপস্যা ও কঠিন যোগসাধনা প্রভৃতি অন্যান্য যুগে যে সব প্রচলিত ছিল, এ যুগে সে সব চলে না। এ যুগের প্রয়োজন, দান ও অন্যকে সাহায্য করা। দানের অর্থ কি? আধ্যাত্মিক জ্ঞান দানই সর্বোচ্চ দান, তারপর নিরপেক্ষ জ্ঞান (বিদ্যা) দান, তারও পরে জীবন দান, সর্বশেষ আহার ও পানীয় দান। যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা ধর্মজ্ঞান দান করেন, তিনি আত্মাকে অসংখ্য জন্মের হাত থেকে রক্ষা করেন। যিনি নিরপেক্ষ বিদ্যাদান করেন, তিনি ধর্মজ্ঞানের প্রতি মানুষের দৃষ্টিকে উন্মোচিত করেন। আর সব দান এগুলির অনেক নীচে, এমনকি জীবন দান পর্যন্ত। সুতরাং, তোমাদের এটুকু শেখা

ও মনে রাখা উচিত, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দানের তুলনায় আর সব কাজই নিকৃষ্টতর। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিকীর্ণ করা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম সাহায্য করা। আমাদের শাস্ত্রগুলি আধ্যাত্মিকতার চিরন্তন ফোয়ারা। এই ত্যাগের ভূমি ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বাস্তব ধর্মানুভূতির এমন মহৎ উদাহরণ পাওয়া যাবে না। পৃথিবী সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশ্বাস কর, অন্যান্য দেশে অনেক কথা হচ্ছে, কিন্তু ধর্মকে জীবনের অঙ্গীভূত করেছেন এমন বাস্তব মানুষ এখানে, শুধু এখানেই আছেন। শুধু কথা বলা ধর্ম নয়; তোতাপাখিও কথা বলে, আজকাল কলকব্জাও কথা বলতে পারে। কিন্তু এমন একটি মানুষের জীবন দেখাতে পার, যে জীবন ত্যাগে, ধর্মে, সহিষ্ণুতায়, অনন্ত প্রেমের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। এরূপ প্রাণই আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষণ। আমাদের দেশে এইসব ধ্যান-ধারণা, মহৎ জীবনের আদর্শ থাকা সত্ত্বেও বিরাট সব যোগী-পুরুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়-সঞ্জাত সম্পদগুলি শুধু ভারতেরই না থেকে সারা জগৎ জুড়ে, ঘোষিত হয়ে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর সম্পদে পরিণত না হয় তবে খুবই পরিতাপের বিষয় হবে। এটি আমাদের মহত্তম কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম, এবং তোমরা দেখবে যে, যত তোমরা অন্যকে সাহায্য করবে, তত নিজেদেরই সাহায্য করা হবে। যদি তোমাদের ধর্মকে, তোমাদের দেশকে সত্যিই ভালবাস, তবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তায় যে, সব অমূল্য সম্পদ শাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত করে যথার্থ উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

সর্বোপরি একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। যুগ যুগ ধরে বীভৎস ঈর্ষা বিদ্বেষে আসক্ত থেকে আমরা সকল সময় পরস্পরকে হিংসা করে চলেছি। কেন একজন আমার চেয়ে একটু বেশী অগ্রাধিকার পাবে, আমিই বা নয় কেন? এমনকি দেবপূজার ক্ষেত্রেও অন্যের চেয়ে আমরা অগ্রাধিকার চাই, আমাদের হিংসার দাসত্ব এতদূর! এই অভ্যাস বর্জন করতে হবে। এখন ভারতে বেদনাদায়ক কোন পাপ যদি থাকে, তাহলে এই দাসত্ব। প্রত্যেকেই হুকুম দিতে চায়, হুকুম মানতে চায় না কেউ। পুরাকালের সেই অপূর্ব ব্রহ্মচর্য শিক্ষার অভাবের জন্যই এই সব ঘটছে। আগে আদেশ পালন করতে শেখ, তবে আদেশ করার অধিকার এমনিই এসে যাবে। সব সময় আগে আনুগত্য শিক্ষা কর, তবে তুমি প্রভু হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। ঈর্ষা হিংসা বর্জন কর, সামনে যে সব বড় দায়িত্ব আছে, সেগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আশ্চর্য সব কাজ করে গেছেন, আমরা সেগুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও গৌরবের সঙ্গে চিন্তা করি। আমাদেরও অনেক মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে, যেন আমাদের উত্তরসূরিগণ মহিমান্বিত গৌরবের সঙ্গে আমাদের কথা স্মরণ করে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা মহান ও মহিমান্বিত, তবু, প্রভুর কৃপায় আমরা প্রত্যেকেই এমন কাজ করে যাব, যা তাঁদের মহিমার ঔজ্জ্বল্যকেও ম্লান করে দিতে পারবে।

পাম্বানে স্বামী বিবেকানন্দ

[রামনাদের সম্মানিত রাজা স্বামী বিবেকানন্দকে পাম্বানে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার পর জনসাধারণের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত স্বাগত ভাষণটি পাঠ করা হয়।]

হে পবিত্র আত্মা !

বহুসংখ্যক আমন্ত্রণ সত্বেও আপনি আমাদের আহ্বানে অনুগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে সাড়া দিয়ে আমাদের দর্শন দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে গভীর তম কৃতজ্ঞতা ও সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে আমরা প্রচুর আনন্দ অনুভব করছি। মহৎ ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী আপনি, বিরাট কাজের পবিত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং যে অসাধারণ নৈপুণ্য, চরম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে সে দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলেছেন, তার জন্যও আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

আমরা সত্যিই আনন্দিত যে মহান পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংস্কৃতিবান লোকেদের মধ্যে হিন্দুদর্শনের বীজ বপনের প্রচেষ্টায় আপনি এতদূর সাফল্যমণ্ডিত যে, আমরা চতুর্দিকে আশাতিরিক্ত ফলপ্রসূ পরিণামের এক উজ্জল উৎসাহব্যঞ্জক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, আর্যাবর্তে অবস্থানকালে অনুগ্রহ করে আমাদের এই মাতৃভূমির অধিবাসীদের নিরানন্দময় জীবনব্যাপী তন্দ্রা ভেঙে দিয়ে তাদের মনকে দীর্ঘকাল-বিস্মৃত শাস্ত্রীয় সত্যের আলোকে জাগ্রত করার জন্য পাশ্চাত্যের চেয়ে আপনি আরও একটু বেশি চেষ্টা করবেন।

আমাদের পবিত্র, আধ্যাত্মিক নেতা,—আপনার প্রতি আমাদের হৃদয় আন্তরিকতম অনুরাগ, পরম ভক্তি ও সর্বোচ্চ শ্রদ্ধায় এতদূর পূর্ণ যে, :উপযুক্ত ভাষায় আমাদের অনুভূতি প্রকাশ অসম্ভব। করুণাময় ভগবানের নিকট আমাদের আন্তরিক ও সমবেত প্রার্থনা এই যে, তাঁর আশীর্বাদে আপনার দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবন ও বহুকাল হারিয়ে যাওয়া ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির জন্য সর্বশক্তি দান করুন।

আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শন, বড় বড় সব ধর্মীয় নেতা এবং ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের জন্মভূমি। অতি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত শুধু এই দেশেই মানুষের মহত্তম আদর্শের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ করে আমি অনেক জাতির অনেক দেশ দেখেছি। আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি নির্দিষ্ট আদর্শের স্থান আছে, যে প্রধান আদর্শটি জাতীয় জীবনে মেরুদণ্ডের মত দাঁড়িয়ে থাকে। রাজনীতি নয়, সামরিক শক্তি নয়, বাণিজ্যিক প্রাধান্য নয়, যান্ত্রিক প্রতিভা ইত্যাদি কিছুই নয়, ভারতের মেরুদণ্ড তার ধর্ম—শুধু ধর্মই। ভারত চিরকালই আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র। শারীরিক শক্তির প্রকাশ নিশ্চয়ই খুব ভাল, বিজ্ঞানের সাহায্যে যান্ত্রিক অগ্রগতির

মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশও চমকপ্রদ ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সবের ক্ষমতা জগতে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবের তুলনায় কম।

আমাদের জাতির ইতিহাস প্রমাণ করে, ভারত চিরকালই কর্মমুখর। তাদের কাছে আমরা আরও জ্ঞান আশা করি, যারা আজকাল এই শিক্ষা দিচ্ছে, 'হিন্দুরা শক্তিহীন ও নিষ্ক্রিয়।' অন্যান্য দেশের মানুষের নিকট এই প্রচার প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। একথা আমি অগ্রাহ্য করি যে, 'ভারত কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল।' আমাদের এই পবিত্র দেশের চেয়ে কর্মমুখর জীবনের পরিচয় আর কোন দেশ দিতে পারেনি। তার প্রমাণ, আমাদের এই সুপ্রাচীন মহান জাতির অস্তিত্ব আজও অব্যাহত এবং তার গৌরবময় জীবন প্রতি দশকে যেন মৃত্যুহীন চিরস্থায়ী নবযৌবন লাভ করে চলেছে। এখানে ধর্মের মধ্যেই তার কর্মের পরিচয়। মানুষের প্রকৃতিতে এ এক বিচিত্র ব্যাপার সে তার নিজকর্মের মানদণ্ড দিয়ে অন্যের বিচার করে। এক জন জুতো তৈরী-করা মুচির উদাহরণ ধরা যাক। সে শুধু জুতো তৈরী বোঝে, আর মনে করে যে এ জীবনে জুতো তৈরী ছাড়া আর কিছুই করার নাই। একজন মিস্ত্রী ইটের গাঁথুনি ছাড়া কিছুই বোঝে না এবং দিনের পর দিন এই একটিমাত্র কাজই তার জীবনের একমাত্র প্রমাণ। ব্যাখ্যাস্বরূপ আর একটি যুক্তি আছে। আলোর তীব্র প্রচণ্ড গতি আমরা চোখে দেখতে পাই না, কারণ, দর্শন শক্তির নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক অন্তর্দর্শনের সাহায্যে যোগী-পুরুষরা অতি সাধারণ মানুষের 'এই জড়জগতের পর্দা ভেদ করে সবকিছু দেখার শক্তি রাখেন।

আধ্যাত্মিক প্রেরণার জন্য সারা পৃথিবীর দৃষ্টি এখন ভারতের দিকে। ভারতকে সব জাতির জন্য এই প্রেরণা যোগাতে হবে। এদেশে মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ ভাবধারা আছে বলে আমাদের বহু যুগব্যাপী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের তত্ত্বগুলি অনুধাবনের জন্য পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা কঠোর চেষ্টা করছেন।

ইতিহাসের ঊষাকাল থেকে কোন ধর্মপ্রচারক হিন্দু মতবাদ প্রচারের জন্য ভারতের বাইরে যান নি, কিন্তু এখন আশ্চর্য সব পরিবর্তন আসছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যখন ধর্মের বিনাশ হয় ও অভ্যুত্থান হয় অধর্মের, তখন আমি বারবার আবির্ভূত হই জগতের কল্যাণের জন্য।" ধর্ম সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, উত্তম নীতিগ্রন্থের অধিকারী পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যে কিছু না কিছু বিষয়ে আমাদের নিকট ঋণী নয়। আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান আছে অথচ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের নিকট থেকে সংগৃহীত নয়, পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মত এত অধিক দস্যুতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কোনদিনই ছিল না। প্রত্যেকেরই জানা উচিত বাসনার জয় না হওয়া পর্যন্ত কোন মুক্তি নেই। যে ব্যক্তি বস্তুর দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ সে কখনো মুক্ত হয় না। ধীরে ধীরে পৃথিবীর সব জাতি এই মহান সত্যটুকু উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। যখনই শিষ্যের এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করার মত

অবস্থা হয়, তখনই গুরুর উপদেশ তার সাহায্যে আসে। ঈশ্বর তার সন্তানদের জন্য অনন্ত করুণা বর্ষণ করে চলেছেন, যার বিরাম নেই এবং সকল মতের মানুষই এই করুণা-ধারায় নিয়ত অভিষিক্ত। আমাদের ঈশ্বর সকল ধর্মেরই ঈশ্বর। এই ভাব একমাত্র ভারতের; এবং আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই ভাব যদি পৃথিবীর আর কোন ধর্মশাস্ত্রে দেখাতে পার!

আমরা, হিন্দুরা, ঈশ্বরের সদিচ্ছায় ও দূরদর্শিতায় এখন খুব সঙ্কট ও দায়িত্বের মধ্যে পড়েছি। আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্য পাশ্চাত্যের জাতিগুলি আমাদের কাছে আসছে। জগতে মনুষ্যজাতির সমস্যাগুলি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্তরূপে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য ভারতের অধিবাসীদের নৈতিক দায়িত্ব আছে। একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। অন্যান্য দেশের বিখ্যাত লোকেরা যখন অতীতের পার্বত্যদুর্গনিবাসী ও পথিকের সর্বস্ব অপহরণকারী ব্যারন-দস্যুদের বংশধর হিসাবে পরিচয় দিতে অহংকার করে, অপর পক্ষে, আমরা, হিন্দুরা পর্বত ও গুহাবাসী ফলমূলাহারী ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন মুনি-ঋষিদের বংশধর বলতে গর্ব অনুভব করি। আমরা এখন মর্যাদাচ্যুত ও অধঃপতিত হতে পারি, কিন্তু ধর্মের জন্য যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে যদি আমরা কাজ শুরু করি, তবে নিশ্চয়ই আমরা বড় হতে পারব।

আমাকে আপনাদের আন্তরিক অভ্যর্থনার জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন! আমার প্রতি রামনাদের রাজার ভালবাসার উত্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। যদি আমার দ্বারা ও আমার মাধ্যমে কোন কাজ হয়ে থাকে, তার জন্য ভারত এই মহৎ ব্যক্তিটির নিকট ঋণী; কারণ, আমার চিকাগো যাওয়ার পরিকল্পনা প্রথমত তাঁরই, তিনিই আমার মগজে ঐ কল্পনাটি ঢুকিয়ে দেন ও কার্যকরী করার জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। তিনি এখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে ও প্রবল আগ্রহের সঙ্গে আশা করছেন, আমি আরও—আরও কিছু কাজ করি। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি আগ্রহশীল হয়ে এই চরিত্রের আরও দশ বিশজন রাজা আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্যে এগিয়ে আসুন, এই আমার ইচ্ছা।

রামেশ্বর মন্দিরে প্রকৃত উপাসনা সম্পর্কে ভাষণ

[স্বামীজী রামেশ্বর মন্দির পরিদর্শনকালে নিম্নোক্ত ভাষণটি প্রদান করেন।]

ধর্মের অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মধ্যে নয়, অনুরাগ ও হৃদয়ের পবিত্র প্রেমের মধ্যে। দেহে মনে শুদ্ধ না হলে কারও পক্ষে মন্দিরে গিয়ে শিব পূজা করা মূল্যহীন। তাঁদের প্রার্থনাই শিব গ্রাহ্য করেন, যাঁরা দেহে মনে পবিত্র। আর, যারা নিজেরা অশুদ্ধ হয়েও অন্যকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে, তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। পূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান আভ্যন্তরীণ ভক্তির দৃষ্টান্ত মাত্র; কিন্তু মানস পূজা ও পবিত্রতাই প্রকৃত পূজা। তোমরা অবশ্যই একথা মনে রেখো।

এই কলিযুগে মানুষ এতটা অধঃপতিত যে, তারা মনে করে যা খুশি করলেও কোন পবিত্রস্থানে গেলেই সব পাপ মুছে যায়। কেউ যদি অশুদ্ধ মন নিয়ে মন্দিরে যায়, তার পাপের বোঝা আরও ভারী হয়; যখন ঘরে ফিরে যায় মন্দিরে যাওয়ার আগের চেয়েও সে নিকৃষ্টতর লোক। তীর্থস্থান পবিত্র মানুষ ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। যদি কোন জায়গায় সাধুব্যক্তিরা বাস করেন, সেখানে কোন মন্দির না থাকলেও সেই স্থান একটি তীর্থ বলে গণ্য। আবার, যদি কোন স্থানে একশোটি মন্দির থাকে কিন্তু অসাধু লোকেদের বসবাস থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, সে স্থান আর তীর্থ নয়। আবার, তীর্থে বাস করাও বেশ সমস্যার ব্যাপার। কারণ, সাধারণ কোন স্থানে পাপ সঞ্চিত হলে, তা দূরীভূত হয়, কিন্তু তীর্থের পাপ কিছুতেই যায় না। শুদ্ধ মন ও অন্যের কল্যাণ কামনা, এই হচ্ছে সকল পূজার সারমর্ম। যিনি দরিদ্র, দুর্বল ও অসুস্থের মধ্যে শিব দর্শন করেন, তিনি প্রকৃত শিবপূজা করেন, আর, যে কেবল মূর্তির মধ্যে শিব দর্শন করে তার পূজা প্রারম্ভিক মাত্র। যে ব্যক্তি শুধু মন্দিরেই শিব দর্শন করে তার চেয়ে শিব অধিক তুষ্ট হন তাঁর প্রতি যিনি একজন দরিদ্রকেও জাতি ধর্ম বর্ণ বিচার না করে শিবজ্ঞানে সেবা ও সাহায্য করেন।

একজন ধনীলোকের বাগানে দু'জন মালী ছিল। তার মধ্যে একজন ছিল খুব অলস, কোন কাজই করত না; কিন্তু মনিব এসে গেলে সে উঠেই করজোড়ে "আমার মনিবের মুখখানি কী সুন্দর!" ইত্যাদি স্তুতি করে নাচানাচি শুরু করে দিত। অন্য মালীটি বেশি বলতো না, বরং কঠোর পরিশ্রম করে সবরকম ফল শাকসব্জী উৎপাদন করে অনেক দূরে মনিবের বাড়িতে মাথায় বয়ে নিয়ে যেত। এই দু'জন মালীর মধ্যে কে বেশি মনিবের প্রিয় হবে? শিব আমাদের প্রভু, এ জগৎ তাঁর বাগান, আর এই বাগানে দু'রকম চরিত্রের মালী আছে। একজন অলস, ভণ্ড, কিছুই করে না, কেবল শিবের সুন্দর চোখ নাক আকৃতির বর্ণনা করে; আর একজন শিবের সৃষ্টি যত দরিদ্র, দুর্বল, সকল প্রাণী, তাঁর সব সন্তান সন্ততির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। এদের মধ্যে কে বেশি শিবের প্রিয় হবে? তিনিই হবেন, যিনি তাঁর সন্তানদের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। যিনি পিতার সেবা

করতে চান, তাঁকে তাঁর সন্তানদের সেবা আগে করতে হবে। যিনি শিব সেবায় আগ্রহী, শিবের সব সন্তান, সব প্রাণীর সেবা তাঁর আগে করা চাই। শাস্ত্রে বলে যে, তাঁরাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দাস, যাঁরা ভগবানের অন্য সব দাসের সেবা করেন। এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

আমি তোমাদের আবার বলছি, তোমাদের শুদ্ধ পবিত্র হতে হবে এবং যে কেউ তোমার কাছে এলে তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে সাহায্য করবে। এটি সৎকর্ম। এর প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং প্রত্যেকের মধ্যে যে শিব আছেন, তাঁর প্রকাশ ঘটে। তিনি সব সময় সকলের হৃদয়ে আছেন। আয়নার ওপর ধুলো-ময়লা জমলে যেমন আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই না তেমন আমাদের হৃদয়রূপ দর্পণেও অজ্ঞান ও শয়তান-স্বভাবের ধুলো-ময়লার আস্তরণ জমে আছে। স্বার্থপরতা, নিজের কথা আগে চিন্তা করা সবচেয়ে বড় পাপ। যে মনে করে আগে আমার খাওয়া চাই, সকলের চেয়ে বেশী অর্থ আমার চাই, চাই সবকিছুর অধিকার; আর, যে মনে করে, সকলের আগে আমিই স্বর্গে যেতে চাই, মুক্তি চাই সবার আগে, তারাই স্বার্থপর। নিঃস্বার্থপর মানুষ বলেন, আমি সকলের শেষে; আমি স্বর্গে যেতে চাই না, এমনকি আমার ভাইদের সেবা করতে গিয়ে যদি নরকে যেতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত। এই নিঃস্বার্থপরতাই ধর্মের পরীক্ষা। যিনি যত বেশী নিঃস্বার্থ তিনি তত বেশী ধার্মিক ও শিবের নিকটতর ব্যক্তি। তিনি জ্ঞানী অথবা মূর্খ যাই হোন্ না কেন, শিবের বিষয় কিছু জানা থাক্ বা নাই থাক্ অন্য সকলের চেয়ে শিবের নিকটতর সান্নিধ্যে তাঁর স্থান। আর, যে পৃথিবীর সব মন্দির, সব তীর্থস্থান দর্শন করেছে, সেজে বসে আছে চিতা-বাঘের মত, তবু স্বার্থপর বলে তার স্থান শিব থেকে অনেক দূরে।

রামনাদে স্বাগত ভাষণের উত্তর

[রামনাদে রাজা সাহেবের অভিনন্দন]

হে পবিত্রতম আত্মা!

শ্রীপরমহংস, যতি-রাজ, দিগ্‌বিজয়-কোলাহল, সর্বমাতা-সম্প্রীতিপর, পরম-যোগেশ্বর, শ্রীমৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কারকমালাসঞ্জাত, রাজাধিরাজ-সেবিত, শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী,

প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিমণ্ডিত সেতুবন্ধ রামেশ্বর অথবা রামনাদপুরম বা রাম-নাদের অধিবাসী আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে আপনাকে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাই। আমাদের প্রভু মহাবীর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্নলাঞ্ছিত ভারতের এই পবিত্র বেলাভূমিতে আপনার পদার্পণে সর্বপ্রথম আপনাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ আমাদের নিকট দুর্লভ। আমরা যথার্থ গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, আমাদের কালোত্তীর্ণ মহান ধর্মের স্বকীয় গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব পশ্চিমের পণ্ডিত বিশারদদের হৃদয়ঙ্গম করাতে আপনার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় অসাধারণ সাফল্য।

আপনার নির্ভুল সরল ভাষার অনতিক্রমণীয় বাগ্মিতায় ইউরোপ ও আমেরিকার সুশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপলব্ধি করাতে পেরেছেন যে, একটি বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ এবং সব জাতি ও সব মতের নরনারী নির্বিশেষে সকলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উপযোগী সবকটি গুণ হিন্দুধর্মের মধ্যেই নিহিত। নিরাসক্ত আবেগে উদ্দীপিত, সর্বোত্তম উদ্দেশ্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় প্রভাবিত হয়ে আপনি দুস্তর সমুদ্রের ওপারে ইউরোপ ও আমেরিকার উর্বর ভূমিতে ভারতের সত্য ও শান্তির বাণী প্রচার এবং ধর্মের বিজয়পতাকা প্রোথিত করে এলেন। আপনি আপনার কর্মবিধি ও আচরণের মধ্যে তাদের দেখিয়ে দিলেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ও কার্যকর সম্ভাবনা। সর্বোপরি, পশ্চিমে আপনার পরিশ্রমের অপ্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পুরুষানুক্রমে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের গৌরব ও মহিমার প্রতি ভারতের উদাসীন সন্তানদের চেতনার জাগরণ এবং তাদের প্রিয় অমূল্য ধর্ম সম্পর্কে চর্চা ও মনঃসংযোগের প্রকৃত আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক নবজাগরণের লক্ষ্যে আপনার হিতকারী পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা আমাদের নেই। আপনার ভক্ত অনুরাগীদের অন্যতম আমাদের রাজার প্রতি আপনি সব সময় যে অনুগ্রহ করেছেন ও প্রথমেই তাঁর রাজ্যে আপনার পদার্পণ করার মহানুভবতা রাজার পক্ষে বর্ণনাতীত সম্মান ও গৌরবের কারণ, একথা উল্লেখ না করে আমরা এই ভাষণ শেষ করতে পারি না।

শেষে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যে শুভকর্মের সূচনা করেছেন, সে দায়িত্ব বহনের জন্য, তাঁর অনুগ্রহে আপনার দীর্ঘ পরমায়ু, স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ হোক্!

শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত
আপনার একান্ত ভক্ত ও অনুগত
শিষ্য এবং সেবকবৃন্দ

রামনাদ,
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৯৭

স্বামীজীর বক্তব্য

দীর্ঘতম রাত্রি বুঝি শেষ হতে চলেছে, দুঃসহ বেদনা হয়তো বা অবসানের পথে, নিদ্রিত শব যেন জেগে উঠেছে,—দূর অতীতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন ওপার থেকে একটি অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জ্ঞান প্রেম ও কর্মের অনন্ত প্রতীক হিমালয়ের শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হয়ে শান্ত দৃঢ় অথচ নির্ভুল সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে আমাদের দিকে, আর দিনের পর দিন এই স্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে ভেঙে দিচ্ছে ঘুম। হিমালয়ের মৃদু মন্দ বাতাসের মত মৃত শরীরের অস্থি ও মাংসপেশীতে জীবনের সঞ্চার আলস্যকে ঠেলে দিচ্ছে দূরে; অন্ধ এবং বিকৃত মস্তিষ্করাই শুধু দেখতে পাচ্ছে না, আমাদের মাতৃভূমি দীর্ঘ গভীর

নিদ্রা থেকে জেগে উঠছেন। আর কেউ তাঁকে রুখতে পারবে না, তিনি আর কোনদিন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হবেন না। কোন বহিঃশক্তি আর তাঁকে বাধা দিয়ে পিছনে ঠেলতে পারবে না; অসীম শক্তির অধিকারিণী যেন এক দানবী নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

রাজাসাহেব ও রামনাদের ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে যে গভীর অনুরাগের সঙ্গে আপনারা আমাকে অভ্যর্থনা দিয়েছেন, এ জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন! আমি মনে করি, আপনারা অকৃত্রিম ও সদাশয়, কারণ, হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের ভাষা, আত্মার সঙ্গে আত্মার অকপট যোগাযোগ মুখের ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশি মধুর, যা আমি আমার অন্তরের গভীরে অনুভব করি।

রামনাদ অধিপতি! যদি পাশ্চাত্য দেশে আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য এই দীন ব্যক্তির দ্বারা কোন কাজ হয়ে থাকে, অজ্ঞাত নিজেদের গৃহে গোপনে সমাহিত অমূল্যসম্পদ সম্পর্কে আমাদের স্বদেশবাসীর সহানুভূতি জাগাতে ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যদি কিছু ক্ষুদ্র কাজ করে থাকি, যদি অন্ধ অজ্ঞতার জন্য তৃষ্ণার জ্বালায় মৃত্যুবরণ না করে অন্যত্র খানা-ডোবার নোংরা জল পান করার পরিবর্তে নিজ দেশের সেই শাশ্বত উৎসের নির্মল জল পান করার জন্য তাদের আহ্বান জানিয়ে থাকি, যদি আমাদের দেশবাসীর মধ্যে কর্মে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য কিছুমাত্র কাজ করে থাকি এবং রাজনীতি সমাজসংস্কার ইত্যাদি সত্ত্বেও কুবেরের ঐশ্বর্য প্রতিটি ভারত সন্তানের মাথার উপর ঢেলে দিলেও 'ধর্ম না থাকলে ভারতের মৃত্যু;—যেহেতু ধর্মই ভারতের প্রাণ'। আমার দেশবাসীর মধ্যে এই সত্যের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য এবং এই লক্ষ্যে ভারত ও অন্যান্য দেশের যেখানেই কিছু কাজ করে থাকি না কেন, তার অধিকাংশ স্বীকৃতি, রামনাদ অধিপতি, আপনারই প্রাপ্য। আপনিই প্রথম আমার মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করেন ও এই কাজে ক্রমাগত উৎসাহ দিতে থাকেন। আপনি যেন স্বজ্ঞাত শক্তিতে ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সর্বদা সাহায্য করেছেন ও উৎসাহ দান থেকে কখনো বিরত হন নি। আমার সাফল্যে প্রথমেই আনন্দ প্রকাশ ও ভারতে ফিরে আসার প্রথমেই আপনার রাজ্যের মাটির সংস্পর্শ লাভ—দুটি ঘটনাই সঙ্গতিপূর্ণ।

অনেক বড় বড় কাজ, অপূর্ব শক্তির বহিঃপ্রকাশ ও অনেক বিষয়ে অন্যান্য জাতিকে আমাদের শিক্ষা দিতে হবে, —এসব কথা আপনাদের রাজা অনেক আগেই বলেছেন। দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, নীতিশাস্ত্র, মাধুর্য, নম্রতা, প্রেম, এ সবের জন্মভূমি ভারত। এগুলি এখনও আছে এবং পৃথিবী সম্পর্কে আমার অর্জিত অভিজ্ঞতার জোরে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে ঘোষণা করতে পারি, ঐ সব বিষয়ে ভারত জগতের মধ্যে এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ক্ষুদ্র বিচিত্র ব্যাপারটি লক্ষ্য করুন! গত চার পাঁচ বছরের মধ্যে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে। বিরাট বিরাট সব রাজনৈতিক দল সমগ্র পাশ্চাত্য জুড়ে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আইন-কানুন বদলে ফেলার কাজে বেশ কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেছে। আমাদের দেশের মানুষকে প্রশ্ন করুন, এত সব পরিবর্তনের ব্যাপারে তারা একটি কথাও শোনেনি। কিন্তু চিকাগোতে ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারত থেকে একজন সন্ন্যাসী যোগ দিয়েছিলেন এবং সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন, আর

তারপর থেকে সেই সন্ন্যাসী পশ্চিমের দেশগুলিতে কাজ করে চলেছেন, এ খবর এখানকার একজন দরিদ্রতম ভিখারী পর্যন্ত রাখে। একথা বলতে আমি শুনেছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ নির্বোধ; তারা শিক্ষাদীক্ষা চায় না ও খবরাখবরের ধার ধারে না। আগে আমার নিজেরও এই ধরনের মতামতের উপর নির্বোধ ঝোঁক ছিল, কিন্তু এখন দেখছি, যে কোন পরিমাণ অনুমান-নির্ভর গবেষণা অথবা দ্রুত গতি-সম্পন্ন বিশ্বভ্রমণকারী বা দর্শকদের অপেক্ষা নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পেয়েছি, ভারতীয় জনসাধারণের বুদ্ধি স্থূল নয়, তাদের গতিও শ্লথ নয়, বরং পৃথিবীর আর যে কোন জাতির তুলনায় সংবাদ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও তৃষ্ণা কম নয়। কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের ভূমিকা আছে এবং স্বভাবতই তাদের নিজস্ব বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। জাতিসমূহের সমন্বয়ের মধ্যেও প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বই তার জীবন—তার প্রাণশক্তি। এর মধ্যেই তার মেরুদণ্ড, তার প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় জীবনের দৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু আমাদের এই পবিত্র দেশের প্রতিষ্ঠা, মেরুদণ্ড, প্রাণশক্তি সবই ধর্মভিত্তিক। অন্যেরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলুক, ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল ধনসম্পদ সংগ্রহের গৌরব, বাণিজ্য শক্তির বিস্তার ও বাহ্যিক স্বাধীনতার গৌরবময় উৎসের কথা বলুক, হিন্দুর মানসিকতায় এ সব বোধগম্য নয়, ইচ্ছাও নাই। তাকে অধ্যাত্মবিষয়, ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিষয়ে বলুন, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, ভারতের একজন নিম্নতম কৃষকও এসব বিষয়ে অন্যান্য দেশের তথাকথিত দার্শনিকদের চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল। আমি বলেছি, ভদ্রমহোদয়গণ, জগৎকে আমাদের আর কিছু শিক্ষা দেবার আছে। এই একমাত্র কারণ, শত শত বৎসরের অত্যাচার, হাজার হাজার বছরের বৈদেশিক শাসন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও এই জাতি ঈশ্বর, ধর্মের রত্নভাণ্ডার ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা আজও আঁকড়ে ধরে আছে,—এই তার অস্তিত্ব রক্ষার মন্ত্র।

এই দেশের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার উৎসমুখগুলি থেকে নির্গত স্রোতের প্লাবনে পৃথিবী ভেসে যাবে এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নূতন সামাজিক পরিকল্পনার জন্য অর্ধমৃত, অধঃপতিত পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতির জীবনে নূতন জীবন ও নূতন প্রাণশক্তি দান করবে। এদেশে কত বিচিত্র সুরের প্রতিধ্বনি, সঙ্গতিপূর্ণ ও সঙ্গতিহীন; তবু সব কলরব ছাপিয়ে আত্মত্যাগের মহত্তম ও হৃদয়গ্রাহী বাণীর উদাত্তধ্বনি ভারতের আকাশ বাতাস ভরে তুলছে। 'ত্যাগ করো'—ভারতীয় ধর্মের এই মূল নীতি-কথা। এ জগৎ মাত্র দু'দিনের মায়া, এ জীবন ক্ষণিকের। তার ওপারে মায়া মোহময় জগতের আরও অনেক দূরে সেই অনন্ত জগৎ, আমাদের সেখানে পৌঁছুতে হবে। এই দেশ বিরাট মনীষা ও প্রতিভার দীপ্তিতে আলোকিত; তথাকথিত বিশ্বজগৎ তাঁদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মাটির ডোবা ছাড়া কিছু নয়। তাঁরা আরও আরও ঊর্ধ্বে চলে যান। তাঁদের কাছে কাল—অনন্তকালও অস্তিত্বহীন। তাঁরা কাল অতিক্রম করে চলে যান আরও দূরে। স্থানও কিছু নয়, তাঁরা স্থানেরও সীমা অতিক্রম করে চলে যেতে চান। প্রপঞ্চময় সত্তার বিস্ময়কর ঊর্ধ্বে চলে যাওয়াই ধর্মের গূঢ় সত্তা। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য শুধু একবার

সেই অতি দূর অজানার আভাস পাওয়ার জন্য অলৌকিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা, এইভাবে যে কোন দারিদ্র্য, যে কোন মূল্যে সবকিছুর উর্ধ্বে চলে যাওয়ার কঠিন প্রয়াস, প্রকৃতির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া। এই আমাদের আদর্শ, কিন্তু কোন দেশের সব লোকই একেবারে সবকিছু ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু তোমরা যদি তাদের উৎসাহিত করতে চাও, তবে আধ্যাত্মিকতার পথেই তা সম্ভব। তাদের কাছে তোমাদের রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, অর্থ উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির আলোচনা হাঁসের পিঠের উপর থেকে জলবিন্দুর মতই ঝরে পড়বে। এই ধর্মজ্ঞানই পৃথিবীকে তোমাদের শেখাতে হবে। পৃথিবী থেকে আমাদেরও কি কিছু শিখতে হবে? সম্ভবত আমাদের কিছু বাস্তব জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন আছে, যা থেকে প্রতিষ্ঠানগত শক্তি, শক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা ও শক্তি সংগঠিত করে কি উপায়ে ক্ষুদ্র থেকে সর্বোত্তম ফললাভ করা যায়। পশ্চিম থেকে সম্ভবত এই বিষয়ে কিছু শিক্ষা নিতে পারি। কিন্তু কেউ যদি ভারতে পান-ভোজন, আমোদ-প্রমোদকে আদর্শ বলে প্রচার করে কিংবা কেউ যদি জড়বস্তুর মধ্যে দেবত্ব আরোপ করতে চায়, তাহলে সে মিথ্যাবাদী; এই পবিত্র ভূমিতে তার কোন স্থান নেই, তার কথা কোন ভারতীয় শুনতেও চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝকমকে চাকচিক্য, ঔজ্জ্বল্য এবং ক্ষমতার অপূর্ব নিদর্শন সত্ত্বেও, মঞ্চের উপর থেকে তাদের খোলাখুলি বলতে পারি, ঐ সব বৃথা—সবই অসার বস্তু। ঈশ্বর, আত্মা ও ধর্মই একমাত্র সত্য। তোমরা সত্যের পথ ধরে থাক।

তবু, আমাদের অনেক ভাই আছে, যারা এই সর্বোচ্চ সত্যজ্ঞান থেকে দূরে পড়ে আছে; সম্ভবত প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু বাস্তবজ্ঞান তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে। প্রায় সব দেশ ও সমাজে এই রকমের ভুল হয়ে থাকে; খুব দুঃখের কথা যে, ভারতেও এই ভুল অর্থাৎ অপরিণত জনতার উপর সর্বোচ্চ সত্যের আদর্শ সাধারণভাবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা কিছুদিন যাবৎ শুরু হয়েছে। আমার পদ্ধতি তোমার উপযোগী নাও হতে পারে। তোমরা জান যে, সন্ন্যাস-ব্রত হিন্দু জীবনের আদর্শ এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেককেই একদিন সংসার ত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেক হিন্দু এই সংসারের স্বাদ গ্রহণ করার পর জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করবে, যে তা করে না সে হিন্দু নয় এবং নিজেকে হিন্দু বলার অধিকারও তার থাকে না। আমরা জানি, পৃথিবীতে অনেক কিছু দেখে শুনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সবই অসার মনে করে 'সংসারধর্ম' ত্যাগ করাই নীতি। যখন দেখা যাবে, বস্তুজগতের ভিতরটা শুধুই শূন্যগর্ভ, ফাঁকা ছাই-ভস্ম ছাড়া কিছুই নেই, তখন সংসার ত্যাগ করে ফিরে যাও। যেমন মন চক্রাকার গতিতে সামনে ইন্দ্রিয়ের দিকে এগোতে থাকে, আবার তাকে পিছনে ফিরে যেতে হয়; প্রবৃত্তি শেষ হয়ে শুরু হয় নিবৃত্তির। এই আদর্শ। কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতা না হলে ঐ আদর্শের উপলব্ধি ঘটে না। আমরা একটি শিশুকে ত্যাগের মহিমা শেখাতে পারি না; কারণ, জন্ম থেকেই তার কামনা-বাসনার স্বপ্ন, তার সমগ্র জীবনের অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে; বস্তুত ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক পুঞ্জীভূত আশা। প্রত্যেক সমাজেই শিশুসুলভ চরিত্রের মানুষ আছে, যাদের সংসারের অসারত্ব

উপলব্ধির জন্য কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু উপভোগের প্রয়োজন আছে, তারপর আসবে তাদের ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের শাস্ত্রে তাদের জন্য যথেষ্ট প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্তী কালে প্রত্যেককেই সন্ন্যাসীদের নিয়মকানুনের বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে; সেটাই সবচেয়ে বড় ভুল। ভারতে দুঃখ-দারিদ্র্যের অনেকটাই এই কারণে। এমনটি নাও হতে পারতো। একজন দরিদ্র মানুষের জীবন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মকানুনের অক্টোপাস বন্ধনে এমনই জড়িত যে, এগুলির কোন বাস্তব প্রয়োজন ছিল না। হাত গুটাও! দরিদ্র মানুষদের একটু সংসার-সুখ উপভোগ করতে দাও, সে নিজেই তারপর উন্নতির পথে যেতে পারবে, ত্যাগের মনোভাব এমনিই আসবে। সম্ভবত এই ব্যাপারে পাশ্চাত্যের লোকেদের কাছে আমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তাও খুব সাবধানতার সঙ্গে। দুঃখের সঙ্গে আমাকে একথা বলতে হচ্ছে, পাশ্চাত্য ভাবধারা আত্মসাৎ করেছে এমন ব্যক্তিদের জীবন দেখা যায় কম বেশী ব্যর্থতার উদাহরণ।

ভারতে আমাদের চলার পথে দুটি প্রধান বাধা—একটি প্রাচীন রক্ষণশীলতা আর একটি আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা, এই উভয়সংকট। দুটির মধ্যে আমি প্রাচীন রক্ষণশীলতাকেই সমর্থন করি, ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা নয়। প্রাচীনপন্থী লোকেরা অজ্ঞ হতে পারে, অপরিণত হতে পারে, তবু একজন মানুষ হিসাবে তার বিশ্বাস আছে, শক্তি আছে, নিজের বিশ্বাসের ভিত্তির উপর সে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মেরুদণ্ড নেই, সে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যেমন তেমন কতকগুলি জগাখিচুড়ি ভাব জোগাড় করেছে, যেগুলি সে হজম কিংবা সামঞ্জস্যবিধান কোনটাই করতে পারেনি। সে না পারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে, না পারে নিজের মাথা ঠিক রাখতে। তার লক্ষ্য কি? উৎসই বা কোথায়? গুটিকয়েক উৎসাহদাতা ইংরেজের মধ্যে। তার সমাজসংস্কারের পরিকল্পনা কতকগুলি সামাজিক প্রথার কুফলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ, সব কিছুর মূলে কয়েকজন ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষক। কেন আমাদের কতকগুলি প্রথাকে মন্দ বলা হয়? যেহেতু ইউরোপীয়রা বলে। এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই। আমি তা স্বীকার করি না। নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ কর; জগতে যদি কোন পাপ থাকে, তার নাম দুর্বলতা। সব দুর্বলতা পরিহার কর কারণ দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু। ঐ সব ভারসাম্যহীন প্রাণীদের কোন ব্যক্তিত্ব নেই। তাদের পুরুষ, স্ত্রী অথবা জীব কি বলে সম্বোধন করব? প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাসী লোকেরা নিষ্ঠাবান এবং নিঃসন্দেহে পুরুষ। আরও অনেক অপূর্ব উদাহরণ আছে, কিন্তু এখন যাঁর উদাহরণ আমি উপস্থাপিত করতে চাই, তিনি তোমাদের রাজা,—রামনাদের অধিপতি। সারা ভারতে আর এমন একটিও হিন্দু পাবে না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এঁর চেয়ে সব বিষয়ে বেশী খবরাখবর রাখেন, এমন আর একটিও রাজা পাবে না, যিনি প্রত্যেক জাতির যা ভাল তা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন। "নীচ জাতি থেকেও আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তম জ্ঞান সংগ্রহ করো। 'পারিয়া' অর্থাৎ অতিনিকৃষ্ট জাতির সেবা করেও মুক্তির পথ বেছে নাও। কুস্থান থেকে কাঞ্চন তুলে নেওয়ার মত সর্বনিম্ন জাতি থেকে রত্নসমা নারীকে বিয়ে করে মর্যাদার

সঙ্গে গ্রহণ কর।" মহান অতুলনীয় দেবোপম মনুর এই বিধান সত্য। নিজের পায়ে দাঁড়াও, যতখানি পার আত্মসাৎ কর, প্রতিটি জাতির কাছ থেকে শিক্ষা নাও, যতখানি তোমার প্রয়োজন কাজে লাগাও। কিন্তু মনে রেখ, হিন্দু হিসাবে তোমার জাতীয় আদর্শের নীচেই আর সবকিছুর স্থান। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে চালিত মানুষের জীবন তার অনন্ত অতীত জীবনের কর্মের পরিণাম। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তোমাদের মহিমান্বিত জাতির অনন্ত অতীত কর্মের উৎকৃষ্ট উত্তরাধিকার অর্জন করেছ। তোমাদের লক্ষ লক্ষ পূর্বপুরুষ তোমাদের প্রতিটি কাজের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। সুতরাং, সাবধান! কোন্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রতিটি হিন্দুসন্তান জন্মগ্রহণ করে? তোমরা কি পড় নি 'মনু'র সেই অহঙ্কারপূর্ণ উক্তি, "ধর্মসম্পদ রক্ষা করার জন্যই ব্রাহ্মণের জন্ম।" আমি বরং বলতে চাই, শুধু ব্রাহ্মণ নয়, এই পবিত্র দেশের প্রতিটি শিশু, বালক অথবা বালিকা যেই হোক না কেন আমাদের ধর্মের অমূল্যভাণ্ডার রক্ষার জন্যই তার জন্ম। জীবনের অন্য সমস্যা ঐ একটি মাত্র প্রধান বিষয়বস্তুর অধীন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সুরের সঙ্গতি রক্ষার জন্য একই নিয়ম। এমন জাতি থাকতে পারে, যাদের প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করা, সেক্ষেত্রে ধর্ম ও অন্যান্য সব বিষয়ের অবস্থান সেই প্রধান বিষয়টির নীচে। কিন্তু আমাদের জাতির মহান লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগ; যার একটিমাত্র মূল কথা, 'এ জগৎ অসার ও তিনদিনের ভ্রম-মাত্র।' এই মুখ্য বিষয়টি ছাড়া আর সব বিষয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ভোগসুখ, ক্ষমতা, অর্থ, নাম-যশ ইত্যাদি সবই গৌণ। একজন প্রকৃত হিন্দুর চরিত্র-রহস্য এই যে, তাঁর পাশ্চাত্য বিদ্যা, ধন-সম্পদ মান-মর্যাদা সবই তাঁর নিজ ধর্মের মূল আদর্শের অধীন; কারণ, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা হিন্দুর জন্মার্জিত সংস্কার। সুতরাং, এই দু'রকম চরিত্রের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন আদর্শে বিশ্বাসী, জাতির জীবনের মূল আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ আস্থাশীল; আর, যারা দু'হাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার নকল মণিমাণিক্য ভরেছে অথচ আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিহীন, আমার সন্দেহ নেই এখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই প্রথমোক্ত চরিত্রকেই সমর্থন করবেন, কারণ, তাঁদের মধ্যে আশা আছে, জাতীয় লক্ষ্য আছে, অবলম্বন আছে; তাদের বিনাশ নেই, কিন্তু অন্য পক্ষের মৃত্যু অনিবার্য। স্বতন্ত্র ব্যক্তি সম্পর্কেও বলা যায়, যদি জীবনের মূল আদর্শ অক্ষত ও অব্যাহত থাকে, অন্য বিষয়ে আঘাত পেলেও মারাত্মক হয় না। সুতরাং, আমাদের জীবনের মৌলিক আদর্শ যতদিন বিঘ্নিত না হবে, স্বতন্ত্র সত্তাকে হত্যা কর না, আমাদের জাতির ধ্বংস-সাধন করতে কেউ পারবে না। তোমরা মনে রাখবে, যদি আধ্যাত্মিক সম্পদ ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার অনুসরণ করতে থাক, পরিণামে মাত্র তিন পুরুষের মধ্যে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়ে তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; যে ভিত্তিভূমির উপর বিশাল আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রাসাদ রচিত হয়েছিল তার সমাধি হবে এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসের মধ্যেই ঘটবে পরিসমাপ্তি।

অতএব বন্ধুগণ! আমাদের প্রথম ও প্রধান উপায়, যে অমূল্য সম্পদ আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা দান করে গিয়েছেন, সেই আধ্যাত্মিকতাকে অবশ্যই শক্ত হাতে ধরে রাখতে হবে। তোমরা কি এমন দেশের কথা কোনদিন শুনেছ, যে দেশের বিশিষ্টতম

রাজারা নিজেদের রাজবংশোদ্ভূত কিংবা প্রাচীন পার্বত্য দুর্গনিবাসী পথিকের সম্পদ লুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যারনদের বংশধর বলে পরিচয় দেওয়ার অহঙ্কার না করে অরণ্যবাসী অর্ধ-উলঙ্গ মুনি-ঋষিগণের উত্তরাধিকারী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করেন? এমন দেশের কথা কি শুনেছ কোনদিন? এই সেই দেশ। অন্যান্য দেশের বড় বড় ধর্মযাজকরা নিজেদের রাজবংশীয় বলে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু এখানকার বড় বড় রাজারা চেষ্টা করেন নিজেদের প্রাচীন মুনি-ঋষির বংশধর বলে পরিচয় দিতে। তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর কিংবা না কর জাতীয় জীবনের স্বার্থে ধর্মের পথ ধরেই তোমাদের চলতে হবে। তারপর অন্যভাবে আর আর জাতিগুলির কাছ থেকে যা পার গ্রহণ করো, কিন্তু সবকিছুই সেই মূল ধর্মাদর্শের অধীনেই থাকবে। তবেই এক অপূর্ব মহিমান্বিত ভারতের ভবিষ্যৎ রচিত হবে; আমি নিশ্চিত যে, এক অভূতপূর্ব মহত্তর ভারতের দিন আসছে। প্রাচীন মুনি ঋষিদের চেয়ে আরও বড় বড় মুনি ঋষির আবির্ভাব হবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষরা পরলোকে থেকে শুধু সন্তুষ্টই হবেন না, তাঁরা তাঁদের বংশধরদের গৌরবজনক মাহাত্ম্য দেখে গর্ব অনুভব করবেন।

ভাইসব, আমাদের সকলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, এখন ঘুমানোর সময় নয়। ভবিষ্যৎ ভারত নির্ভর করছে আমাদের কাজের উপর। নিদ্রিতা ভারতজননী অপেক্ষা করে আছেন। ওঠ, তাঁকে জাগাও! নূতন প্রাণের সঞ্চার করে আরও অনেক বেশী গৌরবের সঙ্গে সেই শাশ্বত সিংহাসনে বসাও। ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের মাতৃভূমি ছাড়া আর কোথাও এতখানি পূর্ণতালাভ করেনি, কারণ, এই জ্ঞানের অস্তিত্ব আগে কোথাও ছিল না। তোমরা হয়ত আমার এই দৃঢ় ঘোষণায় বিস্মিত হচ্ছ, কিন্তু আর কোন ধর্মশাস্ত্র থেকে আমাদের সমতুল্য ঈশ্বরতত্ত্ব দেখাতে পার কি? তাদের সবই জাতীয় বা গোষ্ঠীভুক্ত ঈশ্বর; যেমন, ইহুদীদের ঈশ্বর, আরবদের ঈশ্বর এইরূপ এক একটি জাতির এক একটি ঈশ্বর। এক জাতির ঈশ্বরের সঙ্গে আর এক জাতির ঈশ্বরের লড়াই লেগে আছে। কিন্তু করুণাময়, দয়াময় ঈশ্বর আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, পরম সখা, আত্মারও আত্মা; কেবল এখানেই আছে এই অপূর্ব তত্ত্ব। তিনিই সেই, যিনি শৈবদের শিব, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু, কর্মীদের কর্ম, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, জৈনদের জিন, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের জিহোভা, মুসলমানদের আল্লা, প্রতি সম্প্রদায়ের প্রভু, বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম। তাঁর সর্বব্যাপী মহিমার কথা শুধু এই দেশই জানে; তিনি আমাদের আশীর্বাদ, সাহায্য, শক্তি, তেজ দান করুন, যেন এই তত্ত্ব আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি। আমরা যা শুনেছি ও শিখেছি তা যেন আমাদের অন্নের মত পালন করে, পরস্পরের সাহায্যে শক্তি ও বীর্যের কাজ করে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যেন ঈর্ষার সৃষ্টি না করে। শান্তি, শান্তি, শান্তি,—হরি, হরি, হরি।

পরমকুডিতে স্বামীজী

[রামনাদের পর স্বামীজী পরমকুডিতে এলে তাঁকে নিম্নোক্ত অভিনন্দন দেওয়া হয়]

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী

আমরা পরমকুডির নাগরিকবৃন্দ পাশ্চাত্য জগতে আপনার প্রায় চার বৎসরব্যাপী সফল ধর্মপ্রচারের পর আমাদের এই স্থানে আপনার ন্যায় মহাত্মাকে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাই।

মনুষ্যজাতির প্রতি যে অনুরাগ আপনাকে চিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিতে এবং সারা বিশ্বের ধর্মীয় প্রতিনিধিবর্গের সামনে আমাদের ধর্মের পবিত্র গুপ্ত সম্পদ উপস্থাপিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এজন্য দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও আনন্দ এবং গর্বের অংশীদার। আপনি বৈদিক শাস্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্বারা আমাদের প্রাচীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাসীর মনের প্রতিকূল ধারণার নিরসন করেছেন এবং যুগে যুগে সব-শ্রেণীর বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যে বৈদিক ধর্মের বিশ্বজনীনতা ও সমন্বয় সাধনের শক্তি সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি করাতে পেরেছেন।

আমাদের মধ্যে আপনার পাশ্চাত্যবাসী শিষ্যদের উপস্থিতিই যথাযথ প্রমাণ করে যে, আপনার ধর্মীয় শিক্ষাদান শুধু তত্ত্বগতভাবে নয় বাস্তবেও ফলপ্রসূ হয়েছে। আপনার পবিত্র প্রভাবের চুম্বকশক্তি আমাদের প্রাচীন ও মহান ঋষিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যাঁদের কঠোর তপস্যাবলে অর্জিত আত্মোপলব্ধি এবং আত্মসংযম তাঁদের মানবজাতির প্রকৃত পথনির্দেশক ও গুরুতে পরিণত করেছিল।

পরিশেষে আমরা দয়াময় ঈশ্বরের নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি যে, তিনি আপনাকে মানবজাতির পবিত্র আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে দীর্ঘ জীবন দান করুন।

সর্বোত্তম শ্রদ্ধাসহ
আপনার একান্ত অনুগত ভক্ত শিষ্য
ও
সেবকবৃন্দ

প্রত্যুত্তরে স্বামীজীর ভাষণ

যে অনুগ্রহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আপনারা আমাকে অভ্যর্থনা দিয়েছেন, তার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষমতা আমার নেই। যদি অনুমতি পাই তাহলে বলতে পারি, স্বদেশের জন্য বিশেষ করে স্বদেশবাসীর জন্য আমার ভালবাসা অটুট থাকবে, তারা আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করুক অথবা অবজ্ঞাভরে দেশ থেকে বিতাড়িত করুক, তবুও। আমরা গীতায় পড়েছি, "মানুষ কাজের জন্য কাজ করবে, ভালবাসার জন্য ভালবাসবে।" পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আমি

যে কাজ করেছি, তা অতি সামান্যই বলতে হবে। এখানে এমন একজনও নেই, যিনি পাশ্চাত্যে আমার চেয়ে একশো গুণ বেশি কাজ করতে পারতেন না। আমি আগ্রহের সঙ্গে সেদিনের জন্য অপেক্ষা করছি, যেদিন শক্তিধর আধ্যাত্মিক মহারথীদের আবির্ভাব ঘটবে, আর, তাঁরা ভারতের অরণ্য থেকে উত্থিত একান্ত নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগের ভাবধারা নিয়ে চলে যাবেন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে।

মানুষের ইতিহাসে এমন সময় আসে যখন দেখা যায় সব জাতিই জাগতিক ব্যাপারে ক্লান্ত; যখন তারা দেখতে পায়, তাদের সব পরিকল্পনা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে, পুরাতন নিয়ম ও প্রথা পদ্ধতিগুলি মিশে যাচ্ছে ধুলোয়, ক্ষয়ে যাচ্ছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শিথিল হয়ে যাচ্ছে সবকিছুর বন্ধন। পৃথিবীতে সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য দু'ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। একটি ধর্মভিত্তিক, অপরটি সামাজিক প্রয়োজনভিত্তিক। একটি আধ্যাত্মিকতার উপর ও অন্যটি জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি জ্ঞানাতীত অলৌকিকতা, অন্যটি বাস্তবতা। একটি এই ক্ষুদ্র বাস্তব জগতের দিগন্তসীমা অতিক্রম করে অনেক দূরে চলে যায় এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে সেই অতীন্দ্রিয় লোকে বাস করার সাহসিকতা অর্জন করে, অন্যটি অর্থাৎ দ্বিতীয়টি সংসার-জীবনকে প্রত্যক্ষ ভিত্তি করে নিজের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার আশা করে। যথেষ্ট কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, একের পর এক ঢেউর মত পৃথিবীতে সময় সময় আধ্যাত্মিক ভাব, তারপর আবার বস্তুতান্ত্রিক ভাব প্রবলতা লাভ করে। একই দেশে জোয়ার ভাঁটার ভিন্ন ভিন্ন খেলা চলে। এক এক সময় বস্তুতান্ত্রিক ভাবধারার ব্যাপক প্রসার ঘটে; দেশের উন্নতি, বেশি সুখ, বেশি খাদ্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ইত্যাদি প্রথমে গৌরবময় স্থান অর্জন করে, পরে এইসবের অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার জিগির যুগধর্মে পরিণত হয়। খুব মার্জিত না হলেও একটি সাধারণ ইংরেজী প্রবাদ অনুসারে, 'যে যার নিজের প্রাণ বাঁচাও'—কথাটি সেই যুগের প্রধান নীতিবাক্য হয়ে দাঁড়ায়। তারপর মানুষ ভাবতে আরম্ভ করে জীবনের সব পরিকল্পনাই বুঝি ব্যর্থ। ডুবন্ত পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য ধর্ম এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে ধ্বংস অপরিহার্য। আবার নূতন আশার সঞ্চার হতে থাকে, নূতন গঠনের জন্য নূতন ভিত্তি রচিত হয়, নূতন আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আবার সময় এলে এরও পতন শুরু হয়। নিয়ম অনুসারে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে একই সময়ে একদল মানুষ আসে যারা পার্থিব জগতের উপর স্বতন্ত্র অধিকার দাবি করে। এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার ফলে জড়বাদের দিকে বিশেষ আকর্ষণ গড়ে উঠে ও স্বতন্ত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার দরজা যথেচ্ছ উন্মুক্ত হয়ে যায়। শুধু আধ্যাত্মিক শক্তি নয়, সব রকম পার্থিব ক্ষমতা ও অধিকার মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় ও এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি সমাজের অসংখ্য মানুষের ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তাদেরই শাসন করতে উদ্যত হয়। তখন সমাজ নিজেকেই সাহায্য করে, জড়বাদকেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হয়।

তোমরা যদি আমাদের মাতৃভূমি ভারতের দিকে তাকাও, দেখবে, এখন এই ব্যাপারই চলছে। আজ তোমরা এখানে এমন একজনকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছ, যিনি পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু এটা কিছুতেই সম্ভব হত না যদি পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা এর রাস্তা না খুলে দিত। সকলের জন্য দরজা খুলে দিয়ে জড়বাদ এক হিসাবে ভারতের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, উচ্চশ্রেণীর বিশেষ অধিকার ধ্বংস করে দিয়েছে, অল্পসংখ্যক কয়েকজনের মুঠোর মধ্যে বন্দী অব্যবহৃত অমূল্য সম্পদ সর্বসাধারণের আলোচনার জন্য দিয়েছে মুক্ত করে। এইসব সম্পদের অর্ধেক চুরি ও নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বাকী অর্ধেক এমন লোকেদের হাতে যারা নিজেরাও ব্যবহার করে না, অন্যকেও ব্যবহার করতে দেয় না। অন্যপক্ষে ভারতে আমরা যে রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছি, সেগুলি যুগ যুগ ধরে ইউরোপে চলে আসছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে, অনুপযোগী। একটির পর একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন, গঠনপ্রণালী এবং রাজনৈতিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিষয় অনুপযুক্ততার জন্য বাতিল হয়েছে। ইউরোপে শান্তি নেই, তারা জানে না কোনদিকে মোড় ফিরবে। স্থূল বাস্তবের অত্যাচার এখন প্রচণ্ড। দেশের ধনসম্পদ, ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যারা নিজেরা কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রম নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিপুণ ব্যবহারের কৌশল তাদের আয়ত্তের মধ্যে। এই ক্ষমতার জোরে সারা পৃথিবীকে তারা রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে পারে। ধর্ম এবং সবকিছুই তাদের পায়ের তলায়, তারাই শাসক, আর, সর্বময় কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে। পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজন 'শাইলক'-এর শাসনাধীন। তোমরা সংবিধান সম্মত সরকার, স্বাধীনতা, মুক্তি, আইনসভা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব কথা শুনছো সবই পরিহাস ছাড়া কিছু নয়।

আজ পাশ্চাত্য ধনী 'শাইলক'দের অত্যাচারে আর প্রাচ্যভূমি পুরোহিতদের অত্যাচারের কবলে গভীর আর্তনাদ করছে; এরা পরস্পরকে সামলাবে। মনে কর না, এদের মধ্যে কোন একটির দ্বারাই পৃথিবীর উপকার হবে। নিরপেক্ষ ঈশ্বর এই সৃষ্টির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কণিকার প্রতিও সমান বিচার করছেন। একজন নিকৃষ্ট দানব প্রকৃতির লোকেরও কিছু সদ্‌গুণ আছে, যা একজন শ্রেষ্ঠ সাধুরও নেই এবং ক্ষুদ্র একটি কীটাণুকীটেরও এমন কিছু গুণ আছে, যা একজন সর্বোচ্চশ্রেণীর মানুষের নেই। একজন দরিদ্র শ্রমিক, তুমি মনে কর, তার ভোগসুখের মত তেমন কিছু নেই, তোমাদের মত বুদ্ধি নেই, বেদান্ত দর্শন ইত্যাদি কিছুই বোঝে না; কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শারীরিক তুলনায় দেখবে, তোমাদের শরীরের মত তার শরীর যন্ত্রণায় এত স্পর্শকাতর নয়। তার শরীরের কোথাও গুরুতর ক্ষত হলে তোমাদের চেয়ে অনেক দ্রুত আরোগ্যলাভ করে। তার জীবন ইন্দ্রিয়গত, সেখানেই তার আনন্দ। তার জীবনেরও ভারসাম্য এবং সামঞ্জস্য আছে। ঈশ্বর প্রত্যেককে নিরপেক্ষভাবে ইন্দ্রিয়, মন, অথবা ধর্ম কোন না কোন ভাবে ক্ষতিপূরণ করেছেন। সুতরাং, আমরাই জগতের ত্রাণকর্তা এমন ধারণা সমীচীন নয়। আমরা পৃথিবীকে

অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারি, আবার অনেক বিষয়ে শিক্ষা নিতেও পারি। আমরা জগৎকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারি, যেটি তার প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি না গড়ে উঠলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। মনুষ্যসমাজকে তলোয়ারের দাবিতে শাসন করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। তোমরা দেখবে, যে সব জায়গায় অস্ত্রের জোরে জবরদস্ত শাসনের নীতি আরম্ভ হয়েছে, তাদেরই পতন ও ধ্বংস ঘটেছে সবার আগে। জাগতিক শক্তি প্রকাশের কেন্দ্র ইউরোপ যদি তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমির আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধূলোয় মিশে যাবে। উপনিষদের ধর্মই ইউরোপকে বাঁচাতে পারবে।

আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, দর্শন, শাস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে মূলগত ভিত্তি আছে, সেটি হল, 'জীবাত্মা' যা সব সম্প্রদায়ের স্বীকৃত সত্য। এই আত্মাই জাগতিক প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। হিন্দুদের মত জৈন, বৌদ্ধ, বস্তুত ভারতের সর্বত্র এই বিশ্বাস আছে, জীবাত্মাই সকল শক্তির আধার। তোমরা বেশ ভালভাবেই জান, ভারতে এমন কোন দর্শন নেই যা আমাদের শিক্ষা দিতে পারে,—শক্তি, শুদ্ধতা, পূর্ণতা বাইরে থেকে অর্জন করা সম্ভব। বরং, সবাই এই কথাই বলবে, এগুলি তোমাদের জন্মগত স্বভাব বা প্রকৃতি। অশুদ্ধ আবরণের নীচে তোমার প্রকৃত স্বভাব বা স্বরূপ ঢাকা পড়ে আছে। প্রকৃত 'তুমি' শুদ্ধ ও বীর্যবান। তোমার নিজের মধ্যেই আত্মসংযমের শক্তি আছে, বাইরের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। পার্থক্য শুধু জানা আর না-জানার মধ্যে। সুতরাং, এই বিশেষ সমস্যাটিকে 'অবিদ্যা' এই শব্দের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ভগবান ও মানুষের মধ্যে, সাধু ও পাপীর মধ্যে তফাৎ কি? কেবল অজ্ঞানতা। শ্রেষ্ঠ মানুষ ও পায়ের তলায় বুকে-হাঁটা অতি ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে পার্থক্য কি? অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতাই সকল পাপের মূল! ঐ ক্ষুদ্র বুকে-হাঁটা কীটের মধ্যেও আছে অনন্ত শক্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা, স্বয়ং ঈশ্বরের অসীমসত্তা। এই সত্তার প্রকাশ নাই; একেই প্রকাশিত হতে হবে।

এই একটি মহান সত্য পৃথিবীকে শিক্ষা দেবে ভারত, কারণ, এই সত্য আর কোথাও নাই। এই আধ্যাত্মিকতা বা আত্মবিজ্ঞান। শক্তির জোরে মানুষ উঠে দাঁড়ায় ও কাজ করে। শক্তিই ধার্মিকতা, দুর্বলতা পাপ। যদি উপনিষদ থেকে কোন একটি শব্দ বোমার মত ছিটকে বেরিয়ে এসে পুঞ্জীভূত অজ্ঞানতার উপর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকে তবে সেই শব্দটি 'নির্ভীকতা'। যদি কোন ধর্মশিক্ষা দিতে হয়, তবে সে এই নির্ভীকতার ধর্ম। একথা সত্য যে পার্থিব এবং ধর্মীয় জগতে অধঃপতন ও পাপের নিশ্চিত কারণ, ভয়। ভয় থেকে দুঃখ, ভয় থেকে মৃত্যু, ভয় থেকে অশুভের জন্ম। ভয়ের কি কারণ? আমাদের স্বভাবের অজ্ঞানতা। আমরা প্রত্যেকেই সেই রাজার রাজা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, তাঁর অংশ। না, তাও নয়, অদ্বৈত মত অনুযায়ী আমরাই ব্রহ্ম নিজেদের ক্ষুদ্র মানুষ ভেবে নিজেদেরই স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি।

এই আত্মবিস্মৃতিই পার্থক্য সৃষ্টির মূলে; যেমন,—'তোমার চেয়ে আমি ভাল' অথবা 'আমার চেয়ে তুমি'...ইত্যাদির বিরোধ। ভারত জগৎকে এক অভিন্ন তত্ত্বের মহৎ শিক্ষা দিতে পারে; মনে রেখো, এই তত্ত্বের উপলব্ধির ফলে সমগ্র দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে যাবে। কারণ, তুমি আগে জগৎকে যে দৃষ্টিতে বিচার করতে, এরপর অন্য দৃষ্টিতে বিচার করবে। মনে হবে, এ পৃথিবী প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করার যুদ্ধক্ষেত্র নয়, সবলের জয়লাভ ও দুর্বলের মৃত্যু নয় অবধারিত। এটি একটি খেলার মাঠ, স্বয়ং ঈশ্বর শিশুর মত খেলা করছেন, আর আমরা তাঁর খেলার সাথী, সহকর্মী। যতই ভীষণ, কুৎসিৎ ও বিপজ্জনক মনে হোক না কেন, এ শুধু খেলা। এই খেলাকেই আমরা ভুল বিচার করে থাকি। আত্মার স্বরূপ জানা গেলে, চরম দুর্বল, অধঃপতিত হতভাগ্য পাপীরও মনে আশার সঞ্চার হয়ে থাকে। শাস্ত্র বলেছেন, "হতাশ হয়ো না। তুমি যাই কর না কেন, তুমি সেই একই আছ, তোমার প্রকৃতি-সত্তার পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতি প্রকৃতিকে ধ্বংস করে না। তোমার প্রকৃতি পবিত্র। লক্ষ লক্ষ যুগ এই প্রকৃতি অব্যক্ত থাকতে পারে, কিন্তু অবশেষে একে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এই জন্যই অদ্বৈতবাদ প্রত্যেকের মধ্যে আশার সৃষ্টি করে, নিরাশা নয়। এই শিক্ষা ভয়ের মধ্যে নয়; এমনও নয় যে শয়তান সব সময় তোমার উপর লক্ষ্য রেখেছে, ভুল পদক্ষেপ হলেই ঝাপ্‌টে ধরবে। শয়তানের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, বরং বলা হয়েছে, 'তোমার অদৃষ্ট রচনার দায়িত্ব তোমারই হাতে। তোমার নিজ কর্মফলেই তোমার এই শরীর জন্ম, আর কেউ তোমার হয়ে করেনি। সর্বব্যাপী ঈশ্বর তোমার অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত, দায়িত্ব তোমারই। একথা মনে করো না যে, তোমার ইচ্ছার বাহিরে এ জগতে কেউ তোমাকে এনেছে ও এই সাংঘাতিক জায়গায় ছেড়ে দিয়েছে; বরং, জেনো যে, একটু একটু করে তোমার শরীর তুমিই গড়েছ, এবং এখন এই মুহূর্তেও গড়ে চলেছ। যেমন, তুমি নিজেই খাও, কেউ তোমার হয়ে খায় না। তোমার খাদ্য তুমিই হজম কর, আর কেউ তোমার হয়ে করে না। ঐ খাদ্য থেকে তোমার রক্ত, তোমার মাংসপেশী, তোমার শরীর গঠন কর, তোমার হয়ে আর কেউ তা করে না। তুমি সব সময় এই কাজ করে চলেছ। শৃঙ্খলের ক্ষুদ্র একটি অংশ পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত অনন্ত ধারাবাহিকতাকে বুঝতে সাহায্য করে। যদি এক মুহূর্তের জন্যও সত্যি হয় যে, তুমিই তোমার শরীর গঠন করছ, তাহলে অতীতেও তাই করেছ এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। ভাল এবং মন্দের সব দায়িত্ব তোমার। এটি সবচেয়ে বড় আশার কথা, আমি যা গড়েছি, আমিই তা ভাঙতে পারি। এই সঙ্গে আমাদের ধর্মে মনুষ্যজাতির উপর ঈশ্বর-কৃপার স্বীকৃতিও আছে। তিনি শুভ ও অশুভের প্রচণ্ড স্রোতের পারে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বন্ধনহীন, সর্বদাই কৃপাময়, সংসার-সমুদ্রের ওপারে যাওয়ার জন্য আমাদের সাহায্য করতে সকল সময় প্রস্তুত। তাঁর তুলনাহীন দয়া শুদ্ধাত্মারাই লাভ করে থাকেন।

তোমাদের আধ্যাত্মিকতা একটি বিশেষরূপে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তুলবে। আমার হাতে আরও সময় থাকলে আমি তোমাদের দেখাতে পারতাম,

অদ্বৈতবাদের কোন কোন সিদ্ধান্ত থেকে কিভাবে পাশ্চাত্য আরও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এই জড়বিজ্ঞানের যুগে সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব হয়ত তেমন স্বীকৃতি পাবে না। কিন্তু, তবুও যদি কোন ব্যক্তি স্থূল ধর্মাচরণ করে থাকে এবং মন্দির মূর্তি ইত্যাদি চায়, যত খুশী পেতে পারে, যদি সগুণ ঈশ্বরে অনুরাগ অর্পণ করতে চায়, সে তার মহত্তম ভাব এখানে পাবে, যা পৃথিবীতে আগে কোথাও কোনদিন ছিল না। যদি যুক্তিবাদী মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে চায়, নির্গুণ ব্রহ্মবাদের মধ্যে চূড়ান্ত যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের সন্ধানও সে এখানেই পাবে।

শিবগঙ্গা ও মনমাদুরার সংবর্ধন

[শিবগঙ্গা ও মনমাদুরার জমিদারশ্রেণী ও নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে স্বামীজীকে প্রদত্ত সংবর্ধনা]

বহুমানভাজন মহাশয়,

আমরা, শিবগঙ্গা ও মনমাদুরার জমিদারশ্রেণী ও নাগরিকবৃন্দ আপনাকে জানাই পরম সাদর অভ্যর্থনা। আমরা জীবনের চরম মুহূর্তগুলিতে এমনকি স্বপ্নের গভীরে কখনও ভাবতে পারিনি যে আপনি আমাদের অন্তরের এতো কাছের জন। আপনি যে আমাদের দেশের মাটিতে এত কাছাকাছি আসবেন, এটাও ছিল আমাদের স্বপ্নের অতীত। শিবগঙ্গাতে আসতে পারবেন না জানিয়ে আপনার তারবার্তা আমাদের মনে সৃষ্টি করেছিল বিষাদের কালো ছায়া। কিন্তু পরমুহূর্তে প্রাপ্ত আশার আলো আমাদের মন থেকে বিষাদের মেঘকে করেছে অপসারিত। আমরা যখন প্রথম শুনলাম যে আপনি সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হবার সম্মতি প্রদান করেছেন, আমাদের মনে হয়েছিল, আমাদের সর্বোচ্চ অভীষ্ট বাসনা পূর্ণ হবে। মনে হচ্ছিল যেন পর্বত মহম্মদের কাছে আসতে রাজী হয়েছে; আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। যখন পর্বত সম্মতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়, এবং আমাদের সবচেয়ে বেশী ভীতি ছিল যে হয়তো আমরা পর্বতের নিকট যেতে পারব না, কিন্তু আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আপনি সেই পথ তৈরী করে দিয়েছেন। যাত্রাপথের প্রায় অলঙ্ঘনীয় বাধা অতিক্রম করে আপনি প্রাচ্যের মহান বাণী পাশ্চাত্যে পৌঁছে দিতে পেরেছেন, তার প্রধান কারণ আপনার মধ্যে বিরাজমান আত্মত্যাগের মহান আদর্শ। এই অপূর্ব পন্থা আপনার দৌত্যকে করেছিল সফল। ফলত আপনার মানবহিতৈষী প্রচেষ্টা অর্জন করেছিল আশ্চর্য ও অদ্বিতীয় সাফল্যের বিজয়-মুকুট—আর আপনি হয়েছেন অমর গৌরবের অধিকারী।

যখন পাশ্চাত্য বস্তুবাদ আমাদের ধর্মের মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করছিল এবং যখন আমাদের ঋষিদের মহাপুরুষদের বাণী ও রচনাবলী ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছিল—তখন আপনার মত একজন পথপ্রদর্শকের আগমন ধর্মীয় অগ্রগতির ইতিহাসে একটা যুগকে চিহ্নিত করেছে। আমরা আশা করি আপনি সময়মত ভারতীয় দর্শনের বিশুদ্ধ সোনার ওপর থেকে সাময়িক কৃত্রিমতার প্রলেপ অপসারণে সক্ষম হবেন, এবং আপনার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিশ্বের দরবারে চালু করবেন। যে সর্বজনীনতার বলে আপনি বিজয়ীর মত ধর্ম মহাসভায় ভারতীয় দর্শনের পতাকা বহন করেছিলেন, যার ফলে আমরা সাহসে বুক বেঁধে আশা করতে পারি যে এমন একদিন আসবে যখন আপনার রাজনৈতিক সমসাময়িকদের মত আপনিও একটা সাম্রাজ্য শাসন করতে পারবেন যেখানে সূর্য কখনও অস্তমিত হবে না। শুধুমাত্র পার্থক্য, রাজনৈতিক সাম্রাজ্য হল বস্তুজগৎ আর আপনার সাম্রাজ্য হল মনোজগৎ অর্থাৎ অন্তর্জগৎ। সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ও কার্যকমতার সাহায্যে রাজনৈতিক ইতিহাসে সে যেমন সকল দৃষ্টান্ত ছাপিয়ে গেছে, সেইরূপ প্রেমের উপলব্ধির পূর্ণতা ও স্বকীয় উজ্জ্বলতা দিয়ে আপনিও আধ্যাত্মিক

জগতের সকল পূর্বপুরুষদের অতিক্রম করবেন। ঈশ্বরের কাছে আমরা একান্তভাবে তাই কামনা করি।

ইতি

আপনার কর্তব্যপরায়ণ সেবকবৃন্দ

স্বামীজীর প্রতিভাষণ

আপনারা আমায় যে উদার ও উত্তপ্ত অভ্যর্থনা জানিয়েছেন আমার গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘ সময় ধরে বক্তৃতা দেওয়ার মত অনুকূল পরিস্থিতির অভাব, তথাপি যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে বলার চেষ্টা করব। আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু আমার প্রতি সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আমার তো একটা দেহ আছে—যদিও এই ধরনের চিন্তা হয়ত মূর্খামি। আমার দেহ রক্তমাংসে তৈরী, এবং মানবদেহ সবসময় অনুপ্রেরণা, অবস্থা এবং বস্তুর নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে। বস্তুজগতের নিয়মসাপেক্ষে শরীরে আছে ক্লান্তি আর শ্রান্তি। পাশ্চাত্যে আমার একটা সামান্য কাজের দরুন দেশের সর্বত্র আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার জোয়ার বয়ে গিয়েছে; সত্যিই এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা।

আমি এইভাবে এটাকে যাচাই করতে চাই: ভবিষ্যৎ মহাপুরুষদের জন্য এটাকে প্রয়োগ করতে চাই। যদি আমার সম্পন্ন সামান্য কাজই দেশের কাছ থেকে এই ধরনের সম্মতি অর্জন করে, তবে আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ তথা বিশ্বপথপ্রদর্শক যাঁরা আমাদের পরে আসছেন তাঁরা জাতির কাছ থেকে কত পাবেন। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ; হিন্দুরা ধর্ম—ধর্মই বুঝতে পারে। বহু শতাব্দীর শিক্ষা এই পথে প্রবাহমান; ফলস্বরূপ ধর্মই হয়েছে জীবনের একমাত্র সঙ্গী, তোমরা সকলে ভালোভাবেই জানো ঘটনার বিকাশ এইভাবেই ঘটছে। সকলকেই যে দোকানদার হতে হবে এমন কোন কথা নেই, সকলকেই যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা যোদ্ধা হবে তারও কোন অর্থ নেই, কিন্তু এই বিশ্বজগতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হবে নানা সমন্বয়ের বাণী।

বহুজাতিক ঐক্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে আমরা বোধহয় ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হই। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঐতিহ্য আমরা এখনো বহন করছি যা কিনা আমাকে আনন্দিত করে। এই ঐতিহ্যের জন্য পৃথিবীর যে কোন দেশই গর্ববোধ করতে পারে। আমি আশায় বুক বাঁধি, জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে জাগে গভীর বিশ্বাস। ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি যে মনোভাব প্রদর্শন করা হয়েছে সেইজন্য নয়, যখন জানতে পারি দেশের প্রাণে জাগরিত হয়েছে ঐক্যের বাণী, তখনই আমি আনন্দে আত্মহারা হই। ভারতবর্ষ এখনো বেঁচে আছে; কে বলে ভারতবর্ষ শেষ হয়ে গেছে? কিন্তু পাশ্চাত্য আমাদের কার্যদক্ষতা দেখতে চায়। যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতা দেখতে চায়, তাহলে তারা হতাশ হবে, কারণ যুদ্ধক্ষেত্র

আমাদের স্থান নয়—ঠিক তেমনি আমরাও হতাশ হবো যদি দেখি একটি সামরিক জাতি আধ্যাত্মিক জগতে দক্ষতা প্রদর্শন করছে।

তারা এখানে আসুক এবং দেখে যাক, আমরাও তাদের সমদক্ষতাসম্পন্ন। দেখে যাক, আমরা কি ভাবে বেঁচে আছি এবং চিরকাল বেঁচে থাকব।

অধঃপতনের ধারণাকে আমাদের দূরীভূত করা উচিত। এখন আমি আপনাদের কিছু কঠোর কথা বলতে চাই এবং আশা করি তা আপনারা খারাপ অর্থে গ্রহণ করবেন না। এমন অভিযোগ করা হচ্ছে যে, ইউরোপীয় বস্তুবাদ আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করছে। এর জন্য ইউরোপীয়দের সম্পূর্ণভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, আমরাই অধিক পরিমাণে দায়ী।

আমরা, বেদান্তবাদীরা যে কোন বিষয়কে অন্তর্দর্শনের ও আত্মিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাচাই করব। আমরা, বেদান্তবাদীরা সুনিশ্চিতভাবে জানি যে বিশ্বের কোন শক্তিই আমাদের ক্ষতি করতে পারে না, যদি না আমরা প্রথমে আমাদের ক্ষতিসাধন করি।

ভারতবর্ষের সমগ্র জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান হয়েছে। অতীতের দিকে তাকালে দেখবো প্রাচীন ভারতে জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে এক-পঞ্চমাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, দশ লক্ষের ওপরে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী।

কে এর জন্য দায়ী? এর ব্যাপারে একজন ঐতিহাসিকের কথা চিরস্মরণীয়। তিনি বলেছেন—জীবনের আনন্দমুখর গতি পথে কেন এই দরিদ্র জনসাধারণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনশনে জীবন অতিবাহিত করবে? প্রশ্নটা হল—যারা নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে, তাদের জন্য আমরাই বা কি করতে পারতাম? আমি ইংলণ্ডে একজন সৎ বালিকার কথা শুনেছিলাম যে রাস্তার ভিখারী হতে বাধ্য হয়েছিল। একজন মহিলা তাকে এই পেশা পরিত্যাগ করতে বলেছিল, তখন সে উত্তর দিয়েছিল—এটাই একমাত্র পথ, যে পথে আমি সহানুভূতি অর্জন করতে পারি। আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন একজনকেও আমি খুঁজে পাই নি। যদি আমি অধঃপতিত, পদদলিত হই তাহলে হয়ত দেখা যাবে দয়াবতী মহিলারা আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করছে।

ধর্মত্যাগীদের জন্য আমরা এখন ক্রন্দন করছি, কিন্তু পূর্বেই বা তাদের জন্য আমরা কি করেছিলাম? আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা কি শিক্ষা অর্জন করেছি—আমরা কি সত্যের আলোকবর্তিকা বহন করতে পেরেছি; যদি পেরে থাকি, তবে তা কতদূর বহন করতে পেরেছি? তখন আমরা তাদের সাহায্য করিনি। এই একমাত্র প্রশ্ন আমাদের অন্তরে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমরা কিছু করিনি, এটাই ছিল আমাদের দোষ—আমাদের 'কর্ম'। অন্য কারোকে অভিশাপ দেওয়া অর্থহীন—অভিশাপ দেওয়া যেতে পারে আমাদের কর্মকে।

বস্তুবাদ, ঐস্লামিক মতবাদ বা খ্রীশ্চান মতবাদ অথবা পৃথিবীর যে কোন মতবাদই সাফল্য লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না তুমি তাকে অনুমোদনযোগ্য বলে মনে কর।

কোন জীবাণুই দেহযন্ত্রকে আক্রমণ করতে পারে না, যতক্ষণ না পাপ, খারাপ খাদ্য, অবক্ষয় ও মানসিক ক্লেশ দেহযন্ত্রকে অধঃপতিত ও অবদমিত করে। বিষাক্ত জীবাণুর স্তূপের মধ্যে দিয়ে একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ অনাহত রূপে গমন করতে পারে। আমাদের এখনো পথ পরিবর্তনের সময় আছে। পুরানো আলোচনা ত্যাগ কর, অর্থহীন বিষয় সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ কর, কারণ গুণগত দিক থেকে এর কোন অর্থ নেই।

গত ছয় অথবা সাত শতাব্দীর কথা ভাবো, যখন বয়স্ক ব্যক্তিরা বছরের পর বছর এক গ্লাস জল খাওয়ার সময় চিন্তা করত, গ্লাসটা ডান হাতে না বাঁ হাতে ধরব, হাতকে তিনবার না চারবার পরিষ্কার করব, কুলকুচি পাঁচবার না ছয়বার করব। এই ধরনের ব্যক্তি যারা এই সব ক্ষণিকের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও তার দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করে জীবন কাটিয়ে গেছেন, তাদের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না।

এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের ধর্মের বিপদ। আমরা বেদান্তবাদীও নই, এমনকি আমাদের অধিকাংশই এখন আর পৌরাণিক বা তন্ত্রপন্থীও নই। আমরা পরিণত হয়েছি ছুৎমার্গীর দলে। আমাদের ধর্ম রান্নাঘরে আবদ্ধ। আমাদের ঈশ্বর হলেন রান্নার পাত্র, আর 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি পবিত্র' এই দৃষ্টিভঙ্গি হল আমাদের ধর্ম। এই ঘটনা যদি আরো একটি শতাব্দী ধরে চলে, তবে আমরা সকলে একটা উন্মাদ আশ্রমের সদস্য হয়ে দাঁড়াব। যখন মন জীবনের উচ্চতর সমস্যাকে অবধারণ করতে অক্ষম হয়, তখনই মস্তিষ্কের অক্ষমতা সুনিশ্চিত। সকল উদ্ভাবনী শক্তি অবলুপ্ত, মন সব ধরনের শক্তি, কার্যদক্ষতা ও চিন্তাশক্তি হারিয়েছে, ক্রমশ ক্ষুদ্র বিষয়ের ওপর নিজের পরিমণ্ডলকে আবদ্ধ করেছে। মনের এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, তাহলেই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব; তাহলে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অপরিমেয় ধনকে চিনতে পারবো।

যে ধন বর্তমান বিশ্বের একান্ত প্রয়োজন, সেই ধন সুষ্ঠুভাবে বিতরণ না করলে বিশ্ব-জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশ্বের অন্তরে এই ধনকে উন্মেষিত কর। ব্যাস বলেছেন —কলিযুগে দান করাই একমাত্র কাজ; সকল দানের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন দান করাই শ্রেষ্ঠ, এরপর হল মুক্ত বা পার্থিব জ্ঞান, তারপর হল মানবজাতির প্রাণরক্ষা করা এবং সর্বশেষ হল ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা। খাদ্য আমরা যথেষ্ট দান করি; কোন জাতিই আমাদের মতন এত দানশীল নয়। যদি কোন ভিক্ষুকের গৃহে একখণ্ড রুটি থাকে, তবে সে তার অর্ধেক দান করবে। এই ধরনের ঘটনা একমাত্র ভারতেই লক্ষ্য করা যায়। এই রকম দান করবার ক্ষমতা আমাদের যথেষ্ট আছে—অপর দুটি দান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জ্ঞান এই দুটি দানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। যদি আমরা বলিষ্ঠ হৃদয়ে সাহসে বুক বাঁধি, আন্তরিকতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাই তাহলে পঁচিশ বছরের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারব। কোন কিছুর সঙ্গেই আর সঙ্ঘর্ষ বাঁধবে না। আবার ভারতবর্ষ আর্য রক্তে ঝলসে উঠবে।

এখন আপনাদের প্রতি এই আমার একমাত্র বক্তব্য। পরিকল্পনার জাল বুনতে আমি রাজী নই; বরং কাজ করে দেখাতে চাই, তারপরে আমার পরিকল্পনার কথা। আমার নিজস্ব পরিকল্পনা আছে এবং ঈশ্বরের কৃপায় যদি সম্ভব হয় তবে তা আমি কাজে পরিণত করব। আমি জানি না কতদূর কৃতকার্য হবো; কিন্তু জীবনে একটা মহান আদর্শ গ্রহণ করা ও তার জন্য জীবন উৎসর্গ করাও একটা মহৎ ব্যাপার। নতুবা এই ক্ষুদ্রজীবনের কি মূল্যই বা আছে? উচ্চ আদর্শ গ্রহণের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত মূল্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই মহান কাজ ভারতে সম্পাদন করতে হবে। বর্তমান ধর্মীয় জাগরণকে আমি স্বাগত জানাই; যদি আমি উত্তপ্ত লৌহকে আঘাত করার সুযোগ নষ্ট করি তাহলে সেটা আমার পক্ষে মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাদুরায় অভিনন্দন

[মাদুরার হিন্দুসমাজ স্বামীজীকে এই অভিনন্দন পত্রটি দেন]

আমরা, মাদুরাইয়ের হিন্দুজনতা এই প্রাচীন ও পবিত্র শহরের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। আমরা আপনার মধ্যে একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি উপলব্ধি করতে পেরেছি। আত্মার সন্তোষের জন্য আপনি সকল পার্থিব সম্বন্ধবন্ধন পরিত্যাগ করে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করবার মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন এবং মানবজাতির হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ধর্মীয় আচার-আচরণের মধ্যেই হিন্দুধর্মের সত্যিকারের নির্যাস আবদ্ধ নয়, বরঞ্চ বলা যায় এটা হল একটি মহান দর্শন যা নিপীড়িত জনগণের হৃদয়ে শান্তি ও প্রীতির ভাব সৃষ্টি করতে পারে। যে ধর্ম এবং দর্শন ক্ষমতা ও পরিবেশের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তাধারাকে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে উন্নত করার চেষ্টা করে—আপনি সেই ধর্মের কথা ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাকে শুনিয়েছেন এবং তারা প্রশংসা করতে শিখেছে।

যদিও গত তিনবছর ধরে আপনি আপনার বাণী বিদেশের মাটিতে প্রচার করছেন, এই দেশের লোকেরাও সেগুলি গ্রহণ করতে কম আগ্রহী নয়। বিদেশ থেকে আমদানী ক্রমবর্ধমান বস্তুবাদকে প্রতিহত করবার মতন তাদের কিছুই নেই। বিশ্বজগতে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে পরিপূর্ণ করার দায়িত্ব ভারতবর্ষের। সেইজন্যই ভারতকে কাজ করতে হবে। কলিযুগের ক্রান্তিলগ্নে আপনার মতন মহান ব্যক্তির আবির্ভাব অদূর ভবিষ্যতে মহাপুরুষদের অবতারণের সুনিশ্চিত সূচনা।

প্রাচীন শিক্ষার পীঠস্থান, মাদুরা ভগবান সুন্দরেশ্বরের প্রিয় শহর মাদুরা যোগীপুরুষদের পবিত্র দ্বাদশান্তকক্ষেত্রম্—আপনার ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যাকে আন্তরিক প্রশংসা জ্ঞাপনের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য সহরের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে না। মানবতার মঙ্গলের জন্য আপনার কার্যাবলীকে আন্তরিকতার সঙ্গে জানাই অভিনন্দন।

অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তি নিয়ে আপনি দীর্ঘজীবী হোন—ঈশ্বরের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।

স্বামীজীর প্রতিভাষণ

ইচ্ছা হয়, আরও কয়েকদিন আমি আপনাদের মধ্যে থেকে আপনাদের সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের কথা মতো পাশ্চাত্য দেশে আমার চার বছর পরিভ্রমণ এবং পরিশ্রমের ফলাফল সম্পর্কিত বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিই। দুর্ভাগ্যবশত স্বামীজীদেরও দেহধারণ করতে হয়। গত তিন সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত পরিভ্রমণ ও বক্তৃতা দেওয়ার দরুন আজকের সন্ধ্যায় দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আজকের সন্ধ্যায় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা থাক, ভবিষ্যতে শরীর সুস্থ হলে আর একদিন বিভিন্ন বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা যাবে। মাদুরাতে এসে, বিশেষতঃ সর্বজনবিদিত মহান ব্যক্তি রামনাদের রাজার অতিথি হিসেবে একটা কথা আমার খুব মনে পড়ছে—আপনারা বোধহয় অনেকেই জানেন না এই রাজাই প্রথম আমার মনে জাগিয়েছিলেন চিকাগো যাওয়ার বাসনা। তিনিই সবসময় আন্তরিকভাবে আমাকে সর্বরকমে সাহায্য করেছেন। সেইজন্যই আজকের অভিনন্দন পত্রে আপনারা যে প্রশংসা আমায় অর্পণ করেছেন তার অনেকখানিই দক্ষিণ ভারতের এই মহান ব্যক্তির প্রাপ্য। আমি মনে করি রাজা হওয়ার পরিবর্তে তাঁর সন্ন্যাসী হওয়াই উচিৎ ছিল—কারণ তিনি সন্ন্যাসী হওয়ারই উপযুক্ত।

পৃথিবীর কোন প্রান্তে যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তখনই সম্পূরক শক্তি কোথাও না কোথাও দেখা দেয় এবং নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চার করে। এটা বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ উভয়ক্ষেত্রেই সত্য। যদি পৃথিবীর কোন প্রান্তে অধ্যাত্মিকতার অভাব দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যপ্রান্তে আধ্যাত্মিকতা দেখা যাবে; আমরা সচেতনভাবে চেষ্টা করি বা না করি, একপ্রান্তের আধ্যাত্মিকতা অন্য প্রান্তে পূরণ করবে এবং আধ্যাত্মিকতার ভারসাম্য রক্ষা করবে।

মানবজাতির ইতিহাসে, একবার বা দুবার নয়, বার বার দেখা গিয়েছে অতীতে বিশ্বজগতে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন মিটিয়েছে ভারতবর্ষ। আমরা দেখেছি বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যখন দিগ্বিজয় বা বাণিজ্যের সূত্রে একত্রে মিলিতভাবে কাজ করে, তখন দেখা যায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। মানবতার জ্ঞানবিকাশের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক দর্শনই ভারতবর্ষের একমাত্র দান। পারস্য সম্রাটের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই সে আধ্যাত্মিক দর্শন দান করছে; এবং পারস্য সম্রাটের অভ্যুত্থানের সময়েও সে তাই করেছে। তৃতীয়বার করেছে গ্রীক সাম্রাজ্যের উদয়ের সময়। চতুর্থবার ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের সময়।

বোধহয় আবারও সে কর্তব্য সম্পাদন করতে চলেছে। পশ্চিমী মতবাদের সংগঠন ও বহির্সভ্যতা প্রত্যেকের মধ্যে প্রবেশ করছে এবং আমাদের দেশে প্রভাব বিস্তার করছে।

আমরা তা গ্রহণ করব কি করব না, এইভাবে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন পশ্চিমী ভূমিকে করেছে প্রভাবিত। বিশ্বের কোন শক্তিই একে রোধ করতে পারবে না। এবং আমরাও পশ্চিমী বস্তুবাদী সভ্যতার কিছু কিছু অংশকে রোধ করতে পারব না। মনে হয় এই সামান্য অংশ আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। তদ্রূপ আধ্যাত্মিকতার সামান্য অংশও পশ্চিমের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইভাবে সাম্যাবস্থা সংরক্ষিত হবে। এরকম নয় যে আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে সবকিছু শিখব, অথবা তারা আমাদের কাছ থেকে শিখবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে যেতে হবে ঐক্যের সুমহান বাণী সম্বলিত একটা সুন্দর আদর্শ পৃথিবী গড়বার প্রতিশ্রুতি। আমি জানি না সেই আদর্শ পৃথিবী কখনও গড়ে

উঠবে কিনা। সেই সামাজিক পূর্ণতায় পৌছান সম্ভব হবে কি না—তাতেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু তা সম্ভব হোক বা না হোক, আমাদের আদর্শের জন্য এমনভাবে কাজ করে যেতে হবে যেন আগামীকালই আমরা সেই আদর্শের পূর্ণতা অর্জন করব।

তা যেন শুধুমাত্র কাজের ওপরই নির্ভরশীল হয়। আমাদের প্রত্যেকের যেন এই বিশ্বাস থাকে যে, এই বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করছে এবং এই কথা মনে রেখে যেন কাজ করে যে এই বিশ্বজগৎকে পরিপূর্ণরূপে গড়ার কাজে শুধুমাত্র আমার কাজই বাকি আছে। এই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেককে বহন করতে হবে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে প্রচণ্ডভাবে ধর্মীয় জাগরণ সম্পাদিত হয়েছে। গৌরবের মত সামনে বিপদের সঙ্কেতও আছে। ধর্মীয় জাগরণের ক্রান্তিলগ্নে দেখা যায় ধর্মীয় উন্মাদনা ও উগ্র কার্যাবলী। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে জাগরণের প্রবক্তারাও এই উন্মাদনা সংযত করতে অক্ষম হয়। সুতরাং আগের থেকে সতর্ক হওয়া মঙ্গলজনক। প্রাচীন গোঁড়ামিপূর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্নতার 'স্কাইলা' ও ইউরোপীয়মতবাদ অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব-হীনতার মতবাদ বা বস্তুবাদের 'চেরাবদিলোর' মধ্যে আমাদের পথ তৈরী করে নিতে হবে। নতুবা বস্তুবাদের প্রভাবে সৃষ্ট তথাকথিত সংস্কারসাধন—যা কিনা পশ্চিমী সভ্যতাকে দারুণভাবে আঘাত করেছে। এই দুটি বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে। প্রথমতঃ আমরা পশ্চিমী হতে পারব না, সুতরাং তাদের নকল করাও অর্থহীন। ধরা যাক তুমি পাশ্চাত্যের অনুকরণে সক্ষম হলে, সেই মুহূর্তে তোমার কাছে তোমার অস্তিত্ব ম্লান হয়ে যাবে, তুমি নিজের কাছে হবে পরাজিত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটা হবে অসম্ভব। সময়ের অতীতকাল থেকে একধরনের স্রোতস্বিনী লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানবতার ইতিহাসে প্রবাহিত হচ্ছে; তুমি কি তা উপলব্ধি করতে পেরেছো? অথবা উৎসের দিকে অথবা হিমালয়ের হিমবাহের দিকে তার গতিমুখ সঞ্চারিত করতে পেরেছো কি? এটা যদিও বা সম্ভব, ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তুমি দেখো কয়েক শতাব্দীর সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করা ইউরোপীয়ানদের কাছে অসম্ভব, তাহলে তুমি কি মনে করো কোটি কোটি শতাব্দীর উজ্জ্বল সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব? এটা কখনই হতে পারে না। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য-দেবতা অথবা ক্ষুদ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার যা আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, সেই ঘটনাগুলিকেই মনে করা যেতে পারে ধর্মীয় বিশ্বাস। কিন্তু স্থানীয় ধর্মীয় আচারের সংখ্যা অসীমসংখ্যক এবং দ্বন্দ্বমূলক। কোন স্থানে যা মান্য করা হয়, অন্য স্থানে হয় না।

উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ কোন মাংসভোজী ব্রাহ্মণ দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়; কিন্তু উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ মাংস ভোজনকে গৌরবের ও পবিত্র ব্যাপার বলে মনে করে, এবং সেই কারণে শত শত ছাগল বলি দেয়। তুমি তোমার মতন করে আচরণবিধি পালন করতে পারো, তদ্রূপ অন্যেও তাদের মতন করে করবে।

ভারতের স্থানের সাথে সাথে আচরণবিধিও পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ আচরণবিধি স্থানীয় ব্যাপার। আমাদের সবচাইতে মারাত্মক ভুল হলো অজ্ঞজনেরা মনে করে এই স্থানীয় আচরণবিধিই হচ্ছে সত্যিকারের ধর্ম। এছাড়াও আরও অন্যান্য অসুবিধা আছে। আমাদের শাস্ত্রে দুই ধরনের সত্যের কথা বলা হয়েছে, একটি সত্য হলো ঈশ্বর, আত্মা ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে স্বর্গীয় সম্পর্ক স্থাপনকারী মানুষের স্বর্গীয় প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে।

অপরটি হলো স্থানীয় অবস্থা, সময়ের পরিবেশ, সমাজে শিক্ষার পীঠস্থান ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। প্রথমত: আমাদের ধর্মগ্রন্থ বেদে সত্যের শ্রেণীবিভাগ সরলভাবে বিধৃত আছে, দ্বিতীয়ত: স্মৃতি ও পুরাণেও তা পরিষ্কারভাবে বিধৃত। আমাদের মনে রাখতে হবে সকল কালের জন্য বেদই আমাদের অন্তিম লক্ষ্য এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। যদি পুরাণের সাথে বেদের কোনক্ষেত্রে দ্বিমত হয়, তবে পুরাণের সেই অংশকে নির্দয়ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা দেখেছি এই সব স্মৃতিতে শিক্ষার বাণীও ভিন্ন ভিন্ন।

একটা স্মৃতি বলছে—এই হচ্ছে আচরণরীতি, এই যুগে এটাকেই পালন করা উচিত। অপরটিও বলল—এটাই এই যুগে পালন করা উচিত। এই আচরণরীতিই হবে সত্যযুগের আচরণরীতি অথবা এই রীতিনীতি হবে কলিযুগের আচরণবিধি। শাশ্বত সত্য মানুষের নৈতিকতার ওপর নির্ভরশীল, যতদিন মানবসমাজ থাকবে ততদিন এটাও থাকবে অপরিবর্তনীয়—এই গৌরবজনক মতাদর্শ তোমার অধিকারে আছে। শাশ্বত সত্য সর্বকালের জন্য, সর্বত্র বিরাজমান এবং সার্বজনীন নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন।

কিন্তু স্মৃতি বলেছে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কর্তব্য সম্পর্কে। সময়ের সাথে তার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একটা কথা সর্বদা মনে রাখবে, সামাজিক রীতিনীতির সামান্য পরিবর্তনে ধর্মকে হারানোর কোন কারণ নেই। মনে রেখো এই ধরনের রীতিনীতি ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়েছে। এই ভারতবর্ষে এমন একটা সময় ছিল যখন গরুর মাংস আহার না করলে কোন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত করা হতো না। বেদে পড়ে থাকবে—সন্ন্যাসী, রাজা অথবা মহান ব্যক্তি কোন গৃহে আতিথেয়তা গ্রহণ করলে, তাদের সম্মানার্থে সব থেকে স্বাস্থ্যবান গরুটিকে বলি দেওয়া হতো। কিন্তু সময়কালে আমরা অনুধাবন করলাম যে আমাদের মতন কৃষিপ্রধান দেশে গোহত্যা করার অর্থ হলো জাতির ধ্বংস ডেকে আনা।

গোহত্যা বন্ধ করার জন্য চতুর্দিকে জেহাদ ঘোষিত হলো এবং এইভাবে গোহত্যা বন্ধ হলো। হিন্দুদের গোহত্যা করা বর্তমানে মহাপাপ কিন্তু পূর্বে ছিলো মহাপুণ্যবান ঘটনা। ইতিমধ্যে অনেক নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয়েছে। এগুলি এইভাবে চলতে থাকবে, আসবে অন্যান্য স্মৃতি। বেদ যে শাশ্বত সত্য এই ঘটনা আমরা অনুধাবন করতে পারি। বেদই একমাত্র গ্রন্থ সর্বকালের কাছে যার আবেদন সমান। কিন্তু স্মৃতির পরিসমাপ্তি আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও কালের গহ্বরে লুপ্ত হবে। জ্ঞানীপুরুষদের

আগমন হবে এবং তারা সুন্দর পথে সমাজকে পরিচালিত ও পরিবর্তিত করবে। কালের চাহিদা অনুযায়ী মত ও পথ নির্ধারিত হবে। এই ধরনের ঘটনা পরিক্রমা ছাড়া সমাজের অস্তিত্বই অসম্ভব। এই ধরনের বিপদকে এড়িয়ে আমরাই আমাদের পথ-প্রদর্শন করব। আমি আশা করি এখানে উপস্থিত প্রত্যেকেরই সকল ঘটনা উপলব্ধি করার যথেষ্ট উদার চিন্তাধারা ও বিশ্বাস আছে। আমি বহির্মুখী নয় অন্তর্মুখী চিন্তাধারার কথা বলছি, আমি চাই ধর্মীয় উন্মাদনা ও বস্তুবাদী ব্যাপ্তির গভীরতা। মহাসাগরের মতন অতল, আকাশের মতন অসীম হৃদয়ই আমাদের প্রয়োজন। বিশ্বে কোন দেশ হতে পারেনি এমনভাবে প্রগতিশীল হতে হবে। সাথে সাথে ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসী ও রক্ষণশীল হতে হবে। শুধুমাত্র হিন্দুরাই জানে কিভাবে ঐতিহ্য রাখতে হয়।

সহজ কথায় প্রথমতঃ আমাদের প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের পার্থক্য কি জানতে হবে। প্রয়োজনের মূল্য শাশ্বত। অপ্রয়োজনের মূল্য সাময়িক, যদি প্রয়োজনের সাহায্যে তাকে সময়মত পরিবর্তন না করা হয়, তবে তা বিপদ্‌জনক হয়ে দাঁড়ায়।

সকল পুরাতন আচার-আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কুৎসা রটনার কথা আমি বলছি না। নিশ্চিতভাবে ঐ আচরণবিধি সবচাইতে খারাপ দিকের প্রতিও নিন্দা প্রদর্শন কর না। এমনকি যে আচরণবিধি আজ নিশ্চিতভাবে খারাপ মনে হচ্ছে—অতীতে তাই হয়তো জীবনের সুকুমার প্রবৃত্তি জাগ্রত করত। অতএব অভিশাপের মাধ্যমে এইসব বিষয়কে আমাদের দূরীভূত করা উচিত হবে না। আশীর্বাদ ও অভিনন্দনের মাধ্যমে এদের বিদায় জানাতে হবে, কারণ অতীতে এরাই জাতির সংরক্ষণে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কেউই রাজা মহারাজা অথবা সেনাপতি নয়, প্রত্যেকেই এক একটি মহান ঋষি।

ঋষি কারা? উপনিষদ্ বলেছে—তারা সাধারণ মানুষ নয়, তারা হলো মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ। ঋষি হবে এমন একজন পুরুষ যে ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারে, যার কাছে ধর্ম শুধুমাত্র পুস্তক পঠন নয়, যুক্তিতর্ক নয়, ভবিষ্যদ্বাণী নয়, অতিরিক্ত জ্ঞান বিতরণও নয়। তাঁর কাছে ধর্ম অর্থ সত্যিকারের উপলব্ধি, ঐন্দ্রিয় উত্তরণের মাধ্যমে সত্যের মুখোমুখি হওয়া। একেই বলে ঋষিত্ব প্রাপ্তি। ঋষিত্ব কোন বয়স, সময়, এমনকি সম্প্রদায় ও জাতের মধ্যে বিরাজ করে না।

ঋষি ব্যাৎস্যায়ন বলেছেন—সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে তুমি, আমি এবং প্রত্যেককে ঋষি হওয়ার যোগ্য হতে হবে। নিজেদের ওপর আস্থা রাখতে হবে। সবকিছুই আমাদের মধ্যে আছে, অতএব আমাদের বিশ্বের পথপ্রদর্শক হতে হবে। ধর্মকে মুখোমুখি উপলব্ধি করতে হবে, এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সন্দেহ নিরসন করবো। ঋষিত্বের গৌরবোজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আমরা প্রত্যেকে দীপ্ত হৃদয়ে দাঁড়াতে পারবো। রক্ষাকর্তার অসীম দয়ায় আমাদের প্রত্যেকটা কথা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে হবে উজ্জ্বল।

অশুভশক্তি হবে অবলুপ্ত, কোন কিছুকে অভিশাপ অথবা গালাগালি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। বিশ্বের কোন শক্তির সাথে সংঘর্ষের প্রয়োজন হবে না। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে নিজের ও অপরের মুক্তির জন্য ঋষিত্বকে উপলব্ধি করতে হবে, ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করবে।

কুম্ভকোনমে বিবেকানন্দ

[কুম্ভকোনম পরিভ্রমণকালে স্থানীয় হিন্দু নাগরিকবৃন্দ স্বামীজীকে এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।]

মাননীয় স্বামীজী,

ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর কুম্ভকোনম-এর হিন্দু নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। পাশ্চাত্য জগৎ থেকে মুনি-ঋষি, ধর্মগুরু ও মন্দির-ধন্য এই পবিত্র দেশে আপনার প্রত্যাবর্তনের সংবাদে আমরা গভীরভাবে আনন্দিত।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে আপনার ধর্মপ্রচারের অসাধারণ সাফল্যে আমরা ঈশ্বরের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের, আপনি ঈশ্বরের মহান কৃপায় হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছেন। হিন্দুধর্মের ব্যাপ্তি ও সার্বজনীন আবেদন সম্পর্কে সকলকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। একমাত্র হিন্দুধর্মেরই ঈশ্বর-সম্পর্কিত সকল প্রকার মতবাদের মধ্যে ঐক্য সাধন করার ক্ষমতা আছে—একথা আপনি তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন সত্যের কারণ ঈশ্বরের হাতে সংরক্ষিত। তিনি হলেন বিশ্বজগতের সকল জীবন ও আত্মার সমন্বয়। এটাই হলো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। হাজার হাজার বছর ধরে তার উপস্থিতি আমাদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ আমরা খ্রীশ্চানভূমিতে আপনার পবিত্র কার্যাবলীর শুভ পরিণতিতে আনন্দ প্রকাশ করছি, কারণ শ্রেষ্ঠতম ধার্মিক হিন্দুজাতির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার অসীম মূল্য সম্পর্কে বহিঃ ও অন্তর্ভারতের জনগণকে পরিদৃশ্যমান করতে আপনি সক্ষম হয়েছেন। আপনার এই সাফল্য ইতিমধ্যে বিখ্যাত আপনার মহান গুরুদেবের খ্যাতিকে আরও দীপ্ত করেছে। বিশ্বজগতের সামনে আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম করেছে। উপরন্তু আমরাও অনুভব করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি যে আমাদেরও অতীতের সাফল্য নিয়ে গর্ব করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের সভ্যতায় আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না—তার মানে এই নয় যে আমাদের সভ্যতা নিঃশেষিত অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। চক্ষুষ্মান, আত্মত্যাগী এবং সর্বোপরি আপনার নিঃস্বার্থ সেবক আমাদের মধ্যে বিরাজমান, হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ। মহান ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন, হিন্দুধর্ম ও দর্শনের একজন মহামূল্যবান শিক্ষক হিসেবে আপনাকে জ্ঞানী ও শক্তিশালী করুন। ভগবান যেন আপনার মহান কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়।

স্বামীজীর প্রত্যুত্তর

সামান্য পরিমাণ ধর্মীয় কাজের পরিণাম বৃহৎ। যদি গীতার এই বক্তব্যের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তবে আমি বলব আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ঐ মহান বক্তব্যের

সত্যতা প্রত্যহ অনুভব করছি। যদিও আমার কাজটি খুবই তাৎপর্যবিহীন, তাহলেও কিন্তু আমি কলম্বো থেকে এই শহরে আগমনের প্রতি পদক্ষেপে প্রভূত পরিমাণ আন্তরিক অভিনন্দন পেয়েছি—যা কিনা ছিল আমার ধারণার অতীত।

হিন্দু হিসেবে আমাদের ঐতিহ্যের পক্ষে এটা যথেষ্ট মূল্যবান এবং জাতি হিসেবেও এর মূল্য অপরিসীম। কারণ আমরা হিন্দুরা, ধর্মের সাথে আত্মা, জীবন দর্শন ও প্রাণশক্তিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছি। এই বিশ্বজগতে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য-জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ করে খুব সামান্য অংশই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। প্রত্যেক দেশের মধ্যে অনুসন্ধান পেয়েছি এক গভীর মতাদর্শের, যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাদের মেরুদণ্ড অর্থাৎ পরিষ্কার করে বলতে গেলে জাতির ভিত। কারও কাছে এই ভিত হলো রাজনীতি, কারও কাছে সামাজিক সংস্কৃতি; আবার কারও কাছে বা মানসিক উৎকর্ষ অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যা কিনা প্রত্যেক জাতির চরিত্রের পশ্চাদপটকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে একমাত্র ধর্মই আমাদের নৈতিক চরিত্রের পশ্চাদপট অর্থাৎ আমাদের মেরুদণ্ডের ভিত্তি, শুধু মাত্র তার ওপর ভিত্তি করেই জাতীয় চরিত্রের সৌধ প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকাতে মাদ্রাজের জনগণ যে অভিনন্দন-বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার উত্তরে আমি যে কথা বলেছিলাম আপনারা হয়তো সে কথা স্মরণ করতে পারেন, তাতে আমি বলেছিলাম একজন ভারতীয় কৃষকের ধর্মীয় শিক্ষা যে কোন পশ্চিমী ভদ্রলোকের থেকে অনেক বিষয়ই বেশী। সমস্ত সন্দেহ নিরসন করে আমি নিজের বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখেছি। এমন একটা সময় ছিল যখন তথ্যের অভাবে ভারতীয় জনগণকে জানার এবং তথ্যের প্রতি তাদের অনীহায় আমি অসন্তুষ্টি অনুভব করতাম। কিন্তু বর্তমানে আমি এই ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারি। তাদের মানসিকতা যা চায় সেখানে পৃথিবীর যে কোন জাতির সাধারণ জনগণের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে তথ্যের প্রতি উদ্‌গ্রীব। পরিভ্রমণকালে এর সত্যতা আমি যাচাই করেছি। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের কৃষকশ্রেণীকে প্রশ্ন করো—দেখবে তারা কিছুই জানে না। অথবা জানবার জন্য আগ্রহীও নয়। ভারতের সাথে সম্পর্কহীন সিংহলের একজন কৃষককে প্রশ্ন করো, যা কিনা আমি একজন কার্যরত সিংহলী কৃষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে—ভাই, আমেরিকাতে যে ধর্মমহাসভা হয় তার সম্পর্কে তুমি কি কিছু জানো? উত্তরে সে বলেছিল—হ্যাঁ, সেখানে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী গিয়েছিল এবং প্রভূত পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেছে। সুতরাং ঐ একমাত্র বিষয়ে তার অন্যান্য জাতির মতই তথ্যের জন্য আগ্রহী। ভারতীয় জনগণ ধর্মের প্রতিই প্রধান এবং একমাত্র আকর্ষণ অনুভব করেছে।

জাতির জীবনীশক্তিকে ধর্মীয় মতাদর্শ অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে একাত্ম করা ভালো কি মন্দ, সে বিষয়ে আমি এই মুহূর্তে আলোচনা করছি না। ভালো-মন্দ বিচার পরের কথা, যতদূর উপলব্ধি করতে পেরেছি তাতে মনে হয় ধর্মের সাথে আমাদের জীবনীশক্তি একাত্ম হয়ে আছে। তুমি এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারো না, পারো না একে ধ্বংস করতে অথবা অন্য মানসিকতায় স্থানান্তরিত

করতে। একটা বাড়ন্ত গাছকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা যায় না, বাড়াতে হলে পূর্বস্থান থেকেই বাড়তে দিতে হবে। ভালো বা মন্দ যে কোন কারণেই হোক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মীয় মতাদর্শের প্রবাহ হাজার হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হচ্ছে। বহু শতাব্দীর দীপ্তিতে ভারতীয় পরিবেশ ধর্মীয় মতাদর্শে পরিপূর্ণ। এই ধরনের ধর্মীয় মতাদর্শপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এবং বেড়ে উঠেছি। কারণ ধর্ম আমাদের রক্তের স্রোতে মিশে গেছে। ধমনীর প্রত্যেকটি অণুতে উত্তেজনা সঞ্চারিত করে। ধর্ম আমাদের দৈহিক গঠনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ যেন জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি। সমান শক্তির জাগরণ অথবা হাজার বছরের ধর্মীয় বহুমুখিতাকে পরিপূর্ণ করা ছাড়া ধর্মের এই বন্ধনকে পরিত্যাগ করা যায় না। তুমি কি চাও গঙ্গা তার উৎসে ফিরে গিয়ে নতুন অববাহিকায় প্রবাহিত হোক? এমনকি এটা যদিও সম্ভব, কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় চরিত্র থেকে ধর্মকে পরিত্যাগ করানো অথবা রাজনৈতিক বা অন্য কিছুর মধ্যে মনোনিবেশ করানো অসম্ভব ব্যাপার। শুধুমাত্র মৃদু প্রতিরোধের মধ্যে তুমি কাজ করতে পারো, আর ধর্মীয় মতাদর্শই হবে তোমার মৃদু প্রতিরোধের মাধ্যম। ধর্মের পথ অনুসরণ করাই জীবনের একমাত্র আদর্শ, উন্নতির একমাত্র মাধ্যম এবং ভারতের সমৃদ্ধির একমাত্র পথ। অন্যান্য দেশে জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের মত ধর্মও একটা প্রয়োজনীয় বস্তু। যার একটা সাধারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা আমি করতে অভ্যস্ত, যথা আজকালকার গৃহিণীরা বৈঠকখানা অনেক জিনিস দিয়ে সুসজ্জিত করে রাখতে ভালোবাসে। আজকালকার রীতি জাপানী কারুকাজ করা পাত্র রাখা—অতএব তিনিও তা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবেন। কারণ ওটা ছাড়া ঘরের শ্রীবৃদ্ধি হয় না বলে তিনি মনে করেন। অতএব ভদ্রমহিলা বা ভদ্রলোক যাদের জীবনে পেশা যাই হোক না কেন এবং সামান্য ধর্মভাব ঐ ধরনের সাধ পরিপূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হন। ফলস্বরূপ তারা সামান্য ধর্মপ্রাণ হয়ে ওঠেন। এক কথায় বলতে গেলে এই বিশ্বজগতে, রাজনীতি বা সামাজিক প্রগতিই পাশ্চাত্যের মানবজাতির জীবনের অন্তিম লক্ষ্য, এবং ঐ লক্ষ্যে পৌছানোর পথে ঈশ্বর ও ধর্ম সাহায্যকারী হিসেবে নীরবে উপস্থিত হবে। এককথায় ঈশ্বর তাদের কাছে এই বিশ্বজগতকে কার্যকরী ও নির্মল করার পথে একটা সাহায্যকারী বস্তু, আপেক্ষিকভাবে তারা ঐভাবে ঈশ্বরের অবমূল্যায়ন করেছে।

গত একশো অথবা দুশো বছর ধরে তথাকথিত বেশী জানা বা বেশী জানার ভান করা লোকদের মুখ থেকে শুনেছে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারিত যুক্তির তীক্ষ্ণতা। তারা বলেছে বিশ্বের সমৃদ্ধির পথে ভারতীয় ধর্মের কিছুই দেওয়ার নেই। কারণ আমাদের ধর্ম অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের কথা বলে না বা অন্য জাতির প্রতি অত্যাচার করে না, দুর্বলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে না এবং দুর্বলের খাদ্য কেড়ে নিয়ে নিজের খাদ্যের সংস্থান করে না। নিশ্চিতভাবেই আমাদের ধর্ম ঐ ধরনের শিক্ষা দেয় না।

ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আমাদের ধর্ম পৃথিবীর মাটি কাঁপিয়ে সৈন্যদল প্রেরণ করে না এবং অন্য জাতির সম্পত্তি লুণ্ঠন অথবা বিনাশ সাধনেও আগ্রহী নয়। তারা প্রশ্ন করে—

তাহলে তোমাদের ধর্মে কি আছে? তা পোষণযন্ত্রের কোন কাজে লাগে না, দেহের পেশীসমূহে কোন শক্তি সঞ্চার করে না। সুতরাং ধর্মে কি আছে? তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না আমরা কত সহজে তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে পারি। কারণ আমাদের ধর্ম শুধুমাত্র এই বস্তুজগতের জন্য তৈরী হয়নি।

আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্য। কারণ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বজগতে ক্ষণিকের জীবন ও তার পরিসমাপ্তিই আমাদের ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য নয়। এই বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে আমাদের ধর্মের অন্তর্দৃষ্টি আবদ্ধ নয়। এই বিশ্বজগতের অতীত সুদূর অসীমে আমাদের ধর্ম পরিবৃত; স্থান, কাল ও ইন্দ্রিয়ের অতীত মহাশূন্যের অসীমতায় আমাদের ধর্মের অবস্থান—এই বিশ্বের সবকিছুই সেখানে আবদ্ধ, সেখানে বিশ্বজগৎকে মনে হয় আত্মার গৌরবোজ্জ্বল অতীন্দ্রিয় সাগরের একটি বিন্দু। আমাদের ধর্মই সত্য কারণ এই আমরাই বলি যে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য আর বিশ্বজগৎ হল মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ একটা ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব, অর্থ সম্পদ ধূলিকণা ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের সব ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ। মাঝে মাঝে ধর্মসাধনে জীবনও অনেক ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং বলা যেতে পারে আমাদের ধর্মই সঠিক।

আমাদের ধর্মই সত্য, কারণ সর্বোপরি আমাদের ধর্মেই আছে আত্মত্যাগের শিক্ষা, আমাদের ধর্মই বলে হিন্দুদের তুলনায় যারা কালকের সন্তান—সেই শিশু জাতির কাছে পূর্বপুরুষ-পরম্পরায় অর্জিত জ্ঞানের বাণী প্রচার করে।

তারা বলেছিল—'বৎস, তোমরা হলে ইন্দ্রিয়ের দাস; ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস অনিবার্য; তিন দিনের বিলাসের জীবন—পরিণামে ধ্বংস। অতএব এইসব পরিত্যাগ করো, বস্তুজগৎ ও ইন্দ্রিয়প্রীতি পরিত্যাগ করো। সেটাই হবে ধর্মের পথ।' ভোগের মধ্যে নয়, গভীর ত্যাগের মাধ্যমেই অন্তিমলক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। কিন্তু কি আশ্চর্যের ব্যাপার দেখো, এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি, একের পর এক কয়েক মুহূর্তের জন্য গভীর উৎসাহে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছে—প্রায় কোন চিহ্ন না রেখেই অবলুপ্ত হয়েছে এবং সময়ের মহাসাগরে হয়ত একটা ক্ষুদ্র লহরীও সৃষ্টি করেনি। আমরা এখানে যেন একটা শাশ্বত জীবন যাপন করে চলেছি। তারা যোগ্যজনের ঊর্ধ্বতনের আধুনিক তত্ত্বের কথা বলে, তারা মনে করে, দৈহিক শক্তিই প্রাণীকে সত্যিকারের বেঁচে থাকার শক্তি যোগায়। যদি তাই হতো তাহলে প্রাচীনকালের কোন শক্তিশালী জাতি বর্তমানেও তার গৌরবের শীর্ষে অবস্থান করতে পারতো এবং আমরা দুর্বল হিন্দুরা, যারা কখনও অন্য জাতিকে জয় করিনি নিশ্চয় লোপ পেয়ে যেতাম।

কিন্তু এখনও আমরা ত্রিশ কোটি দীপ্ত হৃদয়ে বেঁচে আছি; (একজন ইংরেজ মহিলা আমাকে বলেছিল—হিন্দুরা কি করেছে? তারা কখনও অন্য কোন জাতিকে জয় করতে পারেনি!) একথা ঠিক নয় যে আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়েছে, আমাদের মধ্যে ক্ষয়ের পালা শুরু হয়েছে—এইসব কথাও ঠিক নয়। এখনও আমাদের হৃদয় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, এবং সময়ের প্রয়োজনে এই প্রাণপ্রাচুর্যের প্রবল জোয়ার প্রবাহিত হতে পারে।

প্রাচীনকাল থেকেই আমরা সমগ্র জগতের কাছে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছি। পাশ্চাত্যে এই সমস্যা সমাধান করা হয় একজন ব্যক্তিজীবনে কত বেশি অধিকার করতে পারে তার দ্বারা, আর আমরা এই সমস্যার সমাধান করি কত অল্পে জীবন অতিবাহিত করা যায় তার মাধ্যমে। এই পার্থক্য ও সংগ্রাম আরো কয়েক শতাব্দী ধরে চলবে।

কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে অথবা ভবিষ্যৎবাণী যদি কখনও সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে দেখা যাবে যারা ক্ষুদ্রপরিসরে জীবন অতিবাহিত করতে ও সংযমের মন্ত্রে দীক্ষিত শেষ পর্যন্ত তারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। এবং যারা ভোগে বিলাসের পেছনে ছোটে, তারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন—জীবনযুদ্ধে তারা পরাজিত হবেই। কখনও কখনও দেখা যায় কোন ব্যক্তির জীবনের ইতিহাসে অথবা কোন জাতির জীবনের ইতিহাসে এমন একটা সময় উপস্থিত হয় যখন সংসার-বিতৃষ্ণা বেদনাদায়কভাবে প্রাধান্য লাভ করে।

মনে হয় এই সংসার-বিতৃষ্ণার জোয়ার পশ্চিমী জগতে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই জগতেও আছেন চিন্তাবিদ ও মহাপুরুষ, তাঁরা ইতিমধ্যেই ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা-লিপ্সার অন্তঃসারশূন্যতার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এবং বেশীর ভাগ রুচিসম্পন্ন মহিলা ও পুরুষগণ এই ক্লান্তিকর প্রতিযোগিতা, এই জীবনসংগ্রাম ও এই বাণিজ্যিক সভ্যতার নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মুক্তি চান। তাঁরা চান নতুন জীবনের সন্ধান, যার জন্য তাঁরা ব্যাকুল। ইউরোপে একটা শ্রেণী এখনও মনে করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ইউরোপকে সকল বিপদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে, কিন্তু সেখানকার মহান চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্য ধরনের মতাদর্শ প্রাধান্য পাচ্ছে। তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনই জীবনের দুঃখকষ্ট থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে অক্ষম। শুধুমাত্র আত্ম-উপলব্ধিই জীবনকে সকল বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। কোন ধরনের শক্তি বা সরকার বা শাসনযন্ত্রের নিষ্ঠুরতা কোন জাতির জীবনের মোড় ঘোরাতে পারে না। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংস্কৃতিই মানব-জাতির জীবনে সকল অশুভ ইঙ্গিতকে অপসারিত করতে পারে। নতুন চিন্তাধারা, নতুন আদর্শের আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য পশ্চিমের জাতিগুলি উদগ্রীব হয়ে আছে। যদিও তাদের খ্রীষ্টধর্মে অনেক ভালো ও মহিমময় দিক আছে, তবুও ঐ ধর্মে অপর্যাপ্ত অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের প্রাচীন-দর্শনশাস্ত্রে—বিশেষত বেদান্তের মধ্যেই পশ্চিমের মহান চিন্তানায়কগণ নতুন চিন্তার আলোকবর্তিকার সন্ধান পেয়েছেন—যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের তীব্র বাসনা তাঁরা বহুকাল পোষণ করেছেন। এই ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

প্রত্যেক ধর্মের আশ্চর্য সুন্দর ঘটনাবলীর কথা শুনতে শুনতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সম্প্রতি আমার বন্ধু ডঃ বারোজ-এর কথা তোমরা শুনেছো—তিনি বলেছেন, খ্রীষ্টধর্মই হল বিশ্বের একমাত্র সর্বজনীন ধর্ম। এই প্রশ্নটি বিশদভাবে বিবেচনা করে আমি বলি খ্রীষ্টধর্ম নয়, বেদান্তই বিশ্বের একমাত্র সর্বজনীন ধর্ম—আর

কোন ধর্মেরই ঐ স্থান অর্জন করার ক্ষমতা নেই। আমাদের ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মই তার সৃষ্টিকর্তা অথবা প্রবর্তকদের জীবনকাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ঐসব ধর্মের তত্ত্ব, শিক্ষা, মতাদর্শ ও নীতিতত্ত্ব সৃষ্টিকর্তার ব্যক্তিজীবনের আবহাওয়ার পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে—কারণ সেখানেই তারা পায় ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, কর্তৃত্ব করার অধিকার ও ক্ষমতার পরিমণ্ডল।

আশ্চর্য ব্যাপার, সেই ধর্মের কাঠামো সৃষ্টিকর্তার জীবন-ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই রচিত। আধুনিক যুগের প্রায় সব তথাকথিত ধর্মস্রষ্টাদের জীবনী যে ভাবে তীক্ষ্ণ মেধার সাহায্যে বিচার করা হচ্ছে, যদি ঠিক সেইভাবে ঐসব ধর্মের ঐতিহাসিকতায় আঘাত করা হয়, তবে দেখা যাবে তাদের জীবনের অধিকাংশই অবিশ্বাস্য কাহিনী এবং বাকি অংশ মারাত্মকভাবে সন্দেহজনক। এটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে ইতিহাসের পাষাণ স্তম্ভগুলির (তাঁদের ভাষায়) ভিত কেঁপে উঠবে, অচিরেই ধর্মের সৌধ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে একেবারেই ভেঙে পড়বে, হারানো গৌরব আর কখনই অর্জন করতে পারবে না। শুধুমাত্র আমাদের ধর্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব মহান ধর্মই ঐতিহাসিক চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু আমাদের ধর্ম নির্দিষ্ট দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'আমিই বেদের স্রষ্টা'—এইরকম দাবি পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই করতে পারে না। বেদ হলো শাশ্বত দর্শনের প্রতিরূপ; মহান ঋষিরাই এর সৃষ্টিকর্তা, এবং মাঝে মাঝে এই মহান ঋষিদের নামের উল্লেখ আছে; তাদের সত্যিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা পরিপূর্ণরূপ ওয়াকিবহাল নই। অনেকক্ষেত্রে তাঁদের পিতৃপুরুষের পরিচয়ও আমরা জানি না বা জানতে পারি না, এমন কি কোথায় এবং কি ভাবে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কেও কিছুমাত্র জানতে পারি না। নামের জন্য তাঁদের কিছুমাত্রও মোহ ছিল না। তাঁরা ছিলেন তাঁদের দর্শনের প্রচারক, এবং দর্শনের পূর্ণতর তত্ত্ব তাঁরা জীবনে পালন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। আমাদের ধর্মে ঈশ্বরের উপস্থিতি নৈর্ব্যক্তিক, অথচ ব্যক্তিক আমাদের ধর্ম গভীরভাবে নৈর্ব্যক্তিক, তা শুধুমাত্র বিশুদ্ধ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ ব্যক্তিগত পূর্ণতার অপরিসীম সুযোগ এখানে আছে। কোন ধর্মে এত অবতার, মহাপুরুষ ও ঋষি আছেন এবং অনেক ধর্মাবতার ভবিষ্যতেও আসবেন? অবতার অসংখ্য, সুতরাং আরো অনেক অবতারকে গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে এই ধরনের ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের, এই মানব-অবতারদের কোন একজন অথবা সকলের কিংবা ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের কারো জীবন-কাহিনী যদি কোনভাবে ইতিহাসে বিধৃত না থাকত, তবুও আমাদের ধর্মের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারতো না। এমনকি তখনও আমাদের ধর্ম দৃঢ়তর থাকত, কারণ এই ধর্ম কোন ব্যক্তির জীবনকাহিনীর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের ওপর। একজন ব্যক্তিত্বকে ঘিরে বিশ্বের সকল লোককে জড়ো করার চেষ্টা করা অর্থহীন।

এমনকি শাশ্বত ও সর্বজনীন আদর্শকে ঘিরেও বিশ্বের জনমতকে একত্র করা খুবই

কষ্টসাধ্য ব্যাপার যদি কখনও মানবজাতির একটি বিরাট অংশকে একটিমাত্র চিন্তার স্রোতে প্রবাহিত করানো সম্ভব হয়, মনে রেখো, তাহলে তা হবে আদর্শেরই অর্থাৎ দর্শনতত্ত্বের ভিত্তিতে, ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নয়। আমি পূর্বে বলেছি আমাদের ধর্মে ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও কর্তৃত্ব করার যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ বর্তমান। ইষ্টবিষয়ে অপূর্ব মতবাদ যা মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত মনে নির্বাচনের সুযোগ দেয়। তুমি যে কোন একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা অথবা ধর্মগুরুকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে বাছাই করতে পারো, তিনিই হতে পারেন তোমার বিশেষ আরাধ্য। তোমার পছন্দসই অবতারকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করার অধিকার তোমাকে দেওয়া হয়েছে; তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু শাশ্বত সত্য দর্শনের প্রতি তোমার আস্থার একটা দৃঢ় পশ্চাদ্‌পট তোমায় রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা হলো আমাদের অবতারদের ক্ষমতা বেদের সূত্র ব্যাখ্যাতে যতখানি ব্যাপ্ত ঠিক ততটুকুই আমাদের কাছে ভালো লাগে।

আমাদের শাশ্বত ধর্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। তিনিই বোধহয় ভারতবর্ষে বেদান্তের ভাষ্যকারদের মধ্যে সর্বোত্তম। বেদান্তের প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণ হলো, পৃথিবীর সকল শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে বেদান্তই হলো একমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ যার শিক্ষা বস্তুজগত্-সম্পর্কিত আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই দুটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে, যদিও ঐ দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আকৃতি, রক্ত-সম্পর্ক ও সহানুভূতির দিক থেকে সমজাতীয়। একটি হলো হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি আর অপরটি হলো গ্রীক। অন্তর্জগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথমটির শুরু, আর বহির্জগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রস্তুতি নিয়ে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয়টির যাত্রা। ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতনের মাধ্যমে পৃথিবীর এই দুইটি প্রাচীন সংস্কৃতি, ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী চরম লক্ষ্যের দিকে একই রকম প্রতিধ্বনি করেছিল।

এটা পরিষ্কার যে ধর্মের সঙ্গে সমতা রেখে আধুনিক বস্তুবাদী বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলিকে বেদান্তবাদী অর্থাৎ হিন্দুরাই গ্রহণ করতে সক্ষম। একথাও ঠিক যে আধুনিক বস্তুবাদ নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে বর্জন না করে বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে আধ্যাত্মিকতার দিকে উপনীত হতে পারে। একথা এখন সকলেই জানে যে বর্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি বেদান্তের প্রাচীন সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ; শুধুমাত্র পার্থক্য হলো, বর্তমান সিদ্ধান্তগুলি বস্তুবাদী ভাষায় লিখিত। বেদান্তের যুক্তিনির্ভরতা বা তার আশ্চর্য সুন্দর যুক্তিবাদ পাশ্চাত্যের হৃদয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমার কাছে বেদান্তের যুক্তিবাদের প্রশংসা করেছেন বর্তমান বিশ্বের অনেক স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক। তাদের মধ্যে একজনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম যিনি খাবার সময় পর্যন্ত ভুলে যেতেন এবং নিজের পরীক্ষাগার ছেড়ে খুব কমই বাইরে যেতেন, কিন্তু বেদান্ত সম্পর্কে আমার বক্তৃতা অধীর আগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতেন। তিনি বলতেন, বেদান্ত সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-নির্ভর এবং বর্তমান কালের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি বেদান্তের সঙ্গে গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুইটি এই ধরনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত তুলনামূলক ধর্ম থেকে গ্রহণ করা যায়; আমি বিশেষভাবে যে দুটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো ধর্মের সর্বজনীনতার; দুই বহু বস্তুর মাধ্যমে ব্যক্তি হয়েছে অদ্বিতীয় এক।

ব্যাবিলনীয় ও ইহুদিদের ইতিহাসে ধর্মীয় আচার ও আচরণের কৌতূহলজনক ঘটনাবলী লক্ষ্য করা যায়।

আমরা দেখতে পাই ব্যাবিলনীয় ও ইহুদি জনগণ অসংখ্য উপজাতিতে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক উপজাতির ছিল নিজস্ব দেবতা। এই উপজাতীয় দেবতাদের বংশগত নামও ছিল। ব্যাবিলনীয় দেবতাদের বলা হতো বল (Baal), তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বল মেরোডক। কোন সময়ে উপজাতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপজাতি অন্যান্যদের জয় করে নিল এবং তাদের দেবতাই সকলের আরাধ্য দেবতার স্থান লাভ করল। এইভাবে সৃষ্টি হয় সিমাইটদের তথাকথিত একেশ্বরবাদ। ইহুদিদের মধ্যে যে দেবতার প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল তার নাম হলো 'মোলক্'। এই মোলক্দের মধ্যে ইস্রায়েল নামক উপজাতিদের ভিতর এক ধরনের মোলকের প্রাধান্য ছিল, যার নাম হলো 'মোলক্-য়াভেহ্' (Yahveh) অথবা 'মোলক-য়াভ'। সময়কালে এই ইস্রায়েল নামক উপজাতি অপর উপজাতিদের জয় করল এবং তাদের দেবতাদের ধ্বংস করে নিজেদের দেবতা অর্থাৎ মোলক্কে সর্বশ্রেষ্ঠ মোলক্ বলে ঘোষণা করল।

আমি নিশ্চিত যে আপনারা অনেকেই অবগত আছেন—এই ধরনের ধর্মযুদ্ধে কি পরিমাণ রক্তপাত, অত্যাচার ও বর্বরতা হয়েছিল। পরে অবশ্য ব্যাবিলনীয়রা মোলক্ যাভেহ্র শ্রেষ্ঠত্বকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেনি। ধর্মক্ষেত্রে উপজাতীয় প্রাধান্য লাভের চেষ্টা ভারত ও তার সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও হয়েছিল। এখানেও, আর্যদের নানা উপদল নিজ নিজ দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নতর, ইহুদিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতবর্ষ হলো সহিষ্ণুতা আর আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। সুতরাং দেবতাদের নিয়ে উপজাতীয় কোন্দল এখানে বেশীদিন স্থায়ী হলো না। প্রাগ্-ইতিহাসের সুপ্রাচীন কালে যেখানে ঐতিহ্যের কোন ধারাই ছিল না, সেই কল্পনার অতীত কালে আমাদের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন ঘোষণা করেছিলেন সেই অতি-পরিচিত বাণী 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য বস্তু এক, প্রাজ্ঞজনেরা ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁর বন্দনা করে। এইটি হলো বিশ্বের সব স্মরণীয় বাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর চেয়ে বড়ো আর আবিষ্কৃত হয়নি এবং আমাদের হিন্দুদের কাছে এই সত্য জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাতীয় জীবনের বীথিকায় বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই বাণী—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এই বাণী, আমাদের জাতীয় জীবনে নিবিড়ভাবে মিলে গেছে, প্রবাহিত হয়েছে রক্তের স্রোতে, আমরা তার সাথে এক হয়ে গেছি। আমাদের প্রতি শিরায় সেই মহৎ সত্য জীবন্ত। তাই আমাদের পবিত্রভূমি হয়েছে ধর্মীয়

সহিষ্ণুতার গৌরবময় তীর্থক্ষেত্র। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রচার করার জন্য অন্যান্য ধর্ম এখানে স্থাপন করেছিল মন্দির এবং গীর্জা।

আমাদের এই পরধর্মসহিষ্ণুতার শিক্ষা বিশ্বকে গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে অসহিষ্ণুতার বিষ কিভাবে এখনো ছড়িয়ে আছে, সে সম্পর্কে আপনারা অল্পই জানেন। বিদেশের সর্বব্যাপী অসহিষ্ণুতা আমাকে কয়েকবার মর্মাহত করেছিল। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নরহত্যা পাপ নয়, বর্তমানে পাশ্চাত্যে এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো পশ্চিমী সভ্যতা গর্বভরে ঐ ধরনের বলিদানেও কুণ্ঠা বোধ করবে না। পশ্চিমে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে কোনব্যক্তিই নিজের ধর্মের কোনক্রমেই বিরোধিতা করতে পারে না। তারা অসম্ভব বাকপটুতায় অবলীলাভরে আমাদের জাতিভেদের তীব্র সমালোচনা করে। যদি আপনারা আমার মতো পাশ্চাত্য দেশে যান এবং সেখানে বাস করেন তাহলে কিছু কিছু বড়ো বড়ো অধ্যাপকদের দেখতে পাবেন যাঁরা ডাহা কাপুরুষ, নিজের ধর্মের মন্দদিকের সমালোচনা দূরে থাক সেই সম্পর্কে কোন মতামতের শতাংশের একাংশ প্রকাশ করতেও পারে না, কারণ জনতার মতামতকে তারা ভীষণভাবে ভয় পায়। সুতরাং সমস্ত বিশ্বজগৎ আমাদের এই মহান সর্বজনীন সহিষ্ণুতার জন্য অপেক্ষা করছে। এর ফলে বিশ্বসভ্যতা এক মহান আদর্শ অর্জনে সক্ষম হবে। কোন সভ্যতাই বেশী দিন টিকতে পারে না, যদি না সে এই আদর্শের নিবিড় ছায়ায় লালিত হয়। যদি ধর্মীয় উন্মাদনা, অযাচিত রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতা স্তব্ধ না করা যায়, তবে কোন সভ্যতারই অগ্রগতি সম্ভব নয়। যদি একজনের সঙ্গে আর একজনের সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ না হয়, তাহলে কোন সভ্যতাই দীপ্ত হৃদয়ে এগোতে পারে না, প্রত্যেককে প্রত্যেকের প্রতি সহনশীল হতে হবে। এই ধরনের অতি প্রয়োজনীয় বদান্যতা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে অন্যের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। শুধুমাত্র সহনশীল হলেই চলবে না—কারণ সহনশীলতার আদর্শ উপলব্ধি করতে হলে প্রত্যেককে প্রত্যেকের উপকারে লাগার উপযোগীরূপে গড়ে তুলতে হবে, ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতাদর্শের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন।

ভারতবর্ষে আমরা ঠিক এইরকম করে থাকি, এইমাত্র আমি আপনাদের যে রকম বললাম। একমাত্র ভারতবর্ষেই হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের জন্য গীর্জা এবং মুসলমানদের জন্য মসজিদ তৈরী করেছে। এইরকমই করতে হবে। তাদের ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, অত্যাচার এবং আমাদের প্রতি বর্ষিত কুৎসাপূর্ণ ভাষা সত্ত্বেও আমরা হিন্দুরা, খ্রীষ্টানদের জন্য গীর্জা নির্মাণ এবং মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করতে থাকব যতদিন না আমরা বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করতে পারব যে — ঘৃণা নয়, একমাত্র ভালোবাসাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার শক্তি যোগায়। নিষ্ঠুরতা বা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ না, শেষ পর্যন্ত ভালোবাসাই ফলবতী হয়, শান্তস্বভাবের জয় হয়। আর যে মহান মতাদর্শটি সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে, যা কিনা সমগ্র ইউরোপের সমগ্র বিশ্বেরই চিন্তার বিষয়। বোধহয় উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণী, সংস্কৃতিবান থেকে অসংস্কৃতিবান, শিক্ষিত থেকে অজ্ঞ লোকেরা এবং বলশালীদের তুলনায় দুর্বলজনেরা

সেই মতাদর্শের প্রতি নিবিড় আনুগত্য প্রকাশ করতে চায়। সেই মহান আদর্শটি হলো সর্বজনীন আধ্যাত্মিক একত্বের আদর্শ। আমার প্রিয় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, আপনাদের সামনে একটি বিষয় বলার আর অপেক্ষা রাখে না, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, পশ্চিমের বস্তুজাগতিক আধুনিক গবেষণা সমগ্র বিশ্বে সর্বজনীন অদ্বিতীয়ত্ব ও ঐক্যের পথে কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

কারণ তুমি, আমি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র এইসব বস্তু হলো অসীম জড়সমুদ্রের তরঙ্গ বা তরঙ্গের অংশ। সেইভাবে অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় দার্শনিকরা বলেছিলেন দেহ এবং মন শুধুমাত্র মানসিক অস্তিত্ব অথবা জড়সমুদ্রের এক ক্ষুদ্র তরঙ্গ।

সমষ্টির মূলতত্ত্ব ঐ দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রচিত। বেদান্তে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে অদ্বিতীয়ত্বের ধারণার অতীত আর একটি বস্তুর অস্তিত্বের কথা; সেই সত্যিকারের আত্মা হলো একক।

এই বিশ্বজগতের সর্বত্র পরমাত্মা বিরাজমান; সকলেই পরমাত্মার অংশ। বিশ্ব-ঐক্যের প্রধান কথা এই মহান বাস্তবভিত্তিক মতাদর্শে অনেকেই শঙ্কিত হয়েছেন। এমনকি আমাদের দেশেও অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। দেখা যাচ্ছে, এই মতাদর্শের অনুগতের তুলনায় বিরোধীর সংখ্যা বেশী। তবুও আমি বলছি, এই দর্শনই হলো একমাত্র সঞ্জীবনী মতাদর্শ যা কিনা সমগ্র বিশ্বের কাছে একান্ত অপরিহার্য, ভারতবর্ষের অসংখ্য মূক জনগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন।

একত্বের মহান দর্শনের ব্যবহারিক ও কার্যকরী প্রয়োগ ব্যতীত আমাদের এই মহান দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।

যুক্তিবাদী-পশ্চিম যুক্তিবাদের যথাযোগ্য প্রয়োগের দিকে ক্রমশ ঝুঁকছে, কারণ নিজ দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের যুক্তিসম্মত ভিত গড়তে হলে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। আপনারা সকলেই জানেন যে নীতিশাস্ত্র শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অনুমোদনের ওপর ভিত্তি করে রচিত হতে পারে না, যত বড় মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষই তিনি হোন। নীতিশাস্ত্রের কর্তৃত্বকরণের এইরূপ ব্যাখ্যা বিশ্বের চিন্তাবিদদের কোনরূপ বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করেনি। কারণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁরা আরও অনেক বেশী মানবিক অনুমোদনে আগ্রহী।

নৈতিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে তারা চায় আরও বেশী পরিমাণে সত্যের শাশ্বত আদর্শ। কোথায় সেই শাশ্বত অনুমোদন যা কিনা শুধুমাত্র অসীম-বাস্তব ব্যতিরেকে সর্বত্র যা তোমার, আমার, সকল আত্মার মধ্যে বিরাজমান। সকল নৈতিকতার শাশ্বত অনুমোদন হলো আত্মার অসীম অদ্বৈততত্ত্ব। তুমি আর আমি, শুধুমাত্র এই বাণীই প্রকাশ করছে না—বিশ্বের সকল সাহিত্যেই মানবজাতির মুক্তির সংগ্রাম বিধৃত হয়েছে, বার বার প্রতিধ্বনিত করেছে। সেই বাণী তুমি আর আমি অবিমিশ্র আত্মা।

এটাই হলো ভারতীয় দর্শনের মূলকথা। সকল নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতার যৌক্তিকতার প্রতিধ্বনি হলো অদ্বৈতবাদ। আমাদের নিপীড়িত জনগণের মতো ইউরোপও এই আদর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় সকল সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উচ্চাশা পরিপূরণে এই আদর্শ অবচেতন মনে এখনও দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করছে। আমার প্রিয়জনেরা লক্ষ্য করুন, স্বাধীনতা বিধৃত সকল সাহিত্য ও বিশ্বের সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে আমাদের বৈদান্তিক দর্শন বার বার উদ্গত হয়েছে, উদ্ভাসিত করেছে মানবজাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখক নিজেই হয়তো তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনার উৎসের সন্ধান পাননি, কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয়েছে তাঁরা অত্যন্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁদের মধ্যে অল্প-সংখ্যক আছেন সাহসী। যাঁরা তাঁদের সৃষ্টির উৎসের উল্লেখ করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

যখন আমি আমেরিকায় ছিলাম, তখন একদা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো যে আমি অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে অত্যধিক প্রচার করছি, কিন্তু দ্বৈতবাদ সম্পর্কে অল্পই বলছি। ধর্ম ও আরাধনার প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্বৈতবাদের মহত্ত্ব, গভীরতা, আনন্দ ও প্রশান্তির অসীমতা কতখানি সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এমন কি জয়ের আনন্দে ক্রন্দন করারও এটা উপযুক্ত সময় নয়। আমরা যথেষ্ট কেঁদেছি, অতএব এখন আর নরম মনোভাব প্রকাশের সময় নেই। এই নম্রতা আমৃত্যু আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে। এখন আমাদের প্রয়োজন লোহার মত দৃঢ় দৈহিক শক্তি, ইস্পাতের ফলার মত দৃঢ় মানবিকতা আর মহামানবিক ইচ্ছাশক্তি, পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। বিশ্বজগতের রহস্যজাল উন্মোচিত করে দীপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হবে।

শুধুমাত্র কঠোর সঙ্কল্পের প্রয়োজন। অন্তিম অভীষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন হলে সমুদ্রের অতলে যেতে হবে, দাঁড়াতে হবে মৃত্যুর মুখোমুখি। এটাই আমরা করতে চাই, এই মনোভাবই সৃষ্টি করতে হবে, করতে হবে কার্যকরী, এবং অদ্বৈতবাদের মতাদর্শ উপলব্ধি করে এই কাজকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তাহলেই প্রতিফলিত হবে সকলের মধ্যে অদ্বিতীয়ত্ব। বিশ্বাস, বিশ্বাস নিজের ওপর। ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই হচ্ছে মহত্ত্বের গোপন কথা। যদি তোমার তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর ওপর বিশ্বাস থাকে, ক্ষণে ক্ষণে বিদেশীদের আমদানী দেবদেবীর ওপর যদি বিশ্বাস থাকে, এবং তোমার নিজের ওপর যদি আস্থা না থাকে, তবে তোমার মুক্তি কখনই সম্ভব হবে না। তোমার নিজের ওপরে বিশ্বাস আছে কি, যদি থাকে তবে সেই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে স্থির হয়ে দাঁড়াও, এবং নিজেকে বলবান করো। এটাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন। গত একহাজার বছর যাবৎ আমরা তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী কোন না কোন সময়ে বিদেশী দ্বারা শাসিত হয়েছি, কেন? আমাদের পরাজিত দেহের ওপর দিয়ে জয়ের রথ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে কেন? কারণ তাদের নিজের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তোমাদের মধ্যে ছিল ঐ বিশ্বাসের একান্ত অভাব। পশ্চিমে আমি যা শিখেছিলাম, খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের অন্তঃসারশূন্য উপদেশামৃতের মধ্যে যা দেখেছিলাম। তাহলো মানুষ একটা ঘৃণ্য পাপীজীব

এই কথাটার অর্থহীন পুনরাবৃত্তি। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতীয় চরিত্রে নিজেদের প্রতি বিশ্বাস গভীরভাবে প্রতিফলিত—এই বিষয়টি আমি সেখানে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

একজন ইংরেজ বালক আপনাকে বলবে, "আমি একজন ইংরেজ, আমি সবকিছু করতে পারি।" এই একই কথা আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের ছেলেরা বলবে। আমাদের ছেলেরা কি এই ধরনের কথা বলতে পারে? বালকেরা কেন, তাঁদের পিতারাও বলতে অক্ষম। আমরা নিজেদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছি। সুতরাং বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচার করা একান্ত অপরিহার্য হৃদয় সম্প্রসারণের জন্য। আত্মিক শক্তির গরিমা উন্মোচিত করাও একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণেই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করছি। কোন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি এই কাজ করিনি; বরঞ্চ এটাকে গ্রহণীয় করার জন্য একটি সর্বজনীন ভূমি প্রস্তুত করেছি।

পুনর্মিলনের পথ সন্ধান করা খুবই সহজ কথা। এর ফলে দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ঈশ্বর অন্তর্নিহিত শক্তি বা সকলের অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, শুধুমাত্র এই একটা মতবাদই ভারতবর্ষে প্রচলিত নয়। আমাদের বৈদান্তিক পদ্ধতি আত্মার পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতার মতবাদ স্বীকার করেছে। কারও কারও মতে এই পূর্ণতার সাধনা কখনো হয়েছে সঙ্কুচিত, কখনো বা সার্থক। এখনো এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈতবাদের মতে এর কোন সঙ্কোচন বা প্রসারণ হয় না, কিন্তু কোন কোন সময় লুক্কায়িত এবং মধ্যে মধ্যে অনাবৃত থাকে। প্রতিটি জিনিসেরই প্রতিক্রিয়া আছে। কারো বক্তব্য অন্যের তুলনায় যুক্তির খাতিরে বেশী জোরালো, কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফলাফল সর্বদাই এক হয়। এটাই হলো একমাত্র কেন্দ্রীয় মতবাদ, বিশ্বজগতে যার প্রয়োজন অপরিহার্য। আমাদের মাতৃভূমি ব্যতীত আর কোথাও এর অভাব এমনভাবে অনুভূত হয়নি।

বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কিছু কঠোর সত্য বলতে চাই। সংবাদপত্রে দেখেছি যখন আমাদের কোন দেশবাসীকে কোন ইংরেজ হত্যা করে বা তার সঙ্গে অসৎ আচরণ করে, তখন দেশের সর্বত্র চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়; এই ধরনের সংবাদ আমাকে মর্মাহত করে—আমার অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে, পরমুহূর্তেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই অর্থহীন বিলাপের জন্য দায়ী কে? একজন বেদান্তবাদী হিসেবে আমি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকেই এই প্রশ্ন করতে পারি না। একজন হিন্দু হলো অন্তর্দর্শনের দীক্ষায় দীক্ষিত। সে কোন কিছুকে উপলব্ধি করে আত্মিক পরিপূর্ণতার মাধ্যমে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অতএব আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি—কে এই অর্থহীন বিলাপের জন্য দায়ী? প্রতিবারই আমি উত্তর খুঁজে পাই—ইংরেজরা এর জন্য দায়ী নয়, আমরাই দায়ী, আমাদের সকল দুর্দশা, আমাদের নৈতিক অধঃপতন—এর জন্য সম্পূর্ণরূপে আমরাই দায়ী।

আমাদের অভিজাত পূর্বপুরুষরা সাধারণ মানুষকে পদদলিত করত, যতক্ষণ না নিজেদের অসহায় বোধ করত ততক্ষণ চলত অত্যাচার। অত্যাচারের বন্ধনে আবদ্ধ অসংখ্য দরিদ্র লোক—তারাও যে মানুষ একথাও ভুলে যায়। ফলত শতাব্দীর

পর শতাব্দী বনের কাঠুরে কাঠুরেই থেকে যায়, ভিস্তি জলই বহন করে যায়। তাদের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দেওয়া হয় যে তারা জন্মেছে দাসবৃত্তি করার জন্য। আধুনিক শিক্ষিত কোন ব্যক্তি যদি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের পক্ষে কোন কথা বলে, তখন দেখা যাবে অনেকেই এর জন্য সংকোচ বোধ করছে। এই দরিদ্র নিপীড়িত জনগণের নৈতিক উন্নতি বিধানেও অনেকে অনীহা প্রকাশ করে—এই বিষয়টি আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি। আমি আরও লক্ষ্য রেখেছি যে বংশগত উত্তরণের জঘন্য মতবাদ চালু করে এবং পাশ্চাত্য জগৎ থেকে অর্থহীন যুক্তি গ্রহণ করে দরিদ্র জনগণের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালানোর পক্ষে অশুভ ইঙ্গিতপূর্ণ ভয়াবহ যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

আমেরিকার ধর্মমহাসভায় একজন আফ্রিকান-জাত নিগ্রো একটি অনিন্দ্য-সুন্দর ভাষণ দিয়েছিল। আমি তাঁর প্রতি খুবই উৎসাহী হয়ে মাঝে মধ্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। লণ্ডনে থাকাকালীন কিছু আমেরিকাবাসীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, তারা আমাকে বলেছিল যে ঐ নিগ্রো তরুণ আফ্রিকার কেন্দ্রে অবস্থিত একজন নিগ্রো-প্রধানের পুত্র. একদিন ঐ তরুণের পিতার প্রতি অপর একজন নিগ্রো-প্রধান ক্রুদ্ধ হয়ে তার পিতা ও মাতা উভয়কেই হত্যা করলো এবং তাদের মাংস রান্না করে খেয়ে ফেলল, সেই হত্যাকারী নিগ্রো-প্রধান আদেশ করল যে শিশুটিকেও হত্যা করে ভক্ষণ করা হবে, কিন্তু বালকটি পালিয়ে গেল, কঠোর পরিশ্রম এবং অনেক পথ অতিক্রম করে সে এক সমুদ্রতীরে উপস্থিত হল। সেখানে এক আমেরিকান জাহাজে তাকে গ্রহণ করা হলো এবং আমেরিকায় নিয়ে আসা হলো। ঐ সেই বালক যে সেদিন অনিন্দ্যসুন্দর ভাষণ দিয়েছিল।

অচ্ছুৎদের তুলনায় ব্রাহ্মণদের বংশগত শিক্ষার যোগ্যতা অনেক বেশী, ব্রাহ্মণদের শিক্ষার জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করো না, সবটাই অচ্ছুৎদের জন্য ব্যয় করো। দুর্বলদের দান করো, কারণ সকল দানের গভীর প্রয়োজন সেখানেই। ব্রাহ্মণরা জন্ম থেকেই যদি বুদ্ধিমান হয় তবে অন্যের সাহায্য ছাড়াই সে শিক্ষিত হতে পারবে। যদি অন্যেরা জন্মগতভাবে বুদ্ধিমান না হয়, তাহলে প্রয়োজনমতো তাদেরই সব রকম শিক্ষা ও শিক্ষক দাও। তবে আমার মনে হয়, সেটাই হবে ন্যায়সঙ্গত যুক্তিসঙ্গত কাজ, সুতরাং আমাদের অসংখ্য দরিদ্র নিপীড়িত ভারতবাসীর নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নারী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ, সবল-দুর্বল নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারত-বাসীকে উপলব্ধি করতে হবে যে সকলের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সবরকমের শক্তি যেমন বলশালী বা দুর্বল, উচ্চ-নীচ এবং প্রত্যেক মানবসত্তার ভিতরেই অবস্থান করে অনন্ত আত্মা। সকলের মধ্যেই অমিত সম্ভাবনা এবং সকলেই হতে পারে মহান ও সৎ। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—ওঠো, জাগো, অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত থেমো না। ওঠো, জাগো! প্রত্যেকের প্রাণের বীণায় ঘোষিত হোক এই বীণা। দুর্বলতার সংমোহনী বন্ধন থেকে নিজেকে জাগরিত করো। কেউই শক্তিহীন নয়, অনন্ত আত্মা সর্বজ্ঞানী এবং সর্বত্র বিরাজমান। দাঁড়াও, নিশ্চিত হৃদয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করো

নিজের সত্তায় বিরাজমান ঈশ্বরের কথা, তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করো না। অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয়তা, দুর্বলতা ও মোহজাল আমাদের জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আধুনিক হিন্দুগণ! তোমরা মোহজাল ছিন্ন করো। আত্মিক উপলব্ধির জন্ম যে পন্থা অবলম্বন করতে হবে তার নির্দেশ তোমাদের পবিত্র শাস্ত্রেই লিখিত আছে। নিজেকে শেখাও, প্রত্যেককে তার স্বাভাবিক প্রকৃতির সন্ধান দাও, নিদ্রিত আত্মাকে জাগাও, দেখো আত্মিক জাগরণ কিভাবে ঘটে। তাহলেই দেখবে শক্তি, গৌরব, পবিত্রতা ও মহানুভবতার উদয় হবে। ঘুমন্ত আত্মার হৃদয়ে আত্মসচেতন সক্রিয়তার বীজ অঙ্কুরিত করলেই পৃথিবীর সবরকম চরম উৎকর্ষপূর্ণ বস্তুর উদয় হবে। যদি গীতার কোন কিছু আমার ভালো লাগে তবে তা হলো দুটি শ্লোক, যার মর্মার্থ গভীরতায় পরিপূর্ণ এবং যা কি না কৃষ্ণের শিক্ষার সার কথা 'যিনি সর্বভূতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন, ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুর অবিনশ্বরতাও তিনি উপলব্ধি করতে পারেন তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরের উপলব্ধির দরুন তিনি আত্মহনন করেন না, ফলত তিনি পরমা গতি লাভ করেন।'

এইভাবে বেদান্ত এখানে এবং পৃথিবীর সর্বত্র মঙ্গলজনক কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ উন্মোচিত করেছে। বিশ্বের সর্বত্র মানবজাতির উন্নতিসাধন ও নৈতিক উত্তরণের জন্য আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব ও সর্বত্র বিরাজমানতার আশ্চর্য সুন্দর মতাদর্শ প্রচার করতে হবে। বিশ্বজগতের যেখানেই অশুভ শক্তির উদ্ভব হয়েছে অথবা অজ্ঞতা বা জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, সেখানেই আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আমাদের শাস্ত্রের কথাই ঠিক, এবং সকল অশুভ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে বৈষম্যের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে এবং সকল শুভশক্তির উদ্ভব ঘটে সব বস্তুর অন্তর্নিহিত সাম্যের ওপর গভীর বিশ্বাস থেকে, এটাই হলো বেদান্তের মহান দর্শন। এই দর্শনকে গ্রহণ করা এক কথা এবং দৈনন্দিন জীবনে এই দর্শনকে পরিপূর্ণরূপে প্রয়োগ করা অন্য ব্যাপার। আদর্শ নির্দেশ করা খুব ভালো, কিন্তু কোথায় আছে অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনের ব্যবহারিক পন্থা?

এখানেই স্বাভাবিক কারণে জাতি ও সমাজসংস্কারের জটিল ও বিরক্তিকর প্রশ্নটি উপস্থিত হয়। কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই মনোভাব আমাদের জনগণের মনে সর্বাপেক্ষা প্রবল। আমি আন্তরিকভাবে তোমাদের বলছি যে আমি জাতি-ভঙ্গকারী বা কেবল সমাজ-সংস্কারক মাত্র নেই। তোমাদের জাতিপ্রথা বা সমাজসংস্কার নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আমি কিছুই করতে চাই না। তুমি যে কোন জাতিরই হও, তার মানে এই নয় যে তুমি অন্য জাতের লোকদের ঘৃণা করতে পারো। একমাত্র ভালোবাসা, হ্যাঁ শুধুমাত্র ভালোবাসার আদর্শই আমি বারবার প্রচার করেছি। বিশ্ব আত্মার অবিনশ্বরতা এবং সর্বত্র বিরাজমান ও বৈদান্তিক সত্যের এই মূল কথাই হলো আমার শিক্ষার ভিত্তি। গত প্রায় একশো বছর ধরে আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারক ও ভিন্ন সমাজসংস্কার প্রস্তাবের বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে ঐ সব সংস্কারকদের মধ্যে আমি ত্রুটি খুঁজে পাইনি। তাঁদের অধিকাংশই ভালো এবং বোদ্ধা ব্যক্তি, এবং কিছু কিছু বিষয়ে তাঁদের লক্ষ্য অত্যন্ত শ্লাঘনীয়।

কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টতর হয়েছে যে একশত বছরের সমাজসংস্কারও সমগ্র দেশের পক্ষে গ্রহণীয় একটি স্থায়ী ও মূল্যবান পন্থা আবিষ্কারে সক্ষম হয় নি। অসংখ্য মঞ্চ-বক্তৃতা হয়েছে, হিন্দুধর্ম ও তার সভ্যতার বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসাপূর্ণ প্রচার চালানো হয়েছে, তথাপি বাস্তবে কোন সুফল অর্জিত হয়নি। এর কারণ কি? এর কারণ অনুসন্ধান করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ ঐ সব সংস্কার-আন্দোলন পারস্পরিক দোষারোপে পূর্ণ ছিল। আমি তোমাদের পূর্বেই বলেছি যে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে জাতি হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত আমাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। অন্যান্য জাতির সব ভালো জিনিসের নির্যাসটুকু আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অন্যদের কাছ থেকে অনেক কিছু আমাদের শিখতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি আমাদের অধিকাংশ সংস্কার-আন্দোলনই পশ্চিমী পদ্ধতির নির্বিচার অনুকরণ মাত্র। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই তা ভারতে প্রযোজ্য হবে না। সেই কারণেই সাম্প্রতিক সংস্কার-আন্দোলন ভারতে কোন সুফল অর্জন করতে পারে নি।

দ্বিতীয়তঃ নিন্দাপ্রচার কখনই ভালো করতে পারে না।

আমাদের সমাজের অশুভ দিকগুলি শিশুরাও লক্ষ্য করতে পারে, এবং পৃথিবীর কোন সমাজেই বা কিছু খারাপ দিক নেই? বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও দেশের পার্থক্য উপলব্ধি করার সুযোগ আমার হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিচারে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আমাদের জনগণ নৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে চরিত্রবান এবং ঈশ্বর-প্রাণ; এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য মানবজাতির কল্যাণসাধনের উপযোগী। সুতরাং আমি অন্যরকম সমাজসংস্কারের প্রয়োজন বোধ করি না।

জাতীয় চরিত্রের পুষ্টিসাধন, সম্প্রসারণ ও উন্নতি বর্ধন করাই আমার আদর্শ। আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই মানবমনের উন্নতি বর্ধনের জন্য আমাদের দেশ ব্যতীত বিশ্বের আর কোন দেশই এতটা অগ্রসর হয়নি। সুতরাং দেশকে দোষারোপ করার মত ভাষা আমার নেই।

আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি—"তোমরা এতোদিন ভালো কাজই করেছো, এখন চেষ্টা করো আরও ভালো কাজ করার।" এই ভারতবর্ষে অতীতে অনেক মহান কাজ হয়েছে, এখনো অনেক মহান কর্তব্য সম্পাদন করার সময় ও সুযোগ আছে।

আমি নিশ্চিত যে আমরা কখনই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। যদি আমরা স্থির নিশ্চল হয়ে থাকি, তবে অচিরেই আমরা লুপ্ত হয়ে যাবো। হয় সামনে অগ্রসর হবো নতুবা পশ্চাদপসারণ করবো। নৈতিক উন্নতি বিধান করবো নতুবা অধঃপতিত হবো।

অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক মহান কাজ করেছেন। আমাদের কর্তব্য হবে জীবনের পূর্ণ বিকাশের পথ প্রসারিত করা। পূর্বপুরুষদের মহান কৃতিত্ব অতিক্রম করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কেমন করে আমরা পিছবো এবং নিজেদের অধঃপতন ডেকে আনব? তা কখনই হতে পারে না, যা হবে না; পশ্চাদপসারণ

জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয় এবং অধঃপতন ডেকে আনবে। অতএব সামনে অগ্রসর হও এবং মহান কর্তব্য সম্পাদন করো ; সেই কথাই আমি তোমাদের বারবার বলেছি।

আমি কোন সাময়িক সমাজসংস্কারের প্রচারক নই। আমি অশুভশক্তির প্রতিকার সাধনের জন্য চেষ্টা করছি না, আমি শুধুমাত্র বলছি সামনে অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ণতা অর্জনের সঠিক পথ অর্থাৎ মানব প্রগতির পূর্ণতা অর্জন বিষয়ে ব্যবহারিক উপলব্ধিকে সম্পূর্ণ করো।

মানবজাতির ঐক্যসাধনে এবং তার জন্মগত শাশ্বত প্রকৃতির বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে বৈদান্তিক আদর্শকে অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করো এবং কাজ করো। যদি আমার সময় থাকত, তবে আমি সানন্দে তোমাদের দেখাতাম যে আমাদের বর্তমান কর্মপন্থা হলো বহু প্রাচীনকালের প্রাজ্ঞজন কর্তৃক নির্দেশিত পথের প্রতিফলন। বর্তমানে বহুবিধ পরিবর্তন যা কিনা জাতীয় জীবনে ঘটছে অথবা ঘটতে যাচ্ছে, সেইসব ঘটনা কত সঠিকভাবে তাঁরা সেই সুদূর অতীতে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরাও তো জাতিভেদ প্রথা মানতেন না—তবে তাঁরা আমাদের আধুনিক জনতার মতন ছিলেন না। তাঁদের কাছে জাতিভেদ প্রথা অমান্য করার অর্থ এই ছিল না যে শহরের সকল নাগরিক একসঙ্গে বসে গো-মাংস ভক্ষণ আর মত্তপান করবে। দেশের মূর্খ ও পাগলেরা যখন যেখানে খুশি যাকে ইচ্ছে হয় বিয়ে করবে এবং ক্রমশ দেশটাকে একটা পাগলা গারদে পরিণত করবে। একজন বিধবা রমণীর কতজন স্বামী হলো তার দ্বারা কোন দেশের সমৃদ্ধির পরিমাপ হয়—এই মতবাদে তারা বিশ্বাস করত না। এইভাবে সমৃদ্ধ দেশ দেখতে আমার ভীষণ কৌতূহল হয়।

আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে আদর্শবান ছিলেন ব্রাহ্মণগণ। আমাদের প্রাচীন পুস্তকে তাঁদের আদর্শের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ইউরোপে আছেন পোপের মন্ত্রণাসভার সদস্য মহান কারডিনাল (Cardinal), যিনি কঠোর সংগ্রাম চালাচ্ছেন এবং হাজার পাউণ্ড ব্যয় করেছেন পূর্বপুরুষদের মহানুভবতা প্রমাণ করার জন্য। পূর্বপুরুষদের ভয়ঙ্কর, অত্যাচারী হিসেবেও যদি পরিচয় পান তবুও তিনি ক্ষান্ত হবেন না। তাদের পূর্বপুরুষরা পাহাড়ে পাহাড়ে বিচরণ করত এবং সেখান থেকে পথচারীদের লক্ষ্য রাখত এবং সুযোগ মত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু লুঠ করে নিত। মহানুভবতা সৃষ্টিকারী পূর্বপুরুষদের এইসব কীর্তিকলাপে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। পূর্বপুরুষদের মহানুভবতা অনুসন্ধানে এই সব কীর্তি মহান কারডিনালকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করবে না। অপরদিকে ভারতবর্ষে মহান রাজা মহারাজারাও পূর্ব-পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য প্রাচীন মুনিঋষিদের মতন জীবনযাপন করত। ঋষিরা একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করত, বাস করত বনে, আহার হিসেবে গ্রহণ করত বনের ফলমূল এবং বেদ অধ্যয়ন করত। এইভাবেই ভারতীয় রাজারা পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত। যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুগণের ঋষি হিসেবে সন্ধান পাও তখনই তুমি পরিণত হও উচ্চবর্ণে—অন্য কোন উপায়ে নয়।

সুতরাং উচ্চবংশে জন্মানোর ধারণা অন্যান্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ও আত্মত্যাগ হলো আমাদের আদর্শ। ব্রাহ্মণের আদর্শ

বলতে আমি কি বোঝাতে চাই? আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব বলতে আমি বোঝাতে চাইছি সাংসারিকতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং সত্য জ্ঞানের প্রচুর সমাগম। হিন্দুজাতির এটাই হলো আদর্শ। তুমি কি শোন নি যে এটা ঘোষিত হয়েছে যে তিনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আইনের চোখে শাসনযোগ্য নয়, তাঁর কোন আইন নেই, তিনি কোন রাজা কর্তৃক শাসিত হন না এবং তার দেহ কখনও আঘাতপ্রাপ্ত হয় না। এটা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থান্বেষী ও মূর্খদের আলোকে এই মতাদর্শকে বিচার করো না বা বোঝার চেষ্টা করো না; কিন্তু সত্য ও উদ্ভাবনক্ষম বৈদিক আদর্শের আলোকে এই ঘটনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। যদি তিনিই হলেন সৎ ব্রাহ্মণ, যিনি সকল স্বার্থপরতার অবসান ঘটিয়েছেন এবং যিনি সত্যজ্ঞান ও ভালোবাসার শক্তি উপলব্ধি ও প্রসারিত করার জন্য কাজ করেন। যদি কোন দেশ এই ধরনের চরিত্রবান ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক নারী পুরুষ যদি আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন, নৈতিকতাসম্পন্ন এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তবে সেই দেশ আইনের ঊর্ধ্বে। তাঁদেরকে শাসনের জন্য কোন পুলিস বা সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেন একজন তাঁদের শাসন করবে? কেনই বা সরকারের শাসনে থাকবে? তারা তো মহৎ এবং উদার, তারা হলো ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই হলো আমাদের আদর্শবান ব্রাহ্মণদের কথা। আমরা পড়েছি সত্যযুগে ভারতবর্ষে একটাই জাত ছিল—তা হলো ব্রাহ্মণ। মহাভারতে আমরা পড়েছি সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর বাসিন্দা ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। যে মাত্র তাদের নৈতিক অধঃপতন হলো তখনই তারা বিভিন্ন জাতে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং চক্রাকারে এই বিবর্তন শুরু হলো। তারা ব্রাহ্মণত্ব সৃষ্টির উৎসে ফিরে যাবে। এই চক্র এখন বিবর্তিত হচ্ছে, এবং এই বিষয়টির দিকে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। উচ্চজাতিকে অধঃপতিত করা, খাদ্য ও পানীয়ের পিছনে ক্ষিপ্রবেগে ছোটা, অতিরিক্ত আনন্দ উপভোগের জন্য অত্যধিক ঝুঁকি গ্রহণ করলেই জাতিগত প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। বৈদান্তিক ধর্মের শিক্ষাকে কার্যকরী করা; আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং আদর্শবান ব্রাহ্মণ হতে পারলেই ঐ প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব।

তুমি আর্যই হও আর অনার্যই হও, ব্রাহ্মণ হও বা ঋষি হও অথবা খুবই নীচু জাত হও না কেন, এই দেশে তোমাদের প্রত্যেকের জন্য পূর্বপুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট আইন আছে। এই আদেশ সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য, শুদ্ধ না হয়ে তোমাকে নৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজের উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীর পাড়িয়াদের পর্যন্ত অর্থাৎ দেশের প্রত্যেককে আদর্শবান ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই বৈদিক আদর্শ শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য। শান্ত, দৃঢ়, শ্রদ্ধেয়, তপস্বী ও অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক আত্মার মহান আদর্শকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির নৈতিক উন্নতি-বিধান করাই হলো জাতি আমাদের সম্পর্কে মতাদর্শ। ঐ আদর্শের অন্তরে আছেন ঈশ্বর। এই সমস্ত বিষয় কি ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

অভিশাপ দেওয়া বা অমঙ্গল কামনা করা, কুৎসা প্রচার এবং কদর্যভাষা ব্যবহার কোন ধরনের নৈতিক মঙ্গলসাধন করে না—এই বিষয়টির প্রতি পুনরায় আমি তোমাদের

মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বছরের পর বছর তারা ঐভাবে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন মূল্যবান ফল অর্জিত হয়নি। শুধুমাত্র ভালোবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমেই সুফল অর্জন সম্ভব। এটা একটি মহৎ বিষয়, যে সমস্ত পরিকল্পনা আমার কাছে পরিদৃশ্যমান তার বিশদ ব্যাখ্যার জন্য প্রচুর পরিমাণে বক্তৃতার প্রয়োজন। এই আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল ধ্যান-ধারণা দিনের পর দিন আমার মনে উদ্ভাসিত হচ্ছে। একটিমাত্র বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করতে চাই, তা হলো আমাদের হিন্দুধর্মের জাহাজটি যুগ যুগ ধরে নির্দিষ্ট পথে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বর্তমানে বোধহয় ঐ জাহাজে কোন ছিদ্র হয়েছে, অথবা অব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। এটাই যদি ঘটনা হয় তবে তোমার আমার কর্তব্য হবে ঐ জীর্ণতাকে শুদ্ধ করার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান। এই বিপদের কথা দেশবাসীকে জানান, তাঁদের জাগানো এবং এর হাত থেকে মুক্তির পথ-সন্ধানে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের দায়িত্ববোধকে জাগরিত করার জন্য আমি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে জোরালো প্রচার চালিয়ে যাবো। ধরা যাক তারা আমার বক্তব্য গ্রহণ করল না, তবুও তাঁদের সম্পর্কে কোন কটূক্তি করব না বা তাঁদেরকে অভিশাপ দেবো না। অতীতে আমাদের দেশের কীর্তিকলাপ ছিল মহান, যদি ভবিষ্যতের জন্য আমরা মহান কাজকর্ম করতে না পারি তাহলে শান্তির অতলে লুপ্ত হয়েছি এই সান্ত্বনা নিয়েই আমরা চলে যাবো। দেশপ্রেমিক হও, এবং স্বজাতিকে ভালোবাসতে শেখো, কারণ অতীতে এই জাতই অনেক মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছে। যতই আমি আমার বক্তব্য তুলনা করছি, ততই আমি আমার দেশবাসীকে ভালোবেসে ফেলছি—তোমরা সুন্দর, পবিত্র এবং ভদ্র। তোমরা চিরকাল অত্যাচারিত হয়েছো, এটাই হলো বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতা—মায়ার ব্যাজস্তুতি। কিছু ভেবো না, কারণ শেষ পর্যন্ত পরমাত্মার জয় হবেই। এখন আমাদের কর্তব্য কাজ করা, দেশের নিন্দা প্রচার নয় বা পবিত্র মাতৃভূমির জীর্ণ ক্লান্ত শিক্ষার পীঠস্থানগুলিকে অভিসম্পাত প্রদান করা বা সমালোচনা করা নয়। এই সমস্ত শিক্ষার পীঠস্থানগুলির অত্যধিক কুসংস্কার ও বিচারশক্তিহীনতার জন্য কোনরূপ দোষারোপ করো না, কারণ অতীতে হয়তো তারা কিছু ভালো কাজ করেছিল। মনে রেখো এই দেশের শিক্ষার পীঠস্থানগুলির মত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে এতো গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পৃথিবীর আর কোন দেশের পীঠস্থানই ছিল না। পৃথিবীর সকলদেশের জাত সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে, কিন্তু এখানকার মত আর কোন দেশেই তাদের পরিকল্পনা এবং উদ্দীষ্ট লক্ষ্য গৌরবময় ভূমিকা পালন করেনি। যদি জাতপ্রথা এড়ানো অসম্ভব হয়, তবে আমি একটা নতুন জাতের কথা বলব, তা হলো—পবিত্রতা, সংস্কৃতি ও আত্মবিশ্বাসের আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ডলারের মানদণ্ডে বিচার করা জাতের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সুতরাং কোন ধরনের কটূ বক্তব্য উচ্চারণ করো না। চুপ করে থাকো এবং হৃদয়কে প্রসারিত করো। এই পবিত্রভূমি এবং সমগ্র বিশ্বজগতের মুক্তির জন্য কাজ করো,

সকলে ভেবে নাও যে পৃথিবীর সকল দায়িত্বের বোঝা আমাদের ওপর বর্তেছে। প্রত্যেকের দরজায় দরজায় বেদান্তের জীবনদর্শন ও বাণী পৌঁছে দাও, সকল আত্মার মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বর-প্রদত্ত শাশ্বত শক্তিকে জাগরিত করো। তোমার সাফল্য যাই হোক না কেন, তুমি পরিতৃপ্তি নিয়ে যেতে পারবে যে একটা মহান কার্য করার জন্য তুমি বেঁচেছিলে এবং সম্পাদন করেছো। এই মহান সাফল্য যতটুকুই হোক না কেন, পৃথিবীর সর্বত্র মানবতার মুক্তির জন্য তা কেন্দ্রীভূত হবে।

মাদ্রাজে অভিনন্দন

[মাদ্রাজ অভ্যর্থনা সমিতি এবং খেতড়ির মহারাজার পক্ষ থেকে প্রদত্ত অভিনন্দন]

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী,

আমরা মাদ্রাজের সকল হিন্দুজনতার পক্ষ থেকে পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার সমাপ্ত করে অক্ষতদেহে দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে জানাচ্ছি সাদর অভিনন্দন।

আপনাকে প্রদত্ত সম্ভাষণের মাধ্যমে কোন ধরনের রীতিসিদ্ধ বা আনুষ্ঠানিক উৎসব উদ্‌যাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা আপনাকে হৃদয়ের ভালোবাসার অর্ঘ্য অর্পণ করতে চাই। ঈশ্বরের, অসীম দয়ায়, পরম সত্যের প্রয়োজনে ভারতীয় দর্শন প্রচার করে যে মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, সেই জন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

যখন চিকাগোতে ধর্মমহাসভা সংগঠিত হয়, তখন আমাদের দেশের কিছুসংখ্যক ব্যক্তি স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ ঐ সভায় আমাদের এই প্রাচীন ও মহান ধর্মের যোগ্যতার সাথে প্রতিনিধিত্ব করা উচিত, এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা আমেরিকার জনগণের হৃদয়ে প্রচারিত হোক ও তার মাধ্যমে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হোক। আপনার সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং একথা আবার উপলব্ধি করেছি—আমাদের জাতির উদ্দেশ্যে যা বারবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, সময়ের আবর্তনে সত্যকে উদ্ভাসিত করার জন্য মহান ব্যক্তির আগমন হয়। যখন আপনি ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, আমরা অনুভব করলাম, এবং আপনার গভীর প্রজ্ঞা থেকে যা আমাদের বোধগম্য হয়েছিল যে ঐ স্মরণীয় ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের দর্শন সঠিকভাবে বিধৃত হবে। ধর্মমহাসভায় হিন্দুদর্শনের প্রাঞ্জল, সঠিক ও প্রামাণিক ব্যাখ্যা যা আপনি প্রদান করেছিলেন, যা ঐ মহাসভার অনেক বোদ্ধা ব্যক্তিকেও প্রভাবিত করেছিল। বিদেশের মাটিতে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন উপলব্ধি করার জন্য কিছুসংখ্যক ব্যক্তি প্রয়াসী হয়েছিলেন। কারণ আমাদের দর্শনেই অভিব্যক্ত আছে মানবতার এক বৃহৎ, পরিপূর্ণ এবং পবিত্র ক্রমবিকাশের কথা, যা জীবন ও প্রেমের অবিনশ্বরতাকে আকর্ষণীয়ভাবে বিধৃত করেছে এবং বিশ্বজগৎ যা কখনই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। হিন্দুধর্মে বিধৃত সকল ধর্মের ঐক্যসাধন এবং সৌভ্রাতৃত্ব—এই মতাদর্শ আপনি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন—সেইজন্য আমরা আপনার নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। শিক্ষিত ও আগ্রহান্বিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝান কখনই সম্ভব হত না যে সত্য এবং পবিত্রতা, কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা দেহের কোন অংশ বা কোন মতাদর্শের বা কোন সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত অধিকার, অথবা কোন দর্শন বা বিশ্বাস সবকিছু বর্জন এবং ধ্বংস করেও বেঁচে থাকবে। "এই ধর্মে জগতে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের লোক নানারকম শর্ত ও অবস্থার মধ্যে দিয়ে একই অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে অর্থাৎ আমরা সকলেই

একই পথের যাত্রী।" ভাগবত গীতার ঐক্য সাধনের এই মহান বাণী আপনার ভাষায় গভীরভাবে অভিব্যক্ত।

আপনার ওপর আরোপিত এই পবিত্র ও মহান কর্তব্যকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি দিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট ছিলেন, এমনকি তখনও আপনার মহামূল্যবান কাজের জন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনার হিন্দু সহধর্মীরা উল্লসিত। আপনার কর্মপন্থা পশ্চিমমুখী করে আপনি ভারতবর্ষের "শাশ্বত ধর্মের" প্রাচীন শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে রচিত জ্ঞান ও শান্তির বাণীর আলোকবর্তিকা সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বৈদিক দর্শনের সুগভীর যৌক্তিকতা উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য আপনি যে কাজ করেছেন, তার জন্য আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আমাদের ধর্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য কয়েকটি স্থায়ী কেন্দ্রে একটি করে সক্রিয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, পরোক্ষভাবে উল্লেখিত আপনার কর্মপন্থা আমাদের গভীরভাবে আনন্দিত করেছে। যে কর্মপদ্ধতির মধ্যে আপনি আপনার মূল্যবান কর্মশক্তি উৎসর্গ করতে চান, তা যে পবিত্র ঐতিহ্যের আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন তার উপযুক্ত, এবং যে মহান গুরুর আদর্শ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য আপনার জীবনকে উৎসাহিত করেছে তারও যথাযোগ্য। আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে এই মহান কার্য সম্পাদনে আমাদেরকে আপনার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত করবেন।

বিশ্বজগতের সর্বজ্ঞানী এবং পরম দয়াবান পরমপুরুষের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করছি যেন তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন ও অনন্ত কর্মশক্তি প্রদান করেন। গৌরব ও সাফল্যের মুকুট যা কিনা অবিনশ্বর সত্যের কপালে চিরকাল উজ্জ্বলতা বিকিরণ করে—আপনার কঠোর শ্রমের জন্য ঈশ্বর যেন ঐ মহামূল্যবান মুকুটে আপনাকে ভূষিত করে, একান্তমনে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

[খেতড়ির মহারাজার অভিভাষণ]

হে পবিত্রপুরুষ,

আপনার আগমনের সুযোগ গ্রহণ করে এবং ভারতবর্ষে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করা উপলক্ষে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এই অভ্যর্থনা-সভায় আমার আনন্দ ও উল্লাস অভিব্যক্ত করতে পারছি সেই জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। পাশ্চাত্যে আপনার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা যে মহান সাফল্য বহন করে এনেছে তার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। পাশ্চাত্য জগতে প্রাজ্ঞজনের হৃদয়ে ধ্বনিত হয় এই কথাটি—"বিজ্ঞান কর্তৃক বিজিত কোন ব্যাপারে ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই।" যদিও বিজ্ঞান কখনই সত্য ধর্মের বিরোধিতা করেনি। চিকাগোর ধর্মমহাসভায় সুযোগ্য প্রতিনিধি লাভ করে আর্যাবর্তের এই পবিত্রভূমি একক্ভাবে হয়েছে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। এটা মূলত আপনার প্রজ্ঞা, উদ্যম এবং উৎসাহের জন্যই পশ্চিমী বিশ্বের কাছে এটা বোধগম্য হয়েছে যে ভারতবর্ষ হলো আধ্যাত্মিকতার অনন্ত ভাণ্ডার।

বেদান্তের সর্বজনীন আলোকের সাহায্যে বিশ্বের বহুবিধ ধর্মমতের দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐক্য সাধন করা সম্ভব—আপনার কঠোর শ্রম সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে।

বিশ্বের বিবর্তনে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন' প্রকৃতির পরিকল্পনা—এই মহান সত্য সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করতে হবে এবং বাস্তবে উপলব্ধি করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য স্থাপন এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাহায্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানবতার সুফল অর্জিত হয়। আশা সৃষ্টিকারী এবং উৎসাহ প্রদানকারী পবিত্র শিক্ষার আলোকে বিশ্ব-ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো—আমরা বর্তমান শতাব্দীর অধিবাসীবৃন্দ তার সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। সেই জগতে হয়তো ধর্মান্ধতা, ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, কিন্তু আমি আশা করি শান্তি, সহানুভূতি ও ভালোবাসাই মানবতার ওপর প্রভুত্ব করবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার এবং আপনার শ্রমের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হোক।

স্বামীজীর প্রত্যুত্তর

মানুষ গড়ে আর দেবতা ভাঙে। প্রস্তাব করা হয়েছিল ইংরেজ রীতি অনুসারে অভিভাষণ ও উত্তর দেওয়া হবে। কিন্তু ঈশ্বর এখানে বিনাশ করলেন—আমি যেন গীতা-বর্ণিত রথ থেকে এক ছত্রভঙ্গ জনতার সামনে ভাষণ দিচ্ছি। সুতরাং ঘটনার পরিক্রমা এই রকম হওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

ফলত আমি বক্তৃতা দেওয়ার উৎসাহ পেয়েছি, এবং আমি যা বলতে চাই তার জন্য শক্তি অর্জন করেছি। আমি জানি না আমার কথা সকলের কাছে পৌঁছবে কিনা, কিন্তু আমি সর্বান্তকরণে চেষ্টা করব। এই রকম মুক্ত সভায় ভাষণ দেওয়ার সুযোগ এর আগে আমি কখন পাইনি। কলম্বো থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত এবং সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে যে গভীর সম্মান ও আগ্রহ এবং উৎসাহপূর্ণ আনন্দ আমি পেয়েছি—তা ছিল কল্পনার অতীত, এই অভিনন্দন-বার্তা আমাকে অভিভূত করেছে। একটা ব্যাপারে আমি গভীরভাবে আনন্দিত হয়েছি কারণ যে কথা আমি পূর্বে বার বার বলেছি যে প্রত্যেক জাতির জীবনীশক্তির একটা আদর্শ আছে, আছে নির্দিষ্ট কর্মসূচী, সুতরাং ভারতীয় মনের বিবর্তনে ধর্মের অসাধারণ প্রভাব এটা সেই নিশ্চয়তাকে প্রমাণ করে।

উদাহরণ স্বরূপ ইংল্যাণ্ডে ধর্ম জাতীয় নীতির অঙ্গ। ইংল্যাণ্ডের গীর্জাগুলি শাসক-শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন, এতে তাদের বিশ্বাস থাক বা না থাক, এটাকে তাদের সমর্থন করতে হয় এই ভেবে যে গীর্জাগুলি হলো আমাদের সম্পত্তি। প্রত্যেক মহিলা ও পুরুষ গীর্জার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটা শিষ্টতার পরিচায়ক। অন্যান্য দেশেও মহান জাতীয় শক্তি আছে—যার প্রতিনিধিত্ব করে হয় রাজনৈতিক অথবা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, অথবা সামরিক বাহিনী বা বণিকশ্রেণী। সেখানে জাতীয় হৃদয় কম্পিত হয়, এবং সেই জাতীয় সম্পদের বিভিন্ন গৌণ বিষয়ের মধ্যে ধর্ম একটা অঙ্গ।

ভারতবর্ষে জাতীয় চরিত্রের হৃদয়ে ধর্মের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। ধর্ম হলো আমাদের জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড, এবং ধর্মের কঠিন ভিতের ওপর আমাদের জাতীয় চরিত্রের সৌধ স্থাপিত। রাজনীতি, ক্ষমতা, এমনকি চিন্তাশক্তিকে এখানে গৌণ শক্তি

হিসেবে গণ্য করা হয়। ধর্মই ভারতবর্ষে একমাত্র প্রধান বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। ভারতের অসংখ্য জনগণের মধ্যে তথ্য সরবরাহের যথেষ্ট অভাব দেখা যায় এই কথা আমি প্রায় কয়েকশো বার বলেছি, এবং এটা সত্য ঘটনা। কলম্বোতে অবতরণ করে আমি একটা ঘটনা লক্ষ্য করেছি, তা হলো এখানকার জনগণ ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখে না। সমাজতন্ত্র ও বিপ্লব, যার জন্য ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়ার বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে এ তার সম্পর্কে এখানকার জনতা ওয়াকিবহাল নয়। ভারতবর্ষের একজন সন্ন্যাসী আমেরিকার ধর্মমহাসভায় যোগদান প্রভৃত পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে এই সংবাদ কিন্তু সিংহলের প্রত্যেক নারী, পুরুষ, এমনকি শিশুরাও পর্যন্ত জানে। এটা প্রমাণ করে যে তথ্য সরবরাহের কোন অভাব নেই, এবং মনঃপূত খবর তথ্যের বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কারণ দৈনন্দিন চাহিদার সাথে তা সম্পর্কযুক্ত। রাজনীতি এবং এই ধরনের বিষয়গুলি ভারতীয় জীবনের দৈনিক চাহিদা মেটাতে পারেনি, কিন্তু ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের আলোকে তারা জীবন অতিবাহিত করেছে ও নৈতিক উন্নতি বর্ধন করেছে এবং ভবিষ্যতে বাঁচার প্রেরণা অর্জন করবে। বিশ্বের দেশগুলির দুটি বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে হবে, ভারতবর্ষের ওপর থাকবে একটির ভার, এবং অপরটির ভার থাকবে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির ওপর। সমস্যাটি হচ্ছে—কে বেঁচে থাকবে? কেন একটা দেশ বেঁচে থাকে এবং অন্য দেশ লুপ্ত হয়? ভালোবাসা শাশ্বত হবে না ঘৃণা, ভোগ না আত্মত্যাগের বাণী চিরকাল মর্মরিত হবে, জীবনসংগ্রামে বস্তুর অস্তিত্ব অবিনশ্বর না আধ্যাত্মিকতার আদর্শ অবিনশ্বর? অতি প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যা করেছিলেন, আমরা সেইভাবে ভাবছি। যেখানে ঐতিহ্য সেই অতীতের অন্ধকারকে ভেদ করতে পারে না, সেখানে আমাদের মহানুভব পূর্বপুরুষরা সমস্যার পক্ষ নিয়ে সমগ্র বিশ্বজগৎকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। ঐ সমস্যা সমাধানের পন্থা হল আত্মত্যাগ, মোহের বন্ধন ছিন্ন করা, ভয়হীনতা এবং ভালোবাসা; বেঁচে থাকার প্রকৃষ্ট পন্থা। জিতেন্দ্রিয়তার আদর্শ দেশকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রমাণস্বরূপ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতেই ছত্রাকের মত জাতির উত্থান ও পতন হয়েছে, শূন্যতা বা আদর্শহীনতা থেকে যার আগমন, কয়েকদিনের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের পর অচিরেই কালের গর্ভে লুপ্ত হয়েছে। অতি বৃহৎ জাত নিয়ে এই মহান দেশ দুর্ভাগ্য, বিপদ ও উত্থান-পতনের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছে, যা কিনা পৃথিবীর কোন দেশকেই করতে হয়নি। তবুও এই দেশ বেঁচে আছে, কারণ সে জন্মলগ্ন থেকেই গ্রহণ করেছিল আত্মত্যাগের মহান আদর্শ। আত্মত্যাগ ছাড়া ধর্মে আর কিই বা থাকতে পারে? একজন মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ঠিক সেইভাবেই ইউরোপ সমস্যার অন্য দিকটার সমাধান করার চেষ্টা করছে। প্রাণপণে প্রচেষ্টা চালিয়ে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে একজন মানুষের পক্ষে কতটা ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্ভব। নিষ্ঠুরতা, প্রীতিহীনতা ও হৃদয়হীনতার মধ্যে প্রতিযোগিতাই হলো ইউরোপের নৈতিক আদর্শের নীতি। আমাদের নীতি জাতিভেদ—প্রতিযোগিতার বন্ধন ছিন্ন করে, তার শক্তিকে স্তব্ধ করে এবং নিষ্ঠুরতাকে প্রশমিত করে, জীবনের রহস্য-সন্ধানে মানবাত্মার পথ পরিষ্কার করা।

বন্ধুগণ, আপনাদের উৎসাহে আমি গভীর আনন্দ উপভোগ করছি। এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। মনে করবেন না আপনাদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছি। উপরন্ত এই গভীর উৎসাহ প্রদর্শনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই ধরনের গভীর উৎসাহই আমাদের একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন উৎসাহের অগ্নি স্থায়ী করা, এই অগ্নি নির্বাপিত করো না। আমরা ভারতবর্ষে মহৎ কাজ সম্পাদিত করতে চাই। সেই কারণেই আমি আপনাদের সাহায্য চাই ; এবং প্রয়োজন এই উৎসাহ। ভবিষ্যতে এই ধরনের বক্তৃতা সংগঠিত করা অসম্ভব।

আপনাদের আন্তরিক উদারতা প্রদর্শন ও উৎসাহপূর্ণ অভিনন্দনের জন্য আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। শান্ত পরিবেশে অনেক গভীর বিষয় ও মতাদর্শ আদান-প্রদান করা যাবে। বন্ধুগণ, এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।

সকলের জন্য ভাষণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং আপনারা এই সন্ধ্যায় শুধুমাত্র আমাকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকুন। অন্য কোন উপলক্ষের জন্য আমি আমার ভাষণ সংরক্ষিত রাখব। আপনাদের উৎসাহপূর্ণ অভিনন্দনের জন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার সমরনীতি

ভীড়ের জন্য সেদিন আমাদের আলোচনা এগোতে পারেনি। মাদ্রাজবাসীদের কাছ থেকে প্রতিটি বিষয়ে আমি যে সহমর্মিতা পেয়েছি সেজন্য এই সুযোগে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে ভাষণগুলি দেওয়া হয়েছে তাতে যেসব সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুন্দরতর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, যেন সারাজীবন আমাদের ধর্মের ও মাতৃভূমির সেবায় নিযুক্ত থেকে আমি এইসব মহৎ সম্ভাষণের যথোচিত মর্যাদা দিতে পারি। তিনি যেন আমাকে এইসব সম্ভাষণের যোগ্য করে তোলেন।

অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মনে হয় আমার কিছু সাহস আছে। পাশ্চাত্যের প্রতি ভারতবর্ষের বাণী আমি বহন করেছিলাম এবং বলিষ্ঠভাবেই আমি তা আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডবাসীদের শোনাতে পেরেছি। আজকের আলোচনা শুরু করার আগে সাহস করে আপনাদের কিছু বলতে চাই। কিছু প্রতিকূল পরিবেশ আমার অগ্রগতিকে বাধা দিতে, আমার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে চেয়েছিল। এমন কি সম্ভব হলে আমার অস্তিত্বও তারা মুছে দিত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে; কারণ এ ধরনের অসৎ অভিসন্ধি সবসময়ই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু গত তিনবছর যাবৎ কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে এবং যতক্ষণ বিদেশে ছিলাম ততক্ষণ নীরবে থেকেছি। একটি কথাও বলিনি। কিন্তু আজ মাতৃভূমির উপর দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু বলতে চাই। এর ফল কি হতে পারে সে সম্পর্কে আমি শঙ্কিত নই, আমার কথা আপনাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সে বিষয়েও আমি চিন্তিত নই। কারণ চার বছর আগে যষ্টি ও কমণ্ডলু হাতে যে সন্ন্যাসী এই শহরে প্রবেশ করেছিল সেই আমি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছি। বিশাল বিশ্ব এখনও আমার সামনে সে রকমই বিস্তৃত রয়েছে। আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক।

প্রথমতঃ থিওসফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। বলা বাহুল্য যে সোসাইটি ভারতবর্ষে কিছু ভালো কাজ করেছে। সে কারণে সমস্ত হিন্দুই এই প্রতিষ্ঠানের কাছে, বিশেষত শ্রীমতী বেসান্তের কাছে কৃতজ্ঞ। যদিও তাঁর সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু জানা নেই, তবুও যেটুকু জানি তা থেকে এ ধারণা জন্মেছে যে তিনি প্রকৃতই আমাদের এই মাতৃভূমির হিতাকাঙ্ক্ষী। এদেশের উন্নতিবিধানে তিনি তাঁর যথাসাধ্য প্রয়াস চালাচ্ছেন। সেজন্য প্রত্যেক প্রকৃত ভারতবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, চিরদিনের জন্য প্রতিটি মানুষের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তাঁর উপর। কিন্তু এ হল এক কথা, অধিবিদ্যকদের (থিওসফিস্ট) সংগঠনের সদস্য হওয়া আর এক কথা। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা, সম্মান প্রদর্শন এক জিনিস, আর খুঁটিয়ে না দেখে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির বক্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। রাষ্ট্র হয়েছে যে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে আমার যৎসামান্য সাফল্য না কি ঐ থিওসফিস্টদেরই কল্যাণে। আপনাদের পরিষ্কার জানাচ্ছি সে এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা, পুরোপুরি ভ্রান্ত।

উদার ধারণা ও পরমত সহিষ্ণুতার ব্যাপারে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কথা শোনা গেছে। খুব ভালো কথা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন আর একজনকে ততক্ষণই সহানুভূতি প্রদর্শন করে যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সমস্ত বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা মেনে নেয়, কিন্তু মতান্তর দেখা দিলেই সেই সহানুভূতি, সে ভালোবাসা অদৃশ্য হয়। কোন কোন লোকের আবার ব্যক্তিগত অভিসন্ধি থাকে এবং কোন প্রতিবন্ধক দেখা দিলেই তাদের অন্তর জলে পুড়ে মরে, ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয় মন, তারা তাদের কর্তব্য স্থির করতে পারে না। হিন্দুরা তাদের বাসভূমিকে কলুষমুক্ত করতে চাইছে, এতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের কি ক্ষতি হয়েছে? হিন্দুরা নিজেদের সংশোধন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, এতেই বা ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারক প্রতিষ্ঠানগুলির কি ক্ষতি হল? তারা কেন বিরোধিতা করবে? তারা কেন এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শত্রু হবে? আমার প্রশ্ন কেন? মনে হয় ঘৃণায়, হিংসায় এরা এতই অন্ধ যে কেন, কিভাবে ইত্যাদি প্রশ্নই সেখানে নিরর্থক।

চারবছর আগে দরিদ্র, অপরিচিত, বান্ধবহীন এক সন্ন্যাসী হিসাবে যখন সমুদ্র পেরিয়ে আমেরিকা যাত্রা করেছিলাম কোন পরিচয় অথবা বন্ধু সেখানে আমার ছিল না। থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেতার সঙ্গে তখন দেখা করি। স্বভাবতঃই আশা ছিল যে যেহেতু সে ব্যক্তি আমেরিকান ও ভারতপ্রেমিক তাই তার কোন স্বদেশ-বাসীকে আমার পরিচয়পত্র তিনি দেবেন। তিনি জানতে চাইলেন "আপনি কি আমার সোসাইটির সদস্য হবেন?" আমি উত্তরে বললাম—"না। তা কেমন করে সম্ভব? আপনাদের অধিকাংশ মতবাদ আমি বিশ্বাস করি না।" তিনি জানালেন "তাহলে দুঃখিত, আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবো না।" এটাতো আমার পথ করে দেওয়া হল না। আপনারা জানেন মাদ্রাজের কিছু বন্ধুর সহযোগিতায় আমি আমেরিকা পৌঁছেছিলাম। তাঁদের অধিকাংশই আজ এখানে উপস্থিত আছেন। শুধু বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার (Subra Mania Iyer) ছাড়া। তাঁর কাছে আমি সবচেয়ে বেশী ঋণী। প্রতিভাবান পুরুষের গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আছে এবং আমার জীবনের সেরা বন্ধুদের তিনি একজন।

তিনি একজন প্রকৃত ভারত সন্তান। ধর্মমহাসভা শুরু হবার বেশ কয়েক মাস আগে আমি আমেরিকা পৌঁছাই। যৎসামান্য অর্থ আমার কাছে ছিল এবং খুব তাড়াতাড়িই তা শেষ হয়ে গেল। শীত পড়তে শুরু করেছে, আমার শুধু পাতলা গ্রীষ্মকালীন পোশাক সম্বল। সেই বিষণ্ণ শীতের আবহাওয়ায় কি করবো ভেবে উঠতে পারলাম না। কারণ রাস্তায় ভিক্ষে করতে গেলে, এরা আমাকে জেলে পুরবে। কয়েকটি মাত্র ডলার শেষ সম্বল করে রইলাম। আমার মাদ্রাজের বন্ধুদের কাছে তার পাঠালাম। অধিবিজ্ঞরা থিওসফিস্টরা সেকথা জানতে পারল, তাদের একজন লিখল: "শয়তান এবার মরতে চলেছে, ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন।" এই কি আমার পথ করে দেওয়ার নমুনা? আজ আমি একথা বলতাম না। কিন্তু আমার স্বদেশবাসীরা যেহেতু জানতে চেয়েছেন, তাই এ সত্য গোপন করা যাবে না। তিন বছর ধরে এ বিষয়ে আমি মুখ খুলিনি; নীরবতাই আমার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আজ

সে কথা প্রকাশ পেল। এখানেই শেষ নয়। ধর্ম-সম্মেলনে কয়েকজন থিওসফিস্টদের দর্শন পেলাম, আমি চেয়েছিলাম তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে, মিশতে। তাদের অবজ্ঞার দৃষ্টি আজও ভুলি নি : ভাবটা যেন—"দেবতাদের সভায় এ ব্যাটা নরক কীটের আগমন কি হেতু ?"

ধর্মমহাসভায় যখন আমার সুনাম হল, তখন প্রচুর কাজ হাতে এল ; কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে থিওসফিস্টরা আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করতে লাগল। থিওসফিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন আমার ভাষণ না শোনেন, তাহলে থিওসফিকাল সোসাইটি তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। কারণ ওদের গুপ্তসাধনপন্থীদের সংস্থায় যে ব্যক্তি যোগ দেবে তাকেই কুঠুমী (Kuthumi) এবং মরিয়া (Maria)-র নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে ; তাদের প্রতিনিধিস্বরূপ মিঃ জাজ (Mr. Judge) এবং মিসেস বেসান্তের কাছ থেকে। যার ফলে এই সীমাবদ্ধ (esoteric) গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না এবং যে মানুষ এ শর্তে রাজী হত তাকে হিন্দু বলেও মানতে পারতাম না। মিঃ জাজের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ছিলেন থিওসফিস্টদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। মিঃ জাজের মতে তাঁর মহাত্মা শ্রেষ্ঠ, অপরপক্ষে মিসেস বেসান্তের মত হল তাঁর মহাত্মাই শ্রেষ্ঠ। এঁদের দুজনের এই মতান্তরকে সমালোচনা করার কোন অধিকার আমার নেই।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এঁরা দুজনে একই মহাত্মার কথা বলে থাকেন। ঈশ্বরই প্রকৃত সত্য জানেন। তিনিই বিচারক, এবং দুদিকের পাল্লাই যখন সমান সমান তখন রায় দেবার অধিকার কোন মানুষের নেই। এভাবেই এরা আমেরিকায় আমার পথ প্রশস্ত করেছেন !

আর এক বিরোধীগোষ্ঠী-খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকদের সঙ্গে এঁরা যোগ দিলেন। এমন কোন কল্পনীয় মিথ্যে নেই যা এই মিশনারীরা আমার বিরুদ্ধে প্রচার করেনি। এক শহর থেকে আর এক শহরে তারা আমার চরিত্রের কুৎসা করেছে, অথচ বন্ধুহীন, নির্ধন হয়ে আমি সেই বিদেশে ঘুরে ফিরছিলাম। প্রতিটি বাড়ি থেকে তারা আমাকে তাড়াতে চেষ্টা করেছে, আমার সদ্যপরিচিত বন্ধুদের শত্রু করতে চেয়েছে।

আমাকে উপবাসী রাখার চেষ্টাও চালিয়েছে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এমন কি আমার এক স্বদেশবাসীও আমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি এক সমাজ-সংস্কারক সংগঠনের নেতা। প্রতিদিন এই ভদ্রলোককে বলতে শুনি :"খ্রীষ্ট ভারতবর্ষে এসেছেন"—এইভাবেই কি খ্রীষ্ট আসবেন ? এই কি ভারতবর্ষ সংস্কারের উপায় ? এই ভদ্রলোককে ছোটবেলা থেকে চিনি, আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। বহুদিন নিজের দলের মানুষকে দেখিনি—তাই তাঁকে দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল—এবং বিনিময়ে পেলাম এই ব্যবহার। যেদিন ধর্ম-মহাসভায় আমাকে অভিনন্দিত করা হল—যেদিন চিকাগো শহরে আমি জনপ্রিয় হলাম—সেদিন থেকে তাঁর বাচনভঙ্গী পাল্টেছে। আমাকে অশোভনভাবে আঘাত হানতে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। এভাবেই কি খ্রীষ্টের আগমনী সূচিত হবে ?

কুড়ি বছর যীশুর পদপ্রান্তে থেকে তাঁর এই শিক্ষা হল ? আমাদের মহান সংস্কার করা বলেন যে খ্রীষ্টধর্ম ও তার শক্তি ভারতবাসীকে উন্নত বরবে। এই কি তার পথ ? সত্যি বলতে, এই ভদ্রলোক যদি সেই উন্নতির নমুনা হন, তাহলে খুব একটা আশাপ্রদ কিছু দেখি না।

আর একটা কথা : সমাজ-সংস্কারকদের এক পত্রিকায় দেখলাম আমাকে শূদ্র বলা হয়েছে এবং সে কারণে আমার সন্ন্যাসী হবার অধিকারকে তারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

এর উত্তরে বলবো আমি এমন এক মহাপুরুষ বংশোদ্ভূত যাকে 'যমায় ধর্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ' এই কটি শব্দোচ্চারণ করে প্রতিটি ব্রাহ্মণ পাদ্যার্ঘ নিবেদন করেন এবং যাঁর বংশধরেরা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ। এইসব তথাকথিত সমাজ-সংস্কারকরা যদি পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে বিশ্বাস করেন তাহলে তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে আমার সম্প্রদায় বহু অতীত কীর্তির অধিকারী হওয়া ছাড়াও শতাব্দীব্যাপী অর্ধেক ভারতবর্ষকে শাসন করে এসেছে। আমার জাতকে বাদ দিলে আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে ? শুধু বাংলাদেশেই আমাদের জাত থেকে পেয়েছে তার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক, শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারককে। এই জাত থেকেই ভারতবর্ষ পেয়েছে তার শ্রেষ্ঠ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের। আমাদের নিজেদের ইতিহাস এই নিন্দুকদের যৎসামান্য জানা উচিত ছিল, তিনবর্ণের ইতিহাস পাঠ করে জানা উচিত ছিল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সন্ন্যাসী হবার সমান অধিকার আছে। ত্রৈবর্ণিকদের রয়েছে বেদ অধ্যয়নের সমান অধিকার। সব কথাই প্রসঙ্গতঃ বল্লাম, আমাকে যদি তারা শূদ্র বলেন তাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না ! আমার পূর্বপুরুষরা দরিদ্রদের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন তার সামান্য ক্ষতিপূরণ এতে হবে। আমি অন্ত্যজ (পারিয়া) হলেও অধিক আনন্দিত হব, কারণ আমি এমন একজন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের শিষ্য যে ব্যক্তি এক অন্ত্যজের বাসগৃহ পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। সে অবশ্য তাঁকে বাধা দিয়েছিল, এই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে তার ঘর পরিষ্কার করতে সে কি করে দেবে ! তখন সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ গভীর রাতে শয্যা ত্যাগ করে তার ঘরে চুপি চুপি প্রবেশ করলেন, তার শৌচাগার পরিষ্কার করে লম্বা চুল দিয়ে জায়গাটি মুছে দিলেন। দিনের পর দিন তিনি এই কাজ করতে লাগলেন। যাতে তিনি সর্বজনের সেবক হতে পারেন। আমি সেই মহাপুরুষের চরণ শিরোধার্য করেছি, তিনি আমার আদর্শ পুরুষ; তাঁর জীবন আমি অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। সর্বজনের সেবা করেই একজন হিন্দু নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করতে চায়। এভাবেই ঐ হিন্দু ভদ্রলোকটি তার দেশের জনসাধারণের উন্নতি বিধান করতে পারেন, কোন বৈদেশিক প্রভাবের আশায় পথ চেয়ে নয়।

কুড়ি বছরের পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাকে সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি তার নিজের বন্ধুকে বিদেশে উপবাসী রাখতে কুণ্ঠিত হন না, শুধু এই কারণে যে বন্ধুটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং যেহেতু তার ধারণা, বন্ধুটি তার অর্থোপার্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। আর একটি দৃষ্টান্তও মনে পড়ছে, তা হল প্রকৃত, প্রাচীনপন্থী

হিন্দুধর্মই এ দেশের পক্ষে কার্যকরী হবে। আমাদের সমাজ সংস্কারকদের একজনও সেরকম জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত দিন, যে জীবন এমনকি একজন পতিত পারিয়াকেও সেবা করতে প্রস্তুত—তাহলেই আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে শিক্ষা নেব—তার আগে নয়। এক আউন্স পরিমাণ কাজ করা কুড়ি হাজার টন বড় কথা বলার সমতুল্য।

এখন আমি মাদ্রাজের সমাজ-সংস্কারক সংগঠনগুলির বিষয়ে বলবো। আমাকে তাঁরা অত্যন্ত সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, অনেক আন্তরিক কথাও বলেছেন। আমাকে বুঝিয়েছেন যে বাংলা ও মাদ্রাজের সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমি তাঁদের কথা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। আপনাদের অনেকের স্মরণে আছে, আমি বহুবার বলেছি যে মাদ্রাজের বর্তমান পরিবেশটি অত্যন্ত চমৎকার।

বাংলাদেশের মত আপনারা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার খেলায় মেতে ওঠেন নি। বরাবরই এখানে ধীর স্থির অগ্রগতি অব্যাহত আছে। এখানে বিকাশ হয়েছে, প্রতিক্রিয়া নয়। বাংলাদেশে অনেক বিষয়ে কিছুটা পুনরুত্থান হয়েছে, কিন্তু মাদ্রাজে পুনরুত্থান হয়নি, হয়েছে স্বাভাবিক বিকাশ। সেজন্য সমাজ-সংস্কারকরা দুদেশের জনসাধারণের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশিত করেছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু একটি পার্থক্য রয়েছে যেটি তাদের বোধগম্য নয়। এখানকার কিছু সংগঠন আমাকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করতে চান বলে আমার আশঙ্কা। তাদের সে প্রচেষ্টা অত্যন্ত অদ্ভুত। যে লোক জীবনের চোদ্দ বছর অনাহারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, আগামী দিনের আহার নিদ্রার সঙ্কুলান কিভাবে হবে তা জেনে না, তাকে এত সহজে কাবু করা যাবে না। বিদেশে শূন্যাঙ্কের তিরিশ ডিগ্রী নীচের তাপমাত্রায় যে লোক প্রায় বস্ত্রহীন হয়ে পরবর্তী আহার জুটবে কিনা না জেনেও টিঁকে থেকেছে, ভারতবর্ষে তাকে অত সহজে বশ মানানো যাবে না। প্রাথমিকভাবে এই কথাই আমি তাদের জানাচ্ছি—আমার যৎসামান্য ইচ্ছাশক্তি আছে। কিছু অভিজ্ঞতাও রয়েছে। সমস্ত বিশ্বের প্রতি আমার কিছু বাণী রয়েছে—যা আমি নির্ভয়ে, ভবিষ্যৎ চিন্তা না করেই প্রচার করবো। সমাজ সংস্কারকদের বলি, আমি তাদের যে কোন জনের তুলনায় অনেক বড় সংস্কারক। তারা শুধু অল্পবিস্তর সংস্কার করতে চান। আমি চাই আগাগোড়া সংস্কার করতে। আমাদের পার্থক্য প্রণালীগত। তাদের প্রণালী ধ্বংসের, আমার গঠনের। আমি পুনর্গঠনে বিশ্বাসী নই, বিকাশে বিশ্বাসী। নিজেকে ঈশ্বরের সমগোত্রীয় করে সমাজকে হুকুম দেবো—"তোমরা এই পথ অনুসরণ করবে, অন্যটি নয়"—সে সাহস আমার নেই। রামের সেতুবন্ধনে যে ছোট কাঠবিড়ালী তার নির্দিষ্ট পরিমাণ বালি বয়ে এনেছিল আমি শুধু তারই মত হতে চাই। এই হল আমার ভূমিকা। এই চমৎকার জাতীয় যন্ত্রটি যুগযুগ ধরে কাজ করে চলেছে, এই মনোহর জাতীয় জীবনপ্রবাহ আমাদের সামনে বয়ে চলেছে। কে জানে, কার বলার সাহস আছে এই প্রবাহ শুভ কি না, অথবা তা কি ভাবে এগোবে? হাজার হাজার ঘটনাপ্রবাহ এর চারপাশে জমায়েত হয়ে একে এক বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে, তার ফলে এ ধারা কখনও হয়েছে ক্ষীণ, কখনও বা খরস্রোতা। এর গতি নির্দেশ করার ক্ষমতা কার?

গীতার ভাষায়, নিষ্কাম কর্মেই আমাদের একমাত্র অধিকার। জাতীয় জীবনে যে রসদ প্রয়োজন তা দিতে হবে, কিন্তু সে বেড়ে উঠবে আপন নিয়মে। বিকাশের পথ তাকে কেউ বাৎলাতে পারে না। আমাদের সমাজের গলদ অনেক, কিন্তু সে গলদ অন্য সমাজেও রয়েছে। এখানকার মাটি পতিহারাদের অশ্রুতে সিক্ত আর পশ্চিমের বাতাস অবিবাহিতাদের দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ। এখানে দারিদ্র্যই জীবনের প্রধান অন্তরায়, সেখানে ভোগবিলাসের ক্লান্ত জীবনই জাতির প্রধান বাধা। এখানকার মানুষ খাদ্যের অভাবে আত্মহত্যা করতে চায়, তারা আত্মহত্যা করতে চায় খাদ্যের প্রাচুর্যের জন্য। গলদ সর্বত্রই—এটা পুরনো বাত-ব্যাধির মতো। পা থেকে এটাকে সরাও, এটা মাথায় যাবে। সেখান থেকে সরাও, এটা অন্য কোথাও যাবে। প্রশ্ন হল এটাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়িয়ে বেড়ানো এবং এটাই যথেষ্ট। ছেলেরা, গলদ দূর করার চেষ্টাটা সঠিক পথ নয়। আমাদের দর্শন এই শিক্ষা দেয় যে ভালো আর মন্দ চিরন্তনভাবে জড়িত, একই টাকার এপিঠ ওপিট। একটি থাকলে অন্যটিও থাকবে; সমুদ্রের এক জায়গায় একটি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, অন্যত্র একটি গহ্বর তৈরী হয়। না, সব জীবনই খারাপ নয়। অন্য কাউকে হত্যা না করে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, কোনো একজনকে বঞ্চিত না করে এককণা খাদ্যও গ্রহণ করা যায় না। এই হল নিয়ম, এই হল দর্শন। সুতরাং একমাত্র এই ব্যাপারটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি যে মন্দের বিরুদ্ধে কাজকর্ম হল আত্মবাদীর চেয়ে বেশি বাস্তব। আমরা যতোই বড়ো বড়ো কথা বলি না কেন, মন্দই বাস্তবের চেয়ে বড়ো শিক্ষাদাতা। এই চিন্তাই সবার আগে মন্দের বিরুদ্ধে কাজ করে; আমাদের শান্ত করে, আমাদের রক্ত থেকে উন্মত্ততা দূর করে। বিশ্বের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে যেখানেই উন্মত্তভাবে সংস্কার হয়েছে, ফলশ্রুতি হিসাবে সেখানেই তারা তাদের লক্ষ্যকেই পরাজিত করেছে। আমেরিকায় দাসপ্রথা উচ্ছেদের আগে অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো অভ্যুত্থানের কথা ভাবাই যায় না। তোমরা সবাই এ সম্পর্কে জানো। আর এর ফল কি? এই প্রথা নিষিদ্ধ করার আগেকার সময়ের চেয়ে দাসদের অবস্থা আজ একশো গুণ খারাপ। নিষিদ্ধ করার আগে গরিব নিগ্রোরা কারো সম্পত্তি ছিল এবং সম্পত্তি হিসাবে তাদের যাতে অবনতি না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হত।

আজ তারা কারো সম্পত্তি নয়। তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। সামান্যতম অজুহাতে তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তাদের গুলি করে মারলে খুনীর কোন বিচার নেই, কারণ তারা যে নিগ্রো, মানুষও নয়, জন্তুও নয়। আইনের মাধ্যমেই হোক অথবা আবেগ দিয়েই হোক, জোর করে অশুভকে বিতাড়িত করার এই হল ফল। প্রতিটি আবেগ আন্দোলন আসে যতই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে ইতিহাস এরকম সাক্ষ্যই দেবে। আমি তা দেখেছি। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে সে শিক্ষা দিয়েছে।

সুতরাং এইসব সমালোচক সংস্কার কোনটিতেই আমি যোগ দিতে পারবো না।

দোষারোপ করে কি লাভ? প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় কলুষ রয়েছে, একথা প্রত্যেকে জানে। এযুগের প্রতিটি শিশুও এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাদের মধ্যে একজন বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে হিন্দু সমাজের ক্ষতিকর বিষয়গুলি সম্বন্ধে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারে। প্রতিটি অশিক্ষিত বিদেশী বিশ্ব-পরিব্রাজক চলন্ত রেলের কামরা থেকে দ্রুত সরে যাওয়া ভারতবর্ষের রূপ দেখে পরে ভারতবর্ষের মারাত্মক দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে অতি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেয়।

আমি স্বীকার করছি যে অশুভের অস্তিত্ব আছে। মন্দ কি তা প্রত্যেকেই দর্শাতে পারে কিন্তু মানবজাতির প্রকৃত হিতৈষী তিনি যিনি তার থেকে বিপদমুক্তির পথ দেখান। ব্যাপারটা ডুবন্ত বালক আর দার্শনিকের গল্পের মত, উপদেশরত দার্শনিককে ডুবন্ত ছেলেটি চীৎকার করে বলেছিল—"আগে আমাকে জল থেকে উদ্ধার করুন—"। একইভাবে ভারতবাসীরা আর্তনাদ করছে, "অনেক ভাষণ শুনেছি, অনেক সংগঠন দেখেছি, অনেক সারগর্ভ রচনা পড়েছি, কিন্তু সে লোক কোথায় যে হাত বাড়িয়ে আমাদের টেনে তুলবে? সে লোক কোথায় যার আমাদের প্রতি দরদ রয়েছে?" হ্যাঁ, সেই মানুষটিরই প্রয়োজন। এখানেই আমার সঙ্গে এইসব পুনর্বিন্যাস আন্দোলনের বিরাট পার্থক্য। একশ বছর ধরে তারা এখানে রয়েছে। গালমন্দ দিয়ে সাহিত্য রচনা ছাড়া কোন ভালো কাজ করা হয়েছে? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তারা এখানে না এলেই ভালো হত! প্রাচীনপন্থীদের তারা সমালোচনা করেছে, দোষ দিয়েছে, গালাগালি করেছে, শেষে প্রাচীনপন্থীরাও তাদের ধরন রপ্ত করে একইভাবে ঐসব গালমন্দের প্রত্যুত্তর দিয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ভাষায় এমন সব জিনিস লেখা হয়েছে যা জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক।

এই কি সংস্কার সাধন? এই কি জাতিকে গৌরবের পথে চালিত করা? এ কার দোষ?

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাবার আছে। ভারতবাসী চিরকাল নৃপতি শাসিত হয়ে এসেছে। রাজরা আমাদের আইনকানুন তৈরী করেছেন। এখন তারা বিগত, এবং এমন কেউ নেই যে এগোতে পারে। সরকার সাহস পায় না, জনমত অনুযায়ী সরকারকে পথ তৈরী করতে হয়। জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের উপযোগী সুস্থ সবল জনমত গড়ে তুলতে অনেক দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। এর মাঝখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সামাজিক সংস্কারের সম্পূর্ণ সমস্যাটি তাহলে একটি কেন্দ্রে গিয়ে দাঁড়ালো: যারা সংস্কারক তারা কোথায়? আগে তাদের তৈরী করুন। সে লোক কোথায়? সংখ্যা লঘিষ্ঠের অত্যাচার পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য অত্যাচার। যারা মনে করে কয়েকটি বিষয়ে দোষযুক্ত সেরকম মুষ্টিমেয় কয়েকজন একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তার চেয়ে সমগ্র জাতই এগিয়ে চলুক না কেন? সর্বপ্রথম জাতিকে শিক্ষিত করুন, নিজের আইন-বিভাগ তৈরী করুন, আইন আপনা থেকেই আসবে। প্রথমে ক্ষমতা সৃষ্টি করুন, যে ক্ষমতার অনুমোদনে আইন তৈরী হবে।

রাজারা চলে গেছেন, নতুন অনুমোদন কোথায়, কোথায় জনসাধারণের নতুন ক্ষমতা? তাকে গড়ে তুলুন। সুতরাং সমাজ-সংস্কারের জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য হল

লোককে শিক্ষিত করা এবং যতক্ষণ সে সময় না আসছে ততক্ষণ আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। বিগত শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার নিয়ে যেসব আন্দোলন হয়েছে তার বেশীর ভাগই পোশাকী। এরকম প্রত্যেকটি সংস্কার-প্রচেষ্টা সমাজের প্রথম দুটি শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীকে স্পর্শ করেনি। বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গটি শতকরা সত্তরভাগ ভারতীয় মহিলাদের জন্য নয়, এধরনের সমস্ত বিষয় উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবাসীদের জন্য, অর্থাৎ যারা সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে শিক্ষিত হয়েছে। তাদের নিজ বাসগৃহ কলুষমুক্ত করার সবরকম চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু তাহলে তো পুনর্বিন্যাস হল না। আপনাকে বিষয়টির ভিত্তিমূলে উপনীত হতে হবে, মূল স্পর্শ করতে হবে। আমি একেই বলি মৌলিক সংস্কার। সেই মূলে প্রেরণার আগুন জ্বালান, তার ঊর্ধ্বমুখী শিখা ভারতীয় জাতকে তৈরী করবে। এই সমস্যার সমাধান খুব সহজ নয়, কারণ সমস্যাটি বিশাল আকৃতির। তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, বহু শতাব্দী ধরে সর্বজনবিদিত।

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ অজ্ঞেয়বাদ নিয়ে আলোচনা করা এখন একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না যে আজকের এই অধঃপতন বৌদ্ধধর্মেরই ফলশ্রুতি। এ জিনিস আমরা বৌদ্ধধর্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। যাঁরা কোনদিন বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতনের ইতিহাস পড়েননি তাঁদের লেখা বইতে আপনারা পড়েন যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার সম্ভব হয়েছিল তার চমৎকার নীতিশাস্ত্র ও গৌতম বুদ্ধের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে। ভগবান বুদ্ধের প্রতি আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে কিন্তু শুনে রাখুন, বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য তাঁর নীতিশাস্ত্র ও গৌতম বুদ্ধের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অবদানের তুলনায় তৎকালে নির্মিত বৌদ্ধধর্মগুলি, তাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, এবং যে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হত তাদের অবদান অনেক বেশী। এভাবেই বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি হয়েছিল। নিজগৃহের যেসব ছোট যজ্ঞকুণ্ডে এতদিন ভারতীয়রা তাদের আহুতি নিবেদন করে এসেছে এই জাঁকাল মঠগুলি এবং তাদের চোখধাঁধানো অনুষ্ঠানের কাছে তারা অতি তুচ্ছ প্রমাণিত হল। কিন্তু পরে সমস্ত বিষয়টি অধঃপতিত হল।

এগুলি এত ব্যাপক দুর্নীতির পীঠস্থান হল যা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আমি উচ্চারণ করতে পারবো না। যাঁরা এ ব্যাপারে জানতে চান, তারা ভাস্কর্যখচিত দক্ষিণ-ভারতের সেই সব বিশাল মন্দিরগুলি দেখলে সামান্য ধারণা করতে পারবেন। এইগুলিই আমরা বৌদ্ধধর্মের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

সে সময় সেই মহান সংস্কারক শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুগামীদের আবির্ভাব হল। তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এই বহু শতাব্দী যাবৎ ধীরে ধীরে ভারতীয় জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের সুপ্রাচীন পবিত্র পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলেছে। এই সব সংস্কারকরা অশুভ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন; কিন্তু তাঁরা কখনও দোষারোপ করেননি। তাঁরা কখনও বলেননি—"তোমাদের যা আছে তা সবই ভ্রান্ত, এবং এগুলি তোমরা বর্জন করো।" এভাবে কখনই হয় না। আমার বন্ধু ডঃ ব্যারোসের (Barrowz) একটি লেখায় পড়লাম যে তিনশ বছরের মধ্যে

খ্রীষ্টধর্ম রোমান ও গ্রীক ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত হতে পেরেছে। যিনি ইউরোপ, গ্রীস ও রোম দেখেছেন তিনি একথা বলতে পারেন না।

রোমান এবং গ্রীক ধর্মের প্রভাব সেখানে সর্বত্র রয়েছে এমন কি প্রোটেস্টান্ট দেশ-গুলিতেও—শুধু নাম পাল্টেছে—পুরোনো দেবতাদের নতুনভাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। তারা তাদের নামগুলি পাল্টেছেন—দেবীরা হয়েছেন মেরীবৃন্দ, দেবতারা হয়েছেন সন্ত, এবং আচার অনুষ্ঠানগুলি নতুনভাবে করা হয়েছে, এমন কি Pontifen Maseimus এই পুরোনো উপাধিটিও রয়ে গেছে। সুতরাং আকস্মিক পরিবর্তন অসম্ভব, শঙ্করাচার্য তা জানতেন। জানতেন রামানুজও। তাঁদের সামনে একটি পথই উন্মুক্ত ছিল, তাহল বর্তমান ধর্মকে সর্বোচ্চ আদর্শে শিখরে উন্নীত করা। অন্য উপায়টি অবলম্বন করলে তাঁরা ভণ্ড বলে পরিগণিত হতেন। কারণ তাঁদের ধর্মের মূলতত্ত্ব হল বিবর্তন, যাতে বলা হয় যে এধরনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি অতিক্রম করে আত্মা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায়। সুতরাং এই পর্যায়গুলি প্রয়োজনীয় এবং সাহায্যকারী। তাদের অভিযুক্ত করার সাহস কার? মূর্তিপূজা নিরর্থক, একথা বলা গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন প্রত্যেকেই একথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন। আমিও একবার এরকমই ভেবেছিলাম। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে এমন এক মানুষের চরণপ্রান্তে বসে আমাকে শিক্ষা নিতে হয়েছিল যিনি বিগ্রহের মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছু উপলব্ধি করেছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথাই বলছি। মূর্তিপূজা যদি এমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদের জন্ম দেয় তাহলে আপনারা কোনটিকে গ্রহণ করবেন—সংস্কারকদের পথ না কি যে কোন সংখ্যক বিগ্রহ? আরও অধিক সংখ্যায় মূর্তিপূজা করুন, মূর্তিপূজার মাধ্যমে যদি কয়েকজন রামকৃষ্ণ পরমহংস তৈরী হয়, ঈশ্বর আপনাদের প্রচেষ্টাকে অধিক উৎসাহিত করুন! ঐ রকম মহৎ চরিত্রের লোক যে কোন উপায়ে সৃষ্টি করুন। তবুও মূর্তিপূজা নিন্দিত হয়ে থাকে। কেন? কেউ জানে না। কয়েক 'শ বছর আগে একজন ইহুদীবংশজাত ব্যক্তি মূর্তিপূজার নিন্দা করেছিলেন, সেজন্য? আসল কথা নিজের বিগ্রহটি ছাড়া অন্য সকলের বিগ্রহকেই তিনি নিন্দা করেছেন। সেই ইহুদী বলেছিলেন যে যদি কোন সুন্দর মূর্তিতে অথবা রূপকের মাধ্যমে যদি ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করা হয়, তা হলে তা অতিশয় মন্দ; তা করা পাপ। যদি তাঁকে একটি সিন্দুক হিসাবে কল্পনা করে দুপাশে দুটি দেবদূত বসিয়ে উপরে ভাসমান মেঘ চিত্রিত করা হয়, তাহলে তা হবে সবচেয়ে পবিত্র বস্তু। ঈশ্বর যদি ঘুঘুর রূপে অবতীর্ণ হন তাহলে তা পবিত্র বিষয়, কিন্তু গোরূপ পরিগ্রহ করলেই তাহবে বিধর্মী কুসংস্কার। সুতরাং তার নিন্দা কর। এই হল পৃথিবীর রীতি। এজন্যই কবি বলেছেন—"মরণশীল মানুষ কি মূর্খ'!" একে অপরের চোখে তাকানো কত কঠিন, এই হল মানবজাতির সর্বনাশা দিক। ঈর্ষা, ঘৃণা, দ্বন্দ্বের মূল এইখানেই নিহিত। বালকরা, গোঁফওয়ালা নাবালকরা, যারা কখনও মাদ্রাজের বাইরে যায়নি তারা আজ উঠে দাঁড়িয়ে হাজার ঐতিহ্যমণ্ডিত লক্ষ লক্ষ জনগণকে নীতি নির্দেশ করছে! তোমাদের লজ্জা হয় না? এধরনের মিথ্যাচার থেকে বিরত হও, প্রথমে নিজের শিক্ষা গ্রহণ করো। শ্রদ্ধাহীন বালকরা,

যেহেতু কাগজে দু-লাইন হিজিবিজি কাটতে পারো এবং কতিপয় মূর্খকে দিয়ে তা ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারো, তাই মনে ভেবেছো তোমরা পৃথিবীর শিক্ষাদাতা, মনে ভেবেছো তোমরাই ভারতবর্ষের জনমত। তাই কি? মাদ্রাজের সমাজ-সংস্কারকদের বলি, তাঁদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমার আছে। তাঁদের উদারচিত্তের জন্য তাঁদের দেশপ্রেমের জন্য, দরিদ্র নিপীড়িতদের প্রতি তাঁদের ভালোবাসার জন্য, আমি তাঁদের স্নেহ করি। কিন্তু ভায়ের ভালোবাসা দিয়েই আমি তাঁদের বলবো যে তাঁদের পদ্ধতি সঠিক নয়। একশ বছর ধরে এভাবেই চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা ব্যর্থ হয়েছে। আসুন, আমরা কোন নতুন পদ্ধতিকে কাজে লাগাই।

ভারতবর্ষে কি কখনও সমাজ সংস্কারকের অভাব হয়েছে? আপনারা কি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েন? রামানুজ কে ছিলেন? কে ছিলেন শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, কবির, দাদু? এই মহান ধর্মপ্রচারকেরা, সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এই নক্ষত্রমণ্ডলী, যাঁরা একের পর এক এসেছেন, এঁরা কারা? রামানুজ পতিতদের অবস্থা অনুভব করেননি? এখন কি অস্পৃশ্যদেরও (প্যারিয়াদের) নিজের গোষ্ঠিভুক্ত করতে তিনি আজীবন চেষ্টা করেননি? মুসলমানদেরও দলভুক্ত করতে তিনি চেষ্টা করেননি? হিন্দু-মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনা করে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাননি নানক? এঁরা সবাই চেষ্টা করেছেন এবং এঁদের কাজ এখনও চলেছে। পার্থক্য হল এই যে আজকের সংস্কারকদের মত বড়াই তাঁদের ছিল না; আজকের সংস্কারকদের মত তাঁদের মুখ থেকে শাপবাক্য শোনা যায়নি, তাঁদের ওষ্ঠ থেকে আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে। তাঁরা কখনও নিন্দা করেননি। তাঁরা লোককে বলতেন যে জাতি সবসময় বিকশিত হবে। ফিরে তাকিয়ে তাঁরা বলতেন "হিন্দুগণ, তোমরা যা করেছ তা ভালো, কিন্তু আমার ভায়েরা, এসো আমরা আরো ভালো কিছু করি।" তাঁরা কখনই বলেন নি, "তোমরা অসৎ ছিলে, এবার এসো ভালো হও।" তাঁরা বলতেন, "তোমরা ভালোই ছিলে, কিন্তু এসো আরও ভালো হওয়া যাক।" এর ফলে এক বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ীই আমরা বেড়ে উঠব। বিদেশী সমাজ আমাদের উপর যে কর্মপন্থা চাপিয়ে দিয়েছে তা অনুসরণ করা বৃথা। এটা অসম্ভব। ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন, এটা অসম্ভব, আমাদের এভাবে দুমড়ে-মুচড়ে নিপীড়িত করেও অন্যজাতির গঠনে গড়ে তোলা যাবে না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচারবিধিকে আমি নিন্দা করি না, তাদের পক্ষে সেগুলি মঙ্গলকর, আমাদের পক্ষে নয়। তাদের পক্ষে যা মাংস আমাদের ক্ষেত্রে তা বিষও হতে পারে। প্রথমেই এই শিক্ষা নিতে হবে। অন্য বিজ্ঞান, অন্য আচারবিধি, অন্য ঐতিহ্য নিয়েই তৈরী হয়েছে তাদের আজকের প্রণালী। আমরা আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে, হাজার বছরের কর্ম সম্বল করে, খুব স্বাভাবিক কারণেই, আমাদের পরিচিত বাঁকগুলিকেই অনুসরণ করতে পারি, পরিচিত আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে দৌড়তে পারি; এবং আমাদের তাই করতে হবে। আমার পরিকল্পনা তাহলে কি? আমার পরিকল্পনা হল আমাদের সুপ্রাচীন মহৎ শিক্ষকদের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা। আমি তাঁদের রচনা পাঠ করেছি, এবং তা থেকে তাঁদের

অনুসৃত কর্মপদ্ধতি আমি জানতে পেরেছি। তাঁরা ছিলেন মহৎ সমাজস্রষ্টা। তাঁরা ছিলেন মহান শক্তিদাতা, পবিত্রতা ও জীবনের উৎস। তাঁরা অতি চমৎকার কাজ করেছেন। আমাদেরও অনুরূপ চমৎকার কাজ করতে হবে। পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, সুতরাং কর্মপদ্ধতিগুলির সামান্য রদবদল প্রয়োজন, তাহলেই হবে। দেখলাম প্রত্যেক ব্যক্তির মত, প্রতিটি জাতির জীবনেও একটি মূল বিষয়বস্তু রয়েছে, যা হল তার কেন্দ্রবিন্দু। এটিই হল সেই মূল সুর যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সুরগুলি মিলিত হয়ে একটি ঐকতান সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক ক্ষমতাই কোন দেশের সঞ্জীবনী সুধা, যেমন ইংল্যাণ্ডে, আবার সংস্কৃতিই কোনদেশের প্রয়োজনীয় শক্তি। ধর্মীয় জীবনই ভারতবর্ষের কেন্দ্রবিন্দু, জাতীয় জীবনের সমস্ত সঙ্গীত প্রবাহের মূল সুর এটি। কোন জাতি যদি তার প্রাণ শক্তিকে বর্জন করতে চায়, বহু শতাব্দী ধরে যে পথ তার নিজস্ব হয়ে গেছে—তা যদি সে ত্যাগ করতে চায় এবং তা করতে সফল হয় তাহলে সে জাতির মৃত্যু হয়। সুতরাং নিজেদের ধর্মকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যদি হয় রাজনীতি, অথবা সমাজ কিংবা অন্য যে কোন কিছুকে নিজের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে, জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে আপনারা বিলুপ্ত হবেন। এই পরিণতি ঠেকাতে আপনাদের সমস্ত কিছুকে এই ধর্মীয় শক্তির মাধ্যমে কাজে লাগাতে হবে। আপনাদের ধর্মের মেরুদণ্ডের মধ্যে যেন আপনাদের প্রতিটি স্নায়ু কম্পিত হয়। আমি লক্ষ্য করেছি সে সমাজ জীবনে ধর্মের প্রকৃত প্রতিক্রিয়া কি তা না ব্যাখ্যা করে আমেরিকানদের এমনকি ধর্মকথাও শোনানো যায় না।

বেদ ও কি ভাবে চমৎকার রাজনৈতিক পরিবর্তন আনবে তা ব্যাখ্যা না করে আমি ইংল্যাণ্ডে ধর্মপ্রচার করতে পারিনি। সেরকমই ভারতবর্ষে সমাজ-সংস্কার করতে হলে দেখাতে হবে নতুন ব্যবস্থা কতটা বেশী আধ্যাত্মিক জীবন সৃষ্টি করবে। রাজনীতি প্রচার করতে ব্যাখ্যা করতে হবে তা জাতির প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিকতা কতটা উন্নত করতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে তার ভালো-মন্দ বেছে নিতে হবে—প্রত্যেক জাতিকেও তাই। বহু যুগ আগে আমরা আমাদের পথ বেছে নিয়েছি এবং আমাদের তা মেনে চলতেই হবে। তাছাড়া সে মনোনয়ন খারাপ হয়নি। বস্তুর কথা না ভেবে আত্মার কথা ভাবা, মানুষের কথা না ভেবে ঈশ্বরের কথা ভাবা কি এ পৃথিবীতে খুব খারাপ? পরজগতে অগাধ বিশ্বাস, ইহজগতের প্রতি অসীম ঘৃণা, ত্যাগের অপার ক্ষমতা, ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস, অমর আত্মায় বিশ্বাস, এসবই আপনাদের মধ্যে রয়েছে। কেউ যদি এগুলিকে ত্যাগ করতে পারেন তাহলে আমি তাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা পারবেন না। বস্তুবাদী হয়ে, কয়েকমাস বস্তুবাদের কথা বলে আপনারা আমার ঘাড়ে নতুন মতবাদের বোঝা চাপানোর চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। আপনাদের হাত যদি ধরি, তাহলে পুনর্বার অদ্বিতীয় ভগবৎবিশ্বাসীই হবেন। নিজের প্রকৃতি কি করে পরিবর্তিত করবেন?

সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতিটি উন্নয়নের জন্য ধর্মক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রয়োজন। সামাজিক বা রাজনৈতিক মতবাদের বন্যায় ভাসানোর আগে ভারতবর্ষের মাটি

আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় প্লাবিত করুন। প্রথমেই আমাদের যে দিকে মনোনিবেশ করতে হবে তা হল যে সুন্দর সত্যগুলি পুরাণ, উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে নিহিত রয়েছে তাদের পাঠোদ্ধার করতে হবে, উদ্ধার করতে হবে সর্ব মন্দির থেকে, বন থেকে, এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর কবল থেকে। তাদের সারা ভারতবর্ষের মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে আগুনের শিখার মত এ সত্যগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকায়, সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এগুলির কথা প্রত্যেকের জানা উচিত, কারণ বলা হয়েছে "এ কথা প্রথমে শ্রবণ করতে হবে, তারপর চিন্তা করতে হবে, পরিশেষে ধ্যান করতে হবে।" প্রথমে জনগণকে সে বাণী শ্রবণ করতে দিন এবং ধর্মগ্রন্থের এই মহান কথামৃত শ্রবণে যে ব্যক্তি তাদের সাহায্য করবেন আজকের যুগে তিনি শ্রেষ্ঠ কর্মের অধিকারী হবেন। ব্যাসসূত্রে বলা হয়েছে: "কলিযুগের মাত্র একটি কর্মই অবশিষ্ট থাকে। কঠোর তপস্যা ও ত্যাগ এখন আর ফলপ্রসূ নয়। একটিই কর্ম থাকে, তা হল দানকর্ম।" দানের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা দানই শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় হল অনুশাসনবর্জিত জ্ঞান, তৃতীয় জীবনদান, চতুর্থ অন্নদান। এই মহান দাতা জাতিটিকে লক্ষ্য করুন, দেখুন, এই দরিদ্র দেশে কি বিপুল পরিমাণ দান করা হয়, একবার ভাবুন এখানে এদেশের আতিথেয়তার কথা। দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদে আপ্যায়িত হয়ে এখানকার মানুষ উত্তর থেকে দক্ষিণে পরিভ্রমণ করে, প্রত্যেকে তার সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। এক টুকরো রুটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কোন ভিক্ষুক উপবাসী থাকে না।

এই দাতা দেশে আসুন আমরা প্রথমে দান, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সংমিশ্রণের শক্তি অর্জন করি। সে সংমিশ্রণকে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, সারা পৃথিবীতে একে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এই ছিল চিরকালীন প্রথা। যারা আপনাদের বলেছেন যে ভারতীয় আধ্যাত্মচিন্তা কখনও ভারতবর্ষের বাইরে প্রচারিত হয়নি, যারা বলছেন সন্ন্যাসীরূপে আমিই প্রথম বিদেশে ধর্মপ্রচার করেছি তারা তাদের নিজের জাতির ইতিহাস জানেন না। এ ঘটনা বারম্বার ঘটেছে। যখনই বিশ্বের প্রয়োজন হয়েছে তখন আধ্যাত্মিকতার এই চিরন্তন প্লাবন সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করেছে। দামামা বাজিয়ে, বিশাল মিছিল করে রাজনৈতিক জ্ঞান দান করা চলে। যুদ্ধের ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক জ্ঞান দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিঃশব্দেই দেওয়া যায়, ঠিক যেমন একবিন্দু শিশির, দৃষ্টির আড়ালে, নিঃশব্দে ঝরে পড়ে, কিন্তু হাজার গোলাপ ফোটায় ভারতবর্ষ পৃথিবীকে বার বার এই উপহার দিয়েছে।

যখনই কোন বিরাট বিজয়ী শক্তি পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একত্রিত করে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছে, সে মুহূর্তে বিশ্বের সামগ্রিক অগ্রগতিতে ভারতবর্ষ তার নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তিটুকু দান করেছে। বুদ্ধ জন্মের বহুবৎসর আগে এ ঘটনা ঘটেছে। এখনও তার চিহ্ন পড়ে আছে চীনে, এশিয়া মাইনরে, মালেশিয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাণকেন্দ্রে। এরকমই ঘটেছিল, যেদিন সেই মহান গ্রীক বিজেতা যুক্ত করেছিলেন তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের চারটি কোণকে। তখনই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার স্রোত

উন্মুক্ত হয়েছিল এবং পাশ্চাত্যের গর্বিত সভ্যতা সেই প্লাবনের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সে সুযোগ আজ আবার এসেছে। ইংল্যাণ্ডের শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। ইংরাজ নির্মিত যোগাযোগব্যবস্থা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে বিস্তৃত। তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সৌজন্যে সমস্ত পৃথিবী অভূতপূর্ব ভাবে গ্রথিত হয়েছে। আজ এত সংখ্যক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি। মুহূর্তে ভারতবর্ষ জেগেছে, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত উজাড় করে দিয়েছে তার আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্ভার। এ দান ছড়িয়ে যাবে বিভিন্ন পথে, যতক্ষণ না সেগুলি পৃথিবীর শেষপ্রান্তে উপনীত হচ্ছে। আমি যে আমেরিকায় গিয়েছিলাম তার কৃতিত্ব আপনাদেরও নয় আমারও নয়, ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছিলেন, এবং আমারই মত আরও শত শত ব্যক্তিকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে তিনিই প্রেরণ করবেন। পৃথিবীর কোন শক্তি একে বাধা দিতে পারবে না। এটিও অবশ্যকর্তব্য। নিজ ধর্ম প্রচারে আপনাদের বাইরে যেতে হবে, সমস্ত জাতি, সমস্ত জনগণের কাছে প্রচার করতে হবে। এই হল আশু কর্তব্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচারের পর তার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা অথবা আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন জ্ঞান প্রচার করুন; কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হন, তাহলে পরিষ্কার জানিয়ে রাখি ভারতবর্ষে আপনাদের সে প্রচেষ্টা নিরর্থক, জনসাধারণের মনে তা কখনই দাগ কাটবে না। কিছুটা এ কারণেই বৌদ্ধধর্মের মত এক বিরাট ধর্ম-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।

সুতরাং, বন্ধুগণ, আমি স্থির করেছি ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে আমাদের ধর্মগ্রন্থের বাণী প্রচারের জন্য আমাদের নবযুবকদের প্রশিক্ষণ দেব। মানুষ চাই, মানুষের প্রয়োজন, আর সবই পাওয়া যাবে, কিন্তু শক্তসমর্থ, প্রকৃতই নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী তরুণের প্রয়োজন। এরকম একদল তরুণ পৃথিবীকে পরিবর্তিত করবে। সঙ্কল্প সমস্ত কিছুর তুলনায় শক্তিমান। সঙ্কল্পের কাছে সবকিছু পরাজিত হয়, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই এই শক্তি প্রদান করেন, পবিত্র, দৃঢ়সঙ্কল্প সর্বশক্তিমান। আপনারা কি তা বিশ্বাস করেন না? নিজধর্মের মহান সত্যগুলিকে সারা বিশ্বে প্রচার করুন, পৃথিবী তাদেরই অপেক্ষায় আছে। শত শতাব্দী ধরে জনসাধারণকে দৈন্যের বুলি শেখানো হয়েছে। তাদের যে কোন মূল্য নেই একথাই বোঝানো হয়েছে। সমস্ত বিশ্বের জনগণকে বলা হয়েছে যে তাঁরা মনুষ্যপদবাচ্য নয়। শতশতাব্দী ধরে তাদের এমন আতঙ্কিত করা হয়েছে যে আজ তারা প্রায় পশুতে পর্যবসিত হতে চলেছে। আত্মার কথা তাদের কখনই শুনতে দেওয়া হয়নি। আত্মার কথা তাদের শুনতে দিন—জানতে দিন যে অতি পতিতের অন্তরেও আত্মা বিরাজমান। এ আত্মার সৃষ্টি নেই, বিনাশ নেই। তারা জানুক সেই অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়, সম্পূর্ণ পবিত্র সর্বশক্তিমান, সর্বভূতে বিরাজমান আত্মাকে—তরবারি যাকে ভেদ করতে পারে না, অগ্নিশিখা যাকে দগ্ধ করতে পারে না, বাতাস যাকে শুকিয়ে ফেলতে পারে না। তাদের আত্মবিশ্বাসী হতে দিন, কারণ ইংরাজদের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্য কোথায়? তারা তাদের ধর্ম প্রচার করুক, কর্তব্যের কথা বলে বেড়াক। আমি সেই পার্থক্যের

কথা জানি। পার্থক্য এই যে ইংরাজের আত্মবিশ্বাস আছে, আপনাদের নেই। একজন ইংরাজ তার ইংরাজ রাজত্বের উপর আস্থাশীল, এবং সে সব কাজ করতে পারে। এই ক্ষমতাই তার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটায় এবং সে তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কাজ করতে পারে। আপনাদের শেখানো হয়েছে যে আপনারা কিছুই করতে পারেন না এবং তার ফলে প্রতিদিন আপনাদের অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। আমাদের শক্তির প্রয়োজন—সুতরাং আত্মবিশ্বাসী হোন। আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি বলেই অতীন্দ্রিয়বাদ ও গুপ্তবিদ্যার (থিয়সফি) মত মেরুদণ্ডহীন বিষয়গুলি আমাদের আস্থা অর্জন করেছে। এগুলির মধ্যে অনেক মহৎ সত্য লুকায়িত থাকতে পারে, কিন্তু এরা আমাদের ধ্বংস করেছে। স্নায়ুগুলিকে সতেজ করুন। আমাদের প্রয়োজন লৌহকঠিন পেশী এবং ইস্পাতনির্মিত স্নায়ু। বহুদিন অশ্রুপাত করেছি। আর কান্না নয়, নিজের পায়ে দাঁড়ান, মানুষ হোন। মানুষ গড়ার ধর্মই আমাদের প্রয়োজন। প্রয়োজন মানুষ গড়ার মতবাদ। দিকে দিকে মানুষ গড়ার শিক্ষা আমরা দিতে চাই। এই হল সত্যের পরীক্ষা—যা কিছু আপনাদের দৈহিক, আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে দুর্বল করছে—বিষবৎ তাকে বর্জন করুন। তার মধ্যে কোন প্রাণ নেই, তা কখনও সত্য হতে পারে না। সত্য শক্তিদায়ক, সত্যই পবিত্রতা, সত্যই সকল জ্ঞানের সমাহার। সত্যকে শক্তিদান করতে হবে, আলোক দান করতে হবে, উৎসাহদান করতে হবে। অতীন্দ্রিয়বাদগুলিতে যৎসামান্য সত্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণত এগুলি আমাদের দুর্বল করে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, সারাজীবন ধরে এ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, এবং আমার একমাত্র সিদ্ধান্ত হল এগুলি দুর্বলতা সৃষ্টি করে। সারা ভারতবর্ষ আমি ঘুরেছি, এখানকার প্রায় প্রতিটি গুহা অন্বেষণ করেছি, হিমালয়ে থেকেছি। এমন লোকদেরও জানি যাঁরা সারাজীবন ওখানে রয়েছেন। আমি আমার দেশকে ভালবাসি, আপনারা আরও দুর্বল হোন, আরও দীন হোন তা আমি দেখতে চাই না। তাই আপনাদের স্বার্থে, সত্যের স্বার্থে আমাকে চীৎকার করে বলতেই হবে "স্থির হও"! আমার জাতির এই অবমাননার বিরুদ্ধে আমি সোচ্চার হতে চাই। দুর্বলতার কারক এইসব অতীন্দ্রিয়বাদ বর্জন করুন, সবল হোন। উপনিষদের শক্তিদায়ক, অত্যুজ্জ্বল দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং এইসব অতীন্দ্রিয় দুর্বলতা সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করুন। এই দর্শন অবলম্বন করুন; সবচেয়ে বড় সত্যগুলি পৃথিবীর সহজতম বস্তু, আপনাদের জীবনের মতই সরল। উপনিষদের সত্যগুলি আপনাদের সামনেই রয়েছে। তাদের গ্রহণ করুন, তাদের নির্দিষ্ট পথে জীবন ধারণ করুন, ভারতবর্ষের মোক্ষ ত্বরান্বিত হবে। আর একটি কথা বলে শেষ করবো। অনেকে দেশপ্রেমের কথা বলেন। আমি দেশপ্রেমে বিশ্বাসী, এবং দেশপ্রেম সম্বন্ধে আমারও ব্যক্তিগত আদর্শ রয়েছে। মহৎ কীর্তির জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন, প্রথমত আন্তরিক অনুভব। বুদ্ধি অথবা যুক্তির মধ্যে এমন কি আছে? কয়েক পা এগিয়েই তা থেমে পড়ে। কিন্তু হৃদয়ের মধ্য দিয়েই অনুপ্রেরণা আসে, প্রেম সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দরজাও খুলে দেয়, প্রেমই হল বিশ্বের সমস্ত রহস্যের প্রবেশপথ। সুতরাং হে আমার আগামী দিনের সংস্কারকরা,

দেশপ্রেমীরা, আপনারা অনুভব করুন। আপনারা কি অনুভব করেন? আপনারা কি অনুভব করেন যে ঈশ্বরের এবং ঋষিদের লক্ষ লক্ষ লক্ষ উত্তরসূরিরা পশুর প্রতিবেশীতে পরিণত হয়েছে? আপনারা কি অনুভব করেন যে লক্ষ লক্ষ লোক আজ উপবাসী এবং বহু যুগ ধরে লক্ষ লোক উপবাস করে চলেছে? আপনারা কি অনুভব করেন যে অজ্ঞানতা অন্ধকার মেঘের মত সারা দেশের উপর বিস্তৃত হয়েছে? এর ফলে কি আপনাদের চিত্তবৈকল্য হয়? এ উপলব্ধি কি আপনাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এ উপলব্ধি কি আপনাদের শিরায় প্রবাহিত রক্তে মিশেছে, হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে কি সুর মিলিয়েছে? এ বোধ কি আপনাদের প্রায় উন্মাদ করেছে? ধ্বংসের দুর্দশার একমাত্র চিন্তা কি আপনাদের সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করেছে? আপনারা কি নিজেদের নাম, যশ, স্ত্রী, পুত্রকন্যা, সম্পত্তি এমন কি দেহ সম্বন্ধেও সবকিছু বিস্মৃত হয়েছেন? তা কি আপনারা করেছেন? এইটি হল দেশপ্রেমিক হবার প্রাথমিক পর্যায়। আপনারা অনেকেই জানেন যে ধর্ম সমাবেশে যোগ দিতে আমি আমেরিকায় যাইনি, কিন্তু এই সুবিশাল চিন্তা আমার অন্তর আত্মায় ছিল। বার বছর সারা ভারতবর্ষ ঘুরে আমি দেশবাসীদের জন্য কিছু করার কোন পথ পাইনি এবং সেজন্যই আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম। যারা তখন আমায় চিনতেন তাদের মধ্যে অনেকেই একথা জানেন। এই ধর্মসভার ব্যাপারে কার মাথাব্যথা ছিল? এখানে প্রতিদিন আমার নিকট আত্মীয়রা ক্রমশ দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছিলেন। তাদের জন্য কে চিন্তা করেছে? এই ছিল আমার প্রথম পদক্ষেপ। আপনারা তাহলে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু শূন্যগর্ভ কথায় শক্তিক্ষয় না করে আপনারা কি কোন বাস্তব সমাধান খুঁজে পেয়েছেন, কোন মুক্তির পথ? দোষারোপ না করে সাহায্য করতে, তাদের দুঃখদূরীকরণে কোন সান্ত্বনাবাক্য জোগাতে, এই জীবন্মৃত অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করতে কোন উপায় কি উদ্ভাবন করতে পেরেছেন?

সেটুকুই সব নয়। পর্বতসমান উঁচু বাধাগুলিকে অতিক্রম করার মনোবল কি আপনাদের আছে? সমস্ত পৃথিবী যদি তরবারি হাতে আপনাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখনও কি যা সঠিক মনে করেন সে কাজ করার সাহস আপনাদের থাকবে? যদি স্ত্রী পুত্রকন্যা আপনাদের বিরোধিতা করে, সমস্ত অর্থ ক্ষয় হয়, যশ সম্পত্তিহানি হয় তাহলেও কি সেই সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন? তখনও কি তাকে অনুসরণ করবেন, ধীর পদক্ষেপে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন? মহান রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলেছেন—"মুনিরা দোষই দিন অথবা প্রশংসাই করুন, ভাগ্যদেবী সঙ্গে থাকুন অথবা খুশী মত অন্য কোথাও যান, শমন আজই আসুক অথবা শতবর্ষ পরেই আসুক, সে ব্যক্তিই হল প্রকৃত দৃঢ়চেতা যে তার সত্য থেকে একবিন্দু বিচ্যুত হয় না।" সেই দৃঢ়তা কি আপনাদের আছে? এই তিনটি জিনিস যদি আপনাদের থাকে তাহলে আপনাদের প্রত্যেকেই অসাধ্য সাধন করতে পারেন। সংবাদপত্রে লেখার প্রয়োজন নেই, ভাষণ দিয়ে বেড়ানোর দরকার নেই, আপনাদের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হবে। যদি গুহায় বাস করেন তাহলেও আপনাদের চিন্তা গুহার পাথরের দেওয়াল ভেদ করে হয়ত শত শত বৎসর সমস্ত পৃথিবীতে হিল্লোলিত হবে যতক্ষণ না

কোন নির্দিষ্ট মস্তিষ্কে তা বাঁধা পড়ছে। চিন্তাশক্তি, একনিষ্ঠতা এবং উদ্দেশ্যের পবিত্রতা এতই ক্ষমতাসম্পন্ন। আমার আশঙ্কা, আমি আপনাদের কালক্ষেপ করছি, তার একটা কথা বলবো।

হে আমার স্বদেশবাসীরা, আমার বন্ধুরা, আমার সন্তানরা, এই জাতীয় তরণী লক্ষ লক্ষ আত্মাকে জীবনসমুদ্র পার করে চলেছে। বহু শত বছর ধরে এই তরণী জীবন-সমুদ্র পারাপার করছে এবং এরই সাহায্যে লক্ষ লক্ষ আত্মা চিরশান্তির জগত অমর্ত্য-লোকে পৌঁছেছে। কিন্তু আজ সম্ভবত আপনাদেরই দোষে এই তরণীর কিছু ক্ষতি হয়েছে, তাতে ছিদ্র দেখা গেছে, সেজন্য কি একে আপনারা অভিশাপ দেবেন? সে তরণী পৃথিবীর যে কোন বস্তুর তুলনায় অনেক বেশী কাজ করেছে। উঠে পড়ে আপনারা আজ তার নিন্দাবাদ করছেন, এটা কি সঙ্গত হচ্ছে; আমাদের এই জাতীয় তরণীতে, এই সমাজে যদি ছিদ্র থাকে, তাহলে আমরাই তো তার সন্তান, আসুন আমরা সেই ছিদ্রগুলি বন্ধ করি। আসুন হৃৎপিণ্ডের শোণিত ঝরিয়ে সানন্দে সে কাজ করি, যদি ব্যর্থ হই তাহলে মৃত্যুবরণ করি। বুদ্ধি দিয়ে আমরা একটি ছিদ্রনিরোধক তৈরী করে এই তরণীতে এঁটে দেবো কিন্তু কখনই তার অবমাননা করবো না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটিও কটূক্তি করবেন না। এর অতীত মহত্বের জন্য আমি এই সমাজকে ভালোবাসি। আপনাদের সকলকে আমি ভালোবাসি কারণ আপনারা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ আপনারা মহান পিতৃপুরুষদের সন্তান। কি করে আপনাদের অভিশাপ দেবো! কখনই না। সমস্ত আশীর্বাদ আপনাদের উপর ঝরে পড়ুক। হে আমার সন্তানগণ আমি তোমাদের কাছে এসেছি আমার সমস্ত পরিকল্পনার কথা জানাতে।

যদি তোমরা তা শোন তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু যদি তা না কর এমন কি ভারতবর্ষ থেকে আমাকে লাথি মেরেও তাড়াও, তাহলেও আমি ফিরে আসব, বলবো আমরা ডুবতে বসেছি। আমি এসেছি তোমাদের মাঝে আসন পাততে, ডুবতে যদি হয় তাহলে এসো আমরা সকলেই ডুবি, কিন্তু অভিশাপ কখনই দিয়ো না।

ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ

আমাদের জাতি এবং ধর্মের .স্বভাব হিসাবে একটি শব্দ খুবই প্রচলিত হয়েছে। বেদান্তবাদ বলতে আমি যা বোঝাতে চাই সে প্রসঙ্গে হিন্দু শব্দটির সামান্য ব্যাখ্যা করতে হবে। 'হিন্দু' শব্দটি ছিল প্রাচীন পার্শী-সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত সিন্ধু নদীর নাম সংস্কৃতের 'S' শব্দটিকে পার্শীরা সবসময় 'H'-এ রূপান্তরিত করেছে। সেকারণেই 'সিন্ধু' হয়েছে 'হিন্দু'। আপনারা সবাই জানেন 'H' শব্দটি উচ্চারণ গ্রীকদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তারা ওটিকে পুরোপুরি বাদ দেয়, তার ফলে আমরা 'ইন্ডিয়ান' এই নামে পরিচিত হলাম। সিন্ধু নদীর অপর তীরে বসবাসকারীদের এই 'হিন্দু' নামকরণের প্রাচীন অর্থ যাই থাক না কেন, আধুনিককালে তা মূল্যহীন।

কারণ সিন্ধুর এপারে যারা বসবাস করছে তারা সকলেই এখন আর এক ধর্মাবলম্বী নয়। প্রকৃত হিন্দু রয়েছে, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং জৈনরাও আছে। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে এরা সকলেই হিন্দু। কিন্তু ধর্মের কথা বোঝাতে এদের সকলকে হিন্দু বলা ঠিক হবে না। সুতরাং আমাদের ধর্মের জন্য একটি সাধারণ নাম আবিষ্কার করা খুবই কঠিন। দেখা যাচ্ছে এ ধর্ম বলতে গেলে বহু ধর্মের, বহু মতবাদের, বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের এক সংমিশ্রণ, যার প্রায় কোন নির্দিষ্ট নাম নেই, নির্দিষ্ট উপাসনা মন্দির বা নির্দিষ্ট সংগঠন নেই বললেই চলে। সম্ভবত একটিমাত্র বিষয়ে আমাদের সমস্ত সম্প্রদায় একমত—তা হল আমরা সকলেই আমাদের ধর্মশাস্ত্র বেদে বিশ্বাসী। একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে বেদের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার না করলে কোন ব্যক্তিরই হিন্দু বলে পরিচিত হবার অধিকার জন্মায় না। আপনারা জানেন যে এই বেদগুলি 'কর্মকাণ্ড' ও 'জ্ঞানকাণ্ড' এই দুভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডে রয়েছে বিবিধ যাগযজ্ঞ ও আহুতির কথা, যার অধিকাংশই আজকাল ব্যবহৃত হয় না। জ্ঞানকাণ্ডে রূপায়িত হয়েছে বেদের আধ্যাত্মিক নির্দেশনাগুলি, উপনিষদ এবং বেদান্ত নামে এগুলি পরিচিত। সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে এগুলি থেকে উদ্ধৃত করেছেন আমাদের সকল শিক্ষক, দার্শনিক এবং লেখকবৃন্দ, তাঁরা দ্বৈতবাদীই হোন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীই হোন, অথবা অদ্বৈতবাদীই হোন। যে দর্শন অথবা সম্প্রদায়ভুক্ত হোক না, উপনিষদকে সর্বময় কর্তা হিসাবে প্রত্যেক ভারতবাসীই মানতে বাধ্য। তা না হলে তার সম্প্রদায় প্রচলিত ধর্মের বিরোধী বলে পরিগণিত হবে। সুতরাং আধুনিককালে ভারতবর্ষের প্রতিটি হিন্দুকে চিহ্নিত করার পক্ষে উপযোগী নাম হল 'বেদান্তবাদী' অথবা আপনারা একে 'বৈদিক'ও বলতে পারেন। এই অর্থেই আমি 'বেদান্ত' ও 'বেদান্তবাদ' এই শব্দগুলি ব্যবহার করি। আমি এ বিষয়টিকে আরও স্বচ্ছ করতে চাই কারণ বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে 'বেদান্ত' শব্দটিকে সমগোত্রীয় করা অধিকাংশ লোকেরই রীতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি যে অদ্বৈতবাদ হল উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দার্শনিক প্রণালীর একটি শাখা মাত্র। উপনিষদ সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের অদ্বৈতবাদীদের মতই শ্রদ্ধা রয়েছে এবং

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা অদ্বৈতবাদীদের মতই বেদান্তের কর্তৃত্ব দাবি করেন। দ্বৈতবাদীরা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ও একই কথা বলে থাকেন।

কিন্তু সাধারণের ভাবনায় বৈদান্তিক শব্দটি অদ্বৈতবাদী এই শব্দটির সঙ্গে কিছুটা একীভূত হয়েছে। সম্ভবত কিছু যুক্তিও এর পেছনে আছে, কারণ ধর্মশাস্ত্র হিসাবে বেদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও স্মৃতি ও পুরাণ নামক কিছু পরবর্তী পর্যায়ের রচনাও আমাদের রয়েছে যাতে বেদের তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলির গুরুত্ব বেদের মত নয়। নিয়ম হল যেখানেই স্মৃতি এবং পুরাণের সঙ্গে শ্রুতির মতপার্থক্য হবে সেখানে শ্রুতিকেই অনুসরণ করতে হবে এবং স্মৃতিকে পরিত্যাগ করতে হবে। মহান অদ্বৈতবাদী শঙ্কর এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মতবাদগুলিতে বেশীর ভাগ প্রামাণ্য বিষয়েই উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। খুব কম ক্ষেত্রেই স্মৃতি থেকে কোন প্রামাণ্য উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। শ্রুতিতে পাওয়া যায় না এমন কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করতেই একমাত্র স্মৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি শ্রুতির তুলনায় স্মৃতির উপরই অধিকাংশ নির্ভরশীল। অতিরিক্ত দ্বৈতবাদীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে তারা সঙ্গতিপূর্ণভাবেই স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেন, একজন বৈদান্তিকের কাছে আমরা যা আশা করি এটি তার তুলনায় একেবারেই সঙ্গতিহীন। এর কারণ সম্ভবত এই যে এগুলি পৌরাণিক কর্তৃত্বের উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে যে আমার ভাষায় বললে, অদ্বৈতবাদীরা শ্রেষ্ঠতম বেদান্তবাদী হিসাবে পরিচিত হলেন।

এটি যাই হয়ে থাক না কেন, বেদান্ত শব্দটি ভারতীয় ধর্মীয় জীবনের সম্পূর্ণ ভূমি অধিকার করে থাকবে, এবং বেদের অংশ হওয়ার জন্য সবাই একে বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য বলে স্বীকার করেন, কারণ আধুনিক পণ্ডিতদের ধারণা যাই হোক না কেন হিন্দুরা কোনমতেই স্বীকার করতে রাজী নন যে বেদের কিছু অংশ প্রথমে এবং কিছু অংশ পরে লেখা হয়েছিল। তারা এখনও এ বিশ্বাসে অটল যে সম্পূর্ণ বেদ রচিত হয়েছিল একই সময়ে, অথবা যদি বলা যায়, এগুলি কখনই রচিত হয়নি। জগদীশ্বরের মনে এগুলি সবসময়ই ছিল। 'বেদান্ত' বলতে আমি এটিই বোঝাতে চাই। ভারতবর্ষের দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদও বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত, এমন কি আমরা বৌদ্ধ, জৈনধর্মের কিছু কিছু অংশও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। অবশ্য তারা রাজী হলে। কারণ আমাদের হৃদয় অনেক প্রশস্ত। কিন্তু তারাই আসবে না। আমরা প্রস্তুত আছি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধধর্মের সারবস্তু একই উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এমনকি বৌদ্ধদের তথাকথিত মহান চমৎকার নীতিশাস্ত্র হুবহু দেখতে পাওয়া যাবে কোন না কোন উপনিষদে, সেরকম অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বাদ দিলে জৈনদের সমস্ত ভালো মতবাদই উপনিষদে ছিল। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবনার পরবর্তী উন্নয়নের বীজও উপনিষদে নিহিত ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয় যে উপনিষদের কোন ভক্তির আদর্শ নেই। উপনিষদের ছাত্ররা জানেন যে এ অভিযোগ সত্যি নয়। আপনি খুঁজতে চাইলে দেখবেন প্রতিটি উপনিষদেই যথেষ্ট পরিমাণ ভক্তি রয়েছে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে পুরাণ ও অন্যান্য স্মৃতিগুলিতে যে সব মতবাদ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি

উপনিষদেই বীজ অবস্থায় ছিল। কাঠামো, বা নকশাটির অস্তিত্ব বরাবরই ছিল। কোন কোন পুরাণে সেই কাঠামো বা নকশার পরিপূর্ণ অবয়ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এমন কোন পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শের সন্ধান মিলবে না যার উৎপত্তিস্থল উপনিষদ নয়। উপনিষদের জ্ঞান অধিক না থাকা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বিদেশী উৎসে ভক্তির উৎপত্তি খোঁজার হাস্যকর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আপনারা জানেন যে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, আপনি ভক্তির যা কিছু চান সবই পাবেন উপনিষদে তো বটেই এমন কি সংহিতাগুলিতেও দেখবেন ভক্তি প্রসঙ্গ রয়েছে, পূজা ও প্রেম এবং ভক্তির অন্যান্য অঙ্গগুলির কথা বলা হয়েছে। শুধু ভক্তির আদর্শগুলি ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছে। সংহিতা অংশে কখনও কখনও এক ভীতি উদ্রেককারী, যন্ত্রণাপূর্ণ ধর্মের কথা বলা হয়েছে, সংহিতায় প্রায়ই দেখবেন কোন উপাসক বরুণ কিংবা অন্য কোন দেবতার সামনে করুণস্বরে প্রার্থনা করছে। প্রায়ই দেখবেন পাপবোধ তাদের অত্যন্ত যন্ত্রণা দিচ্ছে, কিন্তু উপনিষদে এ সমস্ত বর্ণনার কোন স্থান নেই। উপনিষদে ধর্ম ভয়ের ধর্ম নয়, প্রেম এবং জ্ঞানের ধর্ম।

এই উপনিষদগুলি হল আমাদের ধর্মশাস্ত্র। এদের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে এবং আমি ইতিমধ্যেই আপনাদের বলেছি যে পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যের সঙ্গে বেদের পার্থক্য লক্ষিত হলে, পুরাণকে পথ ছাড়তে হবে। কিন্তু একথাও একইভাবে সত্যি যে বাস্তবক্ষেত্রে দেখি আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বুইভাগ পৌরাণিক চেতনা এবং মাত্র দশভাগ বৈদিক চেতনা রয়েছে।

প্রত্যেকেই জানি যে আমাদের মধ্যে স্ববিরোধী রীতি রয়েছে এবং ধর্মীয় মতবাদ-গুলির মধ্যেও এমন কিছু বিষয় আছে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে সেগুলির কোন উল্লেখ নেই। অনেকক্ষেত্রে আমরা দেখে অবাক হই যে এদেশী প্রথাগুলির কোন সমর্থন বেদ, স্মৃতি অথবা পুরাণে মেলে না, এগুলি একেবারেই স্থানীয়। অথচ প্রতিটি অজ্ঞ গ্রামবাসীর ধারণা হল যে এরকম একটি ছোট স্থানীয় প্রথা বিলুপ্ত হলে তার হিন্দুত্ব বিনষ্ট হবে। তাদের মনে বেদান্তবাদ ও এই ছোট ছোট স্থানীয় প্রথাগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে সমগোত্রীয়। শাস্ত্রপাঠ করার সময় তার পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য যে সে যা করছে শাস্ত্র তা সমর্থন করে না, এবং সেগুলি বর্জন করলে তার ক্ষতি তো হবেই না বরং মানুষ হিসাবে সে আরও উন্নত হবে। দ্বিতীয়তঃ আর একটি সমস্যা রয়েছে। আমাদের এই ধর্মশাস্ত্রগুলি অত্যন্ত বৃহদায়তনের। পতঞ্জলির ভাষাতত্ত্ববিষয়ক রচনা, 'মহাভাষ্য' পড়ে আমরা জানতে পারি যে সাম-বেদের একহাজার শাখা রয়েছে। এগুলি সব কোথায় গেল? কেউ জানে না। প্রতিটি বেদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, এইসব গ্রন্থগুলির অধিকাংশই অদৃশ্য হয়েছে, ক্ষুদ্র অংশগুলিই আমাদের কাছে রয়েছে।

এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল কিছু নির্দিষ্ট পরিবারের, এই পরিবারগুলি হয় একে একে বিলুপ্ত হয়েছে তা না হলে শত্রুর দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে অথবা কোন কোন কারণবশত এদের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। সুতরাং বৈদিক জ্ঞানের যে অংশগুলির ভার তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল সেগুলিও বিলুপ্ত হয়। এ তথ্য আমাদের স্মরণে

রাখা কর্তব্য। কারণ যারা নতুন কোন মতবাদ প্রচার করতে চান অথবা এমন কি বেদের বিরুদ্ধে নতুন কিছুকে রক্ষা করতে চান এটি তাদের প্রধান অবলম্বন। যখনই স্থানীয় প্রথা ও শ্রুতির তুলনামূলক আলোচনা ভারতবর্ষে হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে স্থানীয় প্রথাটি ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী, তখনই বিপক্ষরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে প্রথাটি শাস্ত্র-বিরোধী নয়, শ্রুতির কোন অধুনালুপ্ত শাখায় এর অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং তা স্বীকৃত বিষয়ই। আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলির পাঠ ও তাদের ব্যাখ্যার এই বহুবিধ প্রণালীর মধ্যে তাদের সংযোগকারী সূত্রটিকে খুঁজে পাওয়া প্রকৃতই কষ্টকর। কারণ আমরা তৎক্ষণাৎ মেনে নিই যে এই বিভিন্ন ধারা ও উপধারাগুলির মূলে নিশ্চয়ই কোন সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তি রয়েছে। এই ক্ষুদ্রায়তনের গৃহগুলি নিশ্চয়ই কোন সুসংহত, অসাধারণ পরিকল্পনার উপর গড়ে উঠেছে।

এই আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রম সৃষ্টিকারী বস্তুসমষ্টি, যাকে আমরা আমাদের ধর্ম বলি তার নিশ্চয়ই কোন সাধারণ ভিত আছে। তা না হলে এতদিন টিঁকে থাকা, এই দীর্ঘ সময় সমস্ত কিছু সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হোত না।

ভাষ্যকারদের প্রসঙ্গে আমরা আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হই। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার অদ্বৈতবাদ বিষয়ক পুঁথিটিকে সযত্নে রক্ষা করেন, তিনি আবার দ্বৈতবাদ বিষয়ক কোন পুঁথিকে পায়লে ক্ষতবিক্ষত করে তার সবচেয়ে অদ্ভুত অর্থ আবিষ্কার করেন। এত অদ্ভুত অর্থগত পরিবর্তন করা হয়েছে যে কখনও কখনও 'অজ' শব্দটির অর্থ করা হয় 'ছাগল'। ভাষ্যকারের সুবিধার জন্য 'অজ', অর্থাৎ যার জন্ম হয়নি, এই শব্দটিকে 'অজ' অর্থাৎ স্ত্রী ছাগল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এরকমভাবেই অথবা এর চেয়েও খারাপভাবে দ্বৈতবাদীরা এইসব পুঁথিগুলি ব্যবহার করেন। সমস্ত দ্বৈতবাদ সংক্রান্ত পুঁথিগুলিকে রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু যেসব পুঁথিতে অদ্বৈতবাদী দর্শনের কথা বলা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিকে যদৃচ্ছ অত্যাচার করা হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষা এত জটিল, বেদের সংস্কৃত এত সুপ্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব এত নিখুঁত যে একটি শব্দের অর্থ নিয়ে বহুযুগ ধরে যতদূর সম্ভব তর্কালোচনা করা যেতে পারে।

একজন পণ্ডিত ইচ্ছা করলে যে কোন লোকের অনর্থক ভাষণকে পুঁথি থেকে উদ্ধৃতি তুলে এবং যুক্তির জোরে শুদ্ধ সংস্কৃতে রূপান্তরিত করতে পারে। উপনিষদ বোঝার ক্ষেত্রে এগুলিই আমাদের অসুবিধা। আমাকে এমন একজন পুরুষের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়েছিল যিনি জ্ঞানী ব্যক্তিরই মত অত্যন্ত উৎসাহী দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী এবং ভক্ত।

এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকাকালীন ভাষ্যকারদের অন্ধ অনুসরণ না করে উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিকে একটি নিরপেক্ষ এবং আরও ভালো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কথা আমি উপলব্ধি করি। আমার মতে এবং আমার গবেষণালব্ধ ফল অনুযায়ী এই ধর্ম-শাস্ত্রগুলি একেবারেই পরস্পর-বিরোধী নয়। সুতরাং পুঁথি নিগৃহীত হবার কোন আশঙ্কা নেই। পুঁথিগুলি অত্যন্ত সুন্দর এবং তারা পরস্পর-বিরোধী নয় বরং চমৎকার ভাবে সম্পৃক্ত, একটি ভাবধারা আর একটিতে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু একটি বিষয় আমার

নজরে এল যে সমস্ত উপনিষদেই দ্বৈতবাদী ধারণা দিয়ে শুরু করা হয় এবং শেষে অদ্বৈতবাদী ভাবধার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং এখন এই মহাপুরুষের জীবনের আলোয় আমি বুঝতে পেরেছি যে দ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদীদের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবার প্রয়োজন নেই।

জাতীয় জীবনে প্রত্যেকেরই একটি বিরাট স্থান রয়েছে। দ্বৈতবাদীরা অপরিহার্য, কারণ অদ্বৈতবাদীদের মতই তাঁরাও জাতীয় ধর্মজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একটি অপরটিকে ছাড়া বাঁচতে পারে না, একে অপরের পরিপূরক। একটি অট্টালিকা, অপরটি তার শীর্ষদেশ; একটি মূল, অপরটি তার ফলস্বরূপ। সুতরাং উপনিষদের পুঁথিগুলিকে আক্রমণ করার যে কোন প্রচেষ্টাই আমার মতে অত্যন্ত হাস্যকর। আমি ক্রমশ বুঝতে পারছি যে এর ভাষা অত্যন্ত সুন্দর। সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের গুণ-সমন্বিত হওয়া ছাড়াও উপনিষদ সাহিত্য চির সুন্দরের এক বিশ্বশ্রেষ্ঠ চিত্রণ। হিন্দু মানসিকতার স্বাতন্ত্র্য, তার গভীর দূরদৃষ্টি, তার স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এখানে। সুন্দরের বর্ণনা পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশেও পাওয়া যায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সুন্দরকে দেহের প্রতিটি পেশীতে অনুভব করাই যেন তাদের আদর্শ। উদাহরণস্বরূপ মিলটন, দান্তে, হোমার অথবা অন্য যে কোন পাশ্চাত্য কবির লেখার কথা ধরা যাক। বহু শিবসুন্দর বর্ণনা তাদের রচনায় রয়েছে। কিন্তু সেখানে সীমাহীন বিস্তারকে পরশ করার, মহাশূন্যকে, অসীমকে পাওয়ার আকুতি ফুটে উঠেছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে, প্রতিটি মাংসপেশীতে। সংহিতাতেও একই ধরনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। বিশ্বসৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে যে সব ঋকে তার কিছু কিছু আপনাদের জানা আছে। চিরায়তের মধ্যে সুন্দর ও মহাশূন্যে অসীমের অত্যন্ত উচ্ছাসের বর্ণনা সেগুলিতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই তারা আবিষ্কার করলেন যে অসীমকে এভাবে পাওয়া যাবে না। এমন কি অসীম মহাশূন্য, বিশালতা, সীমাহীন বহিঃপ্রকৃতিও তাদের অন্তরে ছটফটিয়ে-মরা অভিব্যক্তিগুলিকে প্রকাশ করতে অক্ষম। সুতরাং এই প্রাচীন কবিরা অন্য বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হলেন। উপনিষদ রচিত হল নতুন ভাষায়, এটি প্রায় নঙর্থক, কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতিহীন। কোন সময়ে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে নিয়ে গিয়ে আমাদের এমন কিছু দর্শাবে যা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না, অনুভব করতে পারবেন না অথচ নিশ্চিত বুঝবেন যে সেই অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। বিশ্বের কোনো ছত্রের সঙ্গে এর তুলনা চলে?—'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।'—"সূর্য সেখানে আলোদান করে না, চন্দ্রতারাও নেই, বিদ্যুৎপ্রভা সে স্থানকে আলোকিত করে না, মনুষ্য উদ্ভাবিত এই অগ্নি সেখানে অতি তুচ্ছ।" অথবা, সমস্ত বিশ্বদর্শনের এর চেয়ে অধিক নিখুঁত প্রকাশ, হিন্দুদের যাবতীয় ভাবনার সারাংশ, মানুষের মুক্তিলাভের স্বপ্নের বর্ণনা এর চেয়ে সুন্দর ভাষায়, সুন্দরতর রূপকের মাধ্যমে কোথায় দেওয়া আছে?

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

"একই গাছে সুন্দর পাখার পাখি বসে আছে, একে অপরের অন্তরঙ্গ দোসর। একটি বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করছে, অপরটি আহার না করে নীরবে বসে আছে। যে পাখি নীচের ডালে বসে সুমিষ্ট ও তিক্ত ফল আস্বাদন করছে সে কখনও সুখী, কখনও বা দুঃখী; কিন্তু যে উপরে বসে আছে সেটি শান্ত, তার রাজকীয়তা রয়েছে। সে সুমিষ্ট অথবা তিক্ত কোন ফলই ভক্ষণ করছে না, সুখ দুঃখ, দুর্দশার ব্যাপারে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, সে তার আপন মহিমায় নিমগ্ন।" এটি হল মানবাত্মার ছবি। মানুষ জীবনের তিক্ত ও মধুর উভয় শ্রেণীর ফলই ভক্ষণ করছে, অর্থের অন্বেষণে, ইন্দ্রিয়ের অনুধাবনে, জীবনের অসার দম্ভের লোভে, জ্ঞানরহিত উন্মাদের মত সে পথ চলেছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে উপনিষদ মানবাত্মাকে সারথির সঙ্গে তুলনা করেছে, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে তুলনা করেছে অসংযত উন্মাদ ঘোড়ার সাথে। এই হল অসার দম্ভের পশ্চাৎধাবনকারী মানুষের অগ্রগতির নমুনা। অবোধ শিশুর মত সোনালী স্বপ্নে এরা বিভোর, শুধু স্বপ্নভঙ্গের অপেক্ষায়, তারপরই বুঝতে পারে যে তারা ব্যর্থ হয়েছে। বৃদ্ধব্যক্তিরা অতীত কীর্তি রোমন্থন করে, তবুও এই বেড়াজাল ভেঙে বের হবার উপায় সম্বন্ধে তারা কিছুই জানতে পারে না। এই হল পৃথিবী। তবুও প্রত্যেকের জীবনেই স্বর্ণ মুহূর্ত আসে; গভীর দুঃখের মধ্যে এমন কি গভীর আনন্দের দিনেও এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন সূর্যালোকগ্রাসী মেঘের একাংশ যেন সরে যায়, আমাদের শত ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও উপলব্ধি করি—দূরে আরও দূরের অতীন্দ্রিয় কোন জগৎকে বস্তু জগতের তুচ্ছ দম্ভ, আনন্দ, দুঃখের বাইরে, প্রকৃতির সীমা ছাড়িয়ে অথবা আমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্পিত সুখরাজ্যের বাইরে, অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, সম্পদ সমস্ত আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে অবস্থিত এক জগৎকে। ক্ষণিকের এই দর্শনে মানুষ স্তব্ধ হয়, চেয়ে দেখে শান্ত, রাজকীয় সেই পাখিকে, যে তিক্ত অথবা মধুর কোন ফলই ভক্ষণ করে নি, স্বমহিমায় নিমগ্ন, আত্মপরিতুষ্ট, আত্মতৃপ্ত। গীতায় বলা হয়েছে:

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥

"যে ব্যক্তি আত্মার ভজন করে, আত্মার উর্ধ্বে যার কোন কামনা নেই, যে আত্মাতেই পরিতুষ্ট, তার কি কাজ করার থাকতে পারে?" সে উঞ্ছবৃত্তি কেন করবে? মানুষ শুধু একাংশ দেখতে পায়, তারপর সবকিছু ভুলে সে আবার জীবনের মধুর ও তিক্ত ফল আস্বাদন করতে থাকে। হয়ত কিছু সময় বাদে পুনর্বার সে আর একটি অংশ দেখতে পায় এবং ক্রমান্বয়ে আঘাত পেতে পেতে নীচের পাখিটি ক্রমশ উপরের পাখিটির নিকটবর্তী হতে থাকে। যদি সে ভাগ্যবান হয় তাহলে কঠিন আঘাত পেয়ে ধীরে ধীরে তার সাথী, অন্য পাখিটির কাছে, তার জীবনের কাছে, সখার কাছে সরে আসে। সে যত কাছে আসতে থাকে ততই উপলব্ধি করে যে উপরের পাখিটির আভা

তার নিজের পালকগুচ্ছের চারপাশে প্রতিফলিত হচ্ছে। সে যত নিকটবর্তী হয় ততই তার পরিবর্তন হতে থাকে। দূরত্ব যত কমতে থাকে ততই সে উপলব্ধি করে যে, সে যেন দ্রবীভূত হতে হতে সম্পূর্ণ বিলীন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না, নীচের পাখি আসলে উপরে হিল্লোলিত পাতার মধ্যে উপবিষ্ট শান্ত, রাজকীয় পাখির প্রতিমূর্তি মাত্র। এ সবই উপরের পাখিটির মহিমা। সে তখন নির্ভীক, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত, নীরবে পবিত্র। এই রূপকের মাধ্যমে উপনিষদ আপনাদের দ্বৈতবাদ থেকে চূড়ান্ত অদ্বৈতবাদে উপনীত করছে।

বহু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তা করার সময় নেই, সময় নেই উপনিষদের চমৎকার কাব্যগুণ বর্ণনা করার, চিরসুন্দরের অসাধারণ চিত্রণ, মনোহর চিন্তাধারাগুলির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করার। কিন্তু অপর একটি ধারণার কথা অবশ্যই বলবো, তা হল, উপনিষদের ভাষা ও চিন্তাধারা সমস্ত কিছুই তরবারির মত সরাসরি নিক্ষিপ্ত হয়, হাতুড়ির ঘায়ের মতই সুকঠিন সে আঘাত। সেগুলির অর্থোদ্ধারে কোন ভ্রান্তি হয় না। সে সংগীতের প্রতিটি সুর অত্যন্ত ঋজু এবং প্রত্যেকে তার পূর্ণ ফলদান করে। কোন মারপ্যাচ নেই, উন্মত্ত শব্দ নেই, বুদ্ধিলোপ করা জটিলতা নেই। উৎকর্ষহানির কোন চিহ্ন নেই, অতিরিক্ত রূপক ব্যবহারের কোন চেষ্টা নেই। সম্পূর্ণ অর্থ বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একের পর এক বিশেষণ ব্যবহার করা, মানুষকে বিভ্রান্ত করে সাহিত্যের গোলকধাঁধা থেকে বের হতে না দেওয়ার কোন চেষ্টা উপনিষদে করা হয় নি। মানবসাহিত্য হতে গেলে একে অবশ্যই এমন একটি সম্প্রদায়ের রচনা হতে হবে এখনও যারা জাতীয় উদ্দীপনার বিন্দুমাত্র অংশও হারিয়ে ফেলে নি।

শক্তি, একমাত্র শক্তির কথাই উপনিষদের প্রতিটি পাতা থেকে পাই। এই মহৎ কথা স্মরণ রাখতে হবে। জীবনে এই মহৎ শিক্ষাই আমি পেয়েছি। হে মানুষ, দুর্বল হয়ো না, শক্তি অবলম্বন করো—এই হল উপনিষদের বাণী। মানুষ প্রশ্ন করে—কোন মানবিক দুর্বলতাই কি নেই? উপনিষদ বলে—আছে। কিন্তু আরও দুর্বলতা কি সেগুলির উপশম করবে? ময়লা দিয়ে কি ময়লা ধোবে তুমি? পাপ কি পাপস্খালন করবে, দুর্বলতা কি করবে দুর্বলতার প্রশমন? উপনিষদ বলে—শক্তি, শক্তিই একমাত্র কাম্য, মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াও, শক্তিমান হও। উপনিষদই পৃথিবীর একমাত্র সাহিত্য যেখানে 'অভী' (Abhih) বা 'নির্ভীক' শব্দটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বর অথবা মানুষের ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়নি। 'অভী' (Abhih), নির্ভীক! আমার মনে পাশ্চাত্যের অতীত দিনের মহান সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ছবি ভেসে ওঠে। আমি ছবির মত দেখতে পাই, সেই মহান সম্রাট সিন্ধু নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আমাদের একজন বনবাসী সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলছেন। যে বৃদ্ধের সঙ্গে তিনি কথোপকথনে রত তিনি হয়ত সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে একখণ্ড পাথরের উপর বসে আছেন। সম্রাট তাঁর জ্ঞানমুগ্ধ হয়ে গ্রীসে আসার জন্য তাঁকে সোনা ও সম্মানের প্রলোভন দেখাচ্ছেন। এই লোকটি সোনা ও সম্মানের প্রলোভনের কথা শুনে হাসছেন এবং সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন। তখন আলেকজাণ্ডার তাঁর সম্রাটসুলভ কর্তৃত্ব সহকারে বলছেন "যদি না আসো তাহলে

আমি তোমাকে হত্যা করবো।" সেই বৃদ্ধ লোকটি হাসিতে ভেঙে পড়ে বললেন—"এখন যা বলছেন এর চেয়ে বড় মিথ্যা জীবনে বলেন নি। আমাকে কে হত্যা করবে? বস্তুজগতের সম্রাট, আপনি আমাকে হত্যা করবেন? অসম্ভব! কারণ আমি অজ, অক্ষয় আত্মা: আমার জন্ম হয় নি এবং মৃত্যু কখনও হবে না। আমি অসীম, সর্বভূতে বিরাজমান, সর্বশক্তিমান, আমাকে হত্যা করতে চান, আপনি তো শিশু!" এই হল শক্তি! আমার বন্ধুগণ, স্বদেশবাসিগণ, যত উপনিষদ পড়ছি তত আপনাদের জন্য দুঃখ হচ্ছে, কারণ উপনিষদেই সেই মহান বাস্তব প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। শক্তি, আমাদের জন্য শক্তি। আমাদের শক্তির প্রয়োজন, কে তা দেবে? আমাদের দুর্বল করার জন্য অনেকে রয়েছে, বহু উপাখ্যান আমরা পড়েছি। আমাদের প্রতিটি পুরাণে এতসংখ্যক গল্প রয়েছে যা দিয়ে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ গ্রন্থাগার বোঝাই করা চলে। জাতি হিসাবে আমাদের দুর্বল করার বহু চেষ্টা বিগত হাজার বছরে হয়েছে। মনে হয় সে সময়ে জাতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমাদের দুর্বল থেকে দুর্বলতর করা, যতক্ষণ না আমরা প্রকৃতই কীটের মত পদদলিত হবার জন্য প্রতিটি পায়ের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুতরাং হে বন্ধুগণ, আপনাদের আত্মার আত্মীয় হিসাবে, আপনাদের জীবন-মরণের সঙ্গী হিসাবে আমাকে বলতে দিন, যে আমাদের শক্তির প্রয়োজন, প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োজন। উপনিষদগুলি হল শক্তির মহান আকর। সমস্ত বিশ্বকে উজ্জীবিত করার মত যথেষ্ট শক্তি উপনিষদে আছে। সমস্ত পৃথিবী তার মাধ্যমে শক্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবে। তূর্যনিনাদে তারা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়, সকল গোষ্ঠীর সমস্ত নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষদের উঠে দাঁড়াবার, মুক্ত হবার ডাক দেবে। মুক্তি, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিই হল উপনিষদের মূল বক্তব্য। পৃথিবীতে উপনিষদই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে মুক্তির কথা না বলে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির বন্ধন থেকে, দুর্বলতা থেকে মুক্ত হও। উপনিষদ দেখিয়ে দেয় যে সে মোক্ষ আপনাদের মধ্যেই রয়েছে। আপনি দ্বৈতবাদী হলেও ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে প্রকৃতিগতভাবে আত্মা বিশুদ্ধ, শুধু কিছু কার্যকলাপের জন্য আত্মা সঙ্কুচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রামানুজের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণতত্ত্ব আধুনিক বিবর্তনবাদীদের বিবর্তনবাদ ও পূর্বগামীকৃতি তত্ত্বের অনুরূপ। আত্মা পশ্চাদপসারণ করে, সঙ্কুচিত হয়, এর শক্তি আচ্ছন্ন হয়, সৎকাজ এবং সৎচিন্তার মাধ্যমে আত্মা পুনর্বার সম্প্রসারিত হয়ে তার স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা প্রকাশ করে। অদ্বৈতবাদীর ক্ষেত্রে তফাৎ হল এই যে তিনি প্রাকৃতিক বিবর্তন স্বীকার করেন, আত্মার নয়। মনে করুন একটি পর্দা ঝুলছে এবং সেই পর্দার মধ্যে একটি ছিদ্র রয়েছে। আমি সেই পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে এই চমৎকার সমাবেশের দিকে তাকিয়ে আছি। এখানকার কয়েকটি মাত্র মুখই আমার দৃষ্টিগোচর হবে। মনে করুন ছিদ্রটি বড় হচ্ছে এবং বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাবেশের আরও বেশী অংশ আমি দেখতে পাচ্ছি। যখন সেই ছিদ্র বিস্তৃত হতে হতে পর্দার সমানায়তন হচ্ছে তখন পর্দার সঙ্গে ছিদ্রের কোন তফাৎ থাকছে না, আমার ও আপনাদের মধ্যে কোন আড়াল থাকছে না। আপনারাও

পাল্টে যাননি, আমিও না। আসল পরিবর্তন নিহিত ছিল পর্দাটির মধ্যে। আগা-গোড়া আপনারা আপনাদের মতই ছিলেন, শুধু পর্দাটিই আপনাদের অবয়বের হেরফের ঘটিয়েছে। প্রাকৃতিক বিবর্তন এবং অন্তঃস্থিত আত্মার প্রকাশ—বিবর্তন প্রসঙ্গে এই হল অদ্বৈতবাদীদের ধারণা। আত্মাকে যে কোনভাবে সঙ্কুচিত করা যায়, তা ঠিক নয়। আত্মা পরিবর্তনযোগ্য নয়, এ হল অসীম সত্তা। আত্মা ঢাকা পড়েছিল মায়ার আবরণে। মায়ার এই আবরণ যত পাতলা হয়ে আসে ততই আত্মার সহজাত, স্বাভাবিক মহিমা তত পরিস্ফুট হয়। সমস্ত পৃথিবী ভারতবর্ষের কাছ থেকে এই তত্ত্ব শোনার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা যে কথাই বলুক না, যত অহঙ্কারই করুক না, প্রতিদিন তারা উপলব্ধি করবে যে কোন সমাজই এ তত্ত্বকে অস্বীকার করে বাঁচতে পারে না। আপনারা কি দেখছেন না সমস্ত বিষয় কি রকম পরিবর্তিত হয়েছে? কোন বস্তুর সততা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সবকিছুই অসৎ এটি ধরে নেওয়া একটি প্রথায় পরিণত হয়েছিল। শিক্ষাব্যবস্থায়, অপরাধীদের দণ্ড-বিধানে, উন্মাদের চিকিৎসায়, এমনকি সাধারণ অসুখের চিকিৎসাতেও এই ছিল প্রাচীন নিয়ম। আধুনিক নিয়ম কি? আধুনিক নিয়ম অনুযায়ী দেহ স্বয়ং সুস্থ, এটি শুধু নিজ প্রকৃতিবশে রোগ নিবারণ করে। ওষুধ দিয়ে শরীরে শ্রেষ্ঠ উপাদান-গুলিকে সঞ্চয় করতে সাহায্য করা চলে মাত্র। অপরাধীদের সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ কি বলছে? আধুনিক মতবাদ মেনে নেয় যে যত জঘন্য অপরাধীই হোক না কেন তার ভেতরে দেবত্ব রয়েছে যা কখনও পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং অপরাধীদের সঙ্গে আমাদের অনুরূপ ব্যবহার করতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি পরিবর্তিত হচ্ছে, সংশোধন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সবক্ষেত্রেই এক ব্যাপার। প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্পর্কে ভারতীয় ধারণাগুলি সচেতন অথবা অবচেতনভাবে অন্যান্য দেশগুলিতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। আপনাদের ধর্মপুস্তকে রয়েছে সেইসব ব্যাখ্যা যেগুলি অন্যান্য দেশ গ্রহণ করতে বাধ্য। একজনের প্রতি অন্যজনের ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হবে এবং মানুষের দুর্বলতা প্রদর্শনকারী এইসব প্রাচীন ধারণাগুলিকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। এই শতাব্দীর মধ্যেই তারা তাদের শেষ আঘাত পাবে। এখন লোকে আমাদের সমালোচনা করতে পারে। পাপ বলে কিছু নেই—এই ভয়ঙ্কর মতবাদ প্রচারের জন্য পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আমি সমালোচিত হয়েছি! খুব ভালো কথা। এই সমালোচকদের উত্তরপুরুষরাই আমাকে আশীর্বাদ করবে ধর্মের প্রচারক হিসাবে, অধর্মের নয়। আমি ধর্ম প্রচার করি, পাপ নয়। আমার গর্ব আমি আলোকবার্তা বহন করি, অন্ধকার নয়।

যে দ্বিতীয় মহৎ ধারণা উপনিষদের কাছ থেকে পাবার জন্য সারা পৃথিবী অপেক্ষা করছে তা হল সমস্ত বিশ্বের সংহতি। প্রভেদ ও পার্থক্যেও প্রাচীন বেড়াগুলি ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও বাষ্পশক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশগুলিকে পারস্পরিক যোগসূত্রে বেঁধেছে। এর ফলে আমরা হিন্দুরা আর একথা বলি না:যে আমাদের দেশের বাইরে প্রতিটি দেশেই দৈত্য এবং ভূতপ্রেত বসবাস করে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী

দেশগুলিও এখন আর বলে না যে ভারতবর্ষে শুধু নরখাদক, বর্বররা বাস করে। দেশের বাইরে গেলে আমরা একই ভ্রাতৃসম মানুষ দেখতে পাই, তারা প্রত্যেকেই সবল হাতে সাহায্য করে, একইভাবে শুভেচ্ছা জানায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের জন্মভূমির লোকের তুলনায় তারা অনেক ভালো। তারা যখন এদেশে আসে একই ভ্রাতৃবর্গকে দেখতে পায়, একই উৎসাহ একই শুভেচ্ছা পেয়ে থাকে। আমাদের উপনিষদে বলা হয় যে সমস্ত অজ্ঞানই সমস্ত দুর্দশার কারণ। সামাজিক অথবা আধ্যাত্মিক যে কোন জীবনের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হোক না কেন এই বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক। অজ্ঞতাই আমাদের শেখায় পরস্পরকে ঘৃণা করতে, অজ্ঞতার জন্যই আমরা একে অপরকে চিনি না, ভালোবাসি না। যখনই আমরা পরস্পরকে চিনতে পারি তখনই ভালোবাসা জন্ম নিতে বাধ্য, কারণ আমরা কি অভিন্ন নই? এভাবেই দেখছি যে শত বিঘ্ন সত্ত্বেও সংহতি গড়ে উঠছে। এমন কি রাজনীতি ও সমাজনীতিতে কুড়ি বছর আগে যে সমস্যা একান্ত জাতীয় সমস্যা ছিল তার সমাধান আজ শুধুমাত্র দেশের মাটিতে সম্ভব নয়। তাদের আকৃতি দৈত্যসম বিশাল হয়ে পড়ছে। আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখলে তবেই তাদের সমাধান পাওয়া যাবে। আন্তর্জাতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংমিশ্রণ, আন্তর্জাতিক বিধিনিয়ম, এই হল বর্তমান যুগের প্রয়োজন। এটিই সংহতি প্রমাণ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জড় সম্পর্কে তারা একই ধরনের উদার মতবাদে উপনীত হচ্ছে। আপনারা জড়ের কথা বলেন, সমস্ত বিশ্বকে এক জড়সমষ্টি বা জড়সমুদ্র বলে থাকেন। এই জড়সমষ্টিতে আমি, আপনি, চন্দ্র, সূর্য, সমস্ত কিছুই হল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণির নামমাত্র, অন্য কিছু নয়। মানসিক দিক থেকে বলতে গেলে, একটি সামগ্রিক চিন্তা-সমুদ্রে আমি আপনি একই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণি এবং অদৃশ্য সত্তা হিসাবে একটি অনড়, অপরিবর্তিত থাকে। এটি হল একমাত্র অপরিবর্তনীয়, অখণ্ড, সমশ্রেণীভুক্ত আত্মা। নৈতিকতার আহ্বানও শোনা যাচ্ছে এবং তাও আমাদের ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। নৈতিকতার ব্যাখ্যা, নীতিশাস্ত্রের উৎসও পৃথিবীর প্রয়োজন এবং তা এখানেই পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষে আমরা কি চাই? বিদেশীদের এগুলি প্রয়োজন হলে আমাদের তা কুড়িগুণ বেশী প্রয়োজন। কারণ উপনিষদের মাহাত্ম্য সত্ত্বেও, ঋষি পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও, অন্যান্য বহু জাতির তুলনায় আমরা দুর্বল। বলতে বাধ্য হচ্ছি আমরা অত্যন্ত দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দুর্বলতা। এই শারীরিক দুর্বলতাই আমাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দুর্দশার কারণ। আমরা অলস, আমরা কাজ করতে পারি না, একত্রিত হতে পারি না। একে অন্যকে ভালোবাসি না। আমরা একান্ত স্বার্থপর। পরস্পরকে ঘৃণা না করে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে তিনজনও একত্রিত হবে না। এই হল আমাদের অবস্থা। আমরা অসংবদ্ধ জনসমষ্টি, অসম্ভব স্বার্থপর, কপালে কোন বিশেষ চিহ্ন কি ভাবে আঁকা হবে তা নিয়ে শত শতাব্দী নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে চলেছি, কোন লোকের দৃষ্টি অন্ন নষ্ট করবে এরকম বৃহদায়তনের প্রশ্ন নিয়ে একের পর এক সারগর্ভ পুস্তক লিখে চলেছি। বিগত

বহু শতাব্দী ধরে আমরা এই কাজে লিপ্ত রয়েছি। এমন চমৎকার সমস্যা ও গবেষণায় লিপ্ত যে জাতি তার বুদ্ধিবৃত্তি থেকে আমরা উন্নত কিছু আশা করতে পারি না। আমরা কি নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জিত নই? কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই, কিন্তু যদিও ভাবি যে এগুলি অসাড় তবুও তাদের বর্জন করতে পারি না। পোষা কাকাতুয়ার মত অনেক বুলি আমরা আওড়াই, কিন্তু কখনও সেগুলি বাস্তবায়িত করি না। কথা বলে কাজ না করা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতা। এ ধরনের দুর্বল বুদ্ধি কিছুই করতে পারে না। একে শক্তিশালী করতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের প্রতিটি যুবক শক্তিমান হবে। আমার যুবক বন্ধুগণ, আপনারা শক্তিমান হোন, আপনাদের প্রতি এই আমার উপদেশ। গীতা পড়ে স্বর্গের যত কাছাকাছি যাওয়া যায় তার বেশী যেতে পারবেন ফুটবল খেলে। অত্যন্ত দুঃসাহসিক শোনালেও আমি একথা বলবো কারণ আমি আপনাদের ভালোবাসি। আমি জানি জুতো কোথায় বেঁধে। সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। শরীরের পেশী দিয়ে গীতাকে আর একটু বেশীভাবে উপলব্ধি করবেন। আপনাদের সতেজ রক্ত দিয়ে কৃষ্ণের অসাধারণ প্রতিভা, দুর্ধর্ষ শক্তি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করবেন। যখন পায়ের উপর ভর দিয়ে আপনাদের শরীর শক্তভাবে উঠে দাঁড়াবে, যখন নিজেদের মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করবেন, তখনই উপনিষদের বাণী, আত্মার মহিমা আরও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবেন। এইভাবে এইগুলিকে আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

আমার অদ্বৈতবাদ প্রচারে লোকে অনেকক্ষেত্রে বিরক্ত হয়। অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ অথবা অন্য কোন মতবাদই আমি পৃথিবীতে প্রচার করতে চাই না। একমাত্র যে সুন্দর মতবাদটি আমাদের এখন প্রয়োজন তা হল আত্মার এই চমৎকার ধারণা—আত্মার চিরন্তন শক্তি, চিরন্তন বীর্য, চিরন্তন পবিত্রতা। আমার যদি একটি শিশু-সন্তান থাকতো তাহলে জন্ম হতে আমি তাকে বলতাম—"তুমিই হলে সেই পবিত্র সত্তা।" একটি পুরাণে আপনারা রানী মদালসার কাহিনী পড়েছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তিনি নিজ হাতে তাকে দোলনায় শুইয়ে দিতেন। তারপর দোলনাটি এদিক ওদিক দুলতে শুরু করলে তিনি গান গাইতেন—"তুমিই সেই পবিত্র সত্তা, নিষ্কলঙ্ক, বলিষ্ঠ, মহান।" হ্যাঁ, কাহিনীটির মধ্যে অনেক গূঢ়ার্থ রয়েছে। নিজেকে মহৎ ভাবতে শিখুন, তাহলেই মহান হবেন। প্রশ্ন হল, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে অভিজ্ঞতা হিসাবে আমি কি পেয়েছি?

পাপীরা কথা বললেও সমস্ত ইংরাজ যদি নিজেদের পাপী হিসাবে কল্পনা করতো তাহলে তারা মধ্য আফ্রিকার নিগ্রোদের তুলনায় বিন্দুমাত্র অধিক উন্নত হত না। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুন কারণ তারা একথা বিশ্বাস করে না। অপর পক্ষে একজন ইংরাজ বিশ্বাস করে যে সে পৃথিবীর প্রভু। তার বিশ্বাস পৃথিবীতে যে কোন কাজ সে করতে পারে। সে যদি চাঁদে কিংবা সূর্যতেও যেতে চায় তাহলে, তার বিশ্বাস, সে ব্যর্থ হবে না এবং এর ফলেই সে মহান হয়েছে।

পুরোহিতের কথায় যদি সে বিশ্বাস করতো যে সে একজন নিঃস্ব, দুর্দশাগ্রস্ত

পাপী সমস্ত যুগ ধরে যাকে শাস্তি পেতে হবে তাহলে আজকের ইংরেজকে আমরা পেতাম না। সুতরাং প্রতিটি দেশে দেখছি, যাজকতন্ত্র ও অন্ধ-কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও মানুষের আভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক সত্তা বেঁচে রয়েছে এবং নিজেকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছে। আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি। আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন, তাহলে বলি, ইংরাজ নরনারীর তুলনায় আমাদের বিশ্বাস হাজার গুণে কম! খুব স্পষ্ট কথা হলেও না বলে থাকতে পারছি না। লক্ষ্য করছেন না, আমাদের আদর্শগুলি উপলব্ধি করে ইংরাজরা যেন উন্মাদ হয়ে পড়েছে? শাসকগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশ-বাসীদের ব্যঙ্গোক্তি উপেক্ষা করেও তারা এদেশে এসে আমাদেরই ধর্ম প্রচার করছে? আপনাদের মধ্যে কজন একাজ করতে পারতেন? কেন পারবেন না? আপনারা কি তা জানেন না? তাদের চেয়ে অনেক বেশী আপনারা জানেন, যতটা জ্ঞানী হওয়া ভালো তার চেয়ে অধিক জ্ঞান আপনারা অর্জন করেছেন। সেখানেই যত অসুবিধা! একমাত্র কারণ আপনাদের রক্ত জলের মতই তরল, বুদ্ধি ধুঁকছে, দেহ দুর্বল। দৈহিক পরিবর্তন আপনাদের করতেই হবে। শারীরিক দুর্বলতাই কারণ, অন্য কিছু নয়। আপনারা সমাজসংস্কারের কথা বলেছেন, আদর্শের কথা বলেছেন এরকম অনেক কিছুই বিগত একশ বছর ধরে বলে আসছেন। কিন্তু এগুলিকে বাস্তবায়িত করার সময় আপনাদের সাক্ষাৎ মেলে না, সমস্ত পৃথিবী বিরক্তি বোধ করে, সংস্কার শব্দটি হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। এর কারণ কি? আপনারা জানেন? ভালোভাবেই জানেন। একমাত্র কারণ আপনারা অত্যন্ত দুর্বল। আপনাদের দেহ দুর্বল, মন দুর্বল, আপনাদের আত্মবিশ্বাস নেই।

শত শত বছর ধরে জাতিপ্রথা, রাজন্যবর্গ, বিদেশী এবং স্বদেশীদের সম্মিলিত নিষ্ঠুর অত্যাচার, আমার ভ্রাতৃবর্গ, আপনাদের সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে। আপনাদের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে, পদদলিত কীটের মত আপনাদের দশা। কে আপনাদের শক্তি জোগাবে? আবার বলছি, শক্তি, শক্তিই আপনাদের প্রয়োজন। শক্তি অর্জনের প্রথম উপায় হল উপনিষদকে তুলে ধরা, বিশ্বাস করা—'আমিই আত্মা', "তরবারি আমাকে খণ্ডিত করতে পারে না, অস্ত্র আমাকে ভেদ করতে পারে না, অগ্নি দাহন করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, আমি সর্বভূতে বিরাজ-মান, আমি সর্বজ্ঞ।" সুতরাং এই পবিত্র, রক্ষাকারী শব্দগুলি বারংবার উচ্চারণ করুন। আমরা দুর্বল একথা উচ্চারণ করবেন না, আমরা সবকিছু করতে পারি। আমরা কি করতে পারি না? আমাদের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব, আমাদের প্রত্যেকেরই সেই এক জ্যোতির্ময় আত্মা রয়েছে। আসুন আমরা একে বিশ্বাস করি। নচিকেতার মত বিশ্বাস রাখুন। পিতার উৎসর্গের সময়, নচিকেতার বিশ্বাস উৎপত্তি হয়েছিল। আমার কামনা আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশ্বাস উদ্রেক হোক। আপনারা প্রত্যেকে দৈত্যের মত ঊর্ধ্বে দাঁড়াবেন, এক বিশাল ধীশক্তির অধিকারী বিশ্ব পরিচালক, সর্বক্ষেত্রে এক অসীম ঈশ্বররূপে। আপনারা এরকম হোন, আমি তাই চাই। এই শক্তি আপনারা উপনিষদের থেকে পাবেন, এই বিশ্বাস সেখান থেকে মিলবে।

হায়, কিন্তু এটি কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল! রহস্য (গুপ্ত)। উপনিষদ ছিল সন্ন্যাসীর অধিকারে, তিনি বনগমন করলেন। শঙ্কর সামান্য দয়ালু ছিলেন, এবং বললেন যে এমন কি গৃহস্থরাও উপনিষদ পাঠ করতে পারে। এর ফলে তাদের উপকার হবে। এটি তাদের ক্ষতি করবে না। কিন্তু এখনও ধারণা রয়েছে যে উপনিষদে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের অরণ্য-জীবনের কথা বলা হয়েছে। আপনাদের এর আগে একদিন বলেছিলাম যে বেদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা মাত্র একবারই দেওয়া হয়েছে। সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, গীতাতে—বেদ তাঁরই প্রত্যাদেশ। সেখানে বলা হয়েছে এই ধর্মশাস্ত্র সমস্ত পেশার লোকের জন্য, প্রত্যেকের জন্য। বেদান্তের এই মতবাদগুলিকে প্রকাশ করতে হবে, শুধু অরণ্যের, গুহার অভ্যন্তরেই তারা থাকবে না, সমাজের প্রতিটি সংগঠনে, আদালতে, ধর্মমঞ্চে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, যে জেলে মাছ ধরছে তাদের মধ্যে, অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে প্রচারিত হবে। জীবিকা নির্বিশেষে প্রতিটি নরনারী, শিশুকে এই মতবাদগুলি আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ভয় করার কি আছে! জেলেরা ও এরা সবাই কি করে উপনিষদের আদর্শগুলিকে রূপায়িত করবে? পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি অসীম, ধর্ম অসীম, এর বাইরে কেউ যেতে পারে না, এবং একাগ্রচিত্তে যাকিছু করবেন সবই আপনাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। এমন কি সুসম্পাদিত যৎসামান্য কাজও চমৎকার ফল দেয়, সুতরাং প্রত্যেককে তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজটুকু করতে দিন। যদি জেলেটি ভাবে যে সে এক অদৃশ্য শক্তি (আত্মা) তাহলে সে আরও ভালো জেলে হবে, যদি ছাত্রটি ভাবে সে এক অদৃশ্য শক্তি তাহলে সে আরও ভালো ছাত্র হবে। যদি আইনজীবী ভাবে সে এক আত্মা তাহলে সে ভালো আইনজীবী হবে। এরফলে বর্ণপ্রথা চিরকাল থাকবে। সমাজের প্রকৃতিই হল বিভিন্ন গোষ্ঠী সৃষ্টি করা, যা চলবে তা হবে এই সুবিধাগুলি। বর্ণ এক প্রাকৃতিক নিয়ম। সমাজজীবনে আমি একটি কাজ করতে পারি, আপনি আর একটি পারেন। আপনি একটি দেশ শাসন করতে পারেন, আমি একজোড়া পুরোনো জুতো সেলাই করতে পারি, কিন্তু তাই বলে যে আপনি আমার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তা নয়। কারণ আপনি কি আমার মতো জুতো সেলাই করতে পারবেন? আমি কি দেশ শাসন করতে পারবো? আমি জুতো সেলাই করতে দক্ষ, আপনি বেদ পাঠে দক্ষ, কিন্তু সেজন্য আপনি আমার মাথা মাড়িয়ে যেতে পারেন না। একজন যদি খুন করে তাহলে কেন সে প্রশংসিত হবে এবং আর একজন চুরি করলে কেনই বা তাকে ফাঁসিকাঠে লটকানো হবে? এ ব্যবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। বর্ণ ভালো। জীবনের সমস্যা সমাধানে এই একমাত্র সহজ পথ। মানুষকে দল তৈরী করতেই হবে এবং আপনি তা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। যেখানেই যাবেন সেখানেই বর্ণ থাকবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এধরনের বিশেষ সুবিধাগুলিও থাকবে। তাদের মাথায় আঘাত হানতে হবে। জেলেকে যদি বেদান্ত শেখান তাহলে সে বলবে আমি তোমারই মত ভালো লোক। আমি জেলে, তুমি দার্শনিক। কিন্তু তোমার মধ্যে যে ভগবান আছেন তিনি আমার মধ্যেও রয়েছেন। আমরা তাই চাই। কাউকে সুবিধা দেওয়া হবে না, প্রত্যেকে সমান

সুযোগ পাবে। প্রত্যেককে শিখতে দিন যে ঈশ্বর অন্তঃস্থলেই আছেন, তাহলে প্রত্যেকেই তার নিজের মোক্ষের পথ খুঁজে নেবে।

বিকাশের প্রথম শর্ত হল স্বাধীনতা। কেউ যদি দম্ভ করে বলে "আমি এই নারী অথবা শিশুটির মোক্ষের পথ তৈরী করে দেব" তাহলে সেকথা মিথ্যা, হাজারবার মিথ্যা। আমাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বিধবা-সমস্যা আর নারীদের বিষয় সম্পর্কে আমার কি ধারণা। আমি একবারই উত্তর দেব—আমি কি বিধবা যে এসব অর্থহীন প্রশ্ন আমাকে করছেন? আমি কি মহিলা যে আমাকে বারবার এই প্রশ্ন করছেন? আপনারা নারী-সমস্যা সমাধান খুঁজে বার করার কে? আপনারা কি প্রভু ঈশ্বর যে প্রতিটি বিধবা, প্রতিটি নারীর উপর ক্ষমতা জাহির করবেন? হাত সরিয়ে নিন। তাঁদের সমস্যা তাঁরাই সমাধান করবেন। স্বেচ্ছাচারীরা, আপনারা ভাবতে চাইছেন, যে কোন লোকের যে কোন কাজ আপনারা করে দিতে পারেন। হাত সরিয়ে নিন। ঈশ্বর সকলকেই দেখবেন। আপনারা সব জানেন এ কথা ভাবার কোন অধিকার আপনাদের আছে? হায় অধার্মিকরা কি করে ভাবলেন যে ঈশ্বরের উপরেও আপনাদের অধিকার জন্মেছে? আপনারা কি জানেন না যে প্রতিটি আত্মাই ঈশ্বরের আত্মা? নিজের ধর্মের কথা ভাবুন। অনেক কর্ম আপনাকে সম্পাদন করতে হবে। জাতি আপনাকে উচ্চাসনে বসাতে পারে, সমাজ গগনচুম্বী উৎসাহ দিতে পারে, মূর্খরা প্রশংসা করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর ঘুমিয়ে নেই, ফল ভোগ আপনাদের করতেই হবে, এখনই হোক অথবা পরেই হোক।

প্রতিটি নরনারী এবং প্রত্যেককে ঈশ্বর রূপে দেখুন। কাউকে সাহায্য আপনি করতে পারেন না, আপনি শুধু সেবা করতে পারেন, ঈশ্বরের সন্তানদের সেবা করুন, যদি সুযোগ থাকে স্বয়ং ঈশ্বরকে সেবা করুন। ঈশ্বর যদি তার সন্তানদের যে কোন একজনকে সেবা করার সুযোগ আপনাকে দেন তাহলে আপনি ধন্য। নিজেদের সম্বন্ধে বিরাট কিছু ভাববেন না। সে সুযোগ অন্য কেউ না পেয়ে আপনি পেয়েছেন এজন্য আপনি ধন্য। পূজার মত করেই সেবা করুন। আমাকে দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে হবে এবং নিজের মোক্ষের জন্যই আমি তাদের পূজা করবো। দরিদ্র ও দুঃস্থদের সেবা করতে হবে যাতে উন্মাদ, অসুস্থ, কুষ্ঠরোগী এবং পাপী প্রভৃতি বিভিন্নরূপে আগত ঈশ্বরের সেবা আমরা করতে পারি। আমার কথা দুঃসাহসিক শোনাচ্ছে, তবুও আবার বলছি ঈশ্বরকে বিভিন্ন রূপে সেবা করতে পারাই আমাদের মহৎ ভাগ্য। অন্যের উপর কর্তৃত্ব করে তাদের উপকার করছেন, এ ধারণা ত্যাগ করুন। একটি চারাগাছকে আপনি যতটা সাহায্য করতে পারেন ঠিক ততটাই এক্ষেত্রে আপনার করণীয়। অঙ্কুরিত বীজকে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগাতে পারেন, তার প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস, মাটি তাকে দিতে পারেন। সেই অঙ্কুরিত বীজ আপনা হতেই তার প্রয়োজনীয় রসদ গ্রহণ করবে, সেগুলি নিশ্চিত করে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বেড়ে উঠবে।

পৃথিবীতে আলো আনুন। আলো, আলো আনতে হবে। প্রত্যেকের কাছে সেই আলো পৌঁছে দিন। যতক্ষণ প্রতিটি লোকের ঈশ্বর-উপলব্ধি না হচ্ছে

ততক্ষণ সে কাজ সম্পূর্ণ হবে না। দরিদ্রদের আলো দেখান, আরও আলো দেখান ধনীদের, কারণ দরিদ্রের তুলনায় তাদের প্রয়োজন অনেক বেশী। অজ্ঞ ব্যক্তিদের আলো দেখান, বেশী করে দেখান শিক্ষিতদের, কারণ আমাদের যুগে শিক্ষার অহঙ্কার অত্যন্ত প্রবল। এইভাবে প্রত্যেকের কাছে আলোকবার্তা পৌঁছে দিন, বাকিটুকুর ভার ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করুন। কারণ তিনিই বলেছেন: "কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।" "তোমার কাজ যেন তোমার জন্যই ফল প্রসব না করে, একইভাবে তুমি যেন কখনও কর্মচ্যুত না হও।" যে ঐশ্বরিক সত্তা বহু যুগ আগে আমাদের পিতৃ-পুরুষদের এইসব মহান ভাবধারায় দীক্ষিত করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর আদেশ পালনের শক্তি আমাদের দেন।

ভারতবর্ষের সাধকদের কথা বলতে গিয়ে আমার মন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে চলে। অতীতের অন্ধকার থেকে রহস্যোদ্ঘাটনের বৃথা চেষ্টা করে ঐতিহ্য। ভারতীয় সাধকদের সংখ্যা প্রায় অগণ্য। হাজার বছর ধরে সাধক সৃষ্টি করা ছাড়া হিন্দুজাতি আর কি করেছে? সুতরাং এদের মধ্যে কয়েকজন অত্যুজ্জ্বল যুগস্রষ্টা মহাপুরুষদের জীবনী আজ আলোচনা করবো। আমার নিরীক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের উপস্থাপিত করবো।

প্রথমতঃ আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলি বিষয়ে সামান্য কিছু বোঝার আছে। সত্যের দুটি আদর্শ আমাদের ধর্মশাস্ত্রে রয়েছে। প্রথমটি শাশ্বত, দ্বিতীয়টি তত প্রামাণ্য না হলেও স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে প্রযোজ্য।

আমরা যাকে শ্রুতি বা বেদ বলি তাতে আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ এবং আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রভৃতি শাশ্বত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সত্যগুলিকে আমরা স্মৃতি বলে থাকি, এগুলি রূপায়িত হয়েছে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য লেখকদের রচনায় এবং পুরাণ থেকে সুরু করে তন্ত্রগুলিতে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থ ও তাদের বাণীগুলি শ্রুতির অধীনস্থ। যেহেতু এগুলির একটিও যখন শ্রুতির কোন তত্ত্বের বিরোধিতা করে তখন শ্রুতিকেই প্রামাণ্য ধরে নেওয়া হয়। এই হল নিয়ম। মূল ধারণাটি হল এই যে অদৃষ্টের কাঠামো ও মানুষের লক্ষ্য এ সবই বেদে লেখা আছে। স্মৃতি ও পুরাণকে খুঁটিনাটি বিষয়গুলির আলোচনার ভার দেওয়া হয়েছে। সাধারণ নির্দেশনার বিষয়ে শ্রুতিই যথেষ্ট। আধ্যাত্মিক জীবন প্রসঙ্গে এর অধিক কিছু বলার নেই, এর বেশী কিছু জানা যায় না। যা কিছু প্রয়োজনীয় তা জানা গেছে, আত্মাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাবার জন্য যা কিছু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন সবই শ্রুতিতে সম্পূর্ণ রয়েছে। শুধু বিশদ ব্যাখ্যাগুলি করা হয়নি এবং স্মৃতিই সময় সময় এই ব্যাখ্যা দিয়েছে।

আর একটি অদ্ভুত বিষয় হল যে এই শ্রুতিগুলিতে বহু সাধকের কথা বলা হয়েছে যাঁরা এর সত্যগুলির সংরক্ষণ করেছেন। এঁদের অধিকাংশই পুরুষ, এমনকি কিছু মহিলাও রয়েছেন। তাঁদের ব্যক্তিত্ব, তাঁদের জন্ম-তারিখ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা গেছে, কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার রক্ষিত হয়েছে আমাদের দেশের পবিত্র সাহিত্য বেদে। অপরপক্ষে স্মৃতিতে ব্যক্তিত্বগুলি অধিক প্রকট হয়েছে। চমকপ্রদ, বিশাল, আকর্ষণীয়, চরিত্রের বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করা যেন সর্বপ্রথম আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের বাণীর তুলনায় তাঁদের ব্যক্তিত্বগুলি অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

এই অদ্ভুত বিষয়টিকে আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে আমাদের ধর্মে এক নির্বিশেষ সগুণ ঈশ্বরের কথা বলা হয়। যে কোন পরিমাণের নির্বিশেষ নীতি এটি প্রচার করে সঙ্গে সঙ্গে সগুণের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধর্মের উৎসমূখ হল শ্রুতি বা বেদ, সেগুলি একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাব দেখি স্মৃতি ও পুরাণগুলিতে—তাঁরা হলেন মহান অবতার, ভগবানের বিমূর্তরূপ, সাধক

ইত্যাদি। এটিও লক্ষ্য করতে হবে যে একমাত্র আমাদের ধর্ম ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত ধর্মমতই কোন একজন প্রতিষ্ঠাতা অথবা প্রতিষ্ঠাতাগণের জীবনীর উপর নির্ভরশীল।

খ্রীষ্টধর্ম গড়ে উঠেছে যীশুখ্রীষ্টের জীবনকে কেন্দ্র করে, মুসলিম ধর্ম মহম্মদের জীবনী ভিত্তিক, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধকে কেন্দ্র করে এবং জৈনধর্ম জৈনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। স্বভাবতই অনুমান করা চলে যে এইসব মহাপুরুষদের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নিয়ে এইসব ধর্মগুলিতে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ হয়েছে। যদি কোন সময়ে এঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কিত ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে ধর্মের সমস্ত সৌধটি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হবে। আমরা এই আশঙ্কা এড়াতে পেরেছি কারণ আমাদের ধর্ম ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়, নীতিভিত্তিক। মুনিবাক্য বলে আপনি আপনার ধর্ম মেনে চলেন তা নয়, না, কৃষ্ণের কোন অবতার বেদের উদ্গাতা নন। বেদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞা। তাঁর মহিমা হল তিনি বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। অন্যান্য অবতারদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, আমাদের সমস্ত সাধকদের ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের প্রথম নীতি হল মানুষের পূর্ণতার জন্য, মোক্ষলাভের জন্য, যা কিছু প্রয়োজন তা সবই বেদে রয়েছে। নতুন কিছু আপনি খুঁজে পাবেন না। একটি নিখুঁত ঐক্য যা সমস্ত জ্ঞানের লক্ষ্য, তার বাইরে আপনি যেতে পারেন না। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই উপনীত হওয়া গেছে, এবং এই ঐক্যের বাইরে যাওয়া অসম্ভব। ধর্মীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ হল 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমিই সে) আবিষ্কারের মাধ্যমে এবং সেটি বেদে ছিল। যা অবশিষ্ট রইল তা হল জনগণকে বিভিন্ন সময়, স্থান কাল ভেদে, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ভেদে পথপ্রদর্শন। জনগণকে অতি প্রাচীন পথে পরিচালিত করার প্রয়োজন হল, সেজন্যই এইসব মহান শিক্ষকরা, মহান ঋষিরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, এই তাৎপর্যের তদপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রকাশ অন্য কোথাও দেখা যায় না। "যখনই ধর্ম কলুষিত হবে, অধর্ম প্রকট হবে, তখনই সাধুজনের রক্ষার্থে আমি আবির্ভূত হই ; সমস্ত অনাচার ধ্বংস করার জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম নিই।" এই হল ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারণা।

কি প্রমাণিত হল? একদিকে রয়েছে এই সমস্ত শাশ্বত নীতিগুলি যা একান্ত স্বনির্ভর, এমন কি কোন যুক্তির মুখাপেক্ষী নয়। যত বড় সাধকই হোন না কেন, যত শ্রেষ্ঠ অবতারই হোন না কেন তাঁদের উপর এই নীতিগুলি আরও কম নির্ভরশীল। আমরা মন্তব্য করতে পারি যেহেতু ভারতবর্ষে এই চমৎকার অবস্থা বিদ্যমান সেজন্য আমাদের দাবি হল বেদান্তই একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম হতে পারে এবং ইতিমধ্যেই এটি সার্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়েছে, কারণ এ ধর্ম নীতিশিক্ষা দেয়, ব্যক্তি বিশেষের কথা বলে না। যে ধর্ম ব্যক্তি-নির্ভর সমগ্র মানবজাতি কখনই একটি আদর্শ হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে পারে না। দেখতে পাই আমাদের দেশে এতগুলি মহাপুরুষের আর্বিভাব হয়েছে। এমন কি একটি ক্ষুদ্র শহরেও বিভিন্ন মানসিকতার লোক বহু ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। কি করে সম্ভব যে একজন মহম্মদ অথবা বুদ্ধ অথবা খ্রীষ্ট সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র আদর্শ হিসাবে পরিগণিত

হবেন ? কি করে সম্ভব যে ঐ একজন মাত্র লোকের সম্মতিতে সমস্ত নীতি, নীতিশাস্ত্র, আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্ম সত্য বলে পরিচিত হবে ? এমন কোন ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্বের প্রয়োজন বৈদিক ধর্মে নেই। মানুষের সনাতন প্রকৃতিই এর স্বীকৃতি, এর নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত মানুষের চিরকালীন আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপর এর অস্তিত্ব বিদ্যমান, একে নতুন করে পেতে হবে না। অপর পক্ষে অনাদি কাল থেকে আমাদের সাধকরা এই তথ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন যে মানবজাতির বড় অংশেরই একটি ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। এক সগুণ ঈশ্বর তাদের থাকা চাই, কোন না কোন রূপে। যে বুদ্ধ সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর শিষ্যরা তাঁকেই এক সগুণ ঈশ্বরে রূপায়িত করলেন। সগুণ ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও জানি যে সগুণ ঈশ্বরের ব্যর্থ কল্পনা, যা নাকি শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের পূজার অযোগ্য, তার পরিবর্তে অথবা তুলনায় উৎকৃষ্টতর জীবন্ত দেবতাদের এই পৃথিবীতেই আমরা পাই, তারা আমাদের মধ্যেই বসবাস করছেন, যখন তখন চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন। কল্পনায় ঈশ্বরের তুলনায় অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যে কোন ধারণাই করি না, তার তুলনায় এঁরা অনেক বেশী পূজনীয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার আমার যা ধারণা থাকতে পারে তার তুলনায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক শ্রেষ্ঠ। আপনি আমি মনে মনে যে আদর্শের কথা কল্পনা করতে পারি তার তুলনায় বুদ্ধ অনেক মহত্তর আদর্শ, অনেক সজীব আদর্শ। সে কারণেই এমনকি সমস্ত কাল্পনিক দেবদেবীর পরিবর্তে তাঁরাই মানুষের কাছ থেকে বেশী পূজা আদায় করেছেন।

এ জিনিস আপনাদের সাধকরা জানতেন, সেজন্য সমস্ত ভারতবর্ষের লোককে এ ধরনের মহাপুরুষদের, অবতারদের পূজা অবাধে করতে দিয়েছেন। এমনকি অবতারশ্রেষ্ঠ বলছেন: "যখনই বাইরের মানুষ এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রকাশ করবে, জেনো আমি সেখানে আছি, তার কারণ আমিই ঐ উৎকৃষ্ট প্রকাশের উৎস।" এর ফলে পৃথিবীর সকল অবতারকে পূজা করার অবাধ সুযোগ হিন্দুরা পেল। হিন্দুরা যে কোন দেশের যে কোন সাধু বা সন্তকে পূজা করতে পারে। বস্তুত আমরা জানি যে খ্রীষ্টানদের উপাসনা মন্দিরে, মুসলমানদের মসজিদে গিয়ে আমরা বহুবার পূজা করি, এবং তা করা ভালো। কেন করবো না ? আমি আগেই বলেছি আমাদের ধর্ম বিশ্বজনীন। সমস্ত আদর্শগুলিকে স্থান দেবার পক্ষে এ ধর্ম যথেষ্ট দীর্ঘ পরিসর, যথেষ্ট ব্যাপক। যে সকল আদর্শ পৃথিবীতে বিদ্যমান, তাদের এখনই অন্তর্ভুক্ত করা চলে এবং আমরা আগামীদিনের আদর্শগুলির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি, যেগুলি একইভাবে গৃহীত হবে, বেদান্তের অসীম বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়বে।

মহাসাধক, ভগবানের অবতারদের বিষয়ে মোটামুটিভাবে এই হল আমাদের মনোভাব। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্বও রয়েছে। বেদান্তে বারবার 'ঋষি' শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাই, আধুনিক যুগে এটি একটি প্রচলিত শব্দে পরিণত হয়েছে।

ঋষি হলেন মহাজ্ঞানী। এই ধারণাটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে ঋষি হলেন মন্ত্রদ্রষ্টা অথবা চিন্তার দ্রষ্টা। অনেক কাল আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ধর্মের প্রমাণ কি? ইন্দ্রিয়গোচর কোন প্রমাণ নেই—এই ছিল উত্তর। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—লক্ষ্যে না পৌঁছে যেখান থেকে বাক্য প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগগচ্ছতি নো মনঃ"—চোখ সেখানে পৌঁছতে পারে না, বাক্যও নয়, মনও নয়। বহু যুগ ধরে এই ঘোষণাই করা হয়েছিল। আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে, অক্ষয় জীবন সম্পর্কে, মানুষের লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বহিঃপ্রকৃতি কোন উত্তর দিতে পারে না। এই মন নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, সর্বদা চঞ্চলাবস্থায় রয়েছে, এটি সসীম, বহু খণ্ডে বিভক্ত। প্রকৃতি কি করে অসীম, অপরিবর্তনীয়, অখণ্ড, অবিভাজ্য, চিরস্থায়ী সত্তার কথা বলবে? তা সে কখনই পারে না। যখনই মানুষ মৃত জড়ের কাছে উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করেছে, তার ফলাফল যে কত মারাত্মক হয়েছে সে প্রমাণ ইতিহাস আমাদের দেয়। তাহলে বেদের জ্ঞান কোথা থেকে আসে? ঋষি হতে পারলে তবেই সে জ্ঞান লাভ করা চলে। এ জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে নেই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ই কি মানুষের সর্বেসর্বা, একমাত্র পরিণতি? আমরা যারা এখানে রয়েছি তাদের প্রত্যেকের জীবনেও কিছু শান্ত মুহূর্ত আসে যখন হয়ত কোন প্রিয়জনকে আমরা মরতে দেখি, যখন কোন আঘাত পাই, অথবা যখন কোন চূড়ান্ত আশীর্বাদ লাভ করি। আরো অনেক সময় আছে যখন মন যেন শান্ত হয়, কিছু সময়ের জন্য এর প্রকৃত প্রকৃতি উপলব্ধি করে।

সে মুহূর্তগুলিতে সীমা বহির্ভূত অসীম, যেখানে বাক্য পৌঁছায় না, এমন কি মনও নয়, তার কিয়দংশ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনে এরকম ঘটে কিন্তু এই মুহূর্তগুলিকে আরও দীর্ঘতর করতে হবে, অনুশীলন করতে হবে, বিশুদ্ধ করতে হবে। বহু যুগ আগে মানুষ আবিষ্কার করেছিলেন যে আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাঁধা নয়, ইন্দ্রিয় একে সীমিত করতে পারে না, এমন কি চৈতন্যও নয়। সত্তা চৈতন্যের সমগোত্রীয় নয়, কিন্তু চৈতন্য সত্তার অংশমাত্র। নির্ভীক ব্যক্তিরা চৈতন্যের গণ্ডীর বাইরে অনুসন্ধান করেন। আধ্যাত্মিক জগতের সত্যে পৌঁছতে গেলে মানুষকে ইন্দ্রিয় জগতের বাইরে যেতেই হবে। এমন কি এখনও অনেকে আছেন যাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম করতে সমর্থ হন। এঁদের ঋষি বলা হয়, কারণ এঁরা আধ্যাত্মিক সত্যের মুখোমুখি হন।

সুতরাং, আমার সামনে যে টেবিল রয়েছে তার যেমন প্রমাণ আছে, বেদেরও তেমনি প্রমাণ রয়েছে। তা হল প্রত্যক্ষ, সরাসরি নিরীক্ষণ। টেবিলটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এবং আধ্যাত্মিকতার সত্যগুলিকে দেখা যায় মানবাত্মার তুরীয় অবস্থায় (superconcious state)। ঋষি-অবস্থা কোন সময় বা স্থান, লিঙ্গ অথবা সম্প্রদায়ের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বাৎস্যায়ন সগর্বে ঘোষণা করেছেন যে ঋষিত্ব হল সাধকদের উত্তরসূরিদের সাধারণ সম্পত্তি, আর্যদের, অনার্যদের এমন কি ম্লেচ্ছদেরও। এই হল বৈদিক সাধকের নির্দশন

এবং ভারতবর্ষে ধর্মের এই আদর্শকে আমাদের মনে রাখতেই হবে। আমার ইচ্ছা পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিও এ কথা স্মরণে রাখুক এবং শিখুক যাতে যুদ্ধ আর বিবাদের সংখ্যা কমে। ধর্মের অস্তিত্ব গ্রন্থে নয়, তত্ত্বে নয়, গোঁড়া মতবাদে নয়, বক্তৃতায় নয়, এমন কি যুক্তিতেও নয়। এটি হল সত্তা ও পরিণতি (being and becoming)। আমার বন্ধুগণ, যতক্ষণ না আপনাদের প্রত্যেকে ঋষিতে পরিণত হচ্ছেন এবং আধ্যাত্মিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন, ততক্ষণ আপনাদের ধর্মীয় জীবন শুরু হয়নি। যতক্ষণ না তুরীয় অবস্থায় পৌছচ্ছেন, ততক্ষণ ধর্ম বাক্যসমষ্টি মাত্র, প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক কথা আপনারা বলছেন এবং এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনাকালে বুদ্ধের সেই চমৎকার উক্তিটি মনে পড়ে। তারা এসেছিলেন ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতে করতে। সেই মহাতপস্বী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন —"আপনারা কি ব্রহ্মকে দেখেছেন ?" ব্রাহ্মণরা বললেন "না"। "আপনাদের পিতা দেখেছেন ?" "না তিনিও দেখেন নি"। "অথবা আপনাদের পিতামহ ?" "মনে হয় না যে তিনিও তাকে দেখেছিলেন।" "বন্ধুগণ, যে ব্যক্তিকে আপনারা ও আপনাদের পিতা-পিতামহরা দেখেন নি তার সম্বন্ধে আপনারা কি করে আলোচনা করেন, একজন আর একজনকে অবদমিত করতে চান ?" সমস্ত পৃথিবী তাই করছে। আসুন বেদান্তের ভাষায় আমরা বলি—"অতিরিক্ত আলোচনার মাধ্যমে আত্মাকে পাওয়া যায় না, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি দিয়ে এমন কি বেদ পাঠের মাধ্যমেও তাকে উপলব্ধি করা যায় না।"

আসুন বেদের ভাষায় আমরা পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সম্বোধন করি : তোমাদের বাগবিতণ্ডা নিরর্থক। যে ঈশ্বরের কথা প্রচার করতে চাও তাকে দেখেছ কি ? যদি না দেখে থাকো তাহলে তোমাদের প্রচার নিরর্থক, তোমরা জানো না তোমরা কি বলছো। যদি ঈশ্বরের দেখা পাও তাহলে তোমরা ঝগড়া করবে না, তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। উপনিষদের বর্ণিত এক প্রাচীন সাধু তার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য পাঠালেন। সে ফিরে আসতে পিতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি শিখেছ ?" শিশুটি উত্তর দিল সে অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। পিতা বললেন— "ওগুলি কিছু নয়, ফিরে যাও।" ছেলেটি ফিরে গেল এবং দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের সময় পিতা পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন এবং পুত্রও একই উত্তর দিল। আবার তাকে ফিরতে হল। তৃতীয়বার সে যখন ফিরে আসল তখন তার সমস্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার পিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"বালক, ব্রহ্মজ্ঞানীর মত তোমার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়েছে।" আপনার যখন ঈশ্বরোপলব্ধি হয়, তখন আপনার মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হবে, কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হবে, এমন কি আপনার সমস্ত চেহারাটিই পাল্টে যাবে। মানবজাতির কাছে আপনি আশীর্বাদ স্বরূপ হবেন, কেউ ঋষিকে বাধা দিতে পারবে না। এই হল ঋষিত্ব, আমাদের ধর্মের আদর্শ। বাকিগুলি অর্থাৎ এইসব আলোচনা, বিতর্ক, দার্শনিক তত্ত্ব, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, এমন কি স্বয়ং বেদও প্রস্তুতিপর্ব মাত্র, অপ্রধান বস্তু। অন্যটি হল প্রাথমিক বিষয়। বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা এ সবই অপ্রধান বিষয়বস্তু। সেই হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যা আমাদের

'অপরিবর্তনীয় সত্তাকে' উপলব্ধি করতে শেখায়। যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁরা হলেন বেদে বর্ণিত সাধকবৃন্দ। আমরা উপলব্ধি করি কিভাবে ঋষি বলতে একটি গোষ্ঠীর, আদর্শের নাম বুঝায়, যা প্রকৃত হিন্দু হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের কোন এক সময়ে হওয়ার কথা, এবং হিন্দুর কাছে যা হওয়ার অর্থ মোক্ষলাভ। মতবাদে বিশ্বাস নয়, শত শত মন্দিরে গমন নয়, পৃথিবীর সমস্ত নদীতে স্নান করা নয়, ঋষি হওয়া, মন্ত্রদ্রষ্টা হওয়াই হল মোক্ষলাভ। পরবর্তী যুগে অনেক মহা-সাধকদের আবির্ভাব হয়েছে, শ্রেষ্ঠ অবতার, যাদের সংখ্যা অনেক ছিল। ভাগবতের মতানুযায়ী এই সাধক, অবতারদের সংখ্যা অগণ্য এবং ভারতবর্ষে যে দুজনের পূজা সর্বাধিক প্রচলিত তারা হলেন রাম এবং কৃষ্ণ। রাম হলেন প্রাচীন শৌর্যময় যুগের আদর্শ, সত্যে, ন্যায়ের প্রতিমূর্তি, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা এবং সর্বোপরি আদর্শ নৃপতি। এই রামকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন বাল্মীকি। রামের জীবনী কবি যে ভাষায় লিখেছেন তার চেয়ে পবিত্র, সুকুমার, সুন্দর অথচ একইভাবে সহজতর অন্য কোন ভাষা হতে পারে না। সীতার কথাই বা নতুন করে কি বলার আছে? পৃথিবীর অতীত সমস্ত সাহিত্য খুঁজে দেখুন, এমন কি আমি জোর গলায় বলতে পারি আগামী দিনের সাহিত্য সমস্ত পড়ে শেষ করেও আর একটি সীতা খুঁজে পাবেন না। সীতা অনন্যা, সে চরিত্র একবার এবং ঐ শেষ বারের মত বর্ণিত হয়েছিল। অনেক রামের দেখা হয়ত পাওয়া যেত, কিন্তু সীতা একজনের অধিক ছিল না। তিনি হলেন ভারতীয় নারীর আদর্শ রূপ, কারণ বিশুদ্ধ রমণী সম্পর্কে যে ভারতীয় আদর্শগুলি আছে তা সবই গড়ে উঠেছে ঐ এক সীতার জীবনীকে কেন্দ্র করে। হাজার বছর ধরে তিনি আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, আর্যাবর্তের সমস্ত অঞ্চলের প্রতিটি নরনারী শিশুর তিনি পূজনীয়া।

ঐ শ্রদ্ধার আসনেই চিরদিন আসীন থাকবেন, আমাদের মহীয়সী সীতা, পবিত্রতার তুলনায় পবিত্র, ধৈর্য ও সহনশীলতার উজ্জ্বল নিদর্শন। যে সীতা তার দুঃখে-ভরা জীবন নীরবে সহ্য করেছেন, যিনি চিরপবিত্রা সহধর্মিণী, দেবতাদের আদর্শ, মানুষের আদর্শ, সেই মহীয়সী সীতা আমাদের জাতীয় দেবী, সকল সময়ই আমাদের মধ্যে থাকবেন। বেশী বর্ণনা দেবার কিছু নেই কারণ আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত। আমাদের সমস্ত পুরাণ লোপ পেতে পারে এমন কি বেদও, আমাদের সংস্কৃত ভাষাও চিরতরে বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পাঁচজন হিন্দুও এদেশে থাকবে, তারা সবচেয়ে অমার্জিত প্রাদেশিক ভাষায় কথা বললেও সীতার কাহিনী তার মধ্যে থাকবে। আমার বক্তব্য লক্ষ্য করবেন: সীতা আমাদের জাতির প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন। প্রতিটি হিন্দু নরনারীর শোণিতধারায় তিনি মিশে আছেন, আমরা তাঁরই সন্তান। সীতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে আমাদের নারীদের আধুনিকা করার যে কোন প্রয়াস সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হয়, আমরা তা প্রত্যহ দেখি। ভারতবর্ষে নারীরা সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই গড়ে উঠবেন, এবং এটিই একমাত্র পথ।

দ্বিতীয় জন হলেন তিনি যিনি বিভিন্ন রূপে পূজিত হন, তিনি নরনারীর প্রিয়

আদর্শ, শিশুদের, বয়স্কদের আদর্শ। আমি তাঁরই কথা বলছি যাঁকে ভাগবত রচয়িতা অবতার বলেও তুষ্ট নন, বরং বলেন: "অন্যান্য অবতারগণ জগদীশ্বরের অংশমাত্র। তিনি কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান।" তাঁর চরিত্রের বহুমুখিতা যখন আমাদের অবাক করে তখন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে যে তাঁকে এত বিশেষণ-ভূষিত করা হবে। তিনি ছিলেন একাধারে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং শ্রেষ্ঠ গৃহী। তাঁর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রজোগুণের শক্তির সমন্বয় ঘটেছে, তেমনি আবার সর্বাপেক্ষা সুন্দর ত্যাগের মধ্যে তিনি কালাতিপাত করেছেন। গীতা না পড়া পর্যন্ত আপনি কৃষ্ণচরিত্র কিছুতেই অনুধাবন করতে পারবেন না, কারণ তিনিই তাঁর বাণীর প্রতিমূর্তি। প্রত্যেক অবতারই সেইসব বাণীর প্রতিমূর্তি যা তাঁরা প্রচার করতে এসেছিলেন।

গীতার উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ আজীবন সেই পুণ্যগীতির বিমূর্ত রূপ ছিলেন। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তার জন্য কখনও অনুশোচনা করেন না। ভারতবর্ষের নেতা এই পুরুষ, যাঁর কথায় নৃপতিরা সিংহাসন ছেড়ে নেমে আসেন, তিনি স্বয়ং কখনও রাজপদ প্রার্থী নন। তিনি অতি সাধারণ কৃষ্ণ, চিরকালের সেই কৃষ্ণ যিনি গোপীদের সঙ্গে খেলেছিলেন। কি চমৎকার তার জীবনের সেই অংশটুকু, সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য, সম্পূর্ণ পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত যে অংশকে অনুধাবন করার চেষ্টা কোন ব্যক্তির করা উচিত নয়। প্রেমের সেই চমৎকার বিকাশ, বৃন্দাবনের লীলার রূপকের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়েছে! যিনি প্রেমে পাগল হয়েছেন, প্রেমসুরা আকণ্ঠ পান করেছেন একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এই লীলামাহাত্ম্য বুঝতে পারবেন না। নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শগোপীদের প্রেমযন্ত্রণা কে বুঝবেন? সে প্রেম স্বর্গেরও পরোয়া করে না, জগতের কোন কিছু অথবা পরজগতের কোন কিছুতেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বন্ধুগণ, গোপীদের এই প্রেমের মধ্যেই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের দ্বন্দ্বের একমাত্র সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা জানি কিভাবে সগুণ ঈশ্বর মনুষ্যজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল: আমরা জানি যে দার্শনিকতা হল বিশ্বপ্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস, বস্তুজগৎ যাঁর প্রকাশ মাত্র। একই সঙ্গে আমাদের আত্মা বিমূর্ত কিছু খুঁজে বেড়ায়, এমন কিছু যা আমরা অনুধাবন করতে পারি, যার চরণতলে আমরা আত্মনিবেদন করতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বর হলেন মনুষ্যপ্রকৃতির সর্বোত্তম ধারণা। অথচ যুক্তি এ বিষয়টিকে মেনে নিতে রাজী নয়। এটি হল সেই বহু প্রাচীন প্রশ্ন যা ব্রহ্মসূত্রে বারংবার আলোচিত হয়েছে দেখবেন, যে প্রশ্ন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অরণ্য মধ্যে আলোচনা করেছেন। যদি সগুণ, কৃপাময়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে তাহলে এই নরককুণ্ডবৎ পৃথিবী কেন রয়েছে, কেন তিনি একে সৃষ্টি করেছেন? তিনি নিশ্চয়ই পক্ষপাতদুষ্ট ঈশ্বর। এর কোন উত্তর ছিল না, এবং যে একটি সমাধান পাওয়া যাচ্ছে তা হল গোপীদের এই প্রেমকাহিনী। কৃষ্ণের নামের সঙ্গে যেসব বিশেষণাদি ব্যবহৃত হয় তার প্রত্যেকটিকে তারা ঘৃণা করত। তারা জানতে চাইত না যে কৃষ্ণ জগদীশ্বর, তারা জানতে চাইত না যে কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

শুধু যে বিষয়টি তারা বুঝতো তা হল কৃষ্ণ অসীম প্রেমময়, সেটুকুই সব। কৃষ্ণকে গোপীরা চিনত শুধু বৃন্দাবনের কৃষ্ণ হিসাবে। যে ব্যক্তি গো-পালকদের নেতা, নৃপতিশ্রেষ্ঠ, তিনি তাদের কাছে রাখাল বালক মাত্র, এবং চিরকালের রাখাল বালক। "আমি বিত্ত চাই না, অধিক পরিজন চাই না, শিক্ষা চাই না, এমন কি স্বর্গেও যেতে চাই না। আমাকে বারবার জন্ম নিতে দাও, কিন্তু প্রভু, শুধু এই প্রার্থনাটুকু পূরণ করো যেন প্রেমের জন্যই তোমার প্রতি আমার প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে।" ধর্মের ইতিহাসে এ এক বিরাট অধ্যায় যেখানে রচিত হল প্রেমের জন্য প্রেম, কর্মের জন্য কর্ম, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য, ইত্যাদি আদর্শ। এই আদর্শগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত হয়ে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঝরে পড়ল ভারতবর্ষের ভূমিতে। ভয় এবং প্রলোভনের ধর্ম চিরতরে বিদায় নিল এবং নরকের ভীতি ও স্বর্গসুখেরপ্রলোভন সত্ত্বেও, নিঃস্বার্থ প্রেম, নিষ্কাম কর্তব্য ও নিষ্কাম কর্মের মহান আদর্শগুলি জন্ম নিল।

কি চমৎকার সেই প্রেম! এইমাত্র আপনাদের বলেছি যে গোপীদের প্রেমের তাৎপর্য বোঝা কঠিন। এমন কি আমাদের মধ্যেও তেমন মূর্খের অভাব নেই যারা সেই চমৎকার উপাখ্যানগুলির অপূর্ব তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। আবার বলছি এমন কি আমাদের বংশজাত এমন অপবিত্র মূর্খও আছে যারা এই উপাখ্যানগুলিকে অপবিত্র ভেবে সঙ্কুচিত হয়। এদের প্রতি আমার শুধু একটি কথাই বলার আছে, সর্বপ্রথম নিজেরা পবিত্র হও; তোমাদের মনে রাখতে হবে যে গোপীদের এই প্রেমকাহিনীর রচয়িতা শুকদেব ছাড়া অন্য কেউ নন। যে ঐতিহাসিক গোপীদের চমৎকার এইসব প্রেমকাহিনীর লিপিকার তিনি জন্মপবিত্র; চিরপবিত্র শুক, ব্যাসের পুত্র। যতক্ষণ হৃদয়ে স্বার্থপরতা রয়েছে ততক্ষণ ভগবৎ প্রেম অসম্ভব; বাণিজ্য করা ছাড়া অন্য কিছু নয়—"আমি তোমাকে কিছু দিচ্ছি, হে প্রভু, বিনিময়ে তুমি আমাকে কিছু দাও।" ঈশ্বর বলছেন: "এইগুলি না করলে মৃত্যুর পর তোমার সুবন্দোবস্ত করবো। বাকী জীবন তোমায় নরকাগ্নিতে দগ্ধ করবো।" যতক্ষণ এসব ধারণা চিন্তায় থাকে, ততক্ষণ গোপীদের প্রেমোন্মাদনা কি করে বোঝা সম্ভব? "ঐ অধরের একটি, একটিমাত্র চুম্বন! যে তোমার চুম্বন পেয়েছে, তোমার প্রতি তার তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সব দুঃখ অপসৃত হয়, তোমারই জন্য, শুধু তোমার জন্য প্রভু, অন্য সবকিছুকে ভালোবাসতে সে ভুলে যায়।" সর্বপ্রথম অর্থের নিমিত্ত, সম্মান খ্যাতির এই কোলাহলমুখর পৃথিবীর জন্য আসক্তি ভুলতে হবে। শুধু তখনই গোপীদের প্রেমের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। এই প্রেম এত পবিত্র যে সর্বস্ব ত্যাগ না করতে পারলে একে উপলব্ধি করা যাবে না, উপলব্ধি করা যাবে না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত। যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে যৌনচিন্তা, অর্থচিন্তা, যশচিন্তা প্রতিমুহূর্তে স্ফুরিত হচ্ছে, গোপীপ্রেমের তাৎপর্য অনুধাবন করা, তার সমালোচনা করার কি অসীম স্পর্ধা তাদের! কৃষ্ণ অবতারের সারসত্তা ঐটি। এমন কি এই প্রেমোন্মাদনার সঙ্গে গীতার মত শ্রেষ্ঠ দর্শনেরও তুলনা চলে না। কারণ গীতায় ভগবান তাঁর শিষ্যকে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু এখানে দেখি উপভোগের উন্মাদনা, প্রেমের মাদকতা,

যে জায়গায় পৌছে শিষ্য, গুরু, শিক্ষা এবং পুঁথিপত্র সবকিছু মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এমন কি ভয়, ঈশ্বর, স্বর্গ ইত্যাদি ধারণাকেও বর্জন করা হয়েছে। যা রইল তা হল প্রেমের উন্মাদনা। এ হল সকল ভোলার খেলা, প্রেমিক শুধু কৃষ্ণকে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কিছুই দেখতে পান না, যখন সর্বভূতের অবয়বে কৃষ্ণ প্রতীয়মান হন, যখন প্রেমিকের নিজের মুখ কৃষ্ণরূপ ধারণ করে, যখন তার আত্মার বর্ণ মিশে যায় কৃষ্ণের শ্যামবর্ণের সঙ্গে। এই ছিলেন মহান কৃষ্ণ!

খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনাদের সময় নষ্ট করবেন না, কাঠামোটিকে, জীবনের সারাংশকে গ্রহণ করুন। ঐতিহাসিক তথ্যে অনেক গড়মিল থাকতে পারে, কৃষ্ণের জীবনীতে প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকতে পারে। এ সমস্ত কিছুই হয়ত সত্যি, কিন্তু একই ভাবে একথাও ঠিক যে এই বিস্ময়কর নতুনত্বের নিশ্চয়ই একটি ভিত্তি ছিল। অন্য যে কোন সাধক অথবা অবতারদের জীবনী হাতে নিলে আমরা দেখি যে সেই মহাপুরুষ আসলে তার পূর্ববর্তী ঘটনাক্রমের বিবর্তিত রূপমাত্র, এও দেখি যে সেই মহাপুরুষ তারই যুগে যেসব ধারণাগুলি তার দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেগুলিই প্রচার করছেন মাত্র। এমনকি সেই মহাপুরুষের অস্তিত্ব সম্পর্কেও গভীর সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু এমুহূর্তে আমি যে কাউকে আহ্বান জানাচ্ছি তিনি প্রমাণ করুন যে কাজের জন্য কাজ, ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য প্রভৃতি আদর্শের উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ নন, সুতরাং নিশ্চয়ই এমন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল যিনি এগুলির উদ্ভাবক।

এগুলি অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ধার করা বিষয় নয়। কৃষ্ণ যখন জন্ম নেন তখন এই ধারণাগুলি হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল না। বরং ভগবান কৃষ্ণই এগুলি প্রথম প্রচার করেন। তাঁর শিষ্য ব্যাসদেব তাঁর কাছ থেকে এগুলি গ্রহণ করে মানবজাতির উদ্দেশে প্রচার করেন। এটি হল কল্পনীয় শ্রেষ্ঠ ধারণা। যে শ্রেষ্ঠ বিষয়টি আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই তা হল গোপীজনবল্লভ, বৃন্দাবন গোপীদের প্রেমাস্পদ। যখন সেই উদ্দামতা আপনাদের মস্তিষ্কে আসবে, যখন আশীর্বাদ-ধন্য গোপীদের অনুধাবন করতে পারবেন তখনই উপলব্ধি করবেন প্রেম কি বস্তু। যখন সমস্ত পৃথিবী অদৃশ্য হবে, যখন অন্যান্য সকল চিন্তা বিলীন হবে, যখন আপনারা শুদ্ধচিত্ত হবেন, অন্য কোন লক্ষ্য থাকবে না, এমন কি সত্যানুসন্ধানও না—তখনই একমাত্র তখনই, আপনাদের মধ্যে প্রেমের উদ্দামতা জন্ম নেবে। জন্ম নেবে গোপীগণের সেই অসীম প্রেম, নিঃস্বার্থ প্রেমের শক্তি। এটিই হল লক্ষ্য। যখন সে লক্ষ্যে উপনীত হবেন, তখন আপনার সকল পাওয়া পূর্ণ হবে।

দ্বিতীয় স্তরে নামা যাক। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ। ভারতবর্ষে ইদানীং একটি প্রচেষ্টা চলেছে অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার মত। অনেক লোকের ধারণা গোপীগণের প্রেমিক কৃষ্ণ কিছুটা দুষ্টপ্রকৃতি বিশিষ্ট, এবং ইউরোপবাসীরা এটিকে খুব একটা পছন্দ করেন না। কোন এক ডক্টর (Dr Soandso) এটি অপছন্দ করেন। অতএব, গোপীদের অবশ্যই বিদায় নিতে হবে! ইউরোপীয়দের অনুমোদন ছাড়া কৃষ্ণ বাঁচেন কি করে? তিনি তা পারেন না! মহাভারতে গোপীদের কোন উল্লেখ

নেই দু-একটি জায়গা ছাড়া এবং সেগুলিও খুব একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নয়। দ্রৌপদীর প্রার্থনায় বৃন্দাবন জীবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং শিশুপালের ভাষণেও আবার বৃন্দাবন জীবনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এগুলি সবই প্রক্ষিপ্ত অংশ। ইউরোপীয়রা যা চায় না সেগুলি অবশ্যই বর্জন করতে হবে। ওগুলি সবই প্রক্ষিপ্ত অংশ, কৃষ্ণ ও গোপীদের উল্লেখটুকুও! ভালো কথা, এই আকণ্ঠ বাণিজ্যে-নিমগ্ন লোকগুলি, যাদের কাছে ধর্মের আদর্শও বাণিজ্যিক ব্যাপার, এরা সবাই এখানে কিছু করে স্বর্গে যেতে চাইছে। বেনে চায় চক্রবৃদ্ধি সুদ, এখানে কিছু লগ্নি করে অন্যত্র তার ফল ভোগ করতে চায়। সুতরাং একথা সুনিশ্চিত যে এ ধরনের চিন্তাধারায় গোপীদের কোন স্থান নেই। সেই আদর্শ প্রেমিক পর্যায় থেকে আমরা এবার কৃষ্ণের দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে আসছি—সেখানে তিনি গীতার প্রচারক। গীতার তুলনায় বেদের অধিক ভালো টীকা এখনও লেখা হয়নি, লেখা যাবে না। শ্রুতি অথবা উপনিষদের সারার্থ অত্যন্ত কঠিনবোধ্য। বিশেষতঃ সেখানে এতসংখ্যক ভাষ্যকার রয়েছেন এবং প্রত্যেকে তাঁর নিজের পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন। তারপর ঈশ্বর স্বয়ং এলেন। যে ব্যক্তি শ্রুতির প্রেরণাদান করেছেন, তিনি স্বয়ং গীতার প্রচারক হিসাবে এলেন আমাদের সেগুলির অর্থ বোঝাতে। এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা পদ্ধতি আজ ভারতবর্ষের অথবা পৃথিবীর প্রয়োজন নেই। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে শাস্ত্রগুলির পরবর্তী ভাষ্যকাররা এমনকি গীতার প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়েও, বহুক্ষেত্রে অর্থোদ্ধার করতে পারেননি। বহুক্ষেত্রে স্রোতটিকে ধরতে পারেননি। কারণ গীতায় আপনারা কি দেখতে পান এবং আধুনিক ভাষ্যকারদের মধ্যে? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার উপনিষদের একটি পুঁথি নিলেন; সেখানে অনেক দ্বৈতবাদী অংশ রয়েছে এবং তিনি সেগুলিকে দুমড়ে মুচড়ে একটি অর্থ দাঁড় করালেন এবং সবকটিকে তাঁর নিজের অর্থে টেনে আনতে চাইলেন। যদি একজন দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার আসেন তাহলে যে অদ্বৈতবাদী অংশ বেশ কিছুসংখ্যক রয়েছে সেগুলিকে দলা পাকিয়ে পুরোপুরি দ্বৈতবাদী অর্থে দাঁড় করালেন। কিন্তু আপনারা দেখেছেন গীতায় তাদের কোনটিকেই এরকম নিগৃহীত করার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। প্রভু বলেন সেগুলি সবই সঠিক, কারণ মানবাত্মা ধীরে ধীরে উন্নীত হয়ে, একটি ধাপ থেকে আর একটি ধাপে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরে, যতক্ষণ না সে পরমাত্মায়, লক্ষ্যে, উপনীত হচ্ছে। গীতায় এ জিনিসই রয়েছে। এমন কি কর্মকাণ্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে যদিও প্রত্যক্ষভাবে এটি আমাদের মোক্ষ এনে দিতে পারে না, শুধু পরোক্ষভাবেই পারে, তবুও এটি অখণ্ডনীয়। রূপকগুলি পরোক্ষভাবে অখণ্ডনীয়, যাগযজ্ঞ কাঠামো এসবই অখণ্ডনীয়, শুধু একটি শর্তসাপেক্ষ। তাহল চিত্তশুদ্ধি। কারণ পূজা বৈধ এবং তা লক্ষ্যে নিয়ে যায় যদি হৃদয় শুদ্ধ ও একনিষ্ঠ থাকে। এই বিভিন্ন ধরনের পূজা-পদ্ধতি প্রয়োজনীয়, তা না হলে সেগুলি ওখানে থাকবে কেন? ধর্ম এবং সম্প্রদায় কোন শঠ ও দুষ্ট চরিত্রের লোকেদের কীর্তি নয়, যারা কিছু অর্থ পাবার জন্য এগুলি আবিষ্কার করেছে। এগুলির উৎপত্তি আদৌ সেভাবে নয়। এগুলি হল মানুষের আত্মার প্রয়োজনের ফলস্বরূপ। এগুলি এখানে

রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর মানবমনের তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে এবং এগুলির বিরুদ্ধে মত প্রচার করার কোন প্রয়োজন নেই। একদিন আসবে যখন সে প্রয়োজন ফুরাবে, এবং প্রয়োজন ফুরানোর সাথে সাথে এগুলিও অদৃশ্য হবে। যতদিন সে প্রয়োজন রয়েছে ততদিন আপনাদের প্রচারকে, সমালোচনাকে উপেক্ষা করে তারা থাকবেই। আপনি তলোয়ার উন্মুক্ত করতে পারেন অথবা বন্দুক ধরতে পারেন, মানুষের রক্তে পৃথিবী ভাসাতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ মূর্তির প্রয়োজন ততক্ষণ তারা থাকবে। এই মূর্তিগুলি এবং ধর্মের অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়গুলি টিঁকে থাকবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে আমরা বুঝি কেন সেগুলি রয়ে যাবে। ভারতীয় ইতিহাসের একটি তুলনামূলকভাবে দুঃখজনক অধ্যায় এবার আসছে। গীতাতে এর মধ্যেই আমরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুদূর পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছি এবং প্রভু স্বয়ং এর মধ্যে এসে তাদের সকলকে একসূত্রে গেঁথেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। তিনি বলেন: "আমার মধ্যে সকলে বাঁধা পড়েছে সূতায় গাঁথা মুক্তের মত।" আমরা এরই মধ্যে দূরাগতধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, সেই দ্বন্দ্বের গুঞ্জন। সম্ভবত শান্তি ও ঐক্যের একটি সময় ছিল, তারপর যখন এই দ্বন্দ্ব নতুনভাবে শুরু হল, তখন শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়, খুব সম্ভবত জাতিগত কারণেও আমাদের দেশের দুই শক্তিশালী সম্প্রদায় রাজন্যবর্গ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। যে বিশাল ঢেউ ভারতবর্ষকে প্রায় হাজার বছর প্লাবিত করেছিল তার শীর্ষদেশ থেকে আমরা আর একজন উজ্জ্বল পুরুষকে দেখতে পাই এবং তিনি হলেন আমাদের গৌতম শাক্যমুনি। আপনারা সকলেই তাঁর বাণী ও প্রচারের কথা জানেন। আমরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠতম প্রচারক বলে থাকি। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। যেন নিজেরই শিষ্য রূপে, সেই কৃষ্ণ ফিরে এলেন তাঁর তত্ত্বগুলিকে কি ভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তা দেখাতে। সে কণ্ঠই আবার শোনা গেল যে কণ্ঠ গীতায় প্রচার করেছিল: "এমন কি এ ধর্ম সামান্যতম অনুসরণ করলেও গভীর আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।" নারী অথবা বৈশ্য এমন কি শূদ্রও প্রত্যেকেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। সমস্ত লোকের বন্ধন চূর্ণ করে, শৃঙ্খল মোচন করে, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সকলকে মুক্ত করে, গীতার বাণী ভেসে আসে, বজ্র গর্জনের মত শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শোনা যায়: "এমন কি এই জীবনেও তারা আপেক্ষিকতা জয় করেছে, যাদের চিত্ত সাদৃশ্যের উপর শক্তভাবে গাঁথা আছে। কারণ ঈশ্বর পবিত্র এবং সকলের কাছেই সমান, সুতরাং একমাত্র এধরনের ব্যক্তিরাই ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করেন একথা বলা হয়ে থাকে।" "সুতরাং একই ঈশ্বরকে সর্বত্র সমানভাবে উপস্থিত থাকতে দেখে সাধক কখনও পরম আত্মাকে আত্মা দিয়ে আঘাত হানেন না এবং এইভাবেই তিনি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছান।" যেন এই উপদেশগুলির সজীব উদাহরণ দিতেই, যেন এর অন্তত একটি অংশকেও বাস্তবায়িত করার জন্য প্রচারক স্বয়ং আর একটি রূপে আবির্ভূত হলেন এবং ইনি হলেন শাক্যমুনি, দরিদ্রদের এবং দুঃস্থদের মধ্যে যিনি প্রচার করেছিলেন। ইনি এমনকি দেবভাষাও পরিত্যাগ করেছিলেন জনসাধারণের ভাষায় কথা বলার জন্য, যাতে তিনি জনগণের

হৃদয় জয় করতে পারেন। ইনি সিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেন ভিক্ষুকদের সঙ্গে, দরিদ্রদের সঙ্গে, নিপীড়িতদের সঙ্গে থাকার জন্য। তিনিই দ্বিতীয় রামের মত পারিয়াকে বুকে চেপে ধরেছিলেন। আপনারা সবাই তাঁর মহৎ রচনার সঙ্গে, মহান চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু তাঁর রচনার একটি বড় ত্রুটি ছিল এবং তার জন্য এমনকি এখনও আমরা দুর্দশাভোগ করছি। প্রভু সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি পবিত্র এবং জ্যোতির্ময়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আর্যদের মধ্যে বসবাসকারী বহু অসভ্য ও অশিক্ষিত মানব-সম্প্রদায় এত গগনচুম্বী আদর্শগুলিকে ঠিকমত গুছিয়ে নিতে পারেনি। বহু কুসংস্কার ও হীন পূজা প্রভৃতিতে নিমগ্ন এই সম্প্রদায়গুলি আর্যদের জগতে ঢুকে পড়েছিল। এবং এক সময়ে মনে হয়েছিল যে তারা যেন সভ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার আগেই তারা তাদের সাপ, ভূত এবং তাদের পূর্বপুরুষদের পূজিত অন্যান্য বহু জিনিস প্রকাশ করলো। এইভাবেই সমগ্র ভারতবর্ষ এক হীন কুসংস্কারের স্তূপে পর্যবসিত হল। প্রথম দিকে বৌদ্ধরা পশুহত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে বেদের আহুতিগুলিকে বর্জন করেছিল এবং এই পশুবলি প্রতিটি গৃহে হত। একটি অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকত, এই ছিল উপাসনার আঙ্গিক। এই পশুবলি প্রথা মুছে গেল এবং তার স্থলাভিষিক্ত হল সুরম্য মন্দির, জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি, এবং জমকালো পুরোহিতবর্গ এবং আরো অনেক কিছু যেগুলি আধুনিককালে আপনারা ভারতবর্ষে দেখতে পান। আমি হাসি যখন এমন কিছু আধুনিক ব্যক্তির রচিত বই পড়ি, যাদের আরও ভালোভাবে জানা উচিত ছিল। তাদের মতে বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের পৌত্তলিকতার ধ্বংস করেছিলেন। তারা একেবারেই জানেন না যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবাদ (Bramhinism) ও পৌত্তলিকতা সৃষ্টি করেছিল।

বছরখানেক অথবা বছর দুয়েক আগে একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক একটি বই লিখেছিলেন, যিনি যীশুখ্রীষ্টের একটি অতি অদ্ভুত জীবন আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেন। এই বইটির একটি অংশে তিনি বলেছেন যে খ্রীষ্ট জগন্নাথের মন্দিরে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ করতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের একচেটিয়া স্বভাব ও পৌত্তলিকতায় বিরক্ত হয়ে তিনি তিব্বতের লামাদের কাছে যান এবং পূর্ণতা লাভ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাস সামান্যতমও জানেন তাঁর কাছে ঐ উক্তিটিই প্রমাণ করে যে সমস্ত বিষয়টি আসলে ধাপ্পাবাজি। কারণ জগন্নাথের মন্দির প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা এইটি এবং অন্যান্যগুলিকে গ্রহণ করে পুনর্বার তাদের হিন্দু ছাঁচে ঢেলে সাজাই। এরকম অনেক কিছুই এখনও আমাদের করতে হবে। এই হল জগন্নাথ এবং তখন সেখানে একজনও ব্রাহ্মণ ছিল না। তৎসত্ত্বেও আমাদের বলা হয় যে যীশু-খ্রীষ্ট সেখানে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ করতে এসেছিলেন। আমাদের মহান রাশিয়ান প্রত্নবিদ এ কথাই বলেছেন।

এইভাবে জীবে দয়া প্রচার করা সত্ত্বেও, পবিত্র নীতিবান ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও, চিরস্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের চুলচেরা আলোচনা

সত্ত্বেও, বৌদ্ধধর্মের সমস্ত প্রাসাদটি একদিন ভেঙে চুরমার হল এবং তার ধ্বংসাবশেষ অতি কুৎসিত। বৌদ্ধধর্মের পেছন পেছন কি ধরনের কুৎসিত ব্যাপার এদেশে প্রবেশ করেছিল আপনাদের সে বর্ণনা দেবার ইচ্ছে ও সময় দুই-ই আমার নেই। সবচেয়ে কুৎসিত উৎসব, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে অশ্লীল পুস্তকাদি যা এযাবৎ মানুষের লেখনী লিখেছে, মস্তিষ্ক কল্পনা করতে পেরেছে, সবচেয়ে পাশবিক আঙ্গিক, ধর্মের দোহাই দিয়ে যা আজ অবধি পার পেয়েছে ত' সবই অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।

কিন্তু ভারতবর্ষকে বাঁচতে হবে এবং ভগবানের আত্মা আবার নেমে এল। যে পরমপুরুষ ঘোষণা করেছিলেন—"ধর্ম নিমজ্জিত হলেই আমি আসব"—তিনি পুনরাবির্ভূত হলেন। এবার তাঁর প্রকাশ ঘটলো দক্ষিণে। উঠে দাঁড়ালেন সেই তরুণ ব্রাহ্মণ যাঁর সম্বন্ধে বলা হয় তিনি নাকি মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তাঁর সমস্ত রচনা শেষ করেছিলেন। সেই চমৎকার বালক শঙ্করাচার্য দেখা দিলেন। এই ষোল বছরের বালকটির লেখা আধুনিক পৃথিবীর বিস্ময়, বালকটি তেমনি। তিনি চাইলেন ভারতীয় সমাজকে তার প্রথম যুগের পবিত্রতায় ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু একবার ভাবুন তাঁর সামনে কি পরিমাণ কাজ ছিল। ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু কথা বলেছি। এই সমস্ত বিভীষিকা যেগুলি আপনারা সংস্কার করতে চাইছেন এসবই সেই অধঃপতনের রাজত্বের ফলস্বরূপ। তাতার, বালুচ এবং আরও অনেক কুৎসিত মানবজাতি ভারতবর্ষে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সঙ্গে এসেছিল তাদের জাতীয় প্রথা। এর ফলে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন পরিণত হল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, পাশবিক প্রথার মসীলিপ্ত একটি অধ্যায়ে। এই জিনিসই বৌদ্ধদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বালক পেয়েছিল। সে সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, ভারতবর্ষে সর্বত্র চলেছে বেদান্তের সাহায্যে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন থেকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা। একাজ এখনও চলেছে, শেষ হয়নি। মহান দার্শনিক শঙ্কর এলেন, এবং দেখালেন যে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সারসত্তার সঙ্গে বেদান্তের বিশেষ তফাৎ নেই। কিন্তু শিষ্যরা গুরুকে বুঝতে না পেরে নিজেদের অধঃপতিত করেছে। তারা আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে এবং নাস্তিকে পরিণত হয়েছে। শঙ্কর এই জিনিস ব্যাখ্যা করলেন, এবং সমস্ত বৌদ্ধরা তাঁদের প্রাচীন ধর্মে ফিরে আসা শুরু করলেন। কিন্তু ততদিনে তাঁরা এইসব প্রণালীগুলিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কি করা যেত?

তখন এলেন অত্যুজ্জ্বল রামানুজ। আমার আশঙ্কা, মহতী ধীশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শঙ্করের হৃদয় তত প্রসারিত ছিল না। রামানুজের হৃদয় অনেক বেশী প্রশস্ত। তিনি নিপীড়িতদের দুঃখ উপলব্ধি করলেন, তাদের সমব্যথী হলেন। তিনি অনুষ্ঠানগুলিকে গ্রহণ করলেন, যতদূর সম্ভব তাদের শুদ্ধ করলেন এবং নতুন আচার-অনুষ্ঠান, নতুন পূজা-পদ্ধতি তৈরী করলেন তাদের জন্য যাদের এগুলি নিতান্ত প্রয়োজন। একই সময় তিনি সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত করলেন ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে পারিয়াদের জন্য। এই হল রামানুজের কাজ। এই কাজ

ছড়াতে লাগলো, একদিন উত্তরাঞ্চলে গিয়ে প্রবেশ করল। সেখানকার কিছু মহান নেতৃবৃন্দ এটিকে গ্রহণ করলেন; কিন্তু তাও অনেক পরে, মুসলিম রাজত্বকালে। তুলনামূলকভাবে আধুনিক সময়ে উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে উজ্জ্বল সাধক হলেন চৈতন্য।

রামানুজের সময় থেকে একটি বৈশিষ্ট্য আপনাদের চোখে পড়তে পারে। সর্বসাধারণের সামনে আধ্যাত্মিকতার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া। রামানুজের পরবর্তী সমস্ত সাধকের মূল কথা ছিল তাই, যেমন ছিল শঙ্করের পূর্ববর্তী সমস্ত সাধকদের। আমি জানি না কেন শঙ্করকে কিছুটা স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। তাঁর রচনায় এমন কিছু দেখি না যাকে অসাধারণ বলা চলে। প্রভু বুদ্ধের বাণীগুলির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি শঙ্করের বাণীগুলির উপর অসাধারণত্ব আরোপিত হবার কারণ সম্ভবত তার বাণীগুলি নয়, বরং তার শিষ্যদের অক্ষমতা। উত্তরের এই মহাসাধক শ্রীচৈতন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদনার প্রতিভূ ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ, তৎকালের গোঁড়া যুক্তিবাদী পরিবারগুলির একটিতে তাঁর জন্ম, তিনি স্বয়ং ছিলেন তর্ক-বিদ্যার অধ্যাপক। তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন এবং জয়লাভ করতেন, কারণ ছোটবেলা থেকে এটিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে জেনেছেন। কিন্তু তবুও কিন্তু একজন সাধুর দয়ায় এই মানুষটির সমস্ত জীবন পরিবর্তিত হল। তিনি তর্কযুদ্ধ ছাড়লেন, ছাড়লেন তাঁর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার পদ, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভক্তি শিক্ষকরূপে উন্মাদ চৈতন্যরূপে পরিচিত হলেন। তাঁর ভক্তি বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে গেল, জনে জনে দিল শান্তি। তাঁর ভালোবাসা ছিল অসীম। সাধু অথবা পাপী, হিন্দু কিংবা মুসলমান, পবিত্র অথবা অপবিত্র, বেশ্যা, ভবঘুরে—তাঁর ভালোবাসায় প্রত্যেকেই ছিল ভাগীদার, প্রত্যেকেই ছিল তাঁর করুণার অংশীদার। অন্যান্যদের মতই কালের অগ্র-গতিতে তাঁর ধর্মসম্প্রদায় যদিও যথেষ্ট অধঃপতিত হয়েছে তবু আজও এরা দরিদ্র, নিপীড়িত, সমাজচ্যুত, দুর্বল, সমস্ত সমাজ-পরিত্যক্ত লোকেদের মহান আশ্রয়দাতা। কিন্তু সত্যের খাতিরে আমি একথা বলতেও বাধ্য যে দার্শনিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আমরা চমৎকার উদারতা দেখতে পাই। শঙ্করের অনুগামী এমন একজনও নেই যে বলবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় সত্যিই আলাদা। একইভাবে জাতিগত ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। কিন্তু প্রতিটি বৈষ্ণব-ধর্মপ্রচারকদের ক্ষেত্রে বর্ণের প্রশ্নে আমরা অত্যন্ত উদারতা লক্ষ্য করি। অবশ্য ধর্মীয় প্রশ্নে তাঁদের কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা চলে।

একজনের ছিল অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, অপরজনের ছিল বিশাল হৃদয়। এমন একজনের জন্মের সময় হল যিনি হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়েরই প্রতিনিধি, এমন একজন যিনি একই সঙ্গে শঙ্করের অদ্ভুত মেধা এবং চৈতন্যের বিশাল হৃদয়ের সংমিশ্রণ ঘটাবেন। তিনি এমন একজন যাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একই সত্তার, একই ভগবানের অস্তিত্ব প্রস্ফুটিত হবে, যিনি প্রতিটি জীবে ঈশ্বরকে অবলোকন করবেন, দরিদ্রের জন্য, দুর্বলের জন্য, পতিতের জন্য, নিপীড়িতের জন্য ভারতবর্ষে কিংবা ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য, যাঁর হৃদয় মথিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে যাঁর অসাধারণ বোধশক্তি এমন মহৎ চিন্তার জন্ম দেবে যার দ্বারা

ভারতে ও ভারতের বাইরে সমস্ত বিবদমান গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। যার দ্বারা বুদ্ধি ও হৃদয়ের সার্বজনীন ধর্মদুটিকে একত্রিত করা যাবে। এমন একজন পুরুষ জন্ম নিলেন এবং তাঁর পদপ্রান্তে বহুকাল বসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সময় হয়েছিল, তাঁর জন্মের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তাই তিনি আবির্ভূত হলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল তাঁর জীবনের সাধনা এমন একটি শহরে গড়ে উঠেছিল যেখানে পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এই শহর উন্মাদের মত পাশ্চাত্য ভাবধারার পশ্চাদ্ধাবন করে এসেছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরগুলির তুলনায় এ শহর ইউরোপীয় ভাবধারায় অনেক বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছে। এখানেই তিনি বাস করতেন, পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর একেবারেই ছিল না, এই মহৎ ধীমান পুরুষটি নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী স্নাতকও তাঁর বোধশক্তির বিশালত্ব উপলব্ধি করেছে। তিনি, এই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন এক আশ্চর্য পুরুষ। এ অনেক বিরাট কাহিনী, আজ রাতে তাঁর সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলার সময় আমার নেই। শুধু মহান শ্রীরামকৃষ্ণের নামটুকু উচ্চারণ করবো, যিনি ভারতীয় সাধককুলের পূর্ণতা এনেছেন, এযুগের সাধক তিনি, যাঁর ভাবধারা বর্তমান সময়ের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। লক্ষ্য করবেন দৈবশক্তি তাঁর আড়ালে কিভাবে কাজ করছে। একজন দরিদ্র পুরোহিতের সন্তান, যাঁর জন্ম হয়েছিল গণ্ডগ্রামে, যিনি ছিলেন অপরিচিত, যাঁর কথা কেউ ভাবেনি, সেই ব্যক্তিই আজ ইউরোপে এবং আমেরিকায় প্রকৃতার্থে হাজার হাজার ব্যক্তির দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। আগামী দিনে তার ভক্ত-সংখ্যা আরও হাজারসংখ্যক বৃদ্ধি পাবে। ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা কে বলতে পারে! হে আমার ভ্রাতৃগণ, যদি দৈবের অঙ্গুলি নির্দেশ আপনারা দেখতে না পান তাহলে বলবো আপনারা অন্ধ, প্রকৃতপক্ষে জন্মান্ধ। যদি সময় ও সুযোগ পাই তাহলে তাঁর সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবো। শুধু এটুকু আজ বলতে দিন যে আপনাদের যদি সত্যের একটি অক্ষরও বলতে পেরে থাকি তাহলে তা একমাত্র তাঁরই উপলব্ধ সত্য। আর যদি এমন অনেক কথা বলে থাকি যা মিথ্যা, নির্ভুল নয়, মানবজাতির পক্ষে হিতকর নয়, তাহলে তা সবই আমার সৃষ্টি, আমার উপরই তাদের দায়িত্ব রইল।

আমাদের বর্তমান কাজ

[মাদ্রাজে ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণ]

পৃথিবীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-সমস্যা প্রতিদিন গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়ে উঠছে। অতি প্রাচীনকালে যখন বৈদান্তিক সত্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন থেকেই সকল জীবনের একত্ব এই মূলমন্ত্র ও সারতত্ত্ব প্রচারিত হয়ে আসছিল। এই জগতে একটি পরমাণু পর্যন্ত সকলকে সঙ্গে না টেনে নড়তে পারে না। কোন উন্নতিই হতে পারে না, যদি না সকল জগৎ সেই পথ অনুসরণ করে এবং প্রতিদিনই একথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে শুধু জাতিগত বা দেশগত সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। প্রতিটি ভাবকে ব্যাপক হয়ে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়তে হবে, যে কোন আকাঙ্ক্ষাকে এমন জড়িয়ে তুলতে হবে, তা যেন শুধু সমস্ত মানব-জাতিকে নয়, সমস্ত প্রাণিজগৎকে পর্যন্ত নিজের সীমার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের প্রাচীনকালে যা ছিল, বিগত কয়েক শতাব্দী কেন আর তেমন নেই। যদি আমরা এই অবনতির কারণ অনুসন্ধান করি, তবে দেখতে পাই যে আমাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, কর্মক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতাই অন্যতম কারণ।

দুটি আশ্চর্য জাতি ছিল—একই মূল জাতিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, কিন্তু ভিন্ন পরিবেশ ও আবহাওয়ায় অবস্থিত, জীবনের সমস্যাগুলি তখন নিজেদের বিশিষ্ট পথে সমাধান করেছিল। আমি প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির কথা বলছি। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয় পর্বতশ্রেণীর গণ্ডিতে ঘেরা, সমতলভূমিকে ঘিরে রেখেছে সমুদ্রের মত তরঙ্গায়িত স্বাদু-সলিলা স্রোতস্বিনীসমূহ, জগতের সীমানা-রেখার মতো অনন্ত অরণ্যানী ভারতের আর্যদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। অন্তর্মুখী সহজাত প্রবৃত্তি, আর্যের সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক, পারিপার্শ্বিক ভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীর স্বাভাবিক ফলেই তাঁরা অন্তর্মুখী হয়ে উঠলেন। নিজের মনকে বিশ্লেষণ করাই ভারতীয় আর্যদের প্রধান বিষয় হয়ে উঠল। অপর দিকে গ্রীক জাতি পৃথিবীর এমন এক অংশে বাস স্থাপন করল যেখানে গাম্ভীর্যের চেয়ে সৌন্দর্যের বেশি সমাবেশ। গ্রীক দ্বীপপুঞ্জমালার সুন্দর দ্বীপগুলি—চারধারের অকৃপণ সরল প্রকৃতির প্রভাবে তাদের মন স্বভাবতই বহির্মুখী হলো। তারা বাহ্যজগৎকে বিশ্লেষণ করতে চাইল। এর ফলে আমরা দেখতে পাই যে ভারত থেকে সবরকম বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞানের এবং গ্রীস থেকে সব রকম সামান্যী-করণের বিজ্ঞানের উদ্ভব হলো। হিন্দু মন নিজের পথে অগ্রসর হয়ে বিস্ময়কর ফল লাভ করল। এমন কি বর্তমানকালেও হিন্দুদের যেমন বিচারশক্তি, ভারতীয় মস্তিষ্কে এখনও যেমন বিরাট শক্তি আছে তার কোন তুলনা হয় না। আমরা সকলেই জানি যে আমাদের যুবকেরা অন্য যে কোন দেশের যুবকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সব সময় জয়লাভ করে। সম্ভবত মুসলমানদের ভারত জয়ের দু-এক শতাব্দী আগে জাতীয় প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন জাতির এই বিচারশক্তির বিশেষত্বটিকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল যে এর অবনতি হয় এবং আমরা ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সকল বিষয়েই এই অবনতির কোন না কোন চিহ্ন দেখি। শিল্পে আর সেই উদার

ধারণা রইল না, আঙ্গিকের সামঞ্জস্য ও ভাবের উচ্চতা রইল না, অলঙ্কারপ্রিয়তা ও চাকচিক্যের ভঙ্গি ভীষণ বড় হয়ে উঠল। জাতির মৌলিকত্ব যেন হারিয়ে গেল। সঙ্গীতে হৃদয়-আলোড়নকারী প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতের ভাব আর রইল না, প্রতিটি সুর যেন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অপূর্ব ঐকতানের সামঞ্জস্য সৃষ্টি করত, তা আর রইল না, সুরগুলি নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলল। সমস্ত আধুনিক সঙ্গীতে নানারকম সুরের তালগোল পাকিয়ে গেছে, এটাই সঙ্গীতের অবনতির লক্ষণ। তোমাদের অন্যান্য আদর্শের ধারণাগুলি যদি বিশ্লেষণ কর, তাহলে দেখবে এমনি অলঙ্কার-প্রিয়তার প্রাচুর্য ও মৌলিকতার অভাব। এমন কি তোমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্মেও ঘোর ভয়াবহ অবনতি হয়েছে। সে জাতির কাছ থেকে আর তুমি কি আশা করতে পার, যে শত শত বছর ধরে এমনি মহা সমস্যার বিচারে ব্যস্ত—জলের গ্লাস ডান হাতে ধরে খাব, না বাঁ হাতে? সে দেশের মহান চিন্তাশীল মনগুলি কয়েক শত বৎসর ধরে শুধু রান্নাঘরের সমস্যা নিয়ে বিচার করছে, বিচার করছে—আমি তোমায় ছুঁলাম, না তুমি আমায় ছুঁলে, আর এই ছোঁয়াছুঁয়ির প্রায়শ্চিত্ত কী হতে পারে! এর চেয়ে বড় অবনতি আর কী হতে পারে? বেদান্তের তত্ত্বগুলি, জগতে প্রচারিত ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে উচ্চতম ও মহত্তম ধারণাগুলি প্রায় হারিয়ে গেল, জঙ্গলের কিছু সন্ন্যাসীদের দ্বারা সংরক্ষিত হলো, আর জাতির অবশিষ্ট সকলেরা কেবল খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ও পোশাকাদির গুরুতর প্রশ্নগুলির আলোচনায় মেতে রইল। মুসলমানগণ ভারত বিজয় করে অনেক ভাল জিনিস আমাদের দিয়েছিল। কারণ পৃথিবীর হীনতম ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিছু না কিছু শেখাতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা জাতির ভিতর শক্তি সঞ্চার করতে পারল না।

তারপর সৌভাগ্যবশত বা দুর্ভাগ্যবশত ইংরাজ ভারত জয় করল। অবশ্য পরদেশ বিজয়মাত্রই মন্দ, বিদেশী শাসন নিঃসন্দেহে অশুভ। কিন্তু কখনও কখনও মন্দের মধ্যে দিয়ে ভালও আসে। ইংরাজের ভারত বিজয়ের শুভ ফল হলো এই—ইংল্যাণ্ড, না, সারা ইউরোপ তাদের সভ্যতার জন্য গ্রীসের কাছে ঋণী। ইউরোপের সব কিছুর মধ্যে দিয়ে গ্রীসই যেন কথা বলছে। প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি আসবাবপত্রে যেন গ্রীসের ছাপ; ইউরোপের বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রীসীয় ছাড়া কিছু নয়। আজ ভারতবর্ষের মাটিতে প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু মিলিত হয়েছে। এইভাবে ধীরে ও নীরবে এক পরিবর্তন আসছে, আমাদের চারপাশে যে উদার প্রাণপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখছি তা এই ভাবরাশির একত্র সংমিশ্রণের ফল। আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এক উদার প্রশস্ত জীবনের ধারণা। যদিও আমরা প্রথমে একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম এবং ভাবগুলিকে একটু সংকীর্ণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আজকাল বুঝেছি যে এই উদার ভাবগুলি, জীবনের এই প্রশস্ততর ধারণাগুলি আমাদেরই প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। আমাদের পূর্বপুরুষদের তত্ত্বগুলির যুক্তিযুক্তভাবে জোরের সঙ্গে তারা কাজে পরিণত করছে। আমাদের শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল—উদার হওয়া, নিজের গণ্ডির বাইরে যাওয়া, সকলের সঙ্গে মিলে ভাবের আদান-প্রদানে সার্বভৌমভাবে উপনীত হওয়া। কিন্তু আমরা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে সর্বদা নিজেদের সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করে ফেলছি, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি।

আমাদের উন্নতির পথে বহু বিঘ্ন আছে, তাঁর মধ্যে একটি হচ্ছে চরম গোঁড়ামি যে আমরাই জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। ভারতের প্রতি আমার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত দেশ-প্রেম, পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমি এই ধারণা ত্যাগ করতে পারি না যে অন্য জাতের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। সকলের পদতলে বসে শিক্ষালাভের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ এটা মনে রেখ যে সকলেই আমাদের শিক্ষা দিতে পারে। আমাদের শ্রেষ্ঠ বিধি-নির্ধারক মনু বলেছেন,—'নীচ জাতির নিকট হইতেও কিছু উত্তম জ্ঞানলাভ কর, অন্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বর্গলোকে গমনের পথ জানিতে হইবে।' সুতরাং মনুর প্রকৃত বংশধররূপে তাঁর নির্দেশ আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে এবং যে কোন ব্যক্তি আমাদের শিক্ষা দিতে সমর্থ হলে, তার কাছ থেকে ঐহিক বা পারত্রিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের এটি ভুললে চলবে না যে, আমাদেরও জগৎকে এক মহান শিক্ষা দেবার আছে। ভারতের বাইরের দেশগুলিকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। আমরা বোকার মতো ভেবেছিলাম তা আমরা পারি এবং তার শাস্তিস্বরূপ আমরা প্রায় হাজার বছর ধরে দাসত্ব ভোগ করছি। আমরা যে অন্য জাতির সঙ্গে আমাদের মতামত বিনিময় করার জন্য বিদেশে যাইনি, আমাদের চারপাশের কর্মধারা লক্ষ্য করিনি, ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই। আমরা শাস্তি পেয়েছি, আর যেন এমন না করি। ভারতবাসীর ভারতের বাইরে যাওয়া উচিত নয়,—এসব মূর্খামি, ছেলেমানুষী। এ সব ধারণা একেবারে বিনাশ করতে হবে। যতই তোমরা ভারতের বাইরে গিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতের সঙ্গে মিশবে, ততই তোমাদের ও দেশের মঙ্গল। তোমরা যদি আগের থেকে তাই করতে—শত শত বৎসর আগে থেকে—তাহলে বর্তমানকালে যে জাতিই ভারতের উপর প্রভুত্ব করতে চেয়েছে, তোমরা তার পদাবনত হতে না। জীবনের প্রথম প্রকাশ হচ্ছে—সম্প্রসারণ। যদি বাঁচতে চাও, নিজেদের সম্প্রসারিত করতে হবে। যে মুহূর্তে তুমি সম্প্রসারণ বন্ধ করেছ, সেই মুহূর্তে মৃত্যুর কবলে পড়েছ, বিপদের সম্মুখীন হয়েছ। আমি ইউরোপ আমেরিকায় গিয়েছিলাম, যার কথা তোমরা সহৃদয়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছ, আমায় যেতে হয়েছিল, কারণ এই সম্প্রসারণই জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম লক্ষণ। এই পুনরভ্যুদয়শীল জাতীয় জীবন তলে তলে সম্প্রসারিত হয়ে আমাকে যেন দূরে নিক্ষেপ করেছিল এবং এইভাবে আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত হবে। আমার কথা মনে রেখ, এটা হবেই, যদি এই জাতি আদৌ বেঁচে থাকে। সুতরাং এই সম্প্রসারণ জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্বপ্রধান লক্ষণ। এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদের যা দেয়, পৃথিবীর সাধারণ উন্নতিকল্পে আমাদের যা দেয়, তা বাইরের জগতে আমরা পাঠাচ্ছি।

এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। তোমাদের মধ্যে যারা মনে কর, হিন্দুরা চিরকালই তাদের দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ, তারা ভ্রান্ত। তোমরা প্রাচীন গ্রন্থগুলি পড়নি, জাতীয় ইতিহাস যথাযথ অধ্যয়ন করনি, না হলে এমন ভাবতে না। যে কোন জাতই হোক, বাঁচতে হলে তাকে কিছু দিতে হবে। প্রাণ দিলে প্রাণ পাবে, কিছু গ্রহণ করলে তার মূল্যস্বরূপ অন্যদের কিছু দিতে হবে। এত হাজার বছর ধরে আমরা

যে বেঁচে আছি এটা বাস্তব সত্য। এই রহস্যের সমাধান হচ্ছে যে আমরা বাইরের জগৎকে সর্বদা কিছু না কিছু দিয়ে এসেছি, অন্যেরা যাই ভাবুক না কেন। তবে ভারতের দান হচ্ছে ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান। ধর্মের ধ্বজা বহন করে পথ পরিষ্কার করার জন্য সৈন্যদলের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও দর্শন শোণিত-স্রোতের মধ্যে দিয়ে বাহিত হবার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও দর্শন রক্তাপ্লুত মানবদেহের উপর দিয়ে হিংসাসহকারে সদর্পে অগ্রসর হয় না, শান্তি ও প্রেমের পাখায় ভর করে আসে এবং বরাবর তাই হয়েছে। অতএব আমাদেরও দিতে হয়েছে। লণ্ডনে এক তরুণী আমায় জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা হিন্দুরা কী করেছ? তোমরা কখনও একটা জাতকেও জয় করনি।' কথাটা ইংরাজ জাতের পক্ষে—বীর সাহসী ক্ষত্রিয় প্রকৃতির ইংরাজ জাতের পক্ষে সত্যি, একজনের উপর অন্যজনের বিজয়ই তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ গৌরব। তার দৃষ্টি-কোণ থেকে এটি সত্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটি সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ভারতের মহত্বের কারণ কী, আমি জবাব দেব, আমরা কখনও কোন জাতিকে জয় করিনি, এটাই আমাদের গৌরব। তোমরা আজকাল প্রতিদিন শুনতে পাও—আমি দুঃখের সঙ্গে বলি কখনও কখনও এমন লোকের মুখ থেকে শোন, যাদের ভালভাবে জানা উচিত—আমাদের ধর্মের নিন্দা, কারণ এটি পরধর্ম-বিজয়ী নয়। আমার মনে হয় আমাদের ধর্ম যে অন্য ধর্মের চেয়ে বেশী সত্য এটি তারই এক যুক্তি, কারণ আমাদের ধর্ম কখনও অন্য ধর্ম জয় করতে প্রবৃত্ত হয়নি, কারণ আমাদের ধর্ম কখনও রক্তপাত করেনি, এটি সকলের প্রতি আশীর্বাণী ও শান্তিবাক্য, প্রেম ও সহানুভূতির কথা উচ্চারণ করেছে। এখানে—একমাত্র এখানেই সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। এখানে—একমাত্র এখানেই সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি কার্যে পরিণত হয়েছে, অন্যান্য দেশে এটি শুধু তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ। এখানে—একমাত্র এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের মসজিদ ও খ্রীশ্চানদের জন্য গীর্জা নির্মাণ করে দেয়।

অতএব তোমরা দেখছ আমাদের বাণী জগতে বহুবার প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু ধীর-ভাবে, নীরবে ও অজ্ঞাতভাবে। ভারতের সকল বিষয়েই এই রকম। ভারতীয় চিন্তার একটি লক্ষণ তার শান্তভাব, তার নীরবতা। এর পিছনে যে শক্তি রয়েছে, কখনও হিংসা দ্বারা তার প্রকাশ হয়নি। এটি সর্বদা ভারতীয় চিন্তার নীরব সম্মোহন শক্তি। কোন বিদেশী যদি আমাদের সাহিত্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমে এটি তার কাছে খুবই বিরক্তিকর লাগে, এতে তাদের দেশের সাহিত্যের মতো উদ্দীপনা নেই। সম্ভবত সেরকম গতি নেই, যাতে সে মুহূর্তে মেতে উঠবে। ইউরোপের বিয়োগান্ত নাটকগুলির সঙ্গে আমাদের বিয়োগান্ত নাটকগুলির তুলনা কর। পাশ্চাত্যের নাটক-গুলি ঘটনায় পূর্ণ, ক্ষণকালের জন্য উদ্দীপিত করে, কিন্তু শেষ হবার পর প্রতিক্রিয়া আসে, সব কিছু মন থেকে যেন মুছে যায়। ভারতীয় বিয়োগান্ত নাটকগুলিতে যেন আছে সম্মোহনকারীর শক্তি, ধীর স্থির, যতই পড়ে যাবে ততই বিমোহিত হবে; তুমি নড়তে পারবে না, বাধা পড়ে যাবে। যারাই সাহস করে আমাদের সাহিত্য পড়েছে, তারাই এর বাঁধন অনুভব করেছে এবং চিরকালের জন্য বাঁধা পড়েছে। শিশির বিন্দু যেমন অদৃশ্য অশ্রুতভাবে অতি সুন্দর গোলাপ কোরককে প্রস্ফুটিত করে তোলে,

জগতের চিন্তারাশির উপর ভারতের অবদানও তেমনি ধারা। নীরবে অজ্ঞাতসারে অথচ সর্বশক্তিতে জগতের চিন্তারাশিতে এটি বিপ্লব এনেছে, কিন্তু কেউ জানে না কখন এটি ঘটেছে। আমার কাছে কথা প্রসঙ্গে একবার বলা হয়েছিল, 'ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করা কি কঠিন!' তাতে আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'এটাই ভারতীয় আদর্শ।' ভারতীয় গ্রন্থকাররা আধুনিক লেখকদের মতো ছিলেন না, যাঁরা অন্য লেখকের গ্রন্থ থেকে শতকরা নব্বই ভাগ চুরি করেন, আর মাত্র দশভাগ তাঁদের নিজেদের এবং তাঁরা সযত্নে এক ভূমিকা লেখেন, 'এই সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী।'

যে সব মহামনীষী মানবজাতির হৃদয়ে আলোড়ন জাগিয়েছেন, তাঁরা গ্রন্থ রচনা করেই সন্তুষ্ট ছিলেন, উত্তরপুরুষকে নিজের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করে সেই সব গ্রন্থ দান করে নীরবে দেহত্যাগ করেছেন। আমাদের দর্শনকারদের নাম কে জানে? পুরাণকারদের নাম কে জানে? তাঁরা সকলেই ব্যাস কপিল ইত্যাদি উপাধি দ্বারাই পরিচিত। তাঁরাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সন্তান। তাঁরাই গীতার প্রকৃত অনুসরণকারী, তাঁরাই সেই মহান নির্দেশ জীবনে পালন করে গেছেন—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

এইভাবে ভারত সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করছে। কিন্তু তার জন্য একটি অবস্থার প্রয়োজন হয়। পণ্যদ্রব্য যেমন কারও নির্মিত পথ দিয়ে স্থানান্তরে যায়, ভাবরাশিও তেমনি যায়। ভাবরাশির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার আগে পথ নির্মিত হওয়ার প্রয়োজন। পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোন মহা দিগ্বিজয়ী জাতি উত্থিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এক সূত্রে গেঁথেছে, তখনই সেই সূত্র অবলম্বন করে ভারতের চিন্তারাশি প্রবাহিত হয়েছে এবং এইভাবে প্রতি জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, বৌদ্ধদের উত্থানের পূর্বেই ভারতের চিন্তারাশি পৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের পূর্বে চীন, পারস্য ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বেদান্ত প্রবেশ করেছিল। আবার যখন শক্তিশালী গ্রীক-মানস প্রাচ্যজগতের বিভিন্ন অংশকে এক সূত্রে আবদ্ধ করল, তখন সেখানে ভারতীয় চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছিল; খ্রীষ্টধর্ম যে সভ্যতার গর্ব করে থাকে, তা ভারতীয় চিন্তার খণ্ড খণ্ড সংগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের হচ্ছে সেই ধর্ম, যার বিদ্রোহী সন্তান হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম, তার সব কিছু মহত্ত্ব নিয়ে, আর খ্রীষ্টধর্ম হচ্ছে খুব এলোমেলো অনুকরণ।

আবার যুগচক্র ঘুরে এসেছে। ইংল্যাণ্ডের প্রচণ্ড শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে একত্রে বদ্ধ করেছে। রোমানদের পথের মতো ইংরাজের রাজপথ কেবল স্থলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, জলেরও বুক চিরে বিভিন্ন দিকে গেছে। সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তরে গেছে ইংল্যাণ্ডের পথগুলি। পৃথিবীর প্রতিটি অংশ যুক্ত হয়েছে অন্য অংশের সঙ্গে, আর বিদ্যুৎ নবনিযুক্ত দূতের ভূমিকা অপূর্বভাবে সম্পাদন করছে। আমরা দেখছি এই রকম পরিবেশে ভারত আবার জেগে উঠছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তার যা দেবার আছে, দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। এরই ফলস্বরূপ প্রকৃতি যেন জোর করে

আমায় ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই দেখা উচিত যে সময় এসে গেছে। সবকিছুই শুভ মনে হচ্ছে, ভারতীয় চিন্তা, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা আর একবার বিশ্ব-বিজয়ে বের হবে। অতএব আমাদের সামনের সমস্যা ক্রমশ বৃহত্তর হয়ে উঠছে। আমাদের শুধু যে স্বদেশকেই আবার জাগিয়ে তুলতে হবে তা নয়,—সে তো সামান্য কাজ; আমি এক ভাবুক মানুষ, আমার ধারণা—হিন্দুজাতির দ্বারা সমস্ত পৃথিবী জয়।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতির আবির্ভাব হয়েছে। আমরাও বড় দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ভারতের মহান সম্রাট অশোক দ্বারা, সে বিজয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার। আর একবার ভারতকে পৃথিবী জয় করতে হবে। এটিই আমার জীবন স্বপ্ন, আর আমি কামনা করি তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের—যারা আজ আমার কথা শুনছ,—সকলের মনে এই স্বপ্ন জাগুক। আর যতদিন না সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করছ ততদিন তোমাদের বিরাম নেই। লোকে তোমাদের প্রতিদিন বলবে যে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে কাজ করতে যাবে। কিন্তু আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলছি—যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ কর, তখনই সে কাজ শ্রেষ্ঠ হয়। যখনই তোমরা নিজেদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাজ যা করেছিলে, তা হচ্ছে সমুদ্রের পারে বিদেশী ভাষায় তোমাদের ভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা আর এই সভাই হচ্ছে প্রমাণ—তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অন্য দেশে জ্ঞানালোক বিতরণের প্রচেষ্টা কেমন করে তোমাদেরই সাহায্য করে থাকে। যদি আমি ভারতবর্ষেই আমার কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখতাম, তাহলে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় যাওয়ার জন্য যে ফল হয়েছে, তার সিকিভাগও হতো না। এই হচ্ছে আমাদের সামনে মহান আদর্শ, আর সকলকেই এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে—ভারতের দ্বারা সমগ্র জগৎ জয়,—তার কম কিছু নয়, আর আমাদের সকলকে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তার জন্য প্রাণ পণ করতে হবে। বিদেশীরা এসে তাদের সৈন্যদল দ্বারা ভারত প্লাবিত করুক, পরোয়া নেই। ওঠ, ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় কর। এ দেশের মাটিতেই এ কথা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—প্রেম ঘৃণাকে জয় করে, ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না। জড়বাদ ও তার সব দুর্দশাকে জড়বাদ দ্বারা জয় করা যায় না। একদল সৈন্য যখন অপর দলকে জয় করার চেষ্টা করে, তখন তারা মানুষকে পশুতে পরিণত করে এবং সেই পশুর সংখ্যাই বৃদ্ধি করে যায়। আধ্যাত্মিকতাই পাশ্চাত্য দেশকে জয় করবে। ধীরে ধীরে তারা বুঝবে যে জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন। তারা তার জন্য অপেক্ষা করছে, তারা তার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। কোথা থেকে এটি আসবে? কোথায় সেই মানুষ—ভারতীয় মহান ঋষিদের ভাবধারা বহন করে পৃথিবীর প্রতি দেশে যেতে প্রস্তুত? কোথায় সেই মানুষ, যারা সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত, যাতে এই বাণী পৃথিবীর প্রতি কোণে পৌঁছায়? সত্য প্রচারের জন্য এমন বীরহৃদয় মানুষ চাই। বিদেশে গিয়ে বেদান্তের মহান সত্যগুলি প্রচারের জন্য বীরহৃদয় কর্মীর প্রয়োজন। পৃথিবী তাই চায়; তা না হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সমস্ত পাশ্চাত্যজগৎ যেন

এক আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, যেটি কালই ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। পাশ্চাত্যবাসীরা পৃথিবীর সব জায়গায় খুঁজে দেখেছে, কিন্তু কোথাও শান্তি পায়নি। তারা আনন্দের পেয়ালা প্রাণভরে পান করেছে, তাতে পেয়েছে অহঙ্কার। এখন এমন কাজ করার সময় এসেছে যাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে। অতএব, মাদ্রাজের যুবকগণ, আমি বিশেষভাবে তোমাদের এ কথা স্মরণ রাখতে বলছি। আমাদের বিদেশে যেতে হবে, আমাদের অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন দ্বারা বিশ্ব জয় করতে হবে। এর অন্য বিকল্প নেই, হয় আমরা এটি করব, নয় মরব। জাতীয় জীবন—জাগ্রত ও প্রাণবন্ত জাতীয় জীবন লাভের একমাত্র শর্ত হচ্ছে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা বিশ্ব-বিজয়।

সেই সঙ্গে আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা বিশ্ববিজয় বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি জীবনপ্রদ তত্ত্বগুলির প্রচার, শত শতাব্দী ধরে আমরা যে কুসংস্কারগুলিকে আলিঙ্গন করে আছি সেগুলি নয়। ওই আগাছা-গুলিকে এই দেশের মাটি থেকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে, যাতে ওরা একেবারে মরে যায়। ওইগুলি জাতির অবনতির কারণ, ওইগুলি মস্তিষ্ককে দুর্বল করে দেয়। যে মস্তিষ্ক উচ্চ ও মহৎ চিন্তায় অক্ষম, যে মৌলিক চিন্তাশক্তি হারিয়েছে, সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, সেই মস্তিষ্ক ধর্মের নামে সবরকমের ছোট ছোট কুসংস্কারে নিজেকে বিষাক্ত করে তুলছে, তার সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমাদের এখানে এই ভারতে কতকগুলি বিপদ আমাদের সামনে রয়েছে। তার মধ্যে দুটি—জলে কুমির ডাঙায় বাঘের মতো দুদিকে দুটি—একদিকে ঘোর জড়বাদ, তার বিপরীতে ঘোর কুসংস্কার, দুটিই এড়িয়ে চলতে হবে। একদিকে পাশ্চাত্য বিদ্যা হজম করা মানুষ মনে করছে সে সব জেনে বসে আছে, সে প্রাচীন ঋষিদের কথা উপহাস করে উড়িয়ে দেয়। তার কাছে হিন্দুজাতির সব চিন্তা হচ্ছে আবর্জনারাশি, হিন্দু দর্শন বালকের ভাষণ, হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কারমাত্র। অন্যদিকে আবার কিছু শিক্ষিত লোক আছেন, কিন্তু তাঁরা কিছুটা বাতিকগ্রস্ত, তাঁরা আবার ওঁদের সম্পূর্ণ উল্টো, তাঁরা সব কিছুর শুভ-অশুভ ব্যাখ্যা করতে চান। তিনি যে বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত তাঁর যে বিশেষ দেবতা বা গ্রামীণ যা কিছু কুসংস্কার আছে, তার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ও সব রকমের ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা করতে তিনি প্রস্তুত। তাঁর কাছে প্রতিটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য কুসংস্কার হচ্ছে বেদের বিধান, তাঁর মতে সেগুলি পালন করার উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করছে। তোমাদের এইসব সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। আমি তোমাদের কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধের চেয়ে ঘোর নাস্তিকরূপে বরং দেখতে চাই। কারণ নাস্তিকরা প্রাণবন্ত, মৃত নয়, তাদের দিয়ে কিছু করানো যেতে পারে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, মগজটি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, মস্তিষ্ক দুর্বল হলে জীবন অধঃপাতে যায়। এ দুটিই পরিত্যাগ কর। আমরা চাই নির্ভীক সাহসী মানুষ। আমরা চাই রক্তে উন্মাদনা, স্নায়ুতে শক্তি, লৌহময় পেশী ও ইস্পাতদৃঢ় স্নায়ু। দুর্বল আজগুবি ধারণা নয়। এগুলি ত্যাগ কর। সবরকম রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব ত্যাগ কর। ধর্মে কোন রহস্য নেই। বেদ, বেদান্ত, সংহিতা বা পুরাণে কি কিছু গুপ্তভাব আছে? কোন

গুপ্ত সমিতি ধর্মপ্রচারের জন্য প্রাচীন ঋষিরা স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মহান সত্যগুলি মানবসমাজে প্রদানের জন্য তাঁরা কি কোন হাত-সাফাই কৌশল ব্যবহার করেছিলেন? গুপ্তভাবের ঝোঁক ও কুসংস্কার সর্বদাই দুর্বলতার চিহ্ন। এগুলি সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব সেগুলি সম্বন্ধে সাবধান, সরল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াও। বড় ব্যাপার আছে, আশ্চর্য ব্যাপার আছে জগতে। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যত দূর, সেই হিসাবে সেগুলিকে অতি-প্রাকৃত বলতে পারি, কিন্তু তাদের একটিও গুপ্ত রহস্যময় নয়। এ দেশে কখনও প্রচারিত হয়নি যে, ধর্মের সত্যগুলি গোপন বিষয় কিংবা হিমালয়ের শিখরে অবস্থিত গুপ্ত-সমিতির সেগুলি একচেটিয়া সম্পত্তি। আমি হিমালয়ে গেছি, তোমরা যাওনি সেখানে, তোমাদের বাসস্থান থেকে তা শত শত মাইল দূরে। আমি সন্ন্যাসী, গত চোদ্দ বছর ধরে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওই রকম গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব কোথাও দেখিনি। এই সব কুসংস্কারের পিছনে দৌড়িও না। তোমাদের এবং তোমাদের জাতির পক্ষে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া ভাল, কারণ তাতে তোমরা তেজস্বী হবে, কিন্তু এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া অবনতি ও মৃত্যুর কারণ। মানবসমাজের পক্ষে লজ্জার বিষয় যে সবল মানুষেরা কুসংস্কারের পেছনে তাদের সময় নষ্ট করবে, ঘোর কুসংস্কারের ব্যাখ্যার জন্য রূপক আবিষ্কার করে সময় নষ্ট করবে। সাহসী হও, সকল বিষয়ের অমন ভাব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে না। প্রকৃত কথা এই যে আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেক কালো দাগ আর ঘা আছে—সেগুলিকে সারিয়ে তুলতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, নষ্ট করতে হবে। কিন্তু তাতে আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন নষ্ট হবে না। ধর্মের প্রতিটি তত্ত্ব এতে নিরাপদ হবে, এই কালো দাগগুলি যতই দূর হয়ে যাবে, ততই মূল তত্ত্বগুলি আরও উজ্জ্বলভাবে, আরও মহিমান্বিত হয়ে প্রকাশিত হবে। সেই তত্ত্বগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাক।

তোমরা শুনেছ প্রত্যেক ধর্মই নিজেকে পৃথিবীর সার্বভৌম ধর্ম বলে দাবি করে থাকে। প্রথমতঃ আমায় বলতে দাও যে, কোন কালে কোন ধর্মই সম্ভবত তা হতে পারবে না; কিন্তু কোন ধর্মের যদি এই দাবি করার অধিকার থাকে, তবে তা একমাত্র আমাদের ধর্মেরই, অন্য কোন ধর্মের নয়। কারণ অন্য সব ধর্মই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে। অন্য সব ধর্মই তথাকথিত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং তারা মনে করেন এই ঐতিহাসিকতাই তাঁদের ধর্মের শক্তি। কিন্তু তাঁদের ধারণাকৃত এই সবলতাই প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ধর্মের দুর্বলতা, কারণ যদি ওই ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা অপ্রমাণিত হয়, তবে তাঁদের ধর্মরূপ প্রাসাদটি একবারে ভেঙে পড়ে। ওই সব ধর্মস্থাপক মহাপুরুষের জীবনের অর্ধেক ঘটনা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব কেবল তাঁদের কথার উপর যেসব সত্য নির্ভরশীল ছিল, সেগুলি শূন্যে বিলীন হয়েছে। যদিও আমাদের মহাপুরুষের সংখ্যা প্রচুর, তবু ধর্মের সত্যগুলি তাঁদের কথার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কৃষ্ণ বলে নয়, তিনি বেদান্তের বড়

শিক্ষাদাতা বলে। যদি তিনি তা না হতেন, তবে বুদ্ধদেবের নামের মতো তাঁর নামও ভারত থেকে মুছে যেত। সুতরাং আমরা ব্যক্তিবিশেষের অনুগামী নই, সর্বদা ধর্মতত্ত্বগুলির অনুগামী। ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বগুলির সাকার মূর্তিস্বরূপ, দৃষ্টান্তস্বরূপ। যদি তত্ত্বগুলি থাকে, শত সহস্র ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। যদি তত্ত্বগুলি নিরাপদ হয়, বুদ্ধের মতো শত সহস্র মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু ওই তত্ত্বগুলি যদি লুপ্ত হয়, বিস্মৃত হয় এবং সমস্ত জাতীয় জীবন তথাকথিত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, তবে সেই ধর্মে দুঃখ আছে, বিপদ আছে। একমাত্র আমাদের ধর্মই কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভর করে না, নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে এতে লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষের স্থান হতে পারে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রচুর স্থান এই ধর্মে আছে, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেককেই এই ধর্মের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে। এইটি ভুললে চলবে না। আমাদের ধর্মের এই তত্ত্বগুলি অবিকৃতভাবে রয়েছে, আমাদের সকলের সারা জীবনের কাজ হবে এগুলিকে অবিকৃতভাবে রক্ষা করা, কালের প্রভাবজনিত মালিন্য থেকে এগুলিকে মুক্ত করে রাখা। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের ঘোর জাতীয় অবনতি বারবার ঘটলেও বেদান্তের এই তত্ত্বগুলি কখনও মলিন হয়নি। অতি দুষ্ট ব্যক্তিও এগুলি দূষিত করতে সাহস করেনি। আমাদের শাস্ত্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উত্তমভাবে সংরক্ষিত শাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় এতে প্রক্ষিপ্ত অংশ, মূলের বিকৃতি, ভাবের সারাংশের বিপর্যয় নেই। প্রথমে যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবেই আছে এবং মানুষের মনকে একই ভাবে আদর্শের দিকে, লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করছে।

তোমরা দেখবে যে বেদের বিভিন্ন ভাষ্যকার ভাষ্য রচনা করেছেন, মহান আচার্যরা প্রচার করেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে বহু সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরও দেখবে যে বেদগ্রন্থে এমন অনেক তত্ত্ব আছে যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী। কিছু শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, আবার কিছু সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদাত্মক। দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার দ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না, তিনি অদ্বৈতবাদী শ্লোকগুলিতে ধামা চাপা দিতে চান। প্রচারক ও পুরোহিতরা সেগুলির দ্বৈতভাবাত্মক ব্যাখ্যা করতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকাররা আবার দ্বৈতভাবাত্মক শ্লোকগুলিকে নিয়ে অমনি করেন। কিন্তু এটা তো বেদের দোষ নয়। সমস্ত বেদ দ্বৈতভাবাপন্ন এটা প্রমাণ করার চেষ্টা মূর্খতা। আবার সমস্ত বেদ অদ্বৈতভাবাপন্ন এটা প্রমাণ করার চেষ্টা একই রকম মূর্খতা। বেদ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবাপন্নই। নতুন ভাবের আলোকে আজকাল আমরা একথা ভালভাবে বুঝছি। এই সব বিভিন্ন ধারণা দ্বারা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মনের ক্রমোন্নতির জন্য দ্বৈত ও অদ্বৈত দুটি মতেরই প্রয়োজন আছে এবং সেজন্যই বেদ সেগুলি প্রচার করেছে। মানবজাতির প্রতি কৃপা করে বেদ সেই উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাবার বিভিন্ন সোপান দেখিয়ে দিয়েছে। সেগুলি যে পরস্পর-বিরোধী তা নয়, শিশুদের প্রতারণা করার জন্য বেদ বৃথা বাক্য ব্যবহার করেনি। সেগুলি শিশুদের প্রয়োজনে নয়, বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজনেই। যতকাল আমাদের শরীর আছে, যতকাল দেহের সঙ্গে একত্ব বোধে আমরা বিভ্রান্ত হব, যতকাল আমরা

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ ও স্থূল জগৎ দর্শন করছি, ততকাল সগুণ সাকার ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। কারণ যতকাল আমাদের এই সকল ধারণা আছে, ততকাল মনীষী রামানুজের প্রমাণ অনুযায়ী ঈশ্বর, জগৎ ও জীবাত্মা সম্বন্ধে সকল ধারণাকে স্বীকার করতে হবে। একটিকে স্বীকার করলে তিনটিকেই স্বীকার করতে হবে,—অস্বীকার করা চলে না। অতএব যত দিন তোমরা বাহ্যজগৎ দেখছ, ততদিন সাকার ঈশ্বর ও জীবাত্মাকে অস্বীকার করা ঘোরতর পাগলামি।

তবে মহাপুরুষদের জীবনে এমন সময় আসে যখন জীবাত্মা নিজের সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে প্রকৃতির পারে চলে যায়, যে প্রদেশ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছে—'যখন মনের সাথে বাক্য তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে।—সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না।—তাঁকে জানি একথা আমরা বলতে পারি না, তাঁকে জানি না এ কথাও বলতে পারি না।'

জীবাত্মা তখনই সকল বন্ধন অতিক্রম করে; তখনই—কেবল তখনই তার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব উদিত হয়—'আমি ও সকল জগৎ এক, আমি ও ব্রহ্ম এক।'

তোমরা দেখবে যে, শুধু জ্ঞান ও দর্শন দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হয় না, এর কিছুটা অংশ প্রেমের শক্তিতে লব্ধ। তোমরা ভাগবতে পড়েছ, কৃষ্ণ অদৃশ্য হলে গোপীরা তাঁর বিরহে বিলাপ করত, অবশেষে তাদের মনে কৃষ্ণ-চিন্তা এত প্রবল হত যে তাদের প্রত্যেকের দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হত এবং নিজেকে কৃষ্ণ বলে মনে করে তাঁর মতো বেশভূষা ধারণ করে তাঁর লীলার অনুকরণ করত। অতএব আমরা বুঝি প্রেমের মাধ্যমেও সেই একত্ব-বোধ আসে। এক প্রাচীন পারসীয় সুফি কবি ছিলেন, তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন,—আমি প্রেমাস্পদের দ্বারে গিয়ে দেখলাম দ্বার রুদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করলাম, ভিতর থেকে শুনলাম, 'কে?' উত্তর দিলাম, 'আমি।' দ্বার খুলল না। দ্বিতীয়বার এসে দ্বারে করাঘাত করলাম, একই কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল, 'কে?' উত্তর দিলাম, 'আমি অমুক।' তবু দ্বার খুলল না। তৃতীয়বার এসে একই প্রশ্ন শুনলাম, 'কে ওখানে?' বললাম, 'প্রিয়তম, আমিই তুমি।' এবার দ্বার খুলল।

অতএব, বিভিন্ন অবস্থা আছে এবং সেগুলি নিয়ে আমাদের বিতর্কের প্রয়োজন নেই, যদিও প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে—যাঁদের আমাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত—তাঁদের মধ্যে বিবাদ থাকতে পারে। জ্ঞানের কোন সীমানা নেই, প্রাচীনকালে বা বর্তমানকালে সর্বজ্ঞত্ব কারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। অতীতকালে যদি ঋষি-মহাপুরুষ থেকে থাকেন, নিশ্চিত জেনো বর্তমানকালেও বহু হবেন। যদি প্রাচীনকালে ব্যাস বাল্মীকি শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হয়ে থাকে, তবে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে শঙ্করাচার্য হতে পারবে না কেন? আমাদের ধর্মের এই বিশেষত্বটিও তোমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্যান্য শাস্ত্রে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের কথা শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সেই প্রত্যাদেশ মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের মাধ্যমেই জনসাধারণের কাছে সত্যগুলি পৌঁচেছে আর সকলকেই তাঁদের কথা মানতে হবে। নাজারেথের যীশুর কাছে সত্য প্রকাশিত হয়েছিল এবং আমাদের সকলকেই তাঁকে মানতে হবে। ভারতবর্ষে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কাছে সত্য প্রকাশিত

হয়েছিল আর ভবিষ্যতের সব ঋষিদের কাছেই সেই সত্য প্রকাশিত হবে; কেবল বাক্যবাগীশ, শাস্ত্রপাঠক, পণ্ডিত ও শব্দতত্ত্ববিদ্ মন্ত্রদ্রষ্টা নন, তত্ত্বদর্শনকারী ব্যক্তিই মন্ত্রদ্রষ্টা। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'—বহু বাক্যব্যয় দ্বারা বা মেধা দ্বারা, এমন কি বেদপাঠ দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। বেদ নিজেই এই কথা বলেছে। তোমরা কি অন্য কোন শাস্ত্রে এমন সাহসের কথা শুনতে পাও যে—বেদপাঠের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যাবে না। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। মন্দিরে গেলেই বা কপালে তিলক ধারণ করলেই কিংবা বিশেষ বস্ত্র পরলেই ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করে রামধনুর সব কটি রঙ লাগাতে পার, কিন্তু হৃদয় যদি না উন্মুক্ত হয়, যদি ঈশ্বরকে না উপলব্ধি কর তাহলে সবই বৃথা। যার হৃদয়ে রঙ লেগেছে সে বাইরের রঙের প্রয়োজন বোধ করে না। সেটিই প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি। আমাদের ভোলা উচিত নয় যে বাইরের রঙ ও অন্যান্য বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মজীবনে সাহায্য করে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি থাকুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু মানুষ যখন বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মকে এক করে ফেলে তখন সেটি অবনতির কারণ হয়, ধর্মজীবনে সাহায্য না করে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়াই ধর্মজীবন হয়ে দাঁড়ায়। এইগুলি অনিষ্টকর ও মারাত্মক, এইগুলি যাতে বন্ধ হয় তা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্র বার বার বলেছে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের দ্বারা কখনও ধর্মানুভূতি লাভ করা যায় না। ধর্ম হচ্ছে তাই, যা আমাদের অক্ষয় পুরুষকে উপলব্ধি করায়, এই ধর্ম সকলের জন্যে। যিনি অতীন্দ্রিয় সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, যিনি আত্মাকে নিজের প্রকৃতিতে উপলব্ধি করেছেন, যিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, সর্ববস্তুতে একমাত্র ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করেন, তিনি ঋষি। ঋষি না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ধর্মজীবন বলে কিছু নেই। ঋষি হলে তোমার প্রকৃত ধর্মজীবন শুরু হবে, এখন শুধু প্রস্তুতি। তখনই তোমার মধ্যে ধর্মের প্রকাশ হবে, এখন কেবল মানসিক কসরৎ ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছ।

অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের ধর্ম স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, যে কেউ মুক্তিলাভ করতে চায়, তাকে ঋষিত্ব লাভ করতে হবে—মন্ত্রদ্রষ্টা হতে হবে, ঈশ্বরদর্শন করতে হবে। এটিই মুক্তি, এই আমাদের শাস্ত্রের বিধান। আর এটিই যদি আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়, তবে আমরা নিজেরাই সহজে আমাদের শাস্ত্র পড়তে পারব, নিজেরাই তার অর্থ বুঝতে পারব, আমরা যা চাই তা বিশ্লেষণ করতে পারব, নিজেরাই সত্যকে বুঝতে পারব। এটাই আমাদের করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ঋষিরা যা করে গেছেন, তার জন্য তাদের শ্রদ্ধা জানাতে হবে। প্রাচীনেরা বড় ছিলেন, কিন্তু আমরা আরও বড় হতে চাই। অতীতে তাঁরা অনেক বড় কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁদের চেয়েও বড় কাজ আমাদের করতে হবে। প্রাচীন ভারতে শত শত ঋষি ছিলেন, এখন লক্ষ লক্ষ ঋষি হবে,—নিশ্চয়ই হবে। আর তোমরা যত শীঘ্র এটা বিশ্বাস করবে, ততই ভারত ও জগতের পক্ষে মঙ্গল। তোমরা বিশ্বাস করবে, তাই হবে। যদি তোমরা নিজেদের ঋষি বলে বিশ্বাস কর, কালই তোমরা ঋষি হবে। কিছুই তোমাদের বাধা দিতে পারবে না। কারণ আমাদের আপাত-

বিরোধী বিবদমান সব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যদি একটি সাধারণ মতবাদ থাকে, তবে তা এই যে, আত্মার মধ্যে পূর্ব হতেই মহিমা তেজ ও পবিত্রতা রয়েছে। কেবল রামানুজের মতে আত্মা সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত ও বিকশিত হন এবং শঙ্করের মতে ওই সঙ্কোচ ও বিকাশ ভ্রম মাত্র। এ প্রভেদে কিছু মনে করো না। সকলেই সত্যকে স্বীকার করে বলছেন,—ব্যক্ত হোক বা অব্যক্ত হোক, শক্তি রয়েছে। যত শীঘ্র এটি বিশ্বাস করবে ততই তোমাদের মঙ্গল। সব শক্তি তোমাদের ভেতরে আছে, তোমরা সব করতে পার। এটা বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করো না যে তোমরা দুর্বল ; নিজেদের আধ-পাগলা বলে মনে করো না, যেমন আজকাল আমাদের অনেকে করে। এমন কি কারও সাহায্য ছাড়াই তোমরা সব করতে পার, সব শক্তি তোমাদের ভেতরে আছে। উঠে দাঁড়াও, নিজের ভেতরের দেবত্বকে প্রকাশ কর।

ভারতের ভবিষ্যৎ

এই সেই প্রাচীনভূমি, অন্যান্য দেশে যাবার পূর্বে তত্ত্বজ্ঞান যে স্থানকে স্বীয় বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করেছিল; এই সেই ভারতভূমি, যার আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়জগতের সাগরপ্রমাণ প্রবহমান স্রোতস্বতী সমূহের ন্যায়, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হয়ে তুষারমণ্ডিত শিখরমালা নিয়ে যেন স্বর্গের রহস্যরাশির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। এই সেই ভারত, যে দেশের মাটি মহান ঋষিদের পদধূলিতে পবিত্র হয়েছে। এখানেই মানবপ্রকৃতি ও অন্তর্জগৎ সম্পর্কে প্রথম জিজ্ঞাসা জেগেছিল। এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে মতবাদের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। এখানেই ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শগুলি চরম পরিণতি লাভ করেছিল। এই সেই ভূমি, যেখান থেকে আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের বন্যা বার বার প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীকে প্লাবিত করেছিল। এই সেই দেশ, যেখান থেকে আবার অমনি তরঙ্গ উঠে ক্ষয়িষ্ণু মানবজাতির ভেতর জীবন ও শক্তি সঞ্চার করবে। এই সেই ভারত, যা শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বিদেশী আক্রমণ, শত প্রকার রীতিনীতির আলোড়ন সহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সেই ভূমি, যা নিজের অবিনাশী শক্তি ও অমর জীবন নিয়ে পৃথিবীর যে কোন পর্বতের চেয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত অমর, ভারতভূমির জীবনও ঠিক তেমন আর আমরা এমনি এক দেশের সন্তান।

হে ভারত সন্তানগণ, আমি আজ এখানে তোমাদের কিছু কাজের কথা বলতে এসেছি এবং অতীত গৌরব-কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। লোকে আমাকে বহুবার বলেছে যে অতীতের পানে তাকালে অবনতি হয়, কোন ফল হয় না এবং আমাদের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কথাটা সত্যি। কিন্তু অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যত দূর পার অতীতের পানে তাকাও, পশ্চাতে যে চিরন্তন নির্ঝরিণী আছে, তার বারি প্রাণ ভরে পান কর এবং তারপরে দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত কর, সম্মুখে অগ্রসর হও এবং ভারতবর্ষ যা ছিল তার চেয়ে তাকে উজ্জ্বলতর, উচ্চতর, মহত্তর করে তোল। আমাদের পূর্বপুরুষরা মহান ছিলেন। আমাদের প্রথমে সে কথা স্মরণ করতে হবে। প্রথমে জানতে হবে আমরা কী উপাদানে গঠিত, কী রক্ত আমাদের শিরায় বইছে; সেই রক্তে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, অতীতে সেই রক্ত কী করেছে তা জানতে হবে এবং অতীতের মহত্ত্বে বিশ্বাসী ও সচেতন হয়ে আমরা এমন এক ভারত গঠন করব, তা অতীতে যা ছিল তার চেয়ে মহত্তর হবে। মাঝে মাঝে এখানে অবনতির যুগ এসেছে, সেগুলিকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই না। আমরা সকলেই জানি—ওই অবনতির প্রয়োজন ছিল। এক বিরাট বৃক্ষে সুন্দর পাকা ফল জন্মাল, ফলটি মাটিতে পড়ে পচে গেল, তার বীজ থেকে নতুন অঙ্কুর জন্মাল, ভবিষ্যতে হয়তো এমন গাছ হবে যেটি আরও বিরাট। এইভাবে যে অবনতির যুগ আমাদের কাটাতে হয়েছে তারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই অবনতির মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতের ভারত জন্মলাভ করছে, অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে, নব-পল্লব বের হয়েছে, এক

বিশাল বিরাট 'ঊর্ধ্ব মূল' বৃক্ষের আবির্ভাব শুরু হয়েছে—তার কথাই আমি আজ তোমাদের বলব।

ভারতের সমস্যা অন্যান্য দেশের সমস্যার চেয়ে জটিলতর, গুরুতর। জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী—এই সব নিয়ে একটি জাতি গঠিত হয়। যে উপাদানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি গঠিত সেগুলির সঙ্গে আমাদের জাতির তুলনা করলে দেখা যাবে যে অন্য কোনটি এমনভাবে জাতি-গোষ্ঠীর পর জাতি-গোষ্ঠীকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়নি। আর্য, দ্রাবিড়, তাতার, তুর্কি, মোগল, ইউরোপীয়—পৃথিবীর সকল জাতির শোণিতধারা এদেশে প্রবাহিত। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে, আর আচারে ব্যবহারে দুটি ভারতীয় জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রভেদ তা ইউরোপীয় ও প্রাচ্যজাতির প্রভেদের চেয়ে বেশি।

আমাদের একমাত্র সাধারণ ভিত্তি হচ্ছে আমাদের পবিত্র ঐতিহ্য, আমাদের ধর্ম। এই ভিত্তির উপরেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করতে হবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় ধর্মই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্মীয় ঐক্যই প্রথম শর্তরূপে একান্ত প্রয়োজন। সারা দেশে একটি মাত্র ধর্ম সকলকে স্বীকার করতে হবে। একটি মাত্র ধর্ম বলে আমি কি বলতে চাইছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধদের মধ্যে যে হিসাবে এক ধর্ম কথাটি বোঝা হয় আমি তেমন অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করছি না। আমরা জানি আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি যতই বিভিন্ন হোক, তাদের দাবির মধ্যে যতই প্রভেদ থাকুক, আমাদের ধর্মের মধ্যে এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে, যা সর্বজনগ্রাহ্য। তাই এই ধর্মে এমন এক সাধারণ ভিত্তি আছে, যার সীমানার মধ্যে বহু বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নেওয়া যায়, নিজস্বভাবে জীবনযাপনের ও চিন্তার অসীম স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া যায়। আমরা সকলেই জানি—অন্তত আমাদের মধ্যে যাঁরা চিন্তা করেছেন, তাঁরা এটা জানেন। আমরা চাই যে আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বগুলি সকলে—সারা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করুক। এই আমাদের প্রথম কর্তব্য, অতএব এই কর্তব্য পালন করতেই হবে।

আমরা দেখতে পাই এশিয়ায়, বিশেষত ভারতবর্ষে; জাতি, ভাষা সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত বাধা এই ধর্মের সমন্বয়কারী শক্তির সামনে কীভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা জানি ভারতবাসীর কাছে আধ্যাত্মিক আদর্শের চেয়ে উঁচু আদর্শ নেই, এটিই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র এবং এই মন্ত্র অনুযায়ী স্বল্পতম বাধার পথেই আমরা কাজ করতে পারি। ধর্মের আদর্শ সব আদর্শের সেরা—এটি শুধু সত্য নয়, ভারতের পক্ষে এটিই একমাত্র কাজ করবার উপায়; প্রথমে ধর্মের দিকটি দৃঢ় না করে অন্য কোন উপায়ে কাজ করতে গেলে ফল সাংঘাতিক হবে। অতএব ভাবী ভারত গঠনের প্রথম কর্মসূচী, যুগযুগান্তরের প্রস্তর কেটে প্রথম সোপান নির্মাণ করতে হবে ধর্মের এই সমন্বয় সাধন দ্বারাই। আমাদের সকলকে শিখতে হবে যে—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায়ের আমরা

হই না কেন, আমাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে; আর নিজেদের মঙ্গলের জন্য, জাতির মঙ্গলের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিবাদ ও বিভেদ পরিত্যাগ করার সময় এসেছে। নিশ্চয় জেনো এই সব বিবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শাস্ত্র এরনিন্দা করেছে, পূর্বপুরুষরা নিষেধ করেছেন, আর যাঁদের বংশধর বলে আমরা দাবি করে থাকি, যাঁদের শোণিত আমাদের শিরায় প্রবাহিত, সেই মহাপুরুষরা তাঁদের উত্তরপুরুষের ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিবাদকে ঘৃণার চোখে দেখেন।

বিবাদ পরিত্যাগ করলে সকল উন্নতি সম্ভব। যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, দেহে কোন রোগ-জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। আধ্যাত্মিকতাই আমাদের রক্তস্বরূপ। যদি এই রক্তপ্রবাহ পরিষ্কার হয়, যদি বিশুদ্ধ, শক্তিশালী, সতেজ হয়, তবে সবকিছুই ঠিক থাকে। যদি এই রক্ত বিশুদ্ধ হয়, রাজনৈতিক, সামাজিক বা কোন বাস্তবজগতের ত্রুটি, এমন কি দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষও সংশোধিত হয়ে যাবে। যদি রোগের জীবাণু বের হয়ে যায়, তবে শরীরে অন্য কী আর প্রবেশ করবে? আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপমা অনুসারে বলা যেতে পারে—রোগ জন্মানোর জন্য দুটি কারণের প্রয়োজন হয়—বাইরের কোন বিষাক্ত জীবাণু ও দেহের অবস্থা। যতক্ষণ না দেহের এমন অবস্থা হয় যে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করতে পারে, যতক্ষণ না দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে রোগ-জীবাণু প্রবেশের ও বৃদ্ধির অনুকূল হয়, ততক্ষণ পৃথিবীর কোন জীবাণুরই শক্তি নেই দেহে রোগ সৃষ্টি করার। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের দেহের মধ্যে দিয়ে কোটি কোটি জীবাণু ক্রমাগত যাতায়াত করছে, যতদিন শরীর সতেজ থাকে, ততদিন কেউ সেগুলির অস্তিত্ব বুঝতে পারে না। শরীর যখন দুর্বল হয়, তখনই জীবাণুরা শরীরে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে ঠিক একই কথা। যখনই জাতীয় দেহ দুর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে—সকল ক্ষেত্রেই সবরকমের রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপন্ন করে। অতএব এর প্রতিকারের জন্য রোগের মূল কারণ কী তা দেখতে হবে এবং রক্তকে জীবাণুশূন্য পরিষ্কার করতে হবে। একমাত্র কর্তব্য হবে রোগীকে শক্তিশালী করে তোলা, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, দেহকে সতেজ করা, তবেই রোগী বাহ্য বিষের প্রবেশ প্রতিরোধ করতে পারবে, তাকে দেহ থেকে দূর করে দিতে পারবে।

আমরা দেখেছি আমাদের শক্তি, আমাদের তেজ, এমন কি আমাদের জাতীয় জীবন আমাদের ধর্মেই নিহিত। আমি এখন বিচার করতে যাচ্ছি না যে এটি ঠিক কি বেঠিক, সত্য কি মিথ্যা, ধর্মেই জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করা পরিণামে মঙ্গলজনক বা অমঙ্গলজনক। ভাল হোক মন্দ হোক, ধর্ম আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি হয়ে গেছে, তোমরা একে ত্যাগ করতে পার না, এটি বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও থাকবে, তাই তোমাদের একে সমর্থন করতে হবে, এমন কি আমার মতো তোমাদের ধর্মে বিশ্বাস না থাকলে পরেও। তোমরা এই ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছ, যদি ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনস্বরূপ, তাকে সুদৃঢ় করতে হবে। তোমরা যে শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করে এখনও

দাঁড়িয়ে আছ, তার সহজ কারণ হচ্ছে তোমরা সযত্নে এই ধর্মকেই রক্ষা করেছ, এর জন্য অন্য সব কিছু ত্যাগ করেছ। এই ধর্মরক্ষার জন্যই তোমাদের পূর্বপুরুষরা সাহস ভরে সব কিছু সহ্য করেছেন, এমন কি মৃত্যুকেও। বিদেশী বিজেতারা মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস করেছে, কিন্তু সেই অত্যাচার-স্রোত যেই একটু স্তিমিত হয়েছে, অমনি সেখানে মন্দিরের চূড়া আবার উঁচু হয়ে উঠেছে। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মন্দিরগুলি ও গুজরাটের সোমনাথের মন্দির তোমাদের প্রভূত জ্ঞান দান করবে, জাতির ইতিহাস সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করবে, যা বহু গ্রন্থ অধ্যয়নেও লাভ করবে না। লক্ষ্য করে দেখ, ওই মন্দিরগুলি শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করে আছে. বার বার ধ্বংস হয়েছে আর বার বার সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠেছে, নতুন জীবনলাভ করে আগের মতোই অটলভাবে রয়েছে। এই হচ্ছে জাতীয় মন, এই হচ্ছে জাতীয় প্রাণ-প্রবাহ। একে অনুসরণ কর, এ তোমাদের গৌরবান্বিত করে তুলবে। একে ত্যাগ কর, মৃত্যু আসবে। জাতীয় প্রাণ-প্রবাহের বিরুদ্ধে গেলে ফল হবে বিনাশ, পরিণাম হবে ধ্বংস। আমি একথা বলছি না যে আর কিছুর প্রয়োজন এই। আমি বলতে চাই না যে রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন নেই ; আমি বলতে চাই ,—আমার ইচ্ছা তোমরা এটা মনে রাখ যে, ভারতবর্ষে ওইগুলি গৌণ, ধর্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথমে ধার্মিক, পরে অন্য কিছু। অতএব ধর্মকে সুদৃঢ় করতে হবে, কিন্তু কেমন ভাবে ? আমি তোমাদের কাছে আমার ধারণা-গুলি বলব। আমেরিকা যাত্রার জন্য মাদ্রাজের তটভূমি পরিত্যাগের বহু বৎসর পূর্ব থেকেই সেই ধারণাগুলি আমার মনের মধ্যে ছিল এবং সেই ধারণাগুলি প্রচার করার জন্যই আমি আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম। ধর্ম-মহাসভা বা অন্য কিছুর জন্য আমার কোন আগ্রহই ছিল না, ওটা শুধু এক সুযোগরূপেই উপস্থিত হয়েছিল ; প্রকৃত পক্ষে আমার ধারণাগুলির জন্যই আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি।

আমার সঙ্কল্প—প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্ম তত্ত্বগুলিকে প্রকাশ্যে আনতে হবে। যাদের হাতে ওইগুলি লুক্কায়িত আছে শুধু তাদের কাছ থেকে বের করে আনলেই চলবে না, তার চেয়ে দুর্ভেদ্য পেটিকা থেকে উদ্ধার করতে হবে, অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষার কঠিন আবরণে শত শতাব্দী ধরে রক্ষিত, তার থেকেও বের করতে হবে। এক কথায় আমি সেগুলিকে জনপ্রিয় করতে চাই। আমি ওই তত্ত্বগুলিকে উদ্ধার করে সর্বসাধারণের সম্পত্তি করে তুলতে চাই, প্রতি ভারতবাসীর সম্পত্তি, সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা না জানুক। এই সংস্কৃত ভাষার—আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার—কাঠিন্যই এই ভাবগুলির প্রচারকার্যে বড় বাধা, আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হচ্ছে, ততদিন এই বাধা দূর হওয়া সম্ভব নয়। এই বাধার কথা, তোমরা ভালভাবে বুঝবে, যদি আমি জানাই যে, আমি সারা জীবন ধরে ওই ভাষা অধ্যয়ন করছি তা সত্ত্বেও প্রতি নতুন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার কাছে নতুন ঠেকে। যারা এই ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করার অবসর পায়নি, তাদের কাছে তাহলে এই ভাষা কত কঠিন! অতএব তত্ত্বগুলি জনসাধারণের প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে।

সেই সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলবে, কারণ সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ জাতিকে মর্যাদা, গৌরব, শক্তি দান করবে। মহান রামানুজ চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন; এই মহাপুরুষদের জীবিতকালেই তাঁদের কার্যের বিস্ময়কর ফল দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরে তাঁদের কার্যের এমন শোচনীয় পরিণাম কেন হলো তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে; এই মহান আচার্যদের তিরোভাবের এক শতাব্দীর মধ্যেই কেন সেই উন্নতি বন্ধ হলো? সে রহস্য হচ্ছে এই—তাঁরা নিম্নজাতিকে উন্নত করেছিলেন, তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তারা উন্নত হোক, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা বিস্তারের জন্য তাঁরা শক্তি প্রয়োগ করেননি। এমন কি মহান বুদ্ধদেবও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করায় একটি ভুল পদক্ষেপ করেছিলেন। তিনি তাঁর কার্যের দ্রুত ফল চেয়েছিলেন, তাই সংস্কৃত ভাষার তত্ত্বগুলি তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ ও প্রচার করলেন। অবশ্য ভালই করেছিলেন—তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় কথা বললেন এবং লোকে তাঁকে বুঝল। এটি খুব ভাল হলো; এতে ভাবধারা দ্রুত বিস্তৃত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সেইসঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হলো বটে, কিন্তু মর্যাদা রইল না, সংস্কৃতি রইল না। সংস্কৃতিই জাতির ধাক্কা সামলাতে পারে, শুধু জ্ঞানরাশি পারে না। জগতের লোককে তুমি একগাদা জ্ঞান দিতে পার, কিন্তু তাতে বিশেষ কল্যাণ হবে না। রক্তের মধ্যে সংস্কৃতি চাই। আমরা সকলেই জানি বর্তমানে বহু জাতিরই প্রচুর জ্ঞান আছে, কিন্তু তাতে কি? তারা বাঘের মতো হিংস্র, বর্বরের মতো নৃশংস, কারণ তাদের সংস্কৃতির অভাব। জ্ঞান তাদের অঙ্গাবরণের মতো, সভ্যতাও তাই, একটু নাড়া দিলেই আবরণ খসে পড়ে আদিম প্রকৃতি প্রকাশ পায়। এই ব্যাপারই জগতে ঘটে, এই হচ্ছে বিপদ। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দিলে, তাদের মধ্যে তত্ত্বকথা ঢুকিয়ে দিলে তারা কিছু তথ্য পেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু পাওয়া দরকার—তাদের সংস্কৃতির স্পর্শ দাও। যতদিন তা তাদের না দিচ্ছ, ততদিন জনসাধারণের উন্নত অবস্থার স্থায়িত্বের আশা নেই। আর একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হবে, সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে একদল তাদের উপরে উঠে প্রভুত্ব করবে। নিম্নজাতীয় লোকদের আমি বলছি,—তোমাদের অবস্থা উন্নত করার একমাত্র পথ—নিরাপত্তার একমাত্র পথ—সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা। উচ্চতর জাতিগুলির বিরুদ্ধে এই যে লেখালিখি তর্ক-বিবাদ চলছে, তা বৃথা; এতে কোন কল্যাণ হয় না, এতে বিবাদ বিরোধই বাড়ে এবং দুর্ভাগ্যবশত যে জাতি ইতিমধ্যেই বিভক্ত, তারা আরও বিভক্ত হয়ে যাবে। জাতিভেদের বৈষম্য দূর করার একমাত্র পথ হচ্ছে উচ্চ জাতির শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নিজেদের অধিকারে আনা। তা যদি করা হয়, তাহলে তোমরা যা চাইছ তা পেয়ে গেলে।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্নের আলোচনা করতে চাই, যেটি মাদ্রাজের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। একটি মত আছে—দাক্ষিণাত্যে আর্যাবর্তবাসী আর্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল এবং দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা হচ্ছেন উত্তর

হতে আগত আর্য, সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী ও জাতি। এখন ভাষাতাত্ত্বিকরা আমায় ক্ষমা করবেন,—আমি বলি এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। একমাত্র প্রমাণ উত্তরের ও দক্ষিণের ভাষার পার্থক্য। আমি তো আর কোন পার্থক্য দেখি না। এখানে আমরা অনেক আর্যাবর্তের মানুষ আছি, আমার ইউরোপীয় বন্ধুদের আমি আহ্বান করছি, এই সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে থেকে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের পৃথক করতে। আমাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? একটু ভাষার প্রভেদ মাত্র। কিন্তু সংস্কৃতভাষী ব্রাহ্মণরা এক বহিরাগত জাতি। ভাল কথা, তারপর তাঁরা এখানে এসে দ্রাবিড় ভাষা বলতে লাগলেন এবং সংস্কৃত ভুলে গেলেন। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে, তবে অন্য শ্রেণী সম্বন্ধে খাটবে না কেন? অন্যান্য শ্রেণীও আর্যাবর্ত নিবাসী ছিল, তারাও দাক্ষিণাত্যে এসে সংস্কৃত ভুলে গিয়ে দ্রাবিড় ভাষা গ্রহণ করেছে, একথাই বা বলা যাবে না কেন? যে যুক্তি দ্বারা তুমি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীকে অনার্য বলে প্রমাণ করছ, সেই যুক্তি দ্বারাই আমি তাদের আর্য বলে প্রমাণ করতে পারি। যুক্তিটা দুদিকেই খাটে। ওইসব বাজে কথায় বিশ্বাস করো না। হতে পারে এক দ্রাবিড় জাত ছিল, তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা বন-জঙ্গলে বাস করছে। খুব সম্ভব ওই ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্তে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সকলেই আর্য, আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে এসেছে। সমস্ত ভারত আর্যময়, এখানে অন্য জাতি আর নেই।

আবার আর এক মত আছে—শূদ্রশ্রেণী নিশ্চয় অনার্য। তারা কারা? তারা আর্যদের দাস। লোকে বলে ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে। মার্কিন, ইংরাজ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ জাতিগুলি আফ্রিকান হতভাগ্যদের ধরে নিয়ে গিয়ে জীবিতকালে কঠোর পরিশ্রম করিয়েছে এবং তাদের বর্ণসঙ্কর পুত্ররাও বহুকাল দাসত্ব ভোগ করেছে। এই বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত থেকে মন কয়েক হাজার বছর অতীতে লাফিয়ে গিয়ে কল্পনা করে নেয় এখানেও এমন ব্যাপার ঘটেছিল। আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকরা স্বপ্ন দেখে থাকেন যে, ভারতবর্ষ কৃষ্ণচক্ষু আদিম অধিবাসীতে পূর্ণ ছিল এবং গৌরবর্ণ আর্যগণ এখানে আগমন করেছিল। ভগবান জানেন কোথা থেকে তারা এল। কেউ বলেন মধ্য-তিব্বত থেকে, আবার কেউ বলেন মধ্য এশিয়া থেকে। অনেক স্বদেশপ্রেমিক ইংরাজ আছেন যাঁরা মনে করেন আর্যদের তাঁদের মতো লাল চুল। আবার অনেকে তাদের পছন্দানুযায়ী বলেন আর্যদের চুল কালো ছিল। লেখকের নিজের চুল কালো হলে, তিনি আর্যদেরও চুল কালো বলেন। সম্প্রতি প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে আর্যেরা সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদের তীরে বাস করতেন। তারা সকলে যদি এই মতামতের সঙ্গে সেই হ্রদে ডুবে মরতেন তাহলেও আমার দুঃখ ছিল না। আজকাল আবার কেউ কেউ বলছেন তারা উত্তরমেরুতে বাস করত। আর্যগণ ও তাদের বাসভূমির উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক! এই সকল মত সত্য কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে একটি কথাও নেই। এমন কোন বাক্য নেই যাতে আর্যদের ভারতের বাইরের কোন স্থানের অধিবাসী মনে করা যেতে পারে, আর আফগানিস্তান প্রাচীন ভারতের

অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর্যদের আগমনের ব্যাপার এখানেই শেষ। আর শূদ্রশ্রেণী যে অনার্য এবং বহুসংখ্যক ছিল—এই মতও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এটা কখনই সম্ভব নয় যে, সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্য শত সহস্র অনার্য দাসের উপর প্রভুত্ব খাটিয়ে এখানে বসবাস করেছিল। এই দাসেরা তাদের খেয়ে ফেলত, পাঁচ মিনিটের মধ্যে চাটনি বানিয়ে চেখে দেখত। শ্রেণীভেদের একমাত্র ব্যাখ্যা মহাভারতে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণশ্রেণী ছিল, তারপর বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে তারা নিজেদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে লাগল। এটাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। আগামী সত্য যুগে আবার সব শ্রেণী পুরানো অবস্থায় ফিরে যাবে, ব্রাহ্মণে পরিণত হবে।

অতএব ভারতে শ্রেণীভেদ সমস্যার মীমাংসা এইভাবে হবে—উচ্চ বর্ণগুলিকে অবনত করা নয়, ব্রাহ্মণকে ধ্বংস করে নয়। ভারতে ব্রাহ্মণত্বই মনুষ্যত্বের পরম আদর্শ —শঙ্করাচার্য তাঁর গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় অতি সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রচারকরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করার জন্যই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটি মহান উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্য মানব, এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও সম্পূর্ণ মানবকে থাকতে হবে, তাঁর লোপ পেলে চলবে না। বর্তমানে জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি —ব্রাহ্মণজাতির সপক্ষে এইটুকু বলতেই হবে যে, অন্যান্য জাতের চেয়ে তাঁদের মধ্যেই অধিকতর সংখ্যায় ব্রাহ্মণত্ব সম্পন্ন মানুষের জন্ম হয়েছে। এটি সত্য কথা। অন্যান্য শ্রেণীর কাছ থেকে এই গৌরব ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। আমাদের নিশ্চয়ই যথেষ্ট সাহসী হয়ে, নির্ভীক হয়ে ব্রাহ্মণদের দোষ দেখিয়ে দিতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে যেটুকু প্রশংসা তাদের প্রাপ্য, তা দিতে হবে। প্রাচীন ইংরাজি প্রবচনটি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—'প্রত্যেককে তার ন্যায্য প্রাপ্য দিও !'

অতএব, বন্ধুগণ, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন নেই। এতে কী ভাল হবে? এতে আমরা আরও বিভক্ত হব, দুর্বল হব, অবনত হব। একচেটে সুবিধা, একচেটে অধিকারের দিন চলে গেছে, ভারত থেকে চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর এটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম সুফল। মুসলমান শাসনকালেও এই একচেটে অধিকার বিলোপের যে সুফল পাওয়া গেছে, যে আশীর্বাদ পাওয়া গেছে তার জন্য আমরা ঋণী। তাদের রাজত্বে যে সবই মন্দ ছিল তা নয়। কোন জিনিসই সম্পূর্ণ মন্দ নয়, আবার সম্পূর্ণ ভালও নয়। মুসলমানদের ভারত বিজয় পদদলিতদের, দরিদ্রদের মুক্তির কারণ হয়েছিল। এই কারণেই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। কেবল তরবারির দ্বারাই এটা হয়নি। কেবল তরবারি ও অগ্নির দ্বারা একাজ হয়েছিল মনে করা নিছক পাগলামি। আর তোমরা যদি সাবধান না হও, তাহলে মাদ্রাজের এক-পঞ্চমাংশ—এমন কি অর্ধেক লোক খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। মালাবারে আমি যা দেখেছি তার চেয়ে আহাম্মকির ব্যাপার জগতে আর কি থাকতে পারে? 'পারিয়া' বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটতে দেওয়া হয় না, কিন্তু সে যদি তার নামটা যা হোক এক ইংরাজি নামে কিংবা কোন মুসলমানী নামে বদলে নেয়, তাহলেই

সব ঠিক হয়ে গেল। এই দেখে সমস্ত মালাবারবাসীরা পাগল ও তাদের গৃহগুলি উন্মাদ আশ্রম ছাড়া আর কী অনুমান করতে পারে ? যতদিন না তারা নিজেদের প্রথা ও আচারাদির সংশোধন করছে, ততদিন তারা ভারতের প্রত্যেক জাতির ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবে। তাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় যে এমন মন্দ ও পৈশাচিক প্রথা অনুসরণ করা হচ্ছে ; নিজেদের সন্তানদের অনাহারে মরতে দিচ্ছে, কিন্তু যেই তারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করছে, তাদের ভালভাবে খাওয়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ আর থাকা উচিত নয়।

এই সমস্যার সমাধান উচ্চবর্ণকে নিচে নামিয়ে নয়, নীচবর্ণকে উন্নত করে করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী কর্মপন্থা ; অবশ্য কতকগুলি লোক—নিজেদের শাস্ত্র সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নেই এবং প্রাচীনদের মহান উদ্দেশ্য বোঝার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই—তারা অন্য কথা বলে থাকে। তারা এটা বুঝতে পারে না। কিন্তু যাঁদের মস্তিষ্ক আছে, তাঁদের এই কাজের ব্যাপক উদ্দেশ্য ধারণা করার বুদ্ধি আছে, তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধরে জাতীয় জীবনের যে আশ্চর্য শোভাযাত্রা চলেছে, তা লক্ষ্য করেন। তাঁরা প্রাচীন ও আধুনিক সকল গ্রন্থের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুধাবন করতে পারেন। কি সেই পরিকল্পনা ? একদিকে ব্রাহ্মণ, অন্যদিকে চণ্ডাল এবং সমস্ত পরিকল্পনা হচ্ছে চণ্ডালকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা। ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমন অনেক গ্রন্থ আছে যেখানে তুমি দেখবে এইরূপ কঠোর বাক্য বলা হয়েছে—'যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে, তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার কিছু স্মরণ থাকে, তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি সে ব্রাহ্মণকে "ওহে ব্রাহ্মণ" বলিয়া সম্বোধন করে তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে হইবে।'

নিঃসন্দেহে এটি পৈশাচিক বর্বরতা, আর তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এতে বিধানদাতাদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁরা সমাজের সম্প্রদায়বিশেষের প্রথা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীনদের মধ্যে কিছু শয়তান লোকও জন্মেছিল। সর্বযুগেই সর্বত্রই অল্পবিশেষ কিছু শয়তান লোক থাকে। পরবর্তী কালে দেখবে শূদ্রদের প্রতি কঠোরতা কিছু কমেছে, উদাহরণস্বরূপ,—'শূদ্রদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাদের বেদাদি শিক্ষা দিবে না।' ক্রমশ আমরা আধুনিক, বিশেষত যেগুলি এই যুগে পূর্ণ শক্তিশালী, সেই স্মৃতিগুলিতে দেখি—'যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করে তবে তাহারা ভালই করিবে, তাহাদের উৎসাহিত করা উচিত।' এইভাবে ক্রমশঃ এটি করা হয়েছে। আমার সময় নেই এই কার্য-প্রণালী বিশদভাবে অনুধাবন করে তোমাদের দেখাবার, কিন্তু সাধারণ ঘটনাগুলি বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, সকল শ্রেণীকেই ধীরে ধীরে উন্নত হতে হবে। এখনও যে সহস্র সহস্র শ্রেণী রয়েছে, তাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নত হচ্ছে। কারণ শ্রেণীবিশেষ যদি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করে, তাতে কে বাধা দিচ্ছে ? জাতিভেদ যত কঠোর হোক, এইভাবেই তা সৃষ্টি হয়েছে। মনে কর কতকগুলি শ্রেণী রয়েছে, প্রত্যেক শ্রেণীতে দশ হাজার লোক আছে। তারা যদি

সকলে মিলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করে কেউ তাদের বাধা দিতে পারে না। আমি নিজের জীবনে এটা দেখেছি। কতকগুলি শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আর যখনই তারা একমত হয়, তখন কে তাদের বাধা দেবে? কারণ আর যাই হোক, এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর সম্পর্ক নেই। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর কাজে হস্তক্ষেপ করে না, এমনকি এক শ্রেণীর বিভিন্ন শাখাগুলিও পরস্পরের কাজে হস্তক্ষেপ করে না।

শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যুগাচার্যরা শ্রেণীভেদপ্রথা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা যেসব অদ্ভুতকাণ্ড করেছিলেন, তা আমি তোমাদের বলতে পারি না; আমি যা বলতে যাচ্ছি তাতেই তোমাদের অনেকে আপত্তি করতে পার। কিন্তু আমার ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতায় আমি সেগুলির সন্ধান পেয়েছি এবং গবেষণা করে আশ্চর্য ফল পেয়েছি। সময়ে সময়ে তারা দলকে দল বেলুচিকে ক্ষত্রিয় করে ফেললেন, দলকে দল জেলেকে একবারে ব্রাহ্মণ করে দিলেন। তাঁরা সকলেই মুনি-ঋষি ছিলেন এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমাদের নত হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। তাই, তোমাদেরও মুনি-ঋষি হতে হবে, এটাই কৃতকার্য হবার গোপন রহস্য। অল্পাধিক আমাদের সকলকেই ঋষি হতে হবে। ঋষি বলতে কী বোঝায়? শুদ্ধস্বভাবের লোক। আগে শুদ্ধচিত্ত হও, তুমি শক্তি লাভ করবে। কেবল 'আমি ঋষি' বললে চলবে না, যখন তুমি যথার্থ ঋষি হবে, দেখবে লোকে সঙ্গে সঙ্গে তোমায় মানছে। তোমার ভেতর থেকে এক আশ্চর্য শক্তি বেরিয়ে অপরকে বাধ্য করবে তোমায় অনুসরণ করতে, তোমার কথা শুনতে, তাদের অজ্ঞাতসারে, এমন কি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তারা তোমার কার্য-সহায়ক হবে। এটিই ঋষিত্ব।

অবশ্য বংশপরম্পরাক্রমে বিশদভাবে এই কাজ করে যেতে হবে। বিবাদ-বিসংবাদের যে কিছু প্রয়োজন নেই, সেটার আভাস আমি দু-এক কথায় দিলাম। আমার আরও দুঃখের কারণ এই যে আজকাল শ্রেণীগুলির এত বিবাদ-বিরোধ চলেছে, এটি বন্ধ হওয়া চাই। কোন পক্ষেরই এতে কিছু লাভ নেই, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর পক্ষে, ব্রাহ্মণদের পক্ষে, কারণ সুযোগ-সুবিধারও একচেটে অধিকারের দিন চলে গেছে। প্রত্যেক অভিজাত শ্রেণীর কর্তব্য নিজেদের কবর নিজেদের খোঁড়া, আর এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি তারা করে ততই ভাল। যত দেরী করবে ততই তারা পচবে, আর মৃত্যুটা ভয়ানক হয়ে উঠবে। অতএব ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে ভারতের অন্যান্য সকলের উদ্ধারের চেষ্টা করা। যদি তিনি তাই করেন এবং যতকাল করেন, ততকালই তিনি ব্রাহ্মণ, যদি তিনি টাকা করার চেষ্টায় ঘুরে বেড়ান, তাহলে তিনি আর ব্রাহ্মণ নন। অপরপক্ষে তোমাদেরও প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা কর্তব্য, তাতেই স্বর্গলাভ হবে। কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করলে স্বর্গলাভ না হয়ে বিপরীত ফল হয়—আমাদের শাস্ত্র এই কথা বলে। এই বিষয়ে তোমাদের সাবধান হতে হবে। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি কোন বৈষয়িক কর্ম করেন না। বৈষয়িক কর্ম অন্যান্য শ্রেণীর জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নয়। ব্রাহ্মণদের কাছে আমার অনুরোধ —তাঁরা যা জানেন অন্য সকলকে শিক্ষা দিয়ে, শত শতাব্দী ধরে যে সংস্কৃতি

তাঁরা সঞ্চয় করেছেন, তা অপরকে দান করে তাঁদের প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হবে ভারতবাসীকে উন্নত করার জন্য। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কী তা স্মরণ করা। মনু বলেছেন,—'ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার কারণ তাঁর কাছে ধর্মের ভাণ্ডার রয়েছে।'

ব্রাহ্মণকে এই ভাণ্ডার খুলে রত্নরাজি জগতে বিতরণ করতে হবে। এ কথা সত্য যে ভারতীয় অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছে ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং তিনিই প্রথমে সর্বস্ব ত্যাগ করেন জীবনের উচ্চ তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করার জন্য, যখন অন্যেরা সেগুলি ধারণাই করতে পারে নি। অন্যান্য শ্রেণীর থেকে তিনি যে এগিয়ে গিয়েছিলেন এটা তাঁর দোষ নয়। অন্যেরা কেন তাঁর মতো উপলব্ধির পথে অগ্রসর হলো না? কেন তারা অলসভাবে চুপ করে বসে থেকে ব্রাহ্মণদের দৌড়-প্রতিযোগিতায় জয়লাভের সুযোগ করে দিল?

কিন্তু একটু সুবিধা লাভ করা এক কথা, আর সেটিকে অসদ্ব্যবহারের জন্য রক্ষা করা আর এক কথা। ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা শয়তানি হয়ে ওঠে। কেবল সদুদ্দেশ্যেই ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে। তাই এই যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কৃতি—তাঁরা এতদিন যার রক্ষক হয়ে আছেন—তা সর্বসাধারণকে হস্তান্তর করতে হবে। তাঁরা সর্বসাধারণকে এটি দেননি বলেই মুসলমান আক্রমণ সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা গোড়া থেকে সর্বসাধারণের কাছে এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নি, সেইজন্যই সহস্র বৎসর ধরে যে কেউ ইচ্ছা করেছে, সেই ভারতে এসে আমাদের পদদলিত করেছে। এই কারণেই আমাদের অবনতি ঘটেছে। তাই আমাদের সর্বপ্রথম কার্য এই যে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ধর্মরূপ অপূর্ব রত্নরাজির গোপন ভাণ্ডার ভেঙে ফেলে সেগুলি বের করে এনে প্রত্যেককে বিতরণ করতে হবে এবং ব্রাহ্মণকেই সবার আগে এই কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে একটি প্রাচীন বিশ্বাস আছে—যে গোখরো সাপ কামড়েছে সে যদি নিজেই বিষ উঠিয়ে নেয় তবেই সাপে-কাটা রোগী বাঁচে। সুতরাং ব্রাহ্মণকে তার নিজের বিষ নিজেকেই উঠিয়ে নিতে হবে।

অব্রাহ্মণ শ্রেণীকে আমি বলছি,—অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হয়ো না। সুবিধা পেলেই ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করো না, কারণ আমি তোমাদের দেখিয়েছি তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাচ্ছ। কে তোমাদের বলেছিল আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃত শিক্ষাকে অবহেলা করতে? এতকাল তোমরা কী করছিলে? কেন তোমরা উদাসীন ছিলে? অপরে তোমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি, বেশি শক্তি, বেশি সাহস, বেশি কর্মশক্তির অধিকারী বলে এখন বিরক্তি প্রকাশ করছ কেন? সংবাদপত্রে এইসব বৃথা বাদানুবাদে শক্তি ক্ষয় না করে, নিজেদের ঘরে বিবাদ-বিরোধ না করে—যেটা পাপ,—তোমাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করে ব্রাহ্মণ যে সংস্কৃতির অধিকারী তা অর্জন করার চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় কর না কেন? আমি এটাই প্রশ্ন করছি। যে মুহূর্তে তোমরা এগুলি করবে, তোমরা ব্রাহ্মণের সমান হয়ে যাবে। ভারতে শক্তিলাভের এটাই রহস্য।

ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও মর্যাদা সমার্থক। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ হলে কেউ তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করবে না। এটিই গোপন তত্ত্ব, একে গ্রহণ কর। অদ্বৈতবাদের প্রাচীন উপমা ব্যবহার করে বলা যায় যে, সমগ্র জগৎ নিজ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আছে। সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের দেহ থেকে যেন তেজ নির্গত হয় এবং নিজের মন যেভাবে স্পন্দিত হয়, অন্যদের মনও সেইভাবে স্পন্দিত করে তোলেন। এমনি বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হয়ে থাকেন। যখন একজন শক্তিমান পুরুষ আবির্ভূত হন, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর চিন্তাধারা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং আমরা অনেকেই সেইভাবে ভাবিত হয়ে উঠি, এইরূপে তখন আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি। একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিই—চার কোটি ইংরাজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কী করে প্রভুত্ব করছে? সংহতিই শক্তির মূল। একথা বললে তোমরা হয়তো বলবে এটি তো জড়শক্তি বলেই সাধিত হয়, তাই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন কোথায় রইল? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বই কি! এই চার কোটি ইংরাজ ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করতে পারে, তার মানেই অসীম শক্তি। তোমাদের ত্রিশ কোটির ইচ্ছাশক্তি বিভিন্ন ভাবের। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার সমস্ত রহস্য রয়েছে এই সংহতির মধ্যে, শক্তি সংগ্রহের মধ্যে, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একীকরণের মধ্যে।

এখনই আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ঋগ্বেদ-সংহিতার সেই অপূর্ব শ্লোক ভেসে উঠছে—'তোমরা সকলে এক অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ পূর্বকালে দেবগণ একমনা হইয়াই তাঁহাদের যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।' দেবগণ মানবগণের দ্বারা উপাসিত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা একমনা ছিলেন। একমনা হওয়াই সমাজ গঠনের রহস্য। আর যতই তোমরা 'আর্য' ও 'দ্রাবিড়' ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয়, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে বিবাদ-বিতর্ক করবে, ততই তোমরা ভাবী ভারত গঠনের শক্তি সঞ্চয় থেকে দূরে সরে যাবে। এটি মনে রেখ ভবিষ্যৎ ভারত এরই উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। ইচ্ছাশক্তি সঞ্চয়, একীকরণ, এককেন্দ্রীকরণ—এটিই হচ্ছে গুপ্ত রহস্য। প্রত্যেক চীনা নিজের মত ভাবে, মুষ্টিমেয় জাপানী একইরকম ভাবে, তার ফল কী হয়েছে তোমরা জান। জগতের ইতিহাসে এটাই হয়ে চলেছে। দেখবে ক্ষুদ্র জাতিগুলি চিরকালই বড় জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব করে থাকে, আর এটি খুবই স্বাভাবিক; কারণ ক্ষুদ্র সংহত জাতিগুলি তাদের বিভিন্ন ভাবকে সহজে কেন্দ্রীভূত করতে পারে এবং তাতেই তারা উন্নত হয়ে থাকে। আর যে জাতি যত বিশাল, সে তত অসংগঠিত। তারা যেন এক অনিয়ন্ত্রিত জনতা, তারা কখনও একত্রিত হতে পারে না। এইসব মত-বিরোধিতার পরিসমাপ্তি করতে হবে।

আমাদের মধ্যে আর একটি দোষ আছে। ভদ্রমহিলাগণ, আমায় ক্ষমা করবেন, বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে আমরা যেন এক স্ত্রীলোকের জাতিতে পরিণত হয়েছি। এদেশে বা অন্য যে কোন দেশে দেখবে—তিন জন স্ত্রীলোক যদি পাঁচ মিনিটের জন্যও একত্র হয় তো তারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করবে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে মেয়েরা বড় বড় সমিতি গড়ে নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার বড় গলায় জাহির করে আর তারপর

নিজেদের মধ্যে ঝগড় শুরু করে দেয়, তখন কোন পুরুষ এসে তাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করতে থাকে। সারা জগতে নারীজাতির এখনও পুরুষের প্রয়োজন হয় তাদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য। আমরা এমনিধারা স্ত্রীলোক হয়ে গেছি। যদি কোন নারী এসে নারীজাতির নেতৃত্ব করতে যায়, অমনি সকলে মিলে তার সমালোচনা শুরু ক.র দেয়, তাকে ছিঁড়ে ফেলে, দাঁড়াতে দেয় না। যদি একজন পুরুষ এসে তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে, মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করে, তবে তারা মনে করে ঠিক হয়েছে। তারা এই রকম বশীভূত থাকতেই অভ্যস্ত। সারা জগৎই এইরকম বশীকরণ ও সম্মোহনে অভ্যস্ত। ঠিক এই ভাবেই আমাদের দেশে একজন কেউ উঠে দাঁড়িয়ে বড় হতে চেষ্টা করে, আমরা সকলে মিলে তাকে টেনে নামাতে চেষ্টা করি, কিন্তু যদি একজন বিদেশী এসে আমাদের লাথি মারার চেষ্টা করে, আমর' মনে করি তা ঠিকই আছে। আমরা এতেই অভ্যস্ত, তাই নয়? দাসেরা কখনও প্রভু হতে পারে? দাস-মনোভাব ত্যাগ কর। আগামী পঞ্চাশ বছর একমাত্র এটিই আমাদের মূলমন্ত্র হোক। ভারত-মাতাই আমাদের আরাধ্য দেবী হোন! অন্যান্য অকেজো দেবতা কিছুকালের জন্য আমাদের মন থেকে অদৃশ্য হয়ে যাক। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাচ্ছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; 'সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।' অন্যান্য দেবতারা নিদ্রিত। কোন অকেজো দেবতার অন্বেষণে আমরা ঘুরে বেড়াব, অথচ আমাদের চার ধারে যে দেবতাকে দেখছি, সেই বিরাটের উপাসনা করতে পারছি না? যখন এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হব, তখন অন্যান্য দেবতার উপাসনায় সক্ষম হব। আধ মাইল হামাগুড়ি দিতে পারার আগেই আমরা হনুমানের মতো সমুদ্র পার হতে চাইছি! তা কখনও হতে পারে না। সকলেই যোগী হতে চায়, সকলেই ধ্যান করতে চায়। তা হতে পারে না। সারাদিন সংসারের কর্মকাণ্ডে মিশে থেকে সন্ধ্যেবেলায় খানিকটা বসে নাক টিপলে কী হবে? এ কি এতই সোজা? তুমি তিনবার প্রাণায়াম করেছ বলে ঋষিরা একবারে উড়ে এসে তোমায় আশীর্বাদ করবে, এ কি ইয়ার্কি? এ সব বাজে কথা। দরকার চিত্তশুদ্ধি। কী করে চিত্তশুদ্ধি হবে? প্রথমে সব পুজোর সেরা—বিরাটের পুজো। তোমার চারধারে যারা রয়েছে, তাদের পুজো। সংস্কৃত 'পূজা' শব্দটিই হচ্ছে উপযুক্ত কথা। কারণ এরা ঈশ্বর—এইসব মানুষ ও পশু; আর আমাদের স্বদেশবাসীগণই আমাদের প্রথম উপাস্য ঈশ্বর। তাদেরই পুজো করতে হবে, পরস্পরকে হিংসা না করে, বিবাদ না করে। আমাদের ঘোর কুকর্মের ফলে কষ্ট পাচ্ছি, তবু আমাদের চোখ খুলছে না।

বিষয়টি এত বড় যে কোনখানে থামব জানি না। মাদ্রাজে আমি যেভাবে কাজ করতে চাই, দু-চার কথায় তা তোমাদের নিকট বলে বক্তৃতা শেষ করব। জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার আমাদের নিতে হবে। এটা কী বুঝেছ? তোমাদের এই নিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে, আলোচনা করতে হবে, চিন্তা করতে হবে এবং কার্যে পরিণত করতে হবে। তাছাড়া এ জাতের উদ্ধার নেই। তোমরা এখন যে শিক্ষা পাচ্ছ তার কতকগুলি গুণ আছে বটে, আবার প্রচণ্ড দোষও আছে, এই দোষ গুণগুলিকে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছে। প্রথমত এই শিক্ষায় মানুষ তৈরি হয় না, এটি সম্পূর্ণ

নেতিমূলক শিক্ষা। কোনরকম নেতিমূলক শিক্ষা মৃত্যুর চেয়ে খারাপ, নেতিমূলক শিক্ষা হচ্ছে নাস্তিভাব পূর্ণ। বালক স্কুলে গিয়ে প্রথমেই শিখল—তার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয় বিষয়—ঠাকুর্দা পাগল, তৃতীয় হলো শিক্ষকরা ভণ্ড, আর চতুর্থ—সব শাস্ত্রই মিথ্যা। ষোল বছর বয়স হবার আগেই দেখা গেল সে প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'নেতি-ভাবের' এক পদার্থ হয়ে গেছে। এর ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে দেশে পঞ্চাশ বছরের শিক্ষায় ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সীর মধ্যে মৌলিক চিন্তাশীল একটি মানুষও সৃষ্টি হয়নি। প্রতিটি মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি অন্যত্র শিক্ষা লাভ করেছেন, এ দেশে নয়; কিংবা নিজেকে কুসংস্কারমুক্ত করার জন্য তিনি পুরানো শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা মানেই মগজে একগাদা তথ্য পুরে দেওয়া হয়, সেগুলো সেখানে গিজ্ গিজ্ করল, সারা জীবনে আর হজম হলো না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করে নিতে হবে, যাতে জীবনটা গঠিত হয়, প্রকৃত মানুষ তৈরি হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা জীবনে মাত্র পাঁচটি ভাবকে হজম করে নিজের জীবন ও চরিত্র সেইভাবে গঠন করতে পার তবে এক গ্রন্থাগারের সব বই মুখস্থ করা যে কোন লোকের চেয়ে তুমি বেশি শিক্ষা পেয়েছ। 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য'—চন্দন-ভারবাহী গর্দভ যেমন ভারই বুঝতে পারে, অন্যান্য গুণ বুঝতে পারে না। যদি শিক্ষা বলতে কতকগুলি বিষয় জানা বোঝায় তবে গ্রন্থাগারগুলিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং অভিধানগুলি ঋষি। সুতরাং আদর্শ হবে আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সব রকমের শিক্ষা নিজেদের হাতে নিতে হবে এবং সেটি জাতীয় ভাবাপন্ন হবে এবং যত দূর সম্ভব জাতীয় প্রণালীতে।

অবশ্য এটা খুব বড় পরিকল্পনা—গুরুতর বিষয়। আমি জানি না এটি কখনও কার্যে পরিণত হবে কিনা। কিন্তু কাজটা শুরু তো করতে হবে। কী ভাবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ মাদ্রাজকে নেওয়া যাক। আমাদের এক মন্দির করতে হবে, কারণ হিন্দুরা সব কাজের গোড়াতেই ধর্মকে টানে। তোমরা বলতে পার মন্দিরে কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত হবে তাই নিয়ে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঝগড়া শুরু হবে। কিন্তু আমরা মন্দিরটি অসাম্প্রদায়িক করব, তাতে শুধু 'ওঁ' প্রতীকটি থাকবে, ওঙ্কার সকল সাম্প্রদায়িরই প্রতীক। যদি কোন সম্প্রদায়ের ওঙ্কার উপাসনায় আপত্তি থাকে, তবে তার নিজেকে হিন্দু বলার কোন অধিকার নেই। সকলেরই নিজের সম্প্রদায়ের ধারণা অনুযায়ী হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করার অধিকার আছে, কিন্তু সর্ব সম্প্রদায়ের উপযোগী এক মন্দির আমাদের চাই। অন্য জায়গায় তোমার নিজের সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুযায়ী মূর্তি ও প্রতীক রাখতে পার, কিন্তু এখানে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ মতগুলি শিক্ষা দেওয়া হবে, সেই সঙ্গে সব সম্প্রদায়ের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে তাদের মত প্রচারের ও শিক্ষাদানের, শুধু একটি জিনিস নিষিদ্ধ,—সেটি সম্প্রদায়ের মত বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ঝগড়া চলবে না। তোমার যা বলার আছে, বলে যাও, জগৎ শুনতে চায়; কিন্তু অন্যের সম্বন্ধে তুমি কী ভাব তা শোনার সময় জগতের নেই, সেটা তুমি নিজের মনেই রাখ।

দ্বিতীয়তঃ এই মন্দিরের সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করার জন্য এক বিদ্যালয়

থাকবে, যাঁরা এখান থেকে শিক্ষিত হয়ে বের হবেন, তাঁরা জনসাধারণকে ধর্ম ও লৌকিক শিক্ষা দান করবেন। এখন যেমন আমরা দ্বারে দ্বারে ধর্মপ্রচার করছি, তাঁরা তেমনি ধর্ম ও বিদ্যা দুটোই প্রচার করবেন। আর এটা সহজেই হতে পারে। এই সব শিক্ষক ও প্রচারকদের দ্বারা কর্মক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হবে এবং অন্যান্য স্থানেও এমনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সারা ভারত ভরে দিতে হবে! এই আমার পরিকল্পনা। এটি বিরাট ব্যাপার মনে হতে পারে, কিন্তু এটি প্রয়োজন। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, টাকা কোথায়? টাকার দরকার নেই। টাকা কিছু নয়। আমার জীবনের গত বারো বছর যাবৎ কাল কী খাব তার ঠিক ছিল না, কিন্তু আমি জানতাম যে টাকা ও আমার যা কিছু দরকার সে সব আসবেই আসবে, কারণ তারা আমার দাস, আমি তাদের দাস নই। টাকা ও সব কিছু নিশ্চয় আসবে। নিশ্চয়—কথাটির উপর জোর বিশ্বাস থাকা চাই। জিজ্ঞাসা করছি মানুষ কোথায়? আমাদের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা আগেই বলেছি। তাই প্রশ্ন,—মানুষ কোথায়?

মাদ্রাজের যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমরাই। জাতির এই আহ্বানে কি তোমরা সাড়া দেবে? যদি তোমরা আমার কথায় ভরসা কর তবে বলছি তোমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ গৌরবময়। নিজের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখ, যেমন ছেলেবেলায় আমার ছিল। আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি এখন এইসব কাজ করতে সক্ষম হয়েছি। তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের উপর তেমনি বিশ্বাস রাখ—বিশ্বাস রাখ যে অনন্ত শক্তি তোমার মধ্যে আছে, তুমি সমস্ত ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করবে। হ্যাঁ, আমরা পৃথিবীর সব দেশে যাব এবং যে সব শক্তি জগতের জাতগুলিকে গঠন করছে, তার উপাদান অল্পকালের মধ্যেই আমাদের ভাবগুলি হয়ে উঠবে। ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রত্যেক জাতির জীবনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে হবে, আর এই অবস্থা আনার জন্য আমাদের উঠে-পড়ে লাগতে হবে।

এর জন্য আমি যুবকদের চাই। বেদ বলেছে,—'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী' —আশাবাদী বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা মেধাবী যুবকরাই ঈশ্বর লাভ করবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ-জীবন নির্ধারণের এই হচ্ছে সময়—যতদিন যৌবনের তেজ আছে, যতদিন না কর্ম-শ্রান্ত হচ্ছ, যতদিন তোমাদের মধ্যে সজীবতা ও যৌবনের শক্তি রয়েছে, কাজ কর —এই তো সময়! কারণ নব-প্রস্ফুটিত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পদতলে অর্পণ করা চলে এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। অতএব ওঠ, জীবন বড় ছোট। অনেক বড় কাজ করার আছে, ছোট ছোট বাদ-বিসংবাদে ওকালতির চেয়ে অনেক মহৎ কাজ আছে। নিজের জাতির কল্যাণের জন্য, মানবসমাজের কল্যাণের জন্য আত্ম-বলিদান অনেক বড় কাজ। এ জীবনে আছে কি? তোমরা হিন্দু, তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস আছে দেহের বিনাশে জীবনের নাশ হয় না, জীবন অনন্ত। অনেক সময় যুবকেরা আমার কাছে এসে নাস্তিকতার কথা বলে থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে হিন্দু কখনও নাস্তিক হতে পারে। সে ইউরোপীয় গ্রন্থাদি পাঠ করে মনে করতে পারে জড়বাদী হয়েছে, কিন্তু সেটা দুদিনের জন্য। এ ভাব তোমাদের মজ্জাগত নয়। তোমাদের ধাতে যা নেই, তা তোমরা কখনও বিশ্বাস

করতে পার না; তা তোমাদের পক্ষে বৃথা চেষ্টা। অমন চেষ্টা করো না। আমি বাল্যকালে একবার অমন চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অনন্ত অমর। অতএব যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন এক মহান আদর্শ নিয়ে জীবনকে উৎসর্গ করা যাক। এটিই আমাদের সঙ্কল্প হোক। সেই ভগবান, যিনি বলেছেন,—'নিজ ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য আমি বার বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই'—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং অভীষ্টলাভে সহায় হোন।]

কলিকাতায় স্বাগত ভাষণ ও প্রত্যুত্তর

[স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের এক সপ্তাহ পরে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত সেনের বাড়িতে একটি সংবর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্রটি পঠিত হয়।]

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীকে—
প্রিয় ভ্রাতা,

আমরা, কলকাতার ও বাংলার বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা, আপনার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনে আন্তরিক স্বাগত জানাইতেছি। আমরা গর্ব ও কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আপনার মহৎ কার্যাবলী ও দৃষ্টান্তের জন্য, আপনি শুধু আমাদের ধর্মকেই গৌরবান্বিত করেন নাই, আমাদের দেশকে, বিশেষ করে আমাদের প্রদেশকেও গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো বিশ্বমেলার শাখা বিরাট ধর্মীয় মহাসভায় আপনি আর্য ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। আপনার ব্যাখ্যার সারতত্ত্ব আপনার শ্রোতৃবৃন্দের অধিকাংশের নিকট দৈববাণীর ন্যায় শক্তি ও মাধুর্যে অভিভূতকর। কয়েকজন হয়তো সংশয়ের সঙ্গে তাহা গ্রহণ করিয়াছে, অল্প কয়েকজন হয়তো তাহার সমালোচনা করিয়াছে কিন্তু মার্জিতরুচিসম্পন্ন বৃহৎ অংশের আমেরিকাবাসীর ধর্মবিশ্বাসে তাহার সাধারণ প্রভাব হইয়াছে বিপ্লবকর। তাঁহাদের মনে এক নতুন ঊষার আলোকপাত হইয়াছে এবং তাঁহাদের স্বভাবসুলভ আন্তরিকতা ও সত্যানুরাগবশত তাঁহারা সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার। আপনার সুযোগ বর্ধিত হইয়াছে, কর্ম ব্যাপক হইয়াছে। আপনাকে বহু প্রদেশের বহু শহর থেকে আহ্বানের পর আহ্বানে সাড়া দিতে হইয়াছে, বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে, বহু সংশয় নিরসন করিতে হইয়াছে, বহু সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে। এই সমুদয় কার্য আপনি উদ্দীপনা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন, যাহা চিরস্থায়ী ফলদায়ক হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বহু শিক্ষিতমহলে আপনার শিক্ষা গভীর প্রভাব ফেলিয়াছে, চিন্তা ও গবেষণা উদ্দীপ্ত করিয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রেই নিশ্চিতভাবে ধর্মীয় ধারণাকে হিন্দু আদর্শের বহুল প্রশংসার দিকে পরিবর্তিত করিয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক গবেষণা ও আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য বহু সংস্থা ও সমিতির দ্রুত বিকাশই সুদূর পাশ্চাত্যে আপনার কর্মের সাক্ষী। লণ্ডনে বেদান্তদর্শন শিক্ষাদানের জন্য মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে আপনাকে গণ্য করা যায়। আপনার বক্তৃতাসমূহ নিয়মিত প্রদত্ত হইয়াছে, নিয়মিত শ্রোতারা উপস্থিত হইয়াছে এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। বক্তৃতাগুলির প্রভাব বক্তৃতাগৃহের প্রাচীর সীমার পরেও বিস্তৃত হইয়াছে। আপনার শিক্ষা যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগরিত করিয়াছে, তাহার প্রমাণ হইতেছে লণ্ডন হইতে আপনার বিদায়কালে সেই শহরের বেদান্ত-দর্শনের ছাত্রদের দ্বারা আপনার সংবর্ধনা ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

শিক্ষাগুরুরূপে আপনার সাফল্যের কারণ শুধুমাত্র আর্যধর্মের সত্যগুলির সহিত আপনার গভীর ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং বক্তৃতা ও রচনা দ্বারা সেগুলি ব্যাখ্যা করিবার পারদর্শিতাই নহে, উপরন্তু ও প্রধানত সেই কারণ হইতেছে আপনার ব্যক্তিত্ব। আপনার ভাষণ, আপনার প্রবন্ধ, আপনার গ্রন্থ প্রভৃতির আধ্যাত্ম ও সাহিত্যমূল্য অতি উচ্চ এবং সেগুলির প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। সেই প্রভাব আরও বর্ধিত হইয়াছে আপনার বর্ণনাতীত সরলতা, আন্তরিকতা, নিঃস্বার্থপরতা, বিনয়, ভক্তি ও ঐকান্তিকতার জীবন্ত উদাহরণ দ্বারা।

আমাদের ধর্মের মহান সত্যের শিক্ষকরূপে আপনার কার্যাবলীর স্বীকৃতির সাথে সাথে আমরা বোধ করি যে আপনার পূজনীয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের স্মৃতির প্রতি আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা জানান উচিত। আপনার জন্য আমরা তাঁহার কাছে বহুলাংশে ঋণী। তাঁহার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আপনার মধ্যে দৈবশক্তি তিনি পূর্বেই জ্ঞাত হইয়া আপনার ভবিষ্যৎ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাহা এখন সানন্দে সত্য হইয়া উঠিতেছে। আপনাকে ঈশ্বর-প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশক্তি তিনিই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আপনার চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে পবিত্র স্পর্শে প্রতীক্ষিত পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অদৃশ্য রাজ্যে আপনার অনুসন্ধানকে সাহায্য করিয়াছেন। উত্তরপুরুষের জন্য তাঁহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান হইতেছেন আপনি।

হে পুণ্যাত্মা, আপনার নির্বাচিত পথে দৃঢ়পদে ও সাহসভরে অগ্রসর হউন। সমস্ত জগৎ আপনার জয় করিবার জন্য রহিয়াছে। অজ্ঞদের নিকট, সংশয়বাদীদের নিকট, স্বেচ্ছান্ধদের নিকট হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা আপনাকে করিতে হইবে। আপনি যে উৎসাহের সাথে কার্য শুরু করিয়াছেন তাহা আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করে এবং ইতিমধ্যে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য বহু দেশ বহন করিতেছে। কিন্তু এখনও বহু কর্ম বাকি রহিয়াছে এবং আমাদের দেশ কিংবা আমাদের বরং বলা উচিত আপনার নিজের দেশ, আপনার প্রতীক্ষায় আছে। হিন্দুধর্মের সত্যগুলি বহুসংখ্যক হিন্দুর কাছেই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই মহৎ কর্তব্যে আপনি নিজেকে নিয়োজিত করুন। আপনার উপর ও আমাদের প্রয়োজনের যৌক্তিকতার উপর আমাদের আস্থা আছে। আমাদের জাতীয় ধর্ম ব্যবহারিক জগতে বিজয়লাভে অভিলাষী নহে। তাহার উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিকতা, তাহার অস্ত্র সত্য, যাহা জাগতিক চক্ষুর অগোচরে থাকে এবং শুধুমাত্র চিন্তাযুক্ত যুক্তির নিকট নতি স্বীকার করে। জগৎকে আহ্বান জানান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হিন্দুদেরও আহ্বান করুন, তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত করিবার জন্য, ইন্দ্রিয়জগতের ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য, শাস্ত্রগ্রন্থ যথারীতি অধ্যয়নের জন্য, পরম সত্তার সাক্ষাৎকারের জন্য, মানবরূপে তাহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপলব্ধি করিবার জন্য। আপনার অপেক্ষা উপযুক্ত আর কেহ নাই এই জাগরণ আননের জন্য বা আহ্বান জানাইবার জন্য। ঈশ্বর-নির্দেশিত আপনার এই মহৎ কার্যে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও অনুগত সহযোগিতার আশ্বাস মাত্র দিতে সক্ষম।

আপনার প্রীতিবদ্ধ
প্রিয় ভ্রাতা, বন্ধু ও গুণমুগ্ধবৃন্দ।

স্বামীজীর প্রত্যুত্তর

মানুষ ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্বসত্তার মাঝে হারিয়ে ফেলতে চায়, মানুষ পূর্ব সংস্কারের সব বন্ধন কাটিয়ে জগৎসংসারের মায়া ত্যাগ করে দূরে চলে যেতে চায়, এমন কি সে যে দেহধারী মানুষ এই কথাটি ভোলার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করে, তবু তার অন্তরের অন্তঃস্থলে এক মৃদুধ্বনি, এক অস্ফুট গুঞ্জন জাগে, কে যেন কানে কানে বলে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসীবৃন্দ, আপনাদের কাছে আমি সন্ন্যাসীরূপে উপস্থিত হচ্ছি না, এমন কি ধর্ম-প্রচারকরূপেও নয়, আমি আগেকার সেই কলকাতার ছেলেটির মতোই আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি, যেমন আমি করতাম। আহা, আমার ইচ্ছে করে শিশুর মতো স্বাধীনভাবে এই শহরের রাস্তায় ধুলোর উপর বসে মন খুলে প্রাণের কথা আপনাদের—আমার ভাইদের—বলতে। আপনারা যে অপূর্ব শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আমাকে যে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। হ্যাঁ, আমি আপনাদের ভাই, আপনারাও আমার ভাই। আমার ফেরার ঠিক আগে এক ইংরাজবন্ধু আমায় জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী, চার বছর বিলাসবহুল গৌরবময় শক্তিশালী পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার পর আপনার মাতৃভূমিকে এখন কেমন লাগে?' আমি শুধু বললাম, 'এখানে আসার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতাম। এখন ভারতের ধূলি পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু এখন আমার কাছে পবিত্র, সে দেশ আমার কাছে এখন পবিত্র-ভূমি, তীর্থস্থান।'

কলকাতার নাগরিকরা,—আমার ভাইরা,—আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য, কিংবা বলা চলে আপনাদের ধন্যবাদ জানানো বাহুল্যমাত্র, কারণ আপনারা আমার ভাই, আপনারা ভাইয়ের কর্তব্য করেছেন, হ্যাঁ, হিন্দু ভাইয়ের কর্তব্য; কারণ এমন পারিবারিক বন্ধন, এমন সম্পর্ক, এমন ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির সীমানার বাইরে আর কোথাও নেই।

চিকাগো ধর্মসভা নিঃসন্দেহে এক বিরাট ব্যাপার হয়েছিল। এই দেশের বহু শহর থেকে আমরা সভায় উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমাদের প্রতি যে সহৃদয়তা তাঁরা দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁদের প্রকৃতই ধন্যবাদ প্রাপ্য। তবে ধর্মমহাসভার প্রকৃত ইতিহাস আমি আপনাদের শোনাই। তাঁরা কিছু 'বলির পাঁঠা' চেয়েছিল। কিছু লোক সেখানে ছিল, যারা চেয়েছিল নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও অন্যদের মূর্খ প্রতিপন্ন করা, কিন্তু বিধির বিধানে ব্যাপারটা উল্টে গেল; এ ছাড়া অন্য কিছু হবার উপায় ছিল না। যা হোক, তাঁদের অনেকেই সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন এবং আমরা তাঁদের যথেষ্ট ধন্যবাদও দিয়েছি।

অন্যদিকে, আমেরিকায় আমার মূল উদ্দেশ্য ধর্মমহাসভায় শুধু যোগদান করাটাই ছিল না। ওটা ছিল পদক্ষেপের প্রথম ধাপ, একটি সুযোগ এবং সেজন্য মহাসভার সভ্যবৃন্দের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধন্যবাদার্হ হচ্ছেন

যুক্তরাষ্ট্রের মহান জনসাধারণ, মার্কিন জাত, অতিথিবৎসল সহৃদয় মহান আমেরিকান জাতি, যাদের মধ্যে অন্য জাতের চেয়ে ভ্রাতৃভাব বেশি বিকশিত হয়েছে। কোন আমেরিকানের সঙ্গে ট্রেনে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হলেই সে বন্ধু হয়ে যায় এবং পরক্ষণেই অতিথিরূপে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তার জীবনের সব রহস্য বন্ধুর সামনে মেলে ধরে। এটাই আমেরিকান জাতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং এটা আমাদের খুব ভাল লাগে। আমার প্রতি তাঁদের সহৃদয়তা বর্ণনাতীত, তাঁরা আমার প্রতি যে বিস্ময়কর সহৃদয় ব্যবহার করেছেন, তা আপনাদের কাছে জানাতে গেলে বছরের পর বছর ধরে বলে শেষ করতে পারব না। অতলান্তিক মহাসাগরের অপর পারের জাতেরও আমাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। ইংরেজ জাতের উপর আমার মতো হৃদয়ে এতটা ঘৃণা নিয়ে কেউ কখনও ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করেনি। এই সভামঞ্চে যেসব ইংরেজ বন্ধু উপস্থিত আছেন, তাঁরা এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারেন। কিন্তু যতই আমি তাঁদের মাঝে বাস করতে লাগলাম, যতই তাঁদের সঙ্গে মিশতে লাগলাম, এবং দেখলাম ইংরেজ জাতের জীবনযন্ত্র কেমনভাবে চলছে, তাঁদের হৃদয়স্পন্দন কীভাবে ধ্বনিত হচ্ছে, ততই আমি তাঁদের ভালবাসতে লাগলাম। আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনাদের মধ্যে এখানে এমন কেউ উপস্থিত নেই, যিনি ইংরেজ জাতকে বর্তমানে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসেন। তাঁদের বিষয়ে সঠিক জানতে হলে, সেখানে কী ঘটছে জানতে হবে, তাঁদের সঙ্গে মিশতে হবে। আমাদের দর্শন—আমাদের জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সিদ্ধান্ত করেছে যে, সকল দুঃখ, সকল দুর্দশা একটিমাত্র কারণ হতেই উদ্ভূত—অজ্ঞান; ঠিক তেমনি ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে যে বিরোধ জাগছে তা বেশির ভাগই অজ্ঞতার জন্যই। আমরা তাঁদের জানি না, তাঁরাও আমাদের জানেন না।

দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্যবাসীরা মনে করে আধ্যাত্মিকতা, এমন কি নীতিজ্ঞান, সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরকাল জড়িত। আর যখনই কোন ইংরেজ বা অন্য কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী এদেশের মাটিতে পদার্পণ করে এবং দেখে যে দেশটি দুঃখ ও দারিদ্র্যে ভরা, অমনি সে সিদ্ধান্ত করে এ দেশে ধর্ম, এমন কি কোন নীতি পর্যন্ত থাকতে পারে না। তার নিজের অভিজ্ঞতা সত্য। ইউরোপের শীতপ্রধান ঋতু ও অন্যান্য পরিবেশের জন্য দারিদ্র্য ও পাপ একত্রে অবস্থান করে, কিন্তু ভারতবর্ষে তা নয়। অন্যদিকে আমার অভিজ্ঞতা এই যে ভারতবর্ষে যে যত বেশি দরিদ্র, সে তত বেশি সাধু। এখন এটি উপলব্ধি করতে সময় লাগে। এখন ভারতীয় জীবনের এই রহস্যের অস্তিত্ব বোঝার জন্য কজন বিদেশী সময় দেন? এই জাতকে বিশ্লেষণ করার ও বোঝার ধৈর্য খুব অল্প লোকেরই আছে। এখানে—একমাত্র এখানেই এমন এক জাত আছে যাদের কাছে দারিদ্র্যের অর্থ অপরাধ নয়, দারিদ্র্য বললে পাপ বোঝায় না। একমাত্র এখানকার জাতের মধ্যেই দারিদ্র্যকে অতি উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে। এখানে দরিদ্রের বেশই শ্রেষ্ঠ বসন। অন্যদিকে আমাদেরও ঠিক ওই ভাবে ধৈর্য সহকারে পাশ্চাত্য সমাজের রীতি-নীতি বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাদের সম্বন্ধে পাগলের মতো দ্রুত কোন ধারণা করব না। তাদের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা, তাদের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবেরই অর্থ আছে,

সবেরই ভাল দিক আছে, শুধু আপনাদের ধৈর্য ধরে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাদের আচার-ব্যবহার আমরা অনুকরণ করতে যাব কিংবা তারা আমাদের অনুকরণ করবে। সব জাতেরই আচার-ব্যবহার শত শত শতাব্দী ধরে সেই জাতের বিকাশের ফলস্বরূপ এবং সবগুলির পেছনেই গভীর অর্থ আছে। অতএব তারা যেন আমাদের আচার-ব্যবহার নিয়ে উপহাস না করে এবং আমরাও যেন তা না করি।

এই সমাবেশে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আমার কাছে ইংল্যাণ্ডের কাজ আমেরিকার কাজের চেয়ে বেশি সন্তোষজনক। সাহসী, দৃঢ়, ধৈর্যশীল ইংরাজ—আর আমার বলাটা যদি দোষণীয় না হয় তো বলি যে, অন্য জাতের চেয়ে একটু মাথা-মোটা যদি কোন ভাব একবার মাথার মধ্যে গ্রহণ করে, তবে তা কোন-কালেই বের হয় না এবং জাতটির অসীম বাস্তববোধ ও প্রাণশক্তি সেই ভাবটিকে বীজ থেকে অঙ্কুরে পরিণত ও অল্পকালের মধ্যে ফলপ্রসূ করে তোলে। অন্য কোন দেশে এমন হয় না। এই প্রভূত বাস্তববোধ ও অপরিসীম জীবনীশক্তি এই জাতের মধ্যে ছাড়া আর অন্য কোথাও আপনারা দেখতে পাবেন না। এদের কল্পনাশক্তি কম, কর্মশক্তি অপরিমেয়। আর এই ইংরেজ-হৃদয়ের মূল উৎস কোথায় কে জানে? কতখানি কল্পনাশক্তি ও অনুভূতি তার গভীরে লুকিয়ে আছে। ইংরেজ বীরের জাত, তারাই প্রকৃত ক্ষত্রিয়; তাদের শিক্ষাই হচ্ছে মনোভাব গোপন রাখা, কখনই তা প্রকাশ না করা। বাল্যকাল থেকে তারা এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছে। আপনারা খুব কমই দেখতে পাবেন ইংরাজ পুরুষ তার হৃদয়ের ভাব বাইরে প্রকাশ করেছেন, পুরুষ দূরে থাক ভাবপ্রবণ নারীজাতি হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ রমণীরা পর্যন্ত কখনও হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করেন না। আমি ইংরেজ নারীকে এমন কাজ করতে দেখেছি যা করতে অতি বড় সাহসী বাঙালীও পেছিয়ে যাবে। কিন্তু এই বীরত্বের পিছনে, বীরসুলভ বাহ্যিক চাকচিক্য সত্ত্বেও ইংরেজ হৃদয়ের ভাবধারা গভীর গুহায় লুকানো থাকে। সেখানে কেমন করে পৌঁছাতে হয় তা যদি একবার আপনি জানেন, যদি তার অন্তরে স্থান পান, মেলামেশা দ্বারা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন, তাহলে সে তার হৃদয় আপনার কাছে উন্মুক্ত করে দেবে, চিরতরে আপনার বন্ধু হবে, আপনার দাস হয়ে যাবে। সেইজন্যই আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডে আমার কার্য বেশি সন্তোষজনক হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে যদি কাল আমার মৃত্যু হয়, তাহলেও ইংল্যাণ্ডে আমার কার্যের মৃত্যু হবে না, বরং দিন দিন তা বিস্তার লাভ করবে।

ভাইসব, আপনারা আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে—গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করেছেন; আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার ইষ্ট, আমার আদর্শ, আমার জীবন-দেবতা—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উল্লেখ করেছেন। যদি আমার দ্বারা, আমার চিন্তা দ্বারা, বাক্য দ্বারা, কর্ম দ্বারা কোন কিছু করা হয়ে থাকে, যদি আমার মুখ থেকে এমন কোন কথা বের হয়ে থাকে যা জগতের কাউকে কোন উপকার করেছে, তাতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, সেটি তাঁরই। কিন্তু যদি আমার মুখ থেকে কোন অভিশাপ কখনও বেরিয়ে থাকে, যদি কারু প্রতি কোন ঘৃণা আমি প্রকাশ করে থাকি,

তবে সেটি আমার, তাঁর নয়। যা কিছু দুর্বলতা তা আমার, যা কিছু প্রাণপ্রদ, বলপ্রদ, পবিত্র, বিশুদ্ধ তা সবই তাঁর প্রেরণা, তাঁর বাণী, তিনি স্বয়ং। হ্যাঁ, বন্ধুগণ, জগতের এখনও সেই মানুষটিকে জানার আছে। জগতের ইতিহাসে আমরা বহু মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করি এবং সেগুলি আমাদের কাছে আসে তাঁদের শিষ্যদের শত শত বৎসরের রচনা ও কর্মের মাধ্যমে। হাজার হাজার বৎসর ধরে মাজা-ঘষা করার পরে সুদূর অতীতের মহাপুরুষদের জীবনী আমাদের কাছে এসেছে, তবু আমার মতে যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যাঁর ছায়ায় আমি বাস করেছি, যাঁর পদতলে বসে আমি সবকিছু শিক্ষালাভ করেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের যেমন উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত তেমন আর কারও নয়।

বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই গীতার সেই প্রসিদ্ধ বাণীটি জানেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—হে ভারতের বংশধর, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

এই সঙ্গে আর একটি কথা আপনাদের বুঝতে হবে। বর্তমানে বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এইরূপ আধ্যাত্মিকতার এক প্রবল বন্যা আসার আগে সমাজের সর্বত্র ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে একটি তরঙ্গ—যার অস্তিত্ব প্রথমে অজ্ঞাত, অকল্পিত, অভাবিত থাকে,—সেটি ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ওঠে, ছোট ছোট তরঙ্গগুলিকে গ্রাস করে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেয়, প্রবল বন্যার আকার গ্রহণ করে সমাজের উপর এমন প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়ে যে কেউ তার গতিরোধ করতে পারে না। সেই ব্যাপারই আমাদের সামনে ঘটছে। যদি আপনাদের চোখ থাকে তবে তা দেখতে পাবেন। যদি আপনাদের হৃদয় উন্মুক্ত থাকে, তবেই তা আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন। যদি আপনারা সত্যান্বেষী হন, তবে তার সন্ধান আপনারা পাবেন। অন্ধ—সে বাস্তবিকই অন্ধ, যে দিনের আলো দেখতে পায় না। আপনাদের অনেকেরই নাম না-শোনা সেই সুদূর পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতির এই সন্তান এখন প্রকৃতপক্ষে সেইসব দেশে পূজিত হচ্ছেন, যেখানকার লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চিৎকার করে আসছেন। এটি কার শক্তি? এ কি আপনার আমার শক্তি? এটি সেই শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, যে শক্তি রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। কারণ আপনি ও আমি, সাধু-মহাপুরুষ, এমন কি অবতারগণ—সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই শক্তির প্রকাশমাত্র; সেই শক্তি কোথাও কম, কোথাও বেশী ঘনীভূত, কোথাও কম কোথাও বেশী ব্যক্তিসত্তায় বিকশিত। এখানে সেই মহাশক্তির প্রকাশ ঘটেছে, যাঁর কাজের সবেমাত্র শুরুটুকুই আমরা দেখছি এবং এই যুগের অবসান হবার আগেই সেই শক্তির আশ্চর্য লীলা

আপনারা দেখবেন। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির প্রকাশ উপযুক্ত সময়েই হয়েছে। কারণ ভারতে যে প্রাণশক্তি সর্বদা সক্রিয় থাকবে তার কথা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

প্রত্যেক জাতেরই কর্মের নিজস্ব বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। কেউ রাজনীতির মাধ্যমে, কেউ সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে, কেউ অন্য কোন প্রণালীতে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কর্ম করে। আমাদের কাছে অগ্রসর হবার একমাত্র পথ হচ্ছে ধর্ম। ইংরাজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে। আমেরিকানরা সম্ভবত সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে ধর্ম বোঝে। কিন্তু হিন্দুরা ধর্মের মধ্যে দিয়ে এলে তবেই রাজনীতি বুঝতে পারে, সমাজতত্ত্বেও ধর্মের মধ্যে দিয়ে আসা চাই, সব কিছুকেই ধর্মের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এটিই হচ্ছে মূল সুর, অন্যগুলি তারই একটু রকমফের মাত্র। আর এটিই বিপন্ন হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভাবটিকে আমরা যেন পরিবর্তন করতে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে, যে মেরুদণ্ডের জোরে আমরা টিঁকে আছি, সেটিকেই যেন বদলে ফেলতে যাচ্ছি, আমাদের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করার চেষ্টা করছি। যদি আমরা এতে কৃতকার্য হতে পারতাম, তাহলে পরিণামে ধ্বংস হয়ে যেতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হলো। এই মহাপুরুষকে আপনারা কি ভাবে দেখেন তা আমি গ্রাহ্য করি না, কতটা শ্রদ্ধা করেন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু আপনাদের মুখের ওপর আমি এই সত্য ঘোষণা করছি যে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারতে এমন অদ্ভুত মহাশক্তির প্রকাশ আর কখনও হয়নি। আর হিন্দু হিসাবে আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে এই শক্তিকে বোঝা, দেখা যে ভারতের পুনরুত্থানের জন্য, মঙ্গলের জন্যই শুধু নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই শক্তি কী করেছে। জগতের কোন দেশে সার্বিক ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবে চিন্তা ও আলোচনা করার অনেক আগেই এই শহরের কাছেই এমন একজন লোক বাস করতেন, যাঁর সমস্ত জীবনটিই ছিল এক ধর্মমহাসভা স্বরূপ।

আমাদের শাস্ত্রগুলি নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছে। আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার মতো উন্নত হতেন, তবে বড় ভাল হতো; কিন্তু তা যখন হবার নয়, তখন মানবজাতির বৃহদাংশের জন্য এক সগুণ আদর্শ একান্ত প্রয়োজন। এমনি কোন মহান আদর্শ পুরুষের অনুগামী হয়ে উৎসাহের সঙ্গে তাঁর পতাকাতলে সমবেত না হলে কোন জাতই দাঁড়াতে পারে না, বড় হতে পারে না, এমন কি কোন কাজই করতে পারে না। রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিভূ কোন মানুষ, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্যজগতের কোন আদর্শ পুরুষ ভারতে প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না। আমাদের সামনে আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। বিরাট অধ্যাত্ম-পুরুষের চারধারে আমরা সমবেত হতে চাই। আমাদের নায়করা হবেন ধর্মবীর। রামকৃষ্ণ পরমহংস নামধারী ব্যক্তিরূপে এমন এক নায়ককে আমরা পেয়েছি। যদি এই জাত উঠতে চায়, তবে আমি বলছি, এই নামে সকলকে মেতে উঠতে হবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি,

আপনি বা অন্য যে কেউ প্রচার করুক তাতে কিছু এসে যায় না। এই মহান আদর্শ পুরুষকে আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করলাম, এখন বিচারের ভার আপনাদের, জাতির মঙ্গলের জন্য জীবনের মহান আদর্শস্বরূপ এই মানুষটিকে নিয়ে কী করবেন সেই বিবেচনা এখন আপনাদের করতে হবে। একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—আপনারা জীবনে যত মহাপুরুষ দেখেছেন অথবা—স্পষ্ট করে বলছি—যত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করেছেন, তার মধ্যে এঁর জীবন পবিত্রতম। বাস্তবিকই এমন পরমাশ্চর্যকর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশের কথা আপনারা হয়তো কোথাও পড়ে থাকতে পারেন, কিন্তু চোখে দেখার প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর দেহত্যাগের দশ বৎসরের মধ্যে এই শক্তি জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়েছে;—এই সত্য তো আপনাদের সামনেই রয়েছে। সেজন্য আমাদের জাতির মঙ্গলের জন্য, আমাদের ধর্মের মঙ্গলের জন্য কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এই মহান আধ্যাত্মিক আদর্শকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি। আমাকে দেখে তাঁর বিচার করবেন না। আমি এক ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র, আমাকে দেখে তাঁর চরিত্রের বিচার করবেন না। তাঁর চরিত্র এত বড় ছিল যে, আমি বা তাঁর অন্য কোন শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরে চেষ্টা করি, তাহলেও তিনি প্রকৃত যা ছিলেন তার কোটি ভাগের এক ভাগও হতে পারব না। আপনারাই বিচার করুন, আপনাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে যিনি সনাতন সাক্ষীরূপে রয়েছেন সেই তিনি—সেই একই রামকৃষ্ণ পরমহংস—আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য, মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য আপনাদের হৃদয়দ্বার খুলে দিন; আর আমরা চেষ্টা করি বা না করি যে মহা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী তার উপযুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদের অকপট ও দৃঢ়চেতা করে তুলুন। কারণ প্রভুর কাজ আপনার বা আমার মতো লোকের জন্য আটকে থাকে না। তিনি তাঁর কাজের জন্য ধুলো থেকে শত সহস্র কর্মী সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর অধীনে কাজ করার সুযোগ পাওয়াই আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের ও গৌরবের বিষয়।

এইভাবে ভাব চারদিকে ছড়াতে থাকে। তোমরা আমাকে বলেছ যে আমাদের জগৎ জয় করতে হবে। আমাদের তা করতেই হবে। ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করতে হবে—আমার আদর্শ তার থেকে কম কিছু নয়। এটি খুব বড় আদর্শ হতে পারে, আপনাদের অনেকেই এতে আশ্চর্য হতে পারেন, তবুও এটিই আমাদের আদর্শ। আমরা জগৎ জয় করব, নয় মরব। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। বিস্তৃতিই জীবনের লক্ষণ। আমাদের গণ্ডীর বাইরে যেতে হবে, নিজেদের প্রসারিত করতে হবে, প্রাণের পরিচয় দিতে হবে, অথবা অবনত থেকে হীন অবস্থায় মরতে হবে। এ ছাড়া অন্য কিছু নেই। দুয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করতে হবে, হয় বাঁচতে হবে নয় মরতে হবে। এখন আমাদের দেশে নানা ছোটখাট ঈর্ষা—বিবাদের কথা আমাদের জানা আছে। আমার কথা শুনুন, এ সর্বত্রই আছে। রাজনীতি যেসব জাতের কাছে প্রধান বিষয়, তাদের বৈদেশিক নীতিও থাকে। যখন তারা দেখে নিজের দেশে গৃহবিবাদের মাত্রা বেড়ে গেছে, তখন তারা কোন বিদেশীর সঙ্গে বিবাদ শুরু করে দেয় আর অমনি গৃহবিবাদ থেমে যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে, কিন্তু তা থামাবার

কোন বৈদেশিক নীতি নেই। আমাদের চিরন্তন বৈদেশিক নীতি হবে জগতের জাতিগুলির কাছে আমাদের শাস্ত্রনিবদ্ধ সত্যসমূহের প্রচার। আপনাদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি-ঘেঁষা তাঁদের আমি জিজ্ঞাসা করছি যে আমাদের অখণ্ড জাতিরূপে মিলিত করার এটি ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ কি চান? আজকের এই সভায়ই তো সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ এই সব স্বার্থবিচার ছেড়ে দিলে আমাদের পিছনে নিঃস্বার্থ মহান জীবন্ত দৃষ্টান্ত সব রয়েছে। ভারতের অধঃপতন ও দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজেকে সঙ্কুচিত করেছিল, শামুকের মতো নিজের খোলের মধ্যে ঢুকে বসেছিল, মানবসমাজের অন্যান্য জাতির কাছে নিজের রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়নি, আর্যেতর সত্যপিপাসু জাতিগুলির কাছে প্রাণপ্রদ সত্যরত্নগুলি দান করতে অস্বীকার করেছিল। আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো যে আমরা বাইরে গিয়ে অন্য জাতের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করিনি। আপনারা সকলেই জানেন যে রাজা রামমোহন রায় যেদিন থেকে এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙলেন সেদিন থেকে ভারতে যেটুকু জীবনের স্পন্দন আপনারা দেখছেন, তার শুরু হয়েছে। সেইদিন থেকে ভারতের ইতিহাস আর একটি মোড় ঘুরেছে এবং ক্রমবর্ধমান বেগে ভারত উন্নতির পথে চলেছে। অতীতে যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা দেখে থাকি, এখন প্রবল বন্যা আসছে এবং কেউ তা রোধ করতে পারবে না। অতএব আমাদের বাইরে বেরিয়ে পড়তেই হবে। আদান-প্রদানই জীবনের রহস্য। আমরা কি চিরকালই গ্রহণ করে যাব, পাশ্চাত্যের পদতলে বসে সবকিছু শিখব, এমন কি ধর্ম পর্যন্ত? তাদের কাছ থেকে যান্ত্রিক কলাকৌশল শিখতে পারি। আরও বহু বিষয় শিখতে পারি। কিন্তু তাদেরকেও আমাদের কিছু শেখাতে হবে। আমরা তাদের ধর্মশিক্ষা দিতে পারি, আমাদের আধ্যাত্মিকতা শেখাতে পারি। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার প্রতীক্ষায় আছে, ভারতের কাছ থেকে সম্পদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় রয়েছে, ভারতের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই বিস্ময়কর সম্পদ, যা সে বহু বৎসরের দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যেও বুকে আঁকড়ে আছে। জগৎ সেই সম্পদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের এই অমূল্য রত্ন-রাজির জন্য ভারতের বাইরের মানুষরা কতখানি উদ্গ্রীব, তা আপনারা জানেন না। আমরা এখানে বাক্যব্যয় করি, পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করি, যা কিছু শ্রদ্ধার বিষয় তা উপহাস করে হেসে উড়িয়ে দিই, যা কিছু পবিত্র তাকে উপহাস করাটা আমাদের প্রায় জাতীয় পাপে পরিণত হয়েছে। এই ভারতবর্ষে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে অমৃত সঞ্চয় করে রেখে গেছেন তার এক বিন্দু পান করার জন্য আমাদের সীমানার বাইরে যে লক্ষ লক্ষ নরনারী হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মনোবেদনা আমরা কিছুই বুঝি না। সেইজন্য আমাদের ভারতের বাইরে যেতে হবে, আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তারা যা কিছু দিতে পারে তা গ্রহণ করতে হবে। অধ্যাত্মজগতের অপূর্ব তত্ত্বগুলির সঙ্গে আমরা জড়জগতের অদ্ভুত আবিষ্কারগুলি বিনিময় করব। আমরা চিরকাল শিষ্য থাকব না, গুরুও হব। সমতা ছাড়া বন্ধুত্ব হয় না, আর এই সমভাব কখনও আসতে পারে না, যদি একদল সর্বদাই গুরু হয়ে থাকে আর অন্যদল

তাদের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করে। যদি ইংরাজ বা মার্কিনদের সমকক্ষ হবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁদের কাছে যেমন শিখতে হবে তেমনি তাঁদের শেখাতেও হবে এবং জগৎকে শত শত শতাব্দী ধরে শেখাবার বিষয় আপনাদের যথেষ্ট আছে। এটা করতেই হবে। হৃদয়ে উৎসাহের আগুন জ্বালতে হবে। বাঙালী জাতির কল্পনা-শক্তি আছে বলা হয়, আমি একথা বিশ্বাস করি। আমাদের কল্পনাপ্রিয়, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ জাত বলে উপহাস করা হয়। কিন্তু বন্ধুগণ, আপনাদের আমি বলি, বুদ্ধি বড় বটে, কিন্তু তার ক্ষমতা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস—একমাত্র ভাবোচ্ছ্বাস থেকেই প্রেরণা আসে। ভাবের মধ্যে দিয়েই গভীরতম রহস্যগুলি উদ্‌ঘাটিত হয়। অতএব বাঙালী দ্বারাই—ভাবুক বাঙালী দ্বারাই—এই কার্য সাধিত হবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত—উঠ, জাগ, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেম না। কলকাতার যুবকেরা,—উঠ, জাগ, কারণ শুভসময় এসেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের সম্মুখের বন্ধ দুয়ার খুলে গেছে। সাহসী হও, ভয় পেও না! একমাত্র আমাদের শাস্ত্রেই ঈশ্বরকে এই বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে—অভীঃ, অভীঃ। আমাদের অভীঃ—নির্ভীক হতে হবে। তবেই আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে। উঠ, জাগ—কারণ তোমাদের মাতৃভূমির এই মহাবলির প্রয়োজন। যুবকরাই এই কাজ করতে পারবে। তরুণ, উৎসাহী, বলিষ্ঠ, দৃঢ় স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান—তাদের জন্যই এই কাজ। আর কলকাতায় এমন যুবক শত সহস্র আছে। আপনারা বলেছেন আমি কিছু কাজ করেছি, যদি তাই হয়, তবে মনে রাখবেন—আমিও ছিলাম কলকাতার রাস্তায় খেলা করে বেড়ানো একটা অপদার্থ বালক। যদি আমি এত-খানি করতে পারি, তবে তোমরা আরও কত বেশি করতে পার। উঠ, জাগ—জগৎ তোমাদের আহ্বান করছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, অর্থবল আছে, কিন্তু উৎসাহ শুধু আমার মাতৃভূমিতেই আছে। তাকে প্রকাশ করতে হবে, অতএব কলকাতার যুবকেরা, রক্তে উৎসাহের জোয়ার নিয়ে জাগ! ভেব না তোমরা দরিদ্র, তোমরা বন্ধুহীন। কে কোথায় দেখেছে টাকায় মানুষ করে? মানুষই চিরকাল টাকা করে। জগতের যা কিছু মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে।

তোমাদের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম উপনিষদ কঠোপনিষদ পড়েছ, তাদের মনে আছে—এক রাজা বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন এবং মূল্যবান বস্তু দক্ষিণা না দিয়ে অকেজো ঘোড়া ও গাভী দান করছিলেন। গ্রন্থটিতে আছে যে এই সময় তাঁর পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দের অনুবাদ আমি করব না, তাতে ভুল হবে; বোঝার পক্ষে এটি এক অপূর্ব শব্দ, অনেক কিছুই এটির উপর নির্ভর করে। এটির কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যাক। কারণ আমরা তখুনি দেখতে পাই নচিকেতার মনে জাগল, 'আমি অনেকের চেয়ে বড়, কয়েকজনের চেয়ে ছোট, কিন্তু কোনখানেই একেবারে সবার নিচে নই, আমিও কিছু করতে পারি।' তার এই সাহসটা বাড়ল, তার মনে যে সমস্যা জেগেছিল তার সমাধান করতে চাইল, মৃত্যু-সংক্রান্ত সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসা একমাত্র যমালয়ে গেলেই হতে পারে

এবং বালকটি তাই গেল। সেই নির্ভীক নচিকেতা যমের গৃহে গিয়ে তিন দিন অপেক্ষা করল। আপনারা জানেন তার মনে যা জেগেছিল তা কেমন করে সে লাভ করল। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত থেকে এই শ্রদ্ধা প্রায় লোপ পেতে বসেছে এবং সেইজন্যই আমাদের বর্তমানে এই অবস্থা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার মাত্রায়, আর কিছুতে নয়। এই শ্রদ্ধাই একজনকে বড় করে, আর অন্যজনকে ছোট, দুর্বল। আমার গুরুদেব বলতেন, যে নিজেকে দুর্বল ভাবে সে দুর্বল হয়ে যায়—এটি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা আপনাদের মধ্যে আসা চাই। পাশ্চাত্য জাতির জড়জগতে যে শক্তির প্রকাশ দেখছেন তা এই শ্রদ্ধার ফলেই, তারা দৈহিক শক্তিতে বিশ্বাসী; আপনারা যদি নিজের আত্মার শক্তিতে বিশ্বাসী হন, তাহলে তার কাজ আরও কত বেশি হবে। অনন্ত আত্মায় বিশ্বাসী হন, অসীম শক্তিতে বিশ্বাসী হন, আপনাদের শাস্ত্রগ্রন্থ ও ঋষিরা একবাক্যে যা প্রচার করেছেন। সেই আত্মাকে কেউ নাশ করতে পারে না, অনন্ত শক্তির উৎস, যাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী—সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে আত্মার মধ্যেই সমস্ত শক্তি আছে, শুধু তাকে ব্যক্ত করতে হবে, প্রকাশ করতে হবে। অতএব আমি চাই এই শ্রদ্ধা। এখানে আমরা সকলে যা চাই তা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস; আর এই বিশ্বাস অর্জনের মহৎ কার্য আপনাদের সামনে পড়ে আছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের জীবাণু প্রবেশ করেছে—সকল বিষয়কে উপহাস করার ভাব, গাম্ভীর্যের অভাব। এটি ত্যাগ করুন! শক্তিমান হন, শ্রদ্ধাবান হন, অন্য সবকিছু নিশ্চয়ই আসবে।

আমি তো এখনও কিছুই করতে পারিনি, তোমাদেরই সব কাজ করতে হবে। যদি আমার কাল মৃত্যু হয়, কাজ লোপ পাবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জনসাধারণের মধ্যে থেকে হাজার হাজার লোক এগিয়ে এসে এই ব্রত গ্রহণ করবে এবং এই কর্মকে এত দূর হতে দূরে ছড়িয়ে দেবে, যা আমার সব আশা ও কল্পনার বাইরে। আমার দেশের উপর আমার বিশ্বাস আছে, বিশেষত আমার দেশের যুবকদের উপর। বাংলার যুবকদের উপর সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব পড়েছে, যা ইতিপূর্বে আর কখনও যুবকদের কাঁধে চাপানো হয়নি। আমি প্রায় গত দশ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়িয়েছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে বাংলার যুবকদের মধ্যে থেকেই সেই শক্তি আসবে যা ভারতকে আবার তার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবে। হ্যাঁ, এই গভীর অনুভূতি ও উৎসাহ যাদের রক্তে মেশানো, সেই বাংলার যুবকদের মধ্যে থেকে বীরের দল এগিয়ে আসবে যারা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করবে ও শিক্ষা দান করবে পূর্বপুরুষদের সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে। তোমাদের সামনে এই মহান কর্তব্য রয়েছে। তাই তোমাদের উপনিষদের বাণী আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।'

ভয় পেও না! কারণ মানবজাতির ইতিহাসে বরাবর দেখা গেছে সব বিশাল শক্তিই

জনসাধারণের মধ্যে থেকে এসেছে। তাদের মধ্যে থেকেই এসেছেন জগতের যত বড় বড় প্রতিভা এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কিছুতেই ভয় পেও না। তোমরা অদ্ভুত কাজ করবে। যে মুহূর্তে ভয় পাবে, সেই মুহূর্তেই শক্তিহীন হয়ে পড়বে। ভয়ই জগতের সব দুঃখের মূল কারণ। ভয়ই সবচেয়ে বড় কুসংস্কার। ভয়ই আমাদের দুঃখের কারণ, নির্ভীক হলে স্বর্গ মুহূর্তের মধ্যে আমাদের করতলগত হবে। অতএব, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন তার জন্য আর একবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমার ইচ্ছা—আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা আমি যেন জগতের এবং সবার উপরে আমার স্বদেশের ও স্বদেশবাসীদের যৎসামান্য সেবায় লাগতে পারি।

সর্বাবয়ব বেদান্ত

[কলিকাতার স্টার থিয়েটারে প্রদত্ত বক্তৃতা]

লিখিত ইতিহাসের অগম্য, পুরুষ-পরম্পরায় স্মৃতিরও অগম্য, কোন বিগত কাল থেকে জ্বলছে একটি আলোকশিখা। কোন বাহ্য কারণে, কখনও অত্যুজ্জ্বল, কখনও বা স্তিমিত, কিন্তু কালজয়ী, অনির্বাণ, এর দ্যুতি শুধু ভারতবর্ষেই প্রতিভাত হয়নি, প্রাতের শিশিরবিন্দু যেমন নিঃশব্দে, সকলের অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে, সুন্দরতম গোলাপ ফুলটিকে ফুটিয়ে তোলে, ঠিক সেইরকম, নিঃশব্দ, কোমল, অথচ এই আলোকশিখা তার নীরব, কোমল এক অমিত শক্তির প্রকাশে সকলের অজ্ঞাতে সমগ্র চিন্তাজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সে সর্বশক্তিমান। এটাই হলো উপনিষদের চিন্তা, বেদান্তের দর্শন। ভারতবর্ষের মাটিতে এর প্রথম অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ কারও জানা নেই। সব অনুমানই ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবাসীদের অনুমানগুলি এতই পরস্পর-বিরোধী যে কোন নিশ্চিত সন তারিখ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। কিন্তু আমরা, হিন্দু আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে, এর কোন বিশেষ উৎপত্তি-কেন্দ্র আছে বলে স্বীকার করি না। আমি একথা বলতেই পারি যে উপনিষদের দর্শন এই বেদান্ত, আধ্যাত্মিকতার জগতে প্রথম এবং শেষ চিন্তা, যা মানুষ নিশ্চিন্তভাবে পেয়েছে এবং পেয়ে বাধিত হয়েছে। বেদান্তের এই বারিধি থেকে জ্ঞানলোকের তরঙ্গের গতি কখনও পশ্চিমাভিমুখে, কখনও বা পূর্বাভিমুখে। বহুকাল আগে একবার পৌঁছেছিল পশ্চিম সীমান্তে, উদ্বুদ্ধ করেছিল এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া ও এন্টিওকের (Antioch) গ্রীক মানসকে। সাংখ্যদর্শন সুনিশ্চিতভাবে প্রাচীন গ্রীকদের চিন্তাধারায় গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। আর সাংখ্যই হোক বা অন্য কোন ভারতীয় দর্শন চিন্তাই হোক সবকিছুরই শেষ মীমাংসাই হলো উপনিষদ, বেদান্ত। ভারতবর্ষেও ঠিক তাই। বিভিন্ন পন্থীদের যেসব বিরোধী যুক্তি-তর্ক যা আমরা আজকাল দেখতে পাই অথবা আগেও ছিল—এসব কিছু সত্ত্বেও চিরকাল ধরেই সব চিন্তা-রীতির শেষ মীমাংসা, এবং মূল ভিত্তি হলো—উপনিষদ, বেদান্ত। তুমি দ্বৈতবাদী, অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী অথবা অন্য কোনরকম অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী অথবা তুমি তোমাকে যে নামেই পরিচয় দাও না কেন। তোমার শাস্ত্র, তোমার ধর্ম-পুস্তক, সব কিছুর পেছনেই একটিই শেষ মীমাংসা—উপনিষদ। ভারতবর্ষের যে দর্শন-চিন্তা উপনিষদকে স্বীকার করে না—তার কোন কৌলীন্য স্বীকৃত হয় না। এমন কি ভারতভূমি থেকে যে বৌদ্ধদের এবং জৈনদের চিন্তাধারার উচ্ছেদ হয়েছিল তারও একমাত্র কারণ যে তারা উপনিষদের আনুগত্য স্বীকার করেনি। তাই, আমরা জানি আর নাই জানি, উপনিষদের চিন্তা ভারতবর্ষের সমস্ত মতাবলম্বী চিন্তাধারার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। আমরা যাকে হিন্দুত্ব বলি সেটা একটা বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষের মত, তার অসংখ্য চিন্তাধারার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত কিন্তু প্রতিটি চিন্তার শাখা-প্রশাখাতেই অন্তর্নিহিত আছে বেদান্তের প্রভাব। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, বেদান্তই আমাদের চিন্তা, বেদান্তই আমাদের

জীবন, বেদান্তই আমাদের শ্বাস-ক্রিয়া, বেদান্তেই আমাদের দেহান্ত। প্রতিটি হিন্দুই তাই করে। সেইজন্য ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে, ভারতীয় শ্রোতাদের সামনে বেদান্ত প্রচার করা একটা অসঙ্গত ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু এটিই একমাত্র প্রচার্য বিষয় এবং যুগ প্রয়োজনে একে অতি অবশ্যভাবে প্রচার করতেই হবে। কারণ, যেমন আমি তোমাদের বলেছি প্রতিটি সম্প্রদায়কেই উপনিষদের আনুগত্য স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এইসব সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকের চিন্তার মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। পুরাকালের অনেক ঋষিরা নিজেরাও অনেক সময় উপনিষদের চিন্তার অন্তর্নিহিত সমন্বয় বুঝে উঠতে পারেন নি। ঋষিরাও অনেক সময়ে এমন বাদানুবাদে মেতে উঠতেন যে একটা কিংবদন্তীই ছিল যে একজন ঋষির সঙ্গে মতের মিল আছে এমন আর একজন ঋষিকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কালের প্রয়োজনেই আজকে উপনিষদের অন্তর্নিহিত সমন্বয়-বিষয়ক বক্তব্যের সবিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে—তা সে দ্বৈতবাদ অথবা অদ্বৈত-বাদ, কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা এই ধরনের যা কিছুই হোক না কেন। সারা পৃথিবীর সামনে আজকে এই সমন্বয়ের কথাটি তুলে ধরতেই হবে। এবং এই কাজটি আজকে ভারতের বাইরেও যেমন প্রয়োজন, ভারতের ভেতরেও ততখানি প্রয়োজন। ঈশ্বরের অপার করুণায়, আমার এমন একজনের পদপ্রান্তে ঠাঁই পাবার অনন্যসাধারণ সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁর জীবনই ব্যাখ্যা, যাঁর বাণীর চাইতে যাঁর জীবন আলেখ্যে উপ-নিষদের ব্যাখ্যা শতগুণ প্রকট হয়ে উঠেছিল, বস্তুত তার মাঝেই উপনিষদের আত্মা জীবন্ত মানবদেহে রূপায়িত হয়েছিল। হয়ত সেই সমন্বয়ের সামান্য কিছু অংশ আমি লাভ করেছি। কিন্তু আমি জানি না আমার মাধ্যমে তার প্রকাশ হবে কি হবে না। কিন্তু সেটাই আমার প্রচেষ্টা। বৈদিক চিন্তার বিভিন্ন ধারাগুলি যে পরস্পর-বিরোধী নয় বরং তাদের পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা আছে, তারা একটি অন্যটির পরিপূরক, যেন একটিকে ভর করেই অন্যটিতে পৌঁছানো যায় যতক্ষণ না 'তত্ত্বমসি'র শেষ চিন্তায় উপনীত হওয়া যায়। এই চিন্তাধারাকে প্রকাশ করাই আমার জীবন-সাধনা। এমন একদিন ছিল যেদিন বৈদিক কর্মকাণ্ডই ভারতবর্ষে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। বেদের এই অংশের ভেতর অনেক মহান আদর্শ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের আজকের পূজা-পার্বণও কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি অনুসারেই চলছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বৈদিক কর্মকাণ্ড ভারতবর্ষ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কর্মকাণ্ডের অনুশাসন দিয়ে আমাদের জীবনের খুব সামান্য অংশই প্রভাবিত বা পরিচালিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাব অনেক বেশী। এমন কি যেসব ব্যাপারে ব্রাহ্মণরা বৈদিক সূত্র ব্যবহার করেন—সেগুলোও বেদকে অনুসরণ না করে তন্ত্র ও পুরাণ অনুসারেই যুগোপযুক্ত করা হয়েছে। সেইজন্য নিজেদের বেদের কর্মকাণ্ড অনুসরণকারী হিসাবে বৈদিক বলে পরিচয় দেওয়াটা যথার্থ হয় না। কিন্তু অন্যদিকে আমরা সকলেই যে বৈদান্তিক সে কথা যথার্থ। যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেন তাঁরা বরং নিজেদের বৈদান্তিক বলে পরিচয় দিলে ভাল করবেন। কারণ আমি আপনাদের দেখিয়েছি যে বৈদান্তিক বলতে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী ইত্যাদি সব মতাবলম্বীদেরই বোঝায়। একালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা

যায়—দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী। এঁদের মধ্যে মতের যে সামান্য পার্থক্য অথবা এঁরা যে বিভিন্ন মীমাংসার দোহাই দিয়ে নিজেদের নতুন নামকরণ করেন, যেমন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী অথবা বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদী ইত্যাদি, তাতে এমন কিছুই আসে যায় না। শ্রেণী বিভাগ করতে গেলে এরা সবাই হয় দ্বৈতবাদী নয় অদ্বৈতবাদী, এবং এ যুগের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের ভিতর কেউ কেউ খুবই নতুন আর বাদবাকি ত সব মনে হয় বহু প্রাচীন মতাবলম্বীদেরই নব সংস্করণ।

ভারতবর্ষে পরবর্তী যুগের দ্বৈতদর্শনের প্রধান চিন্তানায়ক ছিলেন রামানুজ। দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী সব মতাবলম্বীরাই, প্রত্যক্ষভাবেই হোক অথবা পরোক্ষভাবেই হোক, তাঁদের চিন্তায়, শিক্ষায়, এমন কি তাঁদের সঙ্ঘ-সংগঠনের সূক্ষ্মতম ব্যবস্থাপনায় পর্যন্ত রামানুজকেই অনুসরণ করেছেন। রামানুজ এবং তাঁর কর্মধারার সঙ্গে অন্যান্য দ্বৈতবাদীদের সঙ্ঘ-সংগঠন, শিক্ষা এবং পদ্ধতির তুলনা করলে তাঁদের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। দাক্ষিণাত্যের মহান প্রচারক ছিলেন মাধবাচার্য। তাঁকে অনুসরণ করেই এবং তাঁর দর্শনকে গ্রহণ করেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে আরও কিছু মতাবলম্বী আছেন, যেমন শৈবরা, যাঁরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। সিংহল এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ বাদ দিলে ভারতীয় শৈবরা বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদী। কিন্তু বিষ্ণুর পরিবর্তে শিবকে বসানো ছাড়া এবং আত্মার তত্ত্বটি বাদে এরা সর্বতোভাবে রামানুজপন্থী। রামানুজের অনুসরণকারীরা মনে করেন আত্মা হলো অণু অর্থাৎ অণুপ্রমাণ, অতিক্ষুদ্র, আর শঙ্করাচার্যের অনুসরণকারীরা মনে করেন আত্মা হলো বিভু, অর্থাৎ সর্বব্যাপী। কিছু অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও ছিল। মনে হয় পূর্বকালের কিছু কিছু ভিন্নমতাবলম্বীরা শঙ্করাচার্যের প্রবল আলোড়ন এদের সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল। সেই কারণে কোন কোন টীকায় শঙ্করাচার্যের প্রতিও কখনও কখনও কটাক্ষ তোমরা দেখতে পাও। যেমন বিজ্ঞান ভিক্ষু—যদিও অদ্বৈতবাদী, কিন্তু শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে স্থানচ্যুত করবার প্রয়াস করেছিলেন। মনে হয় কিছু কিছু মতবাদ ছিল যা মায়াবাদে বিশ্বাসী ছিল না। তারা শঙ্করাচার্যকে পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন-বুদ্ধ আখ্যা দিতে পশ্চাৎপদ হয়নি। এদের ধারণা যে মায়াবাদ বৌদ্ধধর্ম থেকে আহরণ করে বেদান্ত-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা সে যাই হোক, একালের অদ্বৈতবাদীরা সবাই শঙ্করাচার্যকেই মেনে নিয়েছেন। শঙ্করাচার্য এবং তাঁর শিষ্যরাই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ভারতেই অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক। বাংলাদেশ, কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবে—শঙ্করাচার্যের মতবাদ তেমন ভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতে স্মার্তরা শঙ্করাচার্যের অনুগামী। কিন্তু বারাণসীকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতের বহুস্থানে শঙ্করাচার্যের বিপুল প্রভাব দেখা যায়।

শঙ্করাচার্য বা রামানুজ কেউই তাঁদের চিন্তাধারার মৌলিকতা দাবি করেননি। রামানুজ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তিনি সুপ্রসিদ্ধ বোধায়নের ভাষ্যকেই অনুসরণ করেছেন মাত্র। 'ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।' "প্রাচীন

গুরুগণ ভগবান বোধায়নকৃত ব্রহ্ম-সূত্রের সুবিস্তৃত টীকার সংক্ষিপ্তসার রচনা করে'ছিলেন ; সেই মতানুসারেই সূত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।" রামানুজ তাঁর টীকা 'শ্রীভাষ্যের' সূচনাতেই এ কথা বলেছেন। তিনি একে গ্রহণ করে 'সংক্ষিপ্ত' করেছেন। এবং আজকে আমরা যা পেয়েছি সেটা তাই। বোধায়নের টীকা দেখবার সুযোগ আমার নিজেরও হয়নি। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোধায়নকৃত টীকা ছাড়া ব্যাস-সূত্রের ওপর অন্যসব টীকাকেই পরিত্যাজ্য বলে মনে করতেন। যদিও তিনি রামানুজের প্রতি কটাক্ষ করবার কোন সুযোগ কখনও হারাননি কিন্তু তিনিও বোধায়ন ভাষ্য কখনও দেখাতে পারেননি। আমি সারাভারতবর্ষময় খুঁজেও আজ পর্যন্ত তা দেখতে পাইনি। এই ব্যাপারে রামানুজ কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি বলেছেন যে বোধায়নের চিন্তাধারার এবং কখনও কখনও বোধায়ন-রচিত অংশেরও সংক্ষিপ্ত সারই রামানুজ-ভাষ্য। মনে হয় শঙ্করাচার্যও তাই করেছিলেন।

শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের কোন কোন অংশে প্রাক্তন টীকার উল্লেখ আছে। আমরা যখন জানি যে তাঁর গুরু এবং তাঁর গুরুর গুরুও একমতাবলম্বী বৈদান্তিক তো ছিলেনই বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁর চাইতেও বেশী স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। তখন একথা সহজেই অনুমেয় যে তিনি বিশেষ মৌলিক কোন কথা প্রচার করেননি। রামানুজ বোধায়নের সাহায্যে যা করেছিলেন শঙ্করাচার্যও সেই রকমই কিছু করেছি'লন। তবে তিনি কোন বা কার ভাষ্যের ব্যবহার করেছিলেন সে কথা আজকে আর জানবার কোন উপায় নেই।

তোমরা যে সব দর্শন দেখছ বা শুনছ সে সব কিছুরই ভিত্তি হচ্ছে উপনিষদ। যখনই তাঁরা শ্রুতি থেকে কিছু উদ্ধৃত করার কথা ভাবেন, তখনই তাঁরা উপনিষদই বোঝেন। এঁরা প্রায় সর্বদাই উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উপনিষদকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষে অন্য দর্শনও এসেছে। কিন্তু ব্যাসকৃত দর্শন যেভাবে ভারতবর্ষে শিকড় গাঁথতে পেরেছে, অন্য কোন দর্শনই তা পারেনি। কিন্তু ব্যাসকৃত দর্শনও একটি প্রাচীনতর দর্শন অর্থাৎ সাংখ্যদর্শন থেকেই বিবর্তিত। ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর সমস্ত দার্শনিক চিন্তা এবং পদ্ধতি কপিলমুনির কাছে ঋণী। ভারতবর্ষের মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে তিনিই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী। কপিল মুনির প্রভাব পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা জগতেই প্রসারিত। যেখানেই চিন্তাধারার একটা স্বীকৃত পদ্ধতি আছে, সেখানেই তাঁর চিন্তার প্রভাবের কিছু না কিছু চিহ্ন দেখা যাবে।

এরকম চিন্তাধারা যত হাজার হাজার বছরেরই প্রাচীন হোক না কেন, সেখানেও দেখা যাবে রয়েছেন চিরভাস্বর, গৌরবোজ্জ্বল, বিস্ময়কর কপিল মুনি। ভারতবর্ষের সবরকম মতাবলম্বীরাই তাঁর মনস্তত্ত্ব এবং বহুলাংশেই তাঁর দর্শন-চিন্তাকে মেনে নিয়েছে, বিভেদ যদি কিছু থাকে তা খুবই সামান্য। আমাদের দেশী নৈয়ায়িক দার্শনিকরা ভারতবর্ষের দর্শনচিন্তার জগতে তেমন কোন রেখাপাত করতে পারেননি। নৈয়ায়িকরা সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়েই অত্যধিক ব্যস্ত থাকতেন, যেমন জাতি, দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি। আর ব্যস্ত থাকতেন তাঁদের দুর্বহ পরিভাষা নিয়ে।

সেই পরিভাষা শেখাই তো সারাজীবনের কাজ। সেই জন্য ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দর্শন চিন্তাটা বৈদান্তিকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণে ভারতবর্ষের আধুনিক সবরকমের দার্শনিক মতাবলম্বীরাই বঙ্গীয় নৈয়ায়িকদের ন্যায়ের পরিভাষাকে গ্রহণ করেছেন। জগদীশ, গদাধর, শিরোমনিরা যেমন নদীয়ায় সুপরিচিত, মালাবারের কোনও কোনও শহরেও তেমনি সুপরিচিত। কিন্তু ব্যাস-কৃত দর্শন অর্থাৎ 'ব্যাস-সূত্র' সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর বেদান্ত দর্শনের 'ব্রহ্মন্' চিন্তাটি মানুষের কাছে তাঁর চিরকালের অবদান। শ্রুতির কাছে যুক্তি-তর্ক সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করা হলো। শঙ্করাচার্য বলতেন যে ব্যাস কোনদিনই যুক্তি-তর্কের পরোয়া করেননি। তাঁর সূত্র রচনার উদ্দেশ্য ছিল বেদান্তের মূল বক্তব্যগুলি একত্রিত করে একটি মালার মত করে গেঁথে ফেলা। তাঁর সূত্রগুলি যতখানি পর্যন্ত উপনিষদ অনুসারে প্রামাণিক ততখানিই স্বীকৃত হয়, তার বাইরে নয়। আমি আগেই তোমাদের বলেছি—বর্তমানে ভারত-বর্ষের সব মতাবলম্বীরাই 'ব্যাস-সূত্র'কে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলে মনে করে। নতুন কোন সম্প্রদায় যদি আসে তারাও তাদের জ্ঞান অনুসারে 'ব্যাস-সূত্রে'র নতুন একটি ভাষ্য দিয়েই শুরু করে। কখনও কখনও এই সব নব্য ভাষ্যকারদের ভেতর বিরাট মতাবরোধ দেখা দেয়। কখনও কখনও মূল ব্যাখ্যার মারামারি সত্যিই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। 'ব্যাস-সূত্র' শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থের স্থান পেয়েছে, এবং এর নতুন কোন ভাষ্য না দিতে পারলে নতুন কোন সম্প্রদায় কেউ সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে 'ব্যাস-সূত্রের' পরেই স্থান হলো গীতার—বিরাট যার প্রসিদ্ধি। গীতার প্রচারেই শঙ্করাচার্যের গৌরব। এই মহাপুরুষের মহান জীবনে অনেক মহৎ কাজের ভেতর শ্রেষ্ঠ কাজ হলো গীতার প্রচার এবং গীতার ওপর মনোরম ভাষ্য রচনা করা। এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট মতগুলির প্রতিষ্ঠতারা গীতার এক-একটি ভাষ্য রচনা করেছেন।

উপনিষদ একটি নয়, অনেক। বলা হয় একশ আটটি উপনিষদ আছে। কারুর কারুর মতে এর সংখ্যা আরও অনেক বেশী। বোঝাই যায় যে কোন কোন উপনিষদ অনেক পরবর্তী কালের। যেমন আল্লোপনিষদ যাতে 'আল্লা'-কে প্রশস্তি জানানো হয়েছে এবং মহম্মদকে 'রাজসুল্লা' বলা হয়েছে। আমি শুনেছি যে এটা আকবরের আমলে রচনা করা হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত করবার উদ্দেশ্যে। উপনিষদের ভেতরে আল্লা বা ইল্ল এই রকমের দু একটা শব্দ তাঁরা পেয়ে থাকবেন এবং তার ভিত্তিতেই উপনিষদ তৈরী হয়েছিল। সেই কারণেই এই আল্লোপনিষদে মহম্মদ হলেন রাজসুল্লা, যাই তার মানে হোক না কেন?

এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক উপনিষদ আরও আছে। যাদের আধুনিকত্ব সহজেই বুঝতে পারা যায়। এগুলো লেখাও বেশ সহজসাধ্য। কারণ বেদের সংহিতার অংশটি এমনই অপ্রচলিত ভাষায় লেখা যে তাতে ব্যাকরণের কোন বালাই নেই। অনেক দিন আগে আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল বেদের ব্যাকরণ অধ্যায়ন করা এবং আমি খুব যত্নসহকারে পাণিনি এবং মহাভাষ্য পড়তে শুরু করেছিলাম। তখন একটা জিনিস দেখে আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। বৈদিক ব্যাকরণ কেবল

বিধির ব্যতিক্রম দিয়ে ভর্তি। একটা বিধি তৈরী হলো; তারপরই পাওয়া যাবে একটি উক্তি, "বেদে এই বিধিটির একটি ব্যতিক্রম আছে"। তাহলেই দেখ কেউ যদি কিছু লিখতে চায় তার কি অবাধ স্বাধীনতাই না আছে। তবে এইটেই রক্ষা যে যাস্কের 'নিরুক্ত'টি আছে। তার ভেতরও বহুলাংশে দেখতে পাবে বহু সমার্থক শব্দের ব্যবহার। এই সব সুযোগ থাকলে খুসি মত যত ইচ্ছে উপনিষদ রচনা করা যায়। পুরনো অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করবার মত কিছু সংস্কৃতের জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট, ব্যাকারণের বালাই আর রইল না। তখন অনায়াসেই 'রাজসুল্লা' বা তোমার পছন্দ মত অন্য কোন 'সুল্লা' নিয়ে এসো। এই পন্থায় অনেক উপনিষদ তৈরী হয়েছে এবং আমি শুনেছি যে এখনও নাকি তৈরী হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে কোন কোন মতাবলম্বীদের এই ধরণের উপনিষদ তৈরীর চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই সব উপনিষদের মধ্যে আসল উপনিষদও আছে যাদের দেখলেই খাঁটি বলে বোঝা যাবে। তাদের ওপরেই মহান ভাষ্যকাররা তাঁদের ভাষ্য রচনা করেছেন। বিশেষ করে শঙ্কর এবং তাঁকে অনুসরণ করে রামানুজ ও আরও অনেকে।

উপনিষদ সম্পর্কে আর দু-একটি মাত্র বিষয় তোমাদের নজরে আনতে চাই। আমার মত অনধিকারীর পক্ষেও একটা বক্তৃতায় উপনিষদের কথা বলা সম্ভব নয়, যা বলতে বছরের পর বছর কেটে যাবার কথা—কারণ এ সব যেন বিশাল জ্ঞান-সমুদ্রের মত। সেই জন্যই তোমাদের চোখের সামনে উপনিষদ পাঠের বিষয়ে দু-একটি কথা তুলে ধরতে চাই। প্রথম কথা হলো—পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে আশ্চর্যজনক কবিতা এগুলি, বেদের 'সংহিতা' যদি পড় তাহলে মাঝে মাঝেই দেখতে পাবে এমন সব অংশ—যার অসাধারণ সৌন্দর্যে বিহ্বল হতে হয়। যেমন ধর যে শ্লোকে সৃষ্টির পূর্বকালীন প্রলয়ের বর্ণনা হয়েছে 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে' ইত্যাদি "যখন তমসাশ্রিত ছিল তমসা", ইত্যাদি পড়তে পড়তে অনুভব করা যায় কি আশ্চর্য, কি মহান এই ছন্দবদ্ধ পদ। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছো—ভারতবর্ষের বাইরে এবং ভারতবর্ষেও অসীমকে বর্ণনা করবার চেষ্টা হয়েছে। ভারতের বাইরে অসীমকে বুঝতে চেয়েছে শক্তির অসীমত্বে, বহির্জগতের অসীমত্বে, বস্তু অথবা ব্যাপ্তির অসীমত্বে। ইউরোপের পুরাকালের অথবা একালের শ্রেষ্ঠ কবিরা, মিল্টন বা দান্তে—যখনই অসীমকে বোঝাতে চেয়েছেন, তাকে খোঁজবার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে, অসীমের অনুভূতি দিতে চেয়েছেন দেহের শক্তির মাধ্যমে। এদেশেও তেমন প্রচেষ্টা হয়েছে, সংহিতায় দেখতে পাওয়া যাবে। বিস্তৃতির অসীমত্বর বুদ্ধি বিহ্বলকারী বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পাঠককে। এমন অসামান্য বর্ণনা পৃথিবীর আর কোথাও কখন পাওয়া যায়নি। শুধু ঐ একটা পংক্তিকেই লক্ষ্য কর 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্'।—'যখন তমসাশ্রিত ছিল তমসা', এবারে তিনজন কবির অন্ধকারের বর্ণনাকে তুলনা করা যাক। আমাদের কবি কালিদাস বলেছেন 'অন্ধকার—যাকে সূচ্যাগ্র বিদ্ধ করা সম্ভব।' মিল্টন বলেছেন 'আলো তো নয়, দৃশ্যমান অন্ধকার।' এবারে শোন

উপনিষদ বলছেন, 'তমসাচ্ছন্ন তমসা'। 'তমসায় লুক্কায়িত তমসা', আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা বুঝতে পারি সহজে, বর্ষাকালে, মুহূর্ত মধ্যে, দিকচক্রবাল রেখায় আঁধার নামে, কালো মেঘকে ঢেকে দিয়ে গড়িয়ে আসে আরও কালো মেঘ। এই রকম বর্ণনাই চলতে থাকে। কিন্তু তবুও সংহিতায় অসীমের বর্ণনার চেষ্টা বাইরে থেকে। আরও সব দেশের মতই জীবনের বড় সমস্যাগুলো সমাধান খোঁজা হয়েছে বহির্জগতের ভেতর। প্রাচীন গ্রীক চিন্তা বা আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তা যেমন জীবন-সমস্যা অথবা ঈশ্বর-বিষয়ক সমস্যার সমাধান খুঁজেছিল বহির্জগতে আমাদের পিতৃপুরুষরাও একদিন সেই রকমই খুঁজেছিলেন। তাই ইউরোপীয়রাও যেমন সক্ষম হতে পারেন নি। আমাদের পিতৃপুরুষরাও পারেননি। কিন্তু পশ্চিমাদেশের মানুষরা ঐখানেই থেমে রইলেন, আর অগ্রসর হলেন না। বহির্জগতে জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়ে সেইখানেই পথ হারিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। আমাদের পিতৃপুরুষরাও। এই প্রচেষ্টা যে অসম্ভব তা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে এ কথা বলবার তাঁদের সাহস ছিল যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন দিনই সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপনিষদের চাইতে স্পষ্টতর ভাষায় আর কোথাও এ কথা বলা হয়নি—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'—"সেখান থেকে বাক্য প্রতিবিম্বিত হয়ে মনের সঙ্গেই ফিরে আসে।" 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি।' দৃষ্টি সেখানে যেতে পারে না, বাক্যও পৌঁছতে পারে না।" ইন্দ্রিয়ের অসহায়তা নিয়ে এই রকম আরও অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেইখানেই তাঁরা থেমে থাকেননি। তাঁরাও তখন মানুষের অন্তর্নিহিত স্বত্তার ওপর নির্ভর করলেন। প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেন স্বীয় আত্মার কাছে। অন্তর্দর্শী হলেন। বহির্বিশ্ব থেকে কোন উত্তর, কোন আশারই সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে তাঁরা তাকে ব্যর্থ মনে করে পরিত্যাগ করলেন। তাঁদের সত্যানুভূতি হলো যে মূঢ়, মৃত বস্তু থেকে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তখন তাঁরা মানুষের ভাস্বর আত্মার ওপর নির্ভরশীল হলেন। এবং সেখানেই তাঁরা পেলেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর।

'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা' তাঁদের মুখে ধ্বনিত হলো: "এই আত্মাকেই শুধু জানো অন্য সব অসার বাক্যকে পরিত্যাগ করে', অন্য কোন বাক্য শ্রবণ করো না।" এই আত্মার ভেতরেই তাঁরা সব সমাধান খুঁজে পেলেন—ঈশ্বর, বিশ্ব-জগতের প্রভু, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা, তাঁর সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং তাঁরই মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। এবং এইখানেই দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর মহত্তম কাব্য। বস্তুর মাধ্যমে আত্মাকে বর্ণনার প্রচেষ্টা তখন আর নেই। কেবল তাই নয়; তাঁরা এর জন্য সদর্থক ভাষাও পরিত্যাগ করলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মাধ্যমে অসীমকে অনুভব করবার প্রচেষ্টা শেষ হলো। বহিরাঙ্গর মূঢ়, মৃত, বস্তু সর্বস্ব, ব্যাপ্ত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অসীমের অস্তিত্ব শেষ হলো, তার পরিবর্তে এলো এমন একটি সূক্ষ্ম ধারণা যা বর্ণিত হয়েছে এই ছন্দবদ্ধ বাক্যে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

এই পৃথিবীতে এর চাইতে মহত্তর কাব্য আর কি হতে পারে!

"যেখানে সূর্য আলোকপাত করতে পারে না, চন্দ্রও না, নক্ষত্ররাও না, যেখানে তড়িৎশিখা আলোকপাত করতে পারে না—সেখানে মরজগতের অগ্নিশিখার কথা কি আর বলবো?" এমন কাব্য আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অপূর্ব সুন্দর কঠোপনিষদের কথাই ধর। কী অসাধারণ তার কাব্যশৈলী। কী বিস্ময়কর প্রারম্ভ যেখানে ক্ষুদ্র বালক শ্রদ্ধালাভ করে যমরাজকে দেখতে চেয়েছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু মৃত্যু স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাকে জীবন আর মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছিলেন। কী জানতে চেয়েছিল সেই ক্ষুদ্র বালক? সে জানতে চেয়েছিল মৃত্যুর গূঢ় রহস্য।

উপনিষদ সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় কথাটি তোমাদের মনে রাখতে বলবো—সেটা হল উপনিষদের নির্ব্যক্তিকতা—যদিও উপনিষদে আমরা অনেক নামই দেখতে পাই। দেখতে পাই অনেক গুরু, অনেক বক্তা, কিন্তু একটি কাব্যপদও তাঁদের জীবনের ভিত্তিতে রচিত হয়নি। তাঁদের মধ্যে একজনও উপনিষদের মতো হয়ে ওঠেননি, তাঁরা যেন দৃষ্টির বাইরে ছায়ার মত সঞ্চরণ করছেন, দৃষ্টির বাইরে, অনুভূতির বাইরে। 'উপনিষদের প্রকৃত শক্তিটি প্রস্ফুটিত হয় তার অনন্যসাধারণ, চির ভাস্বর, নৈর্ব্যক্তিক শ্লোকগুলিতে।

কুড়ি জন যাজ্ঞবল্ক্য মুনির আবির্ভাব ও তিরোভাবে উপনিষদের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই; তার মূল শ্লোকগুলি অবধারিতভাবেই আছে। অন্যদিকে উপনিষদ কোনো ব্যক্তিত্বেরই বিরোধী নয়। এর ঔদার্য্য এবং ব্যাপ্তি এতো বিরাট যে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও যারা করবে—তাদের সকলকেই সে অধিগ্রহণ করতে সক্ষম। কোনো মানুষ, অবতার অথবা কোনো ঋষিকে উপাসনা করতে কোনো বাধা নিষেধ নেই। বরং তার প্রতি পূর্ণ সমর্থনই আছে। তা সত্ত্বেও উপনিষদ সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক। সত্যিই চমৎকার। উপনিষদে ঈশ্বরও নৈর্ব্যক্তিক। উপনিষদের চিন্তাও নৈর্ব্যক্তিক। একজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক তার চিন্তায় যতখানি নৈর্ব্যক্তিকত আশা করতে পারেন, ঋষি, চিন্তাশীল মানুষ, দার্শনিক এবং যুক্তিবাদীদের কাছে উপনিষদের চিন্তা ততখানিই নৈর্ব্যক্তিক। এবং এই হলো আমার ধর্মীয় পুস্তক। তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে খ্রীষ্টানদের কাছে যেমন বাইবেল, মহম্মদীয়দের কাছে যেমন কোরাণ, বৌদ্ধদের কাছে যেমন ত্রিপিটক, পার্শিদের কাছে যেমন জেন্দাভেস্তা, আমাদের কাছে তেমনি এই উপনিষদ। এই আমাদের একমাত্র ধর্মশাস্ত্র। পুরাণ, তন্ত্র এবং অন্যান্য বই, এমনকি ব্যাসসূত্র—যে সবেরই প্রাধান্য বিষয়ে অধিকার, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের, কিন্তু বেদ হলো প্রথম পর্যায়ের। মনু, পুরাণ এবং অন্যান্য বইয়ে সেই অংশগুলিই গ্রাহ্য, যে অংশগুলি উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করছে; যেখানে যেখানেই সে স্বীকৃতি নেই সেখানেই সেগুলো নির্মমভাবে বর্জনীয়। এই কথাটা আমাদের সদাসর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে একথা আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি। মনে হয় উপনিষদের বিধানের চাইতে একটা গ্রাম্য আচারেরই প্রাধান্য। মনে হয় বাংলার কোন পল্লীগ্রামের একটা চলতি ধারণার অধিকার বেদের চিন্তার চাইতেও যেন বেশী। আর ঐ 'নৈষ্টিক' শব্দটার কি প্রভাব! একটি গ্রাম্য লোকের কাছে কর্মকাণ্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার মেনে চলাই হলো

নৈষ্ঠিকতার পরাকাষ্ঠা; এবং যে তা করবে না তাকে তখনই বলা হবে, 'দূর হও! তোমার মধ্যে হিন্দুত্ব আর কিছু নেই!' তাই দুর্ভাগ্যবশত আমার এই জন্মভূমিতে, এমনঅনেক লোক আছে যারা কোন একটা তন্ত্রের পথ বেছে নিয়ে বলবে যে এই তন্ত্রের বিধান মানতেই হবে, যে মানবে না তার মতকে আর নৈষ্ঠিক বলা চলবে না। সেইজন্য আমাদের পক্ষে এই কথাটা মনে রাখা ভাল যে উপনিষদের প্রমাণ প্রথম পর্যায়ের, এমন কি গুহ্য ও শ্রৌত সূত্র পর্যন্ত উপনিষদের প্রমাণের অধীন। এই হলো ঋষিদের বাণী, আমাদের পিতৃপুরুষের বাণী, তুমি যদি হিন্দু হতে চাও তাহলে এই বিশ্বাসে তোমাকে অবশ্যই আস্থাবান হতে হবে। তোমার ঈশ্বর চিন্তা যাই হোক না কেন তুমি যদি উপনিষদের প্রমাণকে অস্বীকার করো তুমি তাহলে নাস্তিক বলে গণ্য হবে। এইখানেই খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ এবং আমাদের ধর্মশাস্ত্রের প্রভেদ। তাদের সবই পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র নয়, কারণ তাদের পুঁথিতে আছে প্রলয়ের ইতিহাস, রাজা-রাজড়ার ইতিহাস, রাজপরিবারের ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী, এইসব। এ সব কিছুই পুরাণের অন্তর্গত; বৈদিক চিন্তার সঙ্গে যতখানি মিল ততখানি ভাল। বাইবেল এবং অন্যান্য জাতির ধর্মশাস্ত্রের যতখানি বেদের সঙ্গে মেলে ততখানিই গ্রহণীয়। কিন্তু যখনই সম মত রক্ষা করে না, তখনই বর্জনীয়। কোরাণের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। এদের ভিতর অনেক নৈতিক শিক্ষার কথা আছে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি বেদের সঙ্গে সম মত ততক্ষণই পুরাণের মত প্রামাণিক, কিন্তু তার বেশী নয়। এর মানে হলো বেদ কোনদিনই লেখা হয় নি। তার কোন জন্ম নেই। একবার একজন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক আমাকে বলেছিলেন যে তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের একটা ঐতিহাসিকতা আছে এবং সেই কারণেই সেটা সত্য। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম যে আমার ধর্মশাস্ত্রের কোন ঐতিহাসিকতা নেই, সেই কারণেই সে সত্য। তোমাদের তত্ত্ব ঐতিহাসিক, তার মানে এই যে সেদিন কোন মানুষ তাকে রচনা করেছে। তোমাদের শাস্ত্র মনুষ্যকৃত, আমার তা নয়। তাই ঐতিহাসিকতার অভাবই আমার পক্ষকে সমর্থন করছে, তাই আজকে বেদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের প্রভেদটা এই রকমই।

এবারে উপনিষদের শিক্ষার কথায় আসা যাক্‌, উপনিষদে অনেক বিষয়বস্তু আছে। কিছু কিছু সম্পূর্ণভাবে দ্বৈতবাদের কথা বলে। বাদবাকী অদ্বৈতবাদের কথা বলে, কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু মত আছে যেগুলো সবরকমের মতাবলম্বীদের দ্বারাই স্বীকৃত। প্রথমটি হলো সংসার অথবা আত্মার পুর্নজন্মের মত। দ্বিতীয়তঃ মনস্তাত্ত্বিক চিন্তায় তারা সকলেই একমত। প্রথমে হলো দেহ বা স্থূল দেহ, তার অন্তরে আছে তাঁরা যাকে বলেন সূক্ষ্ম দেহ অথবা মন এবং তারও অন্তরে হলো জীব। এইখানেই আবার পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় মনস্তত্ত্বের প্রচণ্ড ব্যবধান। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বে মনই হলো আত্মা, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা নয়। মনকে আমরা বলি অন্তঃকরণ, সেটা জীবের হাতে একটি আভ্যন্তরিক যন্ত্র মাত্র। এই যন্ত্রের মাধ্যমেই জীব দেহের ওপর অথবা বহির্জগতের ওপর কাজ করে। এবিষয়ে সব পন্থার লোকেরাই এক মত। জীব, আত্মা অথবা জীবাত্মা—একই সত্তার বিভিন্ন মতাবলম্বীদের দেওয়া

বিভিন্ন নাম।—জীবাত্মা হলো চিরন্তন, তাঁর কোন প্রারম্ভ নেই; এবং যতদিন তার মুক্তি না হচ্ছে তিনি নিরন্তর জন্ম থেকে জন্মান্তর পার হয়ে চলেছেন। এই পর্যন্ত সকলেই একমত আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও এরা একমত সেটা হলো আত্মাই সর্বস্ব। এইখানেই পশ্চিমী চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার আর একটি বিরাট প্রভেদ।

সকল শক্তি, সকল পবিত্রতা, সকল মহত্ত্ব--সবই আত্মার অন্তর্ভুক্ত। যোগী তোমাদের এই কথাই বলবেন যে অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি যে সব সিদ্ধাই তিনি লাভ করতে চান—সেসব বাইরে থেকে আহরণীয় নয়; সত্যি কথা বলতে তারা আত্মার অন্তরেই নিহিত আছে, তাদের ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকট করে তুলতে হবে। যেমন পতঞ্জলি বলছেন মানুষের পদদলিত যে কীটাণু তার মধ্যেও যোগীর অষ্ট সিদ্ধির ক্ষমতা বিরাজমান। দেহের তারতম্যের জন্যই প্রভেদ। যখনই সে একটি উপযুক্ত দেহের অধিকারী হবে তখনই তার ক্ষমতা প্রকটিত হবে—কিন্তু ক্ষমতাগুলো আছেই।

নিমিত্তম্ প্রয়োজকং প্রকৃতীনব' বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।

"স্বভাবের পরিবর্তন, সুকর্ম অথবা কুকর্মের পরোক্ষ ফল নয়। কর্ম হলো স্বভাবের বিবর্তনের পথের বাধাগুলির খণ্ডনকারী। যেমন চাষী জল-স্রোতের বাঁধকে ভেঙে দিলে জল তখন আপন স্বভাবেই প্রভাবিত হয়" এই প্রসঙ্গেই পতঞ্জলি তার সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণটি দিয়েছিলেন: কোন একটি বিরাট জলাশয় থেকে চাষীর নিজের ক্ষেতে জল আনবার বিবরণ। জলাশয়টি জলে পরিপূর্ণ, যে কোন মুহূর্তেই সেখান থেকে তার সংলগ্ন ক্ষেতে জল নামতে পারে। বাধা শুধু তাদের অন্তর্বর্তী একটা মাটির দেওয়াল। যে মুহূর্তে সেই বাঁধটি ভেঙ্গে দেওয়া হলো জলের স্বাভাবিক স্রোত নেমে এল চাষীর ক্ষেতে। সমস্ত ক্ষমতারাশি, পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা আত্মার অন্তরে সদাবিদ্যমান। কেবল একটি আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এই আবরণটি সরে গেলেই আত্মা-পূর্ণ-পবিত্রতা লাভ করে, সমস্ত শক্তি প্রকটিত হয়ে ওঠে। মনে রেখো পূর্বের এবং পশ্চিমের চিন্তাধারার এখানেই মস্ত বড় পার্থক্য। সেই জন্যই তোমরা এই সব ভয়াবহ মতবাদ শুনতে পাও যে আমরা সবাই জন্মপাপী; আর এই সব ভয়াবহ মতবাদ বিশ্বাস করি না বলে আমরা সবাই জন্ম অসৎ। তারা একটি বারও ভেবে দেখে না যে আমরা যদি স্বভাবতই খারাপ হই, আমরা তো তাহলে কোনদিন ভাল হতে পারবো না। কারণ মূল স্বভাবের কি পরিবর্তন হয়? যদি তাই সম্ভব হতে,—তাহলে তো সেটা একটা পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার হতো। প্রকৃতির নিয়মে তা হয় না। এই কথাটা মনে রেখো তোমরা, এদেশে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী এবং অন্যরাও সবাই একমত এই বিষয়ে।

এর পরের আলোচ্য বিষয় হলো ঈশ্বর। ভারতবর্ষের সব মতাবলম্বীরাই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। অবশ্য সকলের ঈশ্বর চিন্তা একই রকমের নয়। দ্বৈতবাদীরা কেবল মাত্র সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সগুণ ব্যক্তিসত্তা কথাটা একটু ভাল করে বোঝা দরকার। সগুণ ব্যক্তির ঈশ্বর মানে এই নয় যে তাঁর একটি দেহ আছে, তিনি একটি সিংহাসনে বসে পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করছেন। এর মানে হলো তিনি সগুণ অর্থাৎ তিনি

গুণযুক্ত। সৃষ্টি স্থিতি লয় এই সগুণ ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় সম্ভব—একথা সব ধর্মাবলম্বীরাই স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদীরা আরও একটু এগিয়ে যান। এই সগুণ ঈশ্বরকেই আরও খানিকটা উপরের স্তরে দেখতে পান তাঁরা—যেখানে ব্যক্তিক নৈর্ব্যক্তিক এক হয়ে যায়। যেখানে গুণ নেই কোন বিশেষণের ব্যবহারে তাকে বোঝানো সম্ভব নয়। অদ্বৈতবাদীরা ঈশ্বরের তিনটি ব্যতীত অন্য কোন গুণ আরোপ করতে রাজী নন। সেই তিনটি গুণ হলো সৎ-চিৎ-আনন্দ অর্থাৎ সত্তা, জ্ঞান ও পরমানন্দ। এটা হল শঙ্করাচার্যের ভাষ্য। কিন্তু তোমরা দেখবে যে উপনিষদ আরও গভীরে প্রবেশ করেছে; এবং তাঁরা বলছেন যে এ বিষয়ে 'নেতি, নেতি' ছাড়া আর কিছুই বলা বিধেয় নয়।

এ ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে মতের ঐক্য আছে। দ্বৈতবাদের কথা বলতে গেলে রামানুজের কথা বলতে হয়। তিনি একজন আদর্শ দ্বৈতবাদী—আধুনিক দ্বৈতবাদের মহান প্রতিনিধি তিনি। এটা একটা খুবই দুঃখের কথা যে আমরা বাঙালীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সব মহান ধর্মগুরুরা জন্মেছেন তাঁদের বিষয়ে খুব কম কথাই জানি। সত্যি কথা বলতে গেলে, মুসলমানদের গোটা রাজত্বকালে চৈতন্যদেবকে বাদ দিলে সবকজন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুই দক্ষিণ ভারতে জন্মেছেন। আজকেও দক্ষিণ ভারতের মনীষাই ভারতবর্ষকে পরিচালনা করছে। এমনকি চৈতন্যদেবও মাধবাচার্যের অনুসরণ করেছিলেন। রামানুজের মতে ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি—এই তিনটি সত্তা অনন্তকাল ধরে বিরাজমান, জীবআত্মাগুলিও চিরন্তন, চিরকাল পরমাত্মার সঙ্গে তাদের প্রভেদ থাকবে এবং তাদের স্বতন্ত্রতা চিরকাল থাকবে। রামানুজ বলেছেন যে, অনন্তকাল ধরে তোমার আত্মসত্তার সঙ্গে আমার আত্মসত্তার প্রভেদ থাকবে। তেমনি থাকবে প্রকৃতি তার বিভিন্নতা নিয়ে। সেইরকমই বিরাজমান থাকবেন ঈশ্বর ও আত্মা। ঈশ্বর আত্মার মর্ম কথা মননে রত, তাই তিনি অন্তর্যামী। এই অর্থে রামানুজ কখনও কখনও আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সমাবস্থান চিন্তা করেছেন অথবা ঈশ্বরই আত্মা। প্রলয়কালে, যখন তাঁর ভাষায় সমস্ত প্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়, আত্মা সকলও সঙ্কুচিত হয় এবং ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে অবস্থান করে। প্রলয়শেষে নতুন যুগের আরম্ভে এরা সবাই বেরিয়ে আসে এবং প্রাক্তন কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগ করে। রামানুজের মতে যে কর্ম আত্মার স্বভাবগত পবিত্রতা এবং পরিপূর্ণতাকে সঙ্কুচিত করে সেটাই কুকর্ম, যে কর্ম আত্মার বিকাশ এবং প্রকাশকে প্রশস্ততর করে সেটাই সুকর্ম। যা কিছু দিয়েই আত্মার বিকাশ হয় তাই ভাল, এবং যা কিছুই আত্মাকে সঙ্কুচিত করে তাই খারাপ। এই ভাবে কখনও সঙ্কুচিত কখনও বিকশিত হয়ে চলেছে আত্মার নিরন্তর যাত্রা—যতদিন না ঈশ্বরের করুণায় তার মোক্ষ লাভ হয়। রামানুজ বলেন যে আত্মা পবিত্র এবং করুণালাভে প্রবলভাবে সচেষ্ট—তারা সকলেই এই করুণা লাভ করে। শ্রুতিতে একটা বিখ্যাত শ্লোক আছে :

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।

"খাদ্য যখন পবিত্র হয় সত্ত্বও পবিত্র হয়, সত্ত্ব পবিত্র হলে স্মৃতি সত্য হয়, স্থির হয়, পরম হয়।" স্মৃতি মানে ঈশ্বরের স্মৃতি অথবা অদ্বৈতবাদী হলে স্বীয় সম্পূর্ণতার

স্থিতি। এটা একটা বিরাট আলোচনার বিষয়। প্রথম কথা হলো—সত্ত কি? সাংখ্য মতে এবং সেই মত সর্ব দর্শনগ্রাহ্য—দেহ তিন প্রকার বস্তু দিয়ে সৃষ্ট—গুণ দিয়ে নয়। সাধারণভাবে ধরা হয় যে সত্ত, রজঃ, তম—হলো তিনটি গুণ। মোটেই তা নয়। গুণ নয়, বিশ্বসৃষ্টির বস্তু এগুলো। "এবং আহার শুদ্ধি হলে অর্থাৎ আহার্য বস্তু পবিত্র হলে সত্ত বস্তুটিও পবিত্র হয়। বেদান্তের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো সত্তকে লাভ করা। আমি তোমাদের বলেছি আত্মা নিয়তই পবিত্র এবং পূর্ণ এবং বেদান্ত মতে রজঃ এবং তমঃ-র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে আচ্ছাদিত। সত্তঃ-র অংশগুলি সবচাইতে বেশী ভাস্বর। আত্মার জ্যোতি অতি সহজেই সত্তঃ-র মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, আলো যেমন অতি সহজেই কাঁচের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। তাহলে রজঃ এবং তমঃ-র অংশগুলি দূরীভূত হলে শুধু যখন সত্তঃ অবশিষ্ট থাকে সেই অবস্থায় আত্মার শক্তি এবং পবিত্রতা প্রতীয়মান হয় এবং আত্মাও অধিকতরভাবে প্রকটিত হয়ে ওঠে।

সেই কারণেই সত্তকে লাভ করাই প্রয়োজন। তাই শাস্ত্রবাক্য হলো "আহার যখন পবিত্র হয়"। রামানুজ আহার বলতে খাদ্যকেই বুঝিয়েছেন—এবং এইখানেই তার দর্শন একটি নতুন গতিপথ নিয়েছিল। কেবল তাই নয়, এর প্রভাব সারা ভারতবর্ষের সমস্ত মতাবলম্বীদেরই প্রভাবান্বিত করিছিল। সেই জন্যই এই কথাটার অর্থ বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ রামানুজের মতে আহারশুদ্ধি মানব জীবনের একটি প্রধান বিষয়। রামানুজ বলেছেন, আহার্য কিভাবে পবিত্র হয়? তিনরকমের অশুদ্ধতায় খাদ্য অপবিত্র হয়। প্রথম, জাতি দোষ অর্থাৎ যে খাদ্য স্বভাবতই অপবিত্র, যেমন পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি উগ্র গন্ধযুক্ত বস্তু; দ্বিতীয় হলো, আশ্রয় দোষ—যার কাছ থেকে খাদ্য এসেছে তার অশুদ্ধতা; দুষ্ট মানুষের কাছ থেকে গৃহীত খাদ্য তোমাকে অপবিত্র করবে। আমি আমার নিজের জীবনে দেখেছি অনেক ঋষি মুনি সারা জীবন ধরে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এই নীতিটি মেনে চলেন। অবশ্য তাঁদের একটি বিশেষ শক্তি দিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন কে খাদ্য বহন করে এনেছে, এমনকি সেই খাদ্য বস্তুকে স্পর্শ করেছে তাও তারা বুঝতে পারেন। এরকম ঘটনা আমার জীবনে আমি একবার নয়, একশবার দেখেছি। তৃতীয় হলো নিমিত্ত দোষ—অপবিত্র কোন বস্তু বা প্রভাব যদি খাদ্যকে স্পর্শ করে খাবারের সঙ্গে ধুলো ময়লা অথবা দু-একটা চুল থাক. ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বহুলাংশে প্রচলিত। এবারে কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন। উপরোক্ত তিনটি দোষ থেকে যদি খাদ্যকে মুক্ত করা যায় তাহলে খাদ্য সত্তশুদ্ধ হয়। তাহলে তো ধর্ম আচরণ ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে ওঠে। পবিত্র খাদ্য খেলেই যদি ধর্ম লাভ হয় তাহলে তো সবাই ধার্মিক হতে পারে। এই জগতে এমন কোন দুর্বল বা অক্ষম মানুষ আমি দেখিনি যে এই তিনটি দোষমুক্ত খাদ্য খেতে পারে না। এর পরই শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব। তিনি বললেন, আহার হলো মনের চিন্তা সমষ্টি। সেই চিন্তা যখন পবিত্র হয়, তার আগে নয়। তোমার ইচ্ছামত খাদ্য খেতে পারো তুমি। যদি একমাত্র খাদ্যই সত্তকে পবিত্র করতে পারতো—তাহলে একটা বাঁদরকে জীবনভোর দুধভাত খাওয়ালে সে একজন

মহাযোগী হয়ে উঠবে নাকি? তাহলে তো গরু হরিণ এরা সব মহাযোগী হয়ে উঠতো। কথায় বলে "বহু অবগাহনে যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহলে তো স্বর্গে অগ্রাধিকার হবে মাছেদের। নিরামিষ আহারেই যদি স্বর্গলাভ হয়—তাহলে গরু আর হরিণরাই সর্বাগ্রে স্বর্গে পৌছবে।"

কিন্তু তাহলে সমাধানটা কি? দুটোই প্রয়োজন। অবশ্য শঙ্করাচার্যের 'আহারের' ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তবে পবিত্র খাদ্য ও পবিত্র চিন্তারপক্ষে সাহায্যকারী। সুতরাং উভয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু আজকের ভারতবর্ষের এটাই বিচ্যুতি যে শঙ্করাচার্যের অনুশাসনকে ভুলে সবাই কেবল 'পবিত্র খাদ্যে'র ধারণাটাই নিয়ে বসে আছে। সেই জন্যই আমি যখন বলি যে আমাদের ধর্মের এমন আস্তানা হলো রান্নাঘরে, সবাই আমার উপর এমন ক্ষাপ্প হয়ে ওঠে। তোমরা যদি আমার সঙ্গে মাদ্রাজ যেতে তাহলে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হতে। ওদের চাইতে বাঙালীদের অনেক বেশী ভাল বলতে হবে, মাদ্রাজে খাবারের দিকে অবাঞ্ছিত লোকের দৃষ্টি পড়লেও ওরা খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এসব করে মানুষের যে একটা উন্নতি হয়েছে তাতো আমি দেখতে পাই না। যদি এই খাদ্যটা খাবো, এটা খাব না, এবং ওর দৃষ্টি থেকে খাদ্যকে সরাবো—এই সব করে যদি পূর্ণতা লাভ হতো—তাহলে তো ওরা সবাই এক একজন পরিপূর্ণ মানুষ। কিন্তু ওরা তা মোটেই নয়।

তাহলে এই বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য দুটো চিন্তাকেই একত্রিত করে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তাই বলে ঘোড়ার সামনে গাড়ীকে জুড়লে চলবে না। আজকাল খাদ্যবস্তুর এটা ওটা নিয়ে আর বর্ণাশ্রম নিয়ে খুব একটা রব উঠেছে, আর সে ব্যাপারে বাঙালীরাই সব চাইতে বেশী সোচ্চার। আমি তোমাদের জনে জনে প্রশ্ন করছি বর্ণাশ্রমের বিষয়ে কি জানো তোমরা? এই দেশে কোথায় সেই চারটি বর্ণ? উত্তর দাও আমার প্রশ্নের। আমি তো চারটি বর্ণ দেখতে পাই না। সেই বাংলা প্রবচনটির মত, 'মাথা নেই তার মাথা ব্যাথা'। এখানকার বর্ণাশ্রমও তোমরা সেই রকমই করতে চাও, এখানে চার বর্ণের কোন বাস্তবতা নেই, আমি শুধু দেখতে পাই ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা যদি থাকতো কোথায় তারা? তোমরা যারা ব্রাহ্মণ তোমরাই বা কেন তাদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়ে, বেদ অধ্যয়ন করিয়ে হিন্দুর অবশ্য কর্তব্যে ব্রতী করাওনি? বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়দের যদি কোন অস্তিত্বই না থাকে কেবল যদি ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের বসবাস হয়, তাহলে শাস্ত্রের অনুশাসন হলো যে ব্রাহ্মণরা কখনই শুধুমাত্র শূদ্রদের সঙ্গে বসবাস করবে না। তাহলে তোমরা ব্রাহ্মণরা তোমাদের বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে বিদেয় হও। ম্লেচ্ছ খাদ্য খাওয়া এবং ম্লেচ্ছ শাসনের অধীনে বাস করার—যা তোমরা হাজার বছর ধরে করছো—এর প্রায়শ্চিত্তর শাস্ত্রীয় বিধান কি জানো তোমরা? এর প্রায়শ্চিত্ত হলো স্বহস্তে নিজেকে অগ্নিতে দাহ করা। তোমরা কি নিজেদের গুরুর ভূমিকায় বসিয়ে ভণ্ডের মত আচরণ করতে চাও? সেই যে ব্রাহ্মণ মহাবীর আলেকজান্দারের সঙ্গী হয়েছিলেন, তারপর ম্লেচ্ছ খাদ্য আহার করেছেন ভেবে নিজেকে অগ্নিদগ্ধ করেছিলেন। যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস করো তাহলে তোমাদেরও প্রথম কর্তব্য হল নিজেদের অগ্নিদগ্ধ করা। যদি তাই করতে পারো তাহলে

দেখবে সমস্ত জাতটাই তোমাদের পদপ্রান্তে। তোমরা নিজেরাই তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাসী নও, অথচ তোমাদের ইচ্ছে আর সবাই সেই শাস্ত্র মেনে চলুক। তোমরা যদি মনে করো যে একালে তা সম্ভব নয়, তাহলে নিজেদের দুর্বলতাকে স্বীকার করো, অপরের দুর্বলতাকে ক্ষমা করো। বাংলার ব্রাহ্মণরা অন্য জাতদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দাও, সাহায্য করো তাদের বেদাধ্যয়নে; তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও পৃথিবীর যে কোন সবল আর্যের মত আর্যত্ব লাভ করুক।

সে জঘন্য বামাচার প্রথা দেশকে মরণোন্মুখ করেছে তাকে পরিত্যাগ করো। আমি যখন দেশের মধ্যে বামাচার প্রথার এহেন বিস্তার দেখতে পাই, তখন আমার কাছে এটাকে একটা মান-মর্যাদাহীন দেশ বলে মনে হয়—তা যতই সে তার কৃষ্টির অহঙ্কার করুক না কেন। বামাচারী সম্প্রদায় এই দেশটাকে মধুচক্রের মত ছেয়ে ফেলেছে। যারা দিবালোকে বেরিয়ে এসে আচারের কথা বলে সোচ্চার হয়, তারাই রাত্রের অন্ধকারে জঘন্যতম ভ্রষ্টাচারে উন্মত্ত হয়। এবং সেই কাজে সহায় হয় তাদের ভয়াবহ শাস্ত্র। এই শাস্ত্রই তাদের এইসব কাজে প্রেরণা জোগায়। তোমরা বাঙালীরা সবাই একথা জানো। আজ বাংলার শাস্ত্র হলো বামাচারী তন্ত্র। গাড়ী বোঝাই করে ছাপা হচ্ছে এই সব বই আর তাই দিয়ে তোমাদের শিশু সন্তানদের মনগুলিকে বিষাক্ত করে তুলেছো। অথচ তোমাদের নিজেদের শাস্ত্র শ্রুতির শিক্ষা তাদের দিচ্ছ না। তোমরা যারা পিতা তারা কি এ কথা ভবে লজ্জিত হয়ে উঠছো না যে এই সব ভয়াবহ বিষয়, অনুবাদ সহ, তোমাদের ছেলেমেয়েদের হাতে উঠছে, তাদের মন বিষাক্ত হচ্ছে, আর এগুলোকেই দেশের শাস্ত্র মনে করে বড় হয়ে উঠছে তারা? সত্যিই যদি লজ্জিত বোধ করে থাকো, তাহলে ও সব বই ওদের হাত থেকে সরিয়ে নাও আর তাদের বেদ, গীতা, উপনিষদ এই সব সত্য শাস্ত্রগুলো পড়তে দাও।

ভারতীয় দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মতে বিশিষ্ট আত্মাগুলি আবহমানকাল বিশিষ্ট বিশিষ্ট আত্মা হিসাবেই অবস্থান করে এবং ঈশ্বর পূর্বাবস্থিত উপাদান থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি অভীষ্ট ফলোৎপাদক। অপরদিকে অদ্বৈতবাদীরা মনে করেন যে ঈশ্বর একই সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির বস্তু এবং ফলোৎপাদক স্রষ্টা। তিনি কেবলমাত্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা নন, তাঁর অভ্যন্তর থেকেই বিশ্বের অভ্যুত্থান সম্পন্ন করেন। এই হলো অদ্বৈতবাদীদের মূল কথা। কিছু কিছু অসংস্কৃত দ্বৈতবাদীরা মনে করে যে যদিও ঈশ্বর নিজ সত্তা থেকেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবুও তিনি জগৎ থেকে ভিন্ন এবং সবকিছুই অনন্তকাল ধরে জগৎপতির অধীন। কোন কোন মতাবলম্বীরা আবার মনে করে যে ঈশ্বর জগতের বিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একদিন না একদিন নির্বাণ লাভ করে সীমা থেকে মুক্তি পেয়ে অসীম হবে। তবে এসব মতাবলম্বীদের বিলোপ হয়েছে। আজকে যে অদ্বৈতবাদীদের দেখতে পাও তারা সকলেই শঙ্করাচার্যের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টির উপাদান এবং ফলোৎপাদক দুই-ই; কিন্তু বস্তুতঃ এটা মায়া, সত্য নয়। ঈশ্বর কখনই বিশ্বে পরিণত হননি; জগৎ হলো না-বাচক আর ঈশ্বর হলেন হাঁ-বাচক। মায়া হলো—অদ্বৈত বেদান্তের

সর্বোচ্চ চিন্তা। এই সব চাইতে দুরূহ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার মত সময় নেই আজকে। তোমাদের ভেতর যাদের পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে পরিচয় আছে তারা Kant-এর চিন্তার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য দেখতে পাবে। কিন্তু সাবধান, অধ্যাপক মোক্ষমূলারের কাণ্ট সম্বন্ধীয় রচনায় একটি বিশেষ ভ্রান্তিমূলক ধারণা আছে। দেশ, কাল এবং কার্যকারণতার চিন্তার সঙ্গে মায়াবাদের চিন্তার মধ্যে যে একত্ব বিরাজমান—সে কথা শঙ্করাচার্যই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ শঙ্কর-ভাষ্যের ভেতর দু-একটা জায়গায় এটা আমি পেয়েছিলাম এবং আমার অধ্যাপক বন্ধুকে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম। তাহলে সেই চিন্তাও ভারতবর্ষে ছিল। মায়াবাদের চিন্তাটি অদ্বৈতবেদান্তিবদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেপূর্ণ। ব্রহ্মই একমাত্র অস্তিত্ব, কিন্তু মায়ার প্রভাবেই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। ব্রহ্ম এক, এবং এই একত্বই শেষ কথা এবং চরম লক্ষ্য। পশ্চিমের এবং ভারতের চিন্তার মধ্যে এটাই হলো চিরকালের দ্বন্দ্ব। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সামনে এটাই ছিল ভারতীয় চ্যালেঞ্জ। বহু জাতি তার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু তোমরা আজও বেঁচে আছ। ভারতের বাণী হলো যে এই জগৎসংসার একটা ভ্রান্তিবোধ; তুমি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হাত দিয়েই খাও অথবা সোনার পাত্রেই খাও, তুমি রাজপ্রাসাদবাসী সব চাইতে পরাক্রমশালী নৃপতিই হও অথবা দরিদ্রতম ভিক্ষুকই হও, সবেরই শেষ কথা হলো মৃত্যু; একই কথা সব, সবই মায়া। এই হলো ভারতবর্ষের চিরকালের কথা; বার বার বহু জাতি একথাকে স্তব্ধ করবার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে একে অপ্রমাণ করতে; একমাত্র ভোগকে লক্ষ্য করে, বাহুবলে বলীয়ান হয়ে সেই ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করে। আকণ্ঠ ভোগ করে তারা বেড়ে উঠেছিল কিন্তু পরমুহূর্তেই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু চিরকাল ধরে আমরা বর্তমান, কারণ আমরা দেখতে পাই সবকিছুই মায়া। মায়ার সন্তানরা চিরজীবী, ভোগের সন্তানরা ক্ষণজীবী। এইখানে আর একটি বিরাট ব্যবধান। জার্মানীতে হেগেল এবং সোপেনহাওয়ারের যে প্রচেষ্টা তোমরা দেখতে পাও প্রাচীন ভারতেও সেই একই জাতীয় চিন্তা দেখা দিয়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ হেগেলীয় মতবাদ অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছিল। বেড়ে উঠে পল্লবিত হয়ে তার কুফল দিয়ে আমাদের মাতৃভূমিকে আচ্ছন্ন করতে দেওয়া হয়নি। হেগেলের একান্ত বিশ্বাস ছিল একত্বে, পূর্ণতায় নাকি চিরকালের বিশৃঙ্খলতা,, ব্যক্তিত্ব আরোপিত সত্তাই হলো মহত্তর। ঐহিক জগৎ জগৎহীনতার চাইতে শ্রেষ্ঠ, সংসার মোক্ষের চাইতে মহত্তর। এই একই চিন্তা—যতই তুমি সংসারে আবদ্ধ হবে, যতই তোমার আত্মা জীবনের নানা বর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত হবে, ততই তোমার মঙ্গল। তারা বলে, দেখতে পাও না আমরা কেমন প্রাসাদ তৈরী করছি, রাস্তাঘাটকে ঝকঝকে করছি, কত ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করছি। কিন্তু হায়! ভোগসম্ভারের প্রতিটি কণিকার পেছনে লুকিয়ে রেখেছ কত না বিদ্বেষ, কত না লাঞ্ছন', কত না ভীষণতা।

অন্যদিকে আমাদের দার্শনিকরা প্রথম থেকেই ঘোষণা করে এসেছেন প্রতিটি প্রকাশই—বিবর্তন বলো যাকে তোমরা—অসার, অপ্রকটের প্রকট হবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

হায়, যে তুমি বিশ্বজগতের বিরাট হেতুস্বরূপ—তুমি প্রতিবিম্বিত হতে চাও গোষ্পদে! কিন্তু কিছুদিন প্রচেষ্টার পর একদিন এর অসারত্ব বুঝতে পেরে তখন পশ্চাদপদ হয়ে যেখান থেকে এসেছিলে, সেই স্বস্থানেই গমন করো। একেই বলে বৈরাগ্য অথবা ত্যাগ, এখানেই ধর্মের সূচনা। ত্যাগ ছাড়া ধর্ম বা নীতির সূচনা হওয়া কি করে সম্ভব? ত্যাগ হলো ধর্মের অ-আ। "ত্যাগ করো।" বেদ বলছেন, "ত্যাগ করো।" এই একটাই পন্থা, "ত্যাগ করো।" ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।—"সমুদ্রের মাধ্যমে নয়, সন্তানের মাধ্যমে নয়, একমাত্র পরিত্যাগ করেই অমরত্বে পৌঁছাতে হয়।"

ভারতীয় শাস্ত্রের এই নির্দেশ। অবশ্য অনেক মহান ত্যাগীপুরুষ জন্মেছেন এদেশে। সিংহাসনাসীন হয়েও ত্যাগের নিদর্শন আছে। (রাজা) জনকের চাইতে মহাত্যাগী পুরুষ আর কে? এই আধুনিক যুগে আমরাও সবাই জনক হতে চাই। নিশ্চয়ই সকলেই তো জনক—অর্ধভুক্ত, অর্ধ-উলঙ্গ, হতভাগ্য সন্তানদের জনক। এই অর্থে এদের জনক বলা চলে। রাজা জনকের মত উজ্জ্বল, ঈশ্বরোপম চিন্তার অধিকারী এঁরা নয়। এঁরা হচ্ছেন আমাদের আধুনিক জনক। এই রকমের জনকত্ব কমিয়ে ফেলা ভাল। এবার স্পষ্ট কথায় এসো। যদি ত্যাগ করার ক্ষমতা থাকে তাহলেই তোমাদের ধর্মলাভ হবে। যদি সে ক্ষমতা না থাকে, তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিমের সব বই পড়লেও, সমস্ত পুস্তকাগার গলাধঃকরণ করলেও এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়েও শুধু যদি কর্মকাণ্ড নিয়েই থাকো—কিছুই হলো না তোমার, কিছুমাত্র আধ্যাত্মিকতা লাভ হলো না। একমাত্র ত্যাগের মাধ্যমেই অমরত্বে পৌঁছনো যায়। এ এমন একটা শক্তি, একটা মহাশক্তি যে বিশ্বজগৎকেও পরোয়া করে না। এ হলো—ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে "ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ হয়।"

ত্যাগই হলো একটি নিশান, ভারতের পতাকা সমগ্র জগতের ওপর উড্ডীয়মান। এই মৃত্যুহীন চিন্তা ভারতবর্ষ বার বার পাঠিয়েছে মুমূর্ষু জাতিদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবাণীর মত। স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। এই পতাকা থেকে, হিন্দুরা তোমাদের মুষ্টি শিথিল করো না, উঁচু করে তুলে ধরো একে। তোমরা যদি দুর্বল হও, ত্যাগে অসমর্থ হও, আদর্শকে নামিয়ে এনো না। বলো, "আমি দুর্বল, আমি সংসারকে ত্যাগ করতে অসমর্থ।"

কিন্তু, শাস্ত্রের বাক্যাংশের ওপর জবরদস্তী করে, বড় বড় যুক্তির অবতারণা করে এবং লোকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করে ভণ্ডামীর প্রয়াস করো না। এসব না করে নিজের অক্ষমতাকে স্বীকার করো। কারণ ত্যাগ একটি মহান চিন্তা। যদি লক্ষ মানুষ অকৃতকার্য হয়, কেবল দশ জন কিংবা শুধু মাত্র দুজন সৈন্য জয়লাভ করে ফিরে আসে—তাতেই বা কি এসে যায়। যে লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলো—ধন্য হোক তারা। তাদের রক্তই ত এনেছে জয়। একটি ছাড়া আর সব বৈদিক মতাবলম্বীরাই ত্যাগের আদর্শে বিশ্বাসী—তারা হলো বম্বে প্রেসিডেন্সীর বল্লভাচার্যের অনুগামী সম্প্রদায়। তোমাদের অধিকাংশরই বোধহয় জানা আছে যে যেখানে ত্যাগের অস্তিত্ব নেই, কি অবস্থা হয় সেখানকার। আমরা গোঁড়ামী চাই—এমনকি বিসদৃশ রকমের গোঁড়া,

এমনকি যারা সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়ে রাখে অথবা দুহাত উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে থাকে। অস্বাভাবিক হলেও আমরা তাদের চাই। কারণ তারা ত্যাগের আদর্শে আস্থাবান এবং তারাও জাতির সামনে একটা সতর্কবাণীর মত দণ্ডায়মান। যে নারী-সুলভ বিলাসপ্রিয়তার কাজে আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি আজ ভারতবর্ষে প্রবেশ করছে, সর্বশক্তিকে মোক্ষণ করছে এবং সমস্ত জাতটাকে প্রায় ভণ্ড করে তুলেছে, তারই বিরুদ্ধে সতর্কতা। আমাদের অন্ততঃ সামান্য কৃচ্ছ্রসাধন চাই। ত্যাগ সেকালের ভারতকে জয় করেছিল। এখনও আবার জয় করতে হবে। ত্যাগ আজকেও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুমহান আদর্শ বুদ্ধের দেশ, রামানুজের দেশ, রামকৃষ্ণ পরমহংসের দেশ, ত্যাগের আদর্শের দেশ এই ভারতবর্ষ। এদেশেই প্রাচীন যুগে কর্মকাণ্ডের বিরোধী কথা প্রচার করা হয়েছিল। আজও এদেশে শত শত মানুষ সব কিছু পরিত্যাগ করে জীবন্মুক্ত হচ্ছে। সেই দেশ কি কখনও এই আদর্শকে পরিত্যাগ করতে পারে?

আমাদের সব মতাবলম্বীদের কাছেই গ্রাহ্য আর একই আদর্শের কথা তোমাদের বলবো। এই বিষয়টিও বিশাল। ধর্মকে যে উপলব্ধি করতে হয়—এটা ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।—"অধিক বাক্য দ্বারা, কিংবা ধীশক্তি দ্বারা অথবা প্রভূত ধর্মশাস্ত্র পাঠ দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না।" আমাদেরই একমাত্র শাস্ত্র যা ঘোষণা করছে যে শাস্ত্র পাঠেও আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না—বাক্য দিয়েও না, বক্তৃতা দিয়েও না। আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। গুরুর কাছ থেকে শিষ্যে—এই জ্ঞান সমাগত হয়। শিষ্যের যখন সেই অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হয় তখন সব কিছুই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তারপরেই আসে উপলব্ধি।

আর একটা কথা। বাংলাদেশে আর একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে যাকে বলে কুল-গুরু অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে গুরুগিরি। আমার পিতা তোমার গুরু ছিলেন, অতএব এখন আমি তোমার গুরু হবো। আমার পিতা তোমার পিতৃদেবের গুরু ছিলেন সুতরাং আমি তোমার গুরু। গুরু কাকে বলা হয়? দেখা যাক্ শ্রুতিতে কি বলে—তিনিই গুরু, যিনি বেদের রহস্য জ্ঞাত হয়েছেন। যিনি অনেক বই পড়েছেন, তিনি নন; বৈয়াকরণরাও নন, যিনি সাধারণভাবে পণ্ডিত তিনিও নন; শুধুমাত্র তিনি যাঁর বেদের অর্থ উপলব্ধি হয়েছে। যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্যবেত্তা ন তু চন্দনস্য।—"চন্দন কাঠের বোঝা বহন করে গর্দভ তার ওজনটাই শুধু বুঝতে পারে, তার দুর্মূল্য গুণগুলি নয়।" পণ্ডিতরাও তাই। এরকম পণ্ডিত আমরা চাই না। এই কলকাতা সহরে আমি যখন বালক ছিলাম, আমি ধর্মের সন্ধানে এখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়াতাম, সব জায়গাতেই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে শুনে আমি বক্তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?' ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার কথা শুনে ভদ্রলোকরা হতবাক হতেন। একটিমাত্র মানুষ যিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, দেখেছি," তিনি হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। কেবল তাই নয়, তিনি আমাকে বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে দেখতে পাবার পথেও আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।" শাস্ত্রের রচনায় যারা

হেরফের করে, তার ওপর জবরদস্তি করে, তারা গুরু নয়। বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্, বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে। —"নানাভাবে বাক্যজাল সৃষ্টি, শাস্ত্রের কথাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা—এসবে পণ্ডিতের চিত্তবিনোদন হয়, কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না।" শ্রোত্রিক, অর্থাৎ যিনি শ্রুতির রহস্যে পরিজ্ঞাত, অবৃজিন—যিনি নিষ্পাপ, অকাম হত—আকাঙ্ক্ষা যাকে বিদ্ধ করেনি, যিনি শিক্ষাদানের পরিবর্তে অর্থকামনা করেন না—তিনিই শান্ত, তিনিই সাধু। তিনি নিষ্কামভাবে বসন্তের মত এসে বৃক্ষরাজীকে পত্রপুষ্পে প্রস্ফুটিত করেন,—কারণ তাঁর স্বভাবই হলো মঙ্গল সাধন করা। মঙ্গল সাধন করাই মঙ্গল। গুরুও ঠিক এই রকম, তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ। —"যিনি এই ভয়াবহ জীবন-সমুদ্র অতিক্রম করেছেন এবং কোন লাভালাভের কথা চিন্তা না করে অপরকে এই জীবন-সমুদ্র পার হতে সাহায্য করতে উদ্যত"—তিনিই গুরু। এবং মনে রেখো আর কারুই গুরু হবার অধিকার নেই। কারণ,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

—"নিজেরা তমসাচ্ছন্ন তথাপি আত্মগরিমায় নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করে এই মূর্খরা অপরকে সাহায্য করতে উদ্যত হয়। বাঁকাচোরা পথে কেবলই পাক খেতে খেতে সামনে পেছনে পদস্খলন হয় এদের। একটি অন্ধ আর একটি অন্ধকে পথ দেখালে যেমন হয়—দুজনেরই গভীর গর্তে পতন হয়।" এই হলো বেদের কথা। এর সঙ্গে তোমাদের সামাজিক প্রথাটির তুলনা করো। হ্যাঁ, আমি তোমাদের আরও গোঁড়া করে তুলতে চাই। যত বেশী গোঁড়া হবে, ততই বেশী বুদ্ধিমান হবে; আর যতই বেশী আধুনিক গোঁড়ামীর কথা ভাববে, ততই বেশী বোকা হবে। পুরনো দিনের নিষ্ঠায় ফিরে যাও। সেযুগে এই গ্রন্থ থেকে উঠে আসা প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি স্পন্দন, এসেছিল একটি সবল ধীর এবং অকপট হৃদয় থেকে। তার প্রতিটি সুরই সত্য। তারপর থেকেই শুরু হলো অবনতি—শিল্পে, বিজ্ঞানে, ধর্মে, সর্বক্ষেত্রে, একটা জাতীয় অবনতি, তার কারণ আলোচনা করার মত সময় নেই এখন। কিন্তু সেই যুগ সম্বন্ধে যত বই লেখা হয়েছে, তাতে পাওয়া যায় মহামারীর পূতিগন্ধ—জাতির অবক্ষয়, ফিরে যাও, ফিরে যাও সেই যুগে যখন ক্ষমতা ছিল, ছিল প্রাণশক্তি। আর একবার বীর্যবান হও, প্রাচীন প্রস্রবণ থেকে গভীরভাবে পান করো—কারণ সেটাই হলো ভারতের একমাত্র সত্য অবস্থান।

অদ্বৈতবাদীদের মতে ব্যক্তি-সত্তা একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। সমস্ত পৃথিবীতেই এ বিষয়ে প্রত্যয় আনা খুবই দুরূহ হয়েছে। কোন মানুষকে তার ব্যক্তিসত্তা নেই এ কথা বললেই সে এমনই ভয় পেয়ে ওঠে, যে তার ব্যক্তিত্ব—সেটা যে বস্তুই হোক না কেন—তখনই লোপ পায়। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে ব্যক্তি-সত্তা বলে কখনই কিছু নেই। কারণ তুমি ত' প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল; যখন শিশু ছিলে তখন একরকম করে ভাবতে, এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছো, অন্যরকম করে ভাবছো আবার যখন বার্ধক্য আসবে তখন আরেক রকম করে ভাববে। প্রত্যেকেরই পরিবর্তন ঘটছে,

তাই যদি হয় তাহলে তোমার ব্যক্তি-সত্তাটি কোথায়? নিশ্চয়ই তোমার দেহে নয়, মনেও নয় অথবা চিন্তাতেও নয়। এবং এর বাইরে যা আছে সে হলো তোমার আত্মা এবং অদ্বৈতবাদী বলছেন যে আত্মাই ব্রহ্ম। দুইটি অনন্ত সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তিই আছেন এবং তিনি অসীম। আমরা যুক্তিতে বিশ্বাসী মানুষ, আমরা যুক্তি চাই। যুক্তি কি? মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে শ্রেণীবদ্ধ বিভাগ। কিন্তু যার পর আর অগ্রসর হওয়া চলে না। যা সীমিত তা অসীমের শ্রেণীভুক্ত হলেই মুক্তি পায়। যে কোন সীমিত পদার্থকে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত অসীমে গিয়েই পৌঁছতেই হবে এবং অদ্বৈতবাদীরা বলেন শুধুমাত্র এই অসীমই বিদ্যমান। আর সবই মায়া। আর কিছুরই সত্যিকারের সত্তা নেই। পার্থিব বস্তুর মধ্যেও ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব। আমরাও ব্রহ্ম, আকৃতি, গঠন বা আর সবকিছুই হলো মায়া। আমাদের আকৃতি আর গঠনটি সরিয়ে নিলেই আমরা সবাই এক হয়ে যাই। সাধারণ-ভাবে লোকে বলবে, "আমি যদি ব্রহ্ম হই, আমি তাহলে এটা করতে পারি না কেন? ওটা করতে পারি না কেন?" এখানে শব্দটি কিন্তু অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে মুহূর্তে তুমি তোমাকে বদ্ধ জীব বলে মনে করবে, তুমি আর তোমার সত্তা নও, ব্রহ্ম নও,—কারণ ব্রহ্মের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁর সমস্ত আলোক অন্তর্গামী। তাঁর সমস্ত সুখ আর আনন্দ অন্তর্জগতে। সম্পূর্ণভাবে আত্মপরিতৃপ্ত, তিনি নিষ্কাম, আকাঙ্ক্ষা-বর্জিত, ভয়হীন, তিনি সদামুক্ত। ইনিই ব্রহ্ম। এঁর অন্তরে আমরা সবাই এক।

দেখা যাচ্ছে যে এখানেই দ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদীদের সবচাইতে বেশী মতভেদ। শঙ্করাচার্যের মত মহান ভাষ্যকারের সব ব্যাখ্যা আমার কাছে সব সময়ে যথাযথ বলে মনে হয় না। অনেক সময় রামানুজও শাস্ত্রবাক্যকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা স্বচ্ছ নয়। এখন পণ্ডিত মহলের ধারণা যে একমতাবলম্বীদের কথা যদি সত্য হয়—অন্য-সকলের কথা তাহলে নিশ্চয়ই সত্য হতে পারে না, এবং একমতাবলম্বীদের কথাই শুধু সত্য হতে পারে। অথচ শ্রুতির কথা—যে কথা বিশ্বের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ নিবেদন,—তাঁরা সবাই জানেন, একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। —"যা কিছু বিদ্যমান তা একই; ধার্মিকরা তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকেন।' এইটাই একমাত্র বাক্য—এই বাক্যকে কার্যকরী করে তোলা আজকে জাতির জীবন-সমস্যা। কিন্তু কয়েকজন মাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি, মানে, ভারতের কয়েকজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছাড়া আমরা সবাই এই কথাটা ভুলে যাই। আমরা এই বিরাট চিন্তাটা ভুলে যাই। তোমরা দেখবে একশোজনের ভেতর আটানব্বইজন পণ্ডিতই মনে করেন যে হয় অদ্বৈতবাদীরা সত্য, না হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা সত্য, আর না হইলে দ্বৈতবাদীরা সত্য। বারাণসীর কোন ঘাটে গিয়ে পাঁচমিনিট বসলেই আমার কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবে। এই সব মত আর পথ নিয়ে সেখানে রীতিমত ষাঁড়ের লড়াই দেখতে পাবে।

এইরকমই চলছিল। তখন আবির্ভাব হলো এক মহাপুরুষের যাঁর জীবনই ছিল যেন একটা ব্যাখ্যা। তাঁর জীবনেই এই বিভিন্ন মত-পথের এক সমন্বয় প্রাণবন্ত হয়ে

ফুটে উঠেছিল। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস। উভয় মতের প্রয়োজনীয়তাই তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মত দুটি যেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভূকেন্দ্রিক ও সূর্যকেন্দ্রিক মতের ন্যায়। বালককে যখন প্রথম জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, যেন তাকে প্রথমে ভূকেন্দ্রিক মতটি ও সেই সংক্রান্ত তত্ত্বাদি শেখানো হয়। কিন্তু যখন সে জ্যোতির্বিদ্যার সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, তখন সূর্যকেন্দ্রিক মত শিক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং সে জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্বগুলি আগের চেয়ে ভালভাবে বুঝতে পারে। দ্বৈতবাদ পঞ্চ ইন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবনের স্বাভাবিক ধারণা; যত দিন আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ থাকব, ততদিন আমরা এমন ঈশ্বর দর্শন করব, যিনি সগুণ—সগুণ ব্যতীত অন্য কিছু নন আর জগৎকে ঠিক এইরূপেই দেখব। রামানুজ বলেন, যতদিন তুমি নিজেকে দেহ, মন বা জীব বলে জ্ঞান করছ, ততদিন তোমার ধারণায় শুধু তিনটি বিষয়ই থাকবে—জীব, জগৎ ও উভয়ের কারণস্বরূপ বস্তুবিশেষ।' কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন দেহবোধ একবারে লোপ পেয়ে যায়, মন পর্যন্ত যেখানে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে প্রায় অন্তর্হিত হয় এবং যে সব বস্তু আমাদের ভীতি উৎপাদন করে, আমাদের দুর্বল করে এবং এই দেহে আবদ্ধ করে রাখে, সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন,—একমাত্র তখনই মানুষ সেই প্রাচীন মহান উপদেশের সত্য বুঝতে পারে। সেই উপদেশটি কি?

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

'যাঁদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁরা এই জীবনেই জীবন-মৃত্যুর চক্রকে জয় করেছেন। ব্রহ্ম পবিত্র ও সর্বত্র সম, তাই তাঁরা ব্রহ্মে অবস্থিত।'

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

'ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সেজন্য পরম গতি প্রাপ্ত হন।'

আলমোড়ায় স্বাগত সম্ভাষণ ও প্রত্যুত্তর

[স্বামীজীকে আলমোড়ার নাগরিকরা হিন্দীতে যে স্বাগত সম্ভাষণ জানায় তার অনুবাদ]

হে মহাত্মন্,

যতবধি আমরা শুনিয়াছি যে পশ্চিমে আধ্যাত্মিক বিজয় লাভ করিয়া আপনি ইংলণ্ড হইতে আপনার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই আমরা স্বভাবতই আপনার দর্শন-সুখ লাভের অভিলাষী হইয়াছি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণায় সেই পুণ্য মুহূর্তটি আজ সমাগত। ভক্ত-কুল-চূড়ামণি, মহাকবি তুলসীদাসের বাক্য, "যে যাহাকে একনিষ্ঠভাবে ভালবাসে তাহাকে লাভ করে", আজ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আপনাকে আন্তরিকতার সহিত সভক্তি স্বাগত জানাইবার জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। আপনি নানা অসুবিধা সহ্য করিয়াও কৃপাবশে পুনরায় এই শহরে আগমন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধিয়াছেন। আপনার এই করুণার জন্য ধন্যবাদ জানাইবার ভাষা আমাদের নাই। আপনি ধন্য! ধন্য সেই পূজ্যপাদ গুরুদেব যিনি আপনাকে যোগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ধন্য এই ভারতভূমি, যেখানে এই ভয়াবহ কলিযুগেও আপনার ন্যায় আর্যনেতা আজও অবস্থান করিতেছেন। এমনকি আপনার প্রথম জীবনেও আপনি আপনার সরলতা, আন্তরিকতা, চরিত্র, দাক্ষিণ্য, দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধন, আচরণ এবং জ্ঞানের প্রচার দ্বারা পৃথিবীব্যাপী নিষ্কলুষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা আমাদেরই গৌরব।

সত্যই, শঙ্করাচার্যের পর এদেশে আর কেহই এই প্রকার দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা কি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের এক বংশধর, তাঁর তপশ্চর্যার বলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার জ্ঞানীগুণীদের সম্মুখে সর্বধর্মের উপরে ভারতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবেন? চিকাগোর ধর্মসভায়, সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের প্রতিনিধিদের সম্মুখে আপনি এমন দক্ষতার সহিত ভারতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ হইয়াছিল। সেই মহতী সভায় পণ্ডিতপ্রবর বক্তারা স্ব স্ব ধর্মের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি তাঁহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। আপনি প্রশ্নাতীত ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈদিক ধর্মের সহিত কোন প্রতিযোগিতাই সম্ভব নহে। কেবল তাহাই নহে। উক্ত দুই ভূখণ্ডে আপনার এই প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানের প্রচারের দ্বারা আপনি তদ্দেশীয় বহু পণ্ডিতকে প্রাচীন আর্যধর্ম এবং দর্শনে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও আপনি ভারতীয় পতাকা এমন ভাবে প্রথিত করিয়াছেন যে তাহাকে উৎপাটিত করা সুদূরপরাহত।

এ পর্যন্ত আমাদের ধর্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপ আমেরিকার আধুনিক সভ্যজাতিরা সম্পূর্ণভাবে অপরিজ্ঞাত ছিল। আপনি এতদ্দেশীয় জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা তাহাদের চক্ষুর উন্মেষ করিয়াছেন। তাই একদা অজ্ঞানতাহেতু তাহারা যে ধর্মকে "দাম্ভিকের সূক্ষ্ম তর্কজাল অথবা মূর্খদের জন্য রচিত ঝুড়ি ঝুড়ি বক্তৃতা" বলিয়া অভিহিত

করিত সেইখানেই রত্নধ্বনি দেখিতে পাইয়াছে। বস্তুতঃ, "একশত মূর্খ সন্তানের চাইতে একজন ধর্মনিষ্ঠ ও গুণান্বিত সন্তানই কাম্য।" "সমস্ত তারকা একত্র হইয়াও যে তমসাকে দূরীভূত করিতে পারে না, এক চন্দ্রই তাহা পারে।" পৃথিবীতে আপনার ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ ও মহৎ প্রাণই একমাত্র মূল্যবান বস্তু। আপনার মত সাধুসন্তানরাই—ক্ষয়িষ্ণু ভারতমাতার সান্ত্বনা। কত মানুষ সাগর পার হইয়া উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আপনি আপনার পূর্ব সুকর্মের ফলে সাগরের পরপারে আমাদের ধর্মের মহত্ত্ব সুপ্রমাণ করিয়াছেন। বাক্য, চিন্তা এবং কর্মদ্বারা মনুষ্যজাতিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়াই আপনি আপনার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আপনি সর্বদাই ধর্ম শিক্ষা দিতে প্রস্তুত।

আমরা সানন্দে অবগত হইয়াছি যে আপনি এই স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। আমরা আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনার এই উত্তম সফল হউক। হিন্দু জাতিকে সংরক্ষণ করিবার জন্য মহান শঙ্করাচার্য, তাঁহার ধর্মবিজয়সম্পন্ন করিয়া হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেইরূপ আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইলে ভারতবর্ষের প্রভূত উপকার হইবে। এইস্থানে মঠের প্রতিষ্ঠা হইলে, আমরা কুমায়ুনবাসীরা বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক সুযোগ লাভ করিব। আমাদের মধ্য হইতে প্রাচীন ধর্মটি আর অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।

স্মৃতির অতীতকাল হইতে ভারতের এই অংশটি কৃচ্ছ্র সাধনের দেশ। ভারতীয় ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা এই স্থানে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ও ধর্মপ্রেমে মাতিয়া কাল অতিবাহন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বিগতদিনের কাহিনী। আমাদের একান্ত আশা যে আপনি এখানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের আর একবার তাহা উপলব্ধি করিতে দিন। সত্যধর্ম, কর্ম, নিয়মানুবর্তিতা এবং সদাচারের জন্য এই পুণ্যভূমি একদা সর্বভারতে প্রখ্যাত ছিল। কিন্তু সে সবই যেন কালহরণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষয়প্রাপ্ত। আমাদের আশা যে আপনার সুমহান প্রয়াসের ফলে এই দেশ তার ধর্ম স্থানে পুনরুত্থিত হবে।

আপনার আগমনে আমরা যে আনন্দ অনুভব করিয়াছি তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। পূর্ণস্বাস্থ্যসহ আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নরহিত ব্রতে জীবন অতিবাহন করুন। আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমবর্ধমান হউক, আপনার প্রয়াস ফলে ভারতের দুর্দিন অন্তর্হিত হউক।

স্বামীজীর প্রত্যুত্তর

এ আমার পূর্বপুরুষের স্বপ্নের দেশ; এখানেই জন্ম নিয়েছিলেন ভারতমাতা পার্বতী। এই সেই পবিত্রভূমি যেখানে ভারতের প্রতিটি আগ্রহী মানুষ তার জীবন সন্ধ্যাটি কাটাতে চায় এবং মর জন্মের শেষ অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি করতে চায়। এই দেবধন্য ভূমিখণ্ডের পর্বত শিখরে, গুহার অভ্যন্তরে, এই স্রোতস্বিনীর তীরে তীরে সৃষ্ট হয়েছিল চমকপ্রদ সব চিন্তারাশি। সে চিন্তার ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র বিদেশীদেরও

অভিভূত করেছিল। পৃথিবীর সক্ষমতম বিচারকরাও একে অতুলনীয় চিন্তা বলে মনে করেছেন। এ সেই ভূখণ্ড যেখানে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখেছি শিশুকাল থেকে; এবং একথা তোমরা সবাই জানো যে এখানে বাস করবার জন্য বার বার প্রয়াস করেছি। যদি এখনও ঠিক সময়টি আসেনি, কর্মরত থাকতে হয়েছে আমাকে, এই পবিত্র ভূমি থেকে দূরে সঞ্চালিত হয়েছি তবুও আমার জীবনের আশা যে ঋষিদের লীলাক্ষেত্র এবং দর্শনের জন্মভূমি এই পর্বত-পিতার কোন স্থানে আমার শেষ জীবনটি অতিবাহিত করবো। বন্ধুগণ! আমার সেই পূর্ব পরিকল্পনা মত হয়ত আমি তা পারবো না। আহা! এই স্তব্ধতা—এই অজ্ঞাতবাস যদি সম্ভব হতো! তবু আমার আন্তরিক প্রার্থনা এবং আশা, বিশ্বাসও বলা যায় যে পৃথিবীর অন্য কোথাও না হয়ে আমার শেষের দিনগুলি এখানেই কাটবে।

এই পুণ্যভূমির অধিবাসিগণ, পশ্চিম দেশে আমার সামান্য কর্মের জন্য তোমাদের মুখ থেকে যে প্রশংসাবাণী নিঃসৃত হয়েছে তার জন্য তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো। কিন্তু সেই সঙ্গেই বলছি আজ আমার মন পূর্ব বা পশ্চিম দেশের বিষয়ে কোন কথাই বলতে অপারগ। গিরিরাজের একটির পর একটি শৃঙ্গ যখনই আমার চোখের সামনে দেখা দিতে লাগল ততই আমার কর্মস্পৃহা, আমার বহুকালের মস্তিষ্কের উত্তেজনা মনে হলো স্তিমিত হয়ে গেলো। কি করা হয়েছে, কি করা হবে এসব কথার চাইতে মনটা ফিরে গেল এক চিরন্তন চিন্তায়। যে চিরন্তন চিন্তা হিমালয় আমাদের সতত শেখায়; যে চিন্তা এখানকার আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সে চিন্তার মর্মরধ্বনি আমি শুনতে পাই স্রোতস্বিনীদের জল প্রবাহে—সেই চিরন্তন চিন্তা—বৈরাগ্য। সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্—"এই জীবনের সব কিছুই ভীতিসঙ্কুল; একমাত্র বৈরাগ্যই মানুষকে নির্ভয় করে।" সত্যিই এটা বৈরাগ্যের ভূমি।

বিশদভাবে বলবার মত সময়ও আমার আজ নেই; পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অনুকূল নয়। তাই বক্তব্য শেষ করবার আগে তোমাদের শুধু একটা কথাই বলবো, হিমালয় বৈরাগ্যের প্রতিভূ। মানব জাতিকে আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হলো বৈরাগ্য। আমাদের পিতৃপুরুষরা জীবন সায়াহ্নে হিমালয়ের আকর্ষণ অনুভব করতেন। তেমনি, অনাগত কোন কালে, পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে সবল আত্মার মানুষরা গিরিরাজের আকর্ষণ অনুভব করবে। যেদিন বিভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরোধ, মতবাদের দ্বন্দ্ব বিস্মৃতির জগতে চলে যাবে, তোমার আমার ধর্মের লড়াই চিরতরে অপসারিত হবে, মানবজাতি যেদিন বুঝবে যে ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধি করাই একমাত্র চিরন্তন ধর্ম আর সবই বুদ্‌বুদ্—সেইদিন সব আগ্রহশীল মানুষরাই এখানে আসবে। সেদিন তারা বুঝবে যে এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর অসারত্ব; বুঝবে প্রভু এবং তার উপাসনা ছাড়া আর সব কিছুই তাৎপর্যহীন।

বন্ধুগণ, তোমরা দয়া করে আমার মঠ স্থাপনের পরিকল্পটির বিষয় উল্লেখ করেছো। আমি বোধহয় তোমাদের কাছে বিস্তারিতভাবে তার কারণ ব্যাখ্যা করেছি। সার্বিকধর্মের মহৎ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে সব স্থানের চাইতে কেন এই স্থানটিকে

নির্বাচিত করেছি। এই পর্বতমালার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমাদের জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতি। ধর্মীয় ভারতের ইতিহাস থেকে এই হিমালয়কে সরিয়ে নিয়ে গেলে যেটুকু পড়ে থাকবে তা খুবই সামান্য। সেই জন্যই এখানে একটি কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—কিন্তু শুধুমাত্র কর্মের জন্য নয়, বরং তার চাইতে বেশী নীরবতার জন্য, ধ্যানের জন্য, শান্তির জন্য। আশা করি একদিন আমার এই আশা ফলবতী হবে। আশা করি তোমাদের সঙ্গে আর একদিন মিলিত হবো এবং সেদিন বিষদভাবে কথা বলবার সুযোগ হবে। আজকের মত তোমরা আমাকে যে সৌজন্যতা দেখিয়েছ সে জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদিও ধরে নিচ্ছি সে সৌজন্যতা আমাকে ব্যক্তি হিসেবে দেখাওনি—দেখিয়েছ আমাদের ধর্মের এক প্রতিনিধিকে। আমরা যেন ধর্মকে কখনও বিস্মৃত না হই। আজ এই মুহূর্তে আমরা যেমন পবিত্র, চিরকাল যেন তেমন পবিত্র থাকি। আধ্যাত্মিকতার এইক্ষণের উৎসাহ যেন চিরকাল থাকে।

REPLY OF WELCOME AT CALCUTTA

[A grand reception was accorded to Swami Vivekanda on his arrival to Calcutta after spending a few years in America and other countries. A public reception was held at the palace of Raja Debkanta Deb Bahadur of Sobha Bazar. Raja Benoykrishna Deb Bahadur was in the chair. An address of welcome was read and given to him. It was published in the Third Volume of this edition. The following is the reply of Swamiji.]

One wants to lose the individual in the universal, one renounces, flies off, and tries to cut himself off from all associations of the body of the past, one works hard to forget even that he is a man ; yet, in the heart of his heart, there is a soft sound, one string vibrating, one whisper, which tells him, East or West, home is best. Citizens of the capital of this Empire, before you I stand, not as a Sannyasin, no, not even as a preacher, but I come before you the same Calcutta boy to talk to you as I used to do. Ay, I would like to sit in the dust of the streets of this city, and, with the freedom of childhood, open my mind to you, my brothers. Accept, therefore my heartfelt thanks for this unique word that you have used, "Brother". Yes, I am your brother, and you are my brothers. I was asked by an English friend on the eve of my departure, "Swami, how do you like now your motherland after four years' experience of the luxurious, glorious, powerful west ?" I could only answer, "India I loved before I came away. Now the very dust of India has become holy to me, the very air is now to me holy ; it is now the holy land, the place of pilgrimage, the Tirtha." Citizens of Calcutta—my brothers —I cannot express my gratitude to you for the kindness you have shown, or rather I should not thank you at all, for you are my brothers, you have done only a brother's duty, ay, only a Hindu brother's duty ; for such family ties, such relationships, such love exist nowhere beyond the bounds of this motherland of ours.

The Parliament of Religions was a great affair, no doubt. From various cities of this land, we have thanked the gentlemen who organised the meeting, and they deserved all our thanks for the kindness that has been shown to us ; but yet allow me to construe

for you the history of the Parliament of Religions. They wanted a horse, and they wanted to ride it. There were people there who wanted to make it a heathen show, but it was ordained otherwise; it could not help being so. Most of them were kind, but we have thanked them enough.

On the other hand, my mission in America was not to the Parliament of Religions. That was only something by the way, it was only an opening, an opportunity, and for that we are very thankful to the members of the Parliament; but really, our thanks are due to the great people of the United States, the American nation, the warmhearted, hospitable, great nation of America, where more than anywhere else the feeling of brotherhood has been doveloped. An American meets you five minutes on board a train, and you are his friend, and the next moment he invites you as a guest to his home and opens the secret of his whole living there. That is the character of the American race, and we highly appreciate it. Their kindness to me is past all narration, it would take me years yet to tell you how I have been treated by them most kindly and most wonderfully. So are our thanks due to the other nation on the other side of the Atlantic. No one ever landed on English soil with more hatred in his heart for a race than I did for the English, and on this platform are present English friends who can bear witness to the fact; but the more I lived among them and saw how the machine was working—the English national life—and mixed with them, I found where the heartbeat of the nation was, and the more I loved them. There is none among you here present, my brothers, who loves the English people more than I do now. You have to see what is going on there, and you have to mix with them. As the philosophy, our national philosophy of the Vedanta, has summarised all misfortune, all misery, as coming from that one cause, ignorance, herein also we must understand that the difficulties that arise between us and the English people are mostly due to that ignorance; we do not know them, they do not know us.

Unfortunately, to the western mind, spirituality, nay, even morality, is eternally connected with worldly prosperity; and as soon as an Englishman or any other western man lands on our soil and finds a land of poverty and of misery, he forthwith concludes that there cannot be any religion here, there cannot be any morality even. His own experience is true. In Europe, owing to the inclemency

of the climate and many other circumstances, poverty and sin go together, but not so in India. In India, on the other hand, my experience is that the poorer the man the better he is in point of morality. Now this takes time to understand, and how any foreign people are there who will stop to understand this, the very secret of national existence in India? Few are there who will have the patience to study the nation and understand. Here, and here alone, is the only race where poverty does not mean crime, poverty does not mean sin; and here is the only race where not only poverty does not mean crime, but poverty has been defined, and the beggar's garb is the garb of the highest in the land. On the other hand, we have also similarly, patiently to study the social institutions of the West and not rush into mad judgements about them. Their intermingling of the sexes, their different customs, their manners, have all their meaning, have all their grand sides, if you have the patience to study them. Not that I mean that we are going to borrow their manners and customs, not that they are going to borrow ours, for the manners and customs of each race are the outcome of centuries of patient growth in that race, and each one has a deep meaning behind it; and, therefore, neither are they to ridicule our manners and customs, nor we theirs.

Again, I want to make another statement before this assembly. My work in England has been more satisfactory to me than my work in America. The bold, brave, and steady Englishman, if I may use the expression, with his skull a little thicker than those of other people -if he has once an idea put into his brain, it never comes out; and the immence practicality and energy of the race makes it sprout up and immediately bear fruit It is not so in any other country. That immense practicality, that immense vitality of the race, you do not see anywhere else. There is less of imagination, but more of work, and who knows the well spring, the mainspring of the English heart? How much of imagination and of feeling is there! They are a nation of heroes, they are they true Kshatriyas; their education is to hide their feelings and never to show them From their childhood they have been educated up to that. Seldom will you find an Englishman manifesting feeling, nay, even an Englishwoman. have seen Englishwomen go to work and do deeds which

would stagger the bravest of Bengal is to follow. But with all this heroic superstructure, behind this covering of the fighter, there is a deep spring of feeling in the English heart. If you once know how to reach it, if you get there, if you have personal contact and mix with him, he will open his heart, he is your friend for ever, he is your servant. Therefore in my opinion, my work in England has been more satisfactory than anywhere else. I firmly believe that if I should die tomorrow the work in England would not die, but would go on expanding all the time.

Brothers, you have touched another chord in my heart, the deepest of all, and that is the mention of my teacher, my master, my hero, my ideal, my God in life—Shri Ramakrishna Paramahamsa. If there has been anything achieved by me, by thoughts, or words, or deeds, if from my lips has ever fallen one word that has helped any one in the world, I lay no claim to it, it was his. But if there have been curses falling from my lips, if there has been hatred coming out of me, it is all mine and not his. All that has been weak has been mine, and all that has been life-giving, strengthening, pure, and holy, has been his inspiration, his words, and he himself. Yes, my friends, the world has yet to know that man. We read in the history of the world about prophets and their lives, and these come down to us through centuries of writings and workings by their disciples. Through thousands of years of chiselling and modelling, the lives of the great prophets of yore come down to us ; and yet, in my opinion not one stands so high in brilliance as that life which I saw with my own eyes, under whose shadow I have lived, at whose feet I have learnt everything—the life of Ramakrishna Paramahamsa. Ay, friends, you all know the celebrated saying of the Gita :

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"Whenever, O descendant of Bharata,there is decline of Dharma, and rise of Adharma, then I body Myself forth. For the protection of the good, for the destruction of the wicked, and for the establishment of Dharma I come into being in every age."

Along with it you have to understand one thing more. Such a thing is before us today. Before one of these tidal waves of

spirituality comes, there are whirlpools of lesser manifestation all over society. One of these comes up, at first unknown, unperceived and unthought of, assuming proportion, swallowing, as it were, and assimilating all the other little whirlpools, becoming immense, becoming a tidal wave, and falling upon society with a power which none can resist. Such is happening before us. If you have eyes, you will see it. If your heart is open, you will receive it. If you are truth-seekers, you will find it. Blind, blind indeed is the man who does not see the signs of the day! Ay, this boy born of poor Brahmin parents in an out-of-the-way village of which very few of you, have even heard, is literally being worshipped in lands which have been fulminating against heathen worship for centuries. Whose power is it? Is it mine or yours? It is none else than the power which was manifested here as Ramakrishna Paramahamsa. For, you and I, and sages and prophets, nay, even Incarnations, the whole universe, are but manifestations of power more or less individualised more or less concentrated. Here has been a manifestation of an immense power, just the very beginning of whose workings we are seeing, and before this generation passes away, you will see more wonderful workings of that power. It has come just in time for the regeneration of India, for we forget from time to time the vital power that must always work in India.

Each nation has its own peculiar method of work. Some work through politics, some through social reforms, some through other lines. With us, religion is the only ground along which we can move. The Englishman can understand even religion through politics. Perhaps the American can understand even religion through social reforms. But the Hindu can understand even politics when it is given through religion; sociology must come through religion, everything must come through religion. For that is the theme, the rest are the variations in the national life-music. And that was in danger. It seemed that we were going to change this theme in our national life, that we were going to exchange the backbone of our existence, as it were, that we were trying to replace a spiritual by a political backbone. And if we could have succeeded, the result would have been annihilation. But it was not to be. So this power became manifest. I do not care in what light you understand this great sage, it matters not how much respect you pay to him, but I challenge you face to face with the fact that here is a manifestation

of the most marvellous power that has been for several centuries in India, and it is your duty, as Hindus, to study this power, to find what has been done for the regeneration, for the good of India, and for the good of the whole human race through it. Ay, long before ideas of universal religion and brotherly feeling between different sects were mooted and discussed in any country in the world, here, in sight of this city, had been living a man whose whole life was a parliament of religions as it should be.

The highest ideal in our scriptures is the impersonal, and would to God everyone of us here were high enough to realise that impersonal ideal; but, as that cannot be, it is absolutely necessary for the vast majority of human beings to have a personal ideal; and no nation can rise, can become great, can work at all, without enthusiastically coming under the banner of one of these great ideals in life. Political ideals, personages representing political ideals, even social ideals, commercial ideals, would have no power in India. We want spiritual ideals before us, we want enthusiastically to gather round grand spiritual names. Our heroes must be spirtual. Such a hero has been given to us in the person of Ramakrishna Paramahamsa. If this nation wants to rise, take my word for it, it will have to rally enthusiastically round this name. It does not matter who preaches Ramakrishna Paramahamsa, whether I, or you, or anybody else. But him I place before you, and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now, what you shall do with this great ideal of life. One thing we are to remember that it was the purest of all lives that you have ever seen, or let me tell you distinctly, that you have ever read of. And before you is the fact that it is the most marvellous manifestation of soul power that you can read of, much less expect to see. Within ten years of his passing away, this power has encircled the globe; that fact is before you. In duty bound, therefore, for the good of our race, for the good of our religion, I place this great spiritual ideal before you. Judge him not through me. I am only a weak instrument. Let not his character be judged by seeing me. It was so great that if I or any other of his disciples spent hundreds of lives, we could not do justice to a millionth part of what he really was. Judge for yourselves; in the heart of your hearts is the Eternal Witness, and may He, the same Ramakrishna Paramahamsa, for the good of our nation, for the welfare of our country, and for the

good of humanity, open your hearts, make you true and steady to work for the immense change which must come, whether we exert ourselves or not. For the work of the Lord does not wait for the like of you or me. He can raise His workers from the dust by hundreds and by thousands. It is a glory and a privilege that we are allowed to work at all under Him.

From this the idea expands. As you have pointed out to me, we have to conquer the world. That we have to ! India must conquer the world, and nothing less than that is my ideal. It may be very big, it may astonish many of you, but it is so. We must conquer the world or die. There is no other alternative. The sign of life is expansion ; we must go out, expand, show life, or degrade, fester, and die. There is no other alternative. Take either of these, either live or die. Now, we all know about the petty jealousies and quarrels that we have in our country. Take my word, it is the same everywhere. The other nations with their political lives have foreign policies. When they find too much quarrelling at home, they look for somebody abroad to quarrel with, and the quarrel at home stops. We have these quarrels without any foreign policy to stop them. This must be our eternal foreign policy, preaching the truths of our Shastras to the nations of the world. I ask you who are politically minded, do you require any other proof that this will unite us as a race ? This very assembly is a sufficient witness.

Secondly, apart from these selfish considerations, there are the unselfish, the noble, the living examples behind us. One of the great causes of India's misery and downfall has been that she narrowed herself, went into her shell as the oyster does, and refused to give her jewels and her treasures to the other races of mankind, refused to give the life-giving truths to thirsting nations outside the Aryan fold. That has been the one great cause, that we did not go out, that we did not compare notes with other nations—that has been the one great cause of our downfall, and every one of you knows that that the little stir, the little life that you see in India, begins from the day when Raja Rammohan Roy broke through the walls of that exclusiveness. Since that day, history in India has taken another turn, and now it is growing with accelerated motion. If we have had little rivulets in the past, deluges are coming, and none can resist them. Therefore we must go out, and the secret of life is

to give and take. Are we to take always, to sit at the feet of the Westerners to learn everything, even religion ? We can learn mechanism from them. We can learn many other things. But we have to teach them something, and that is our religion, that is our spirituality. For a complete civilisation the world is waiting, waiting for the treasures to come out of India, waitingfor the marvellous spiritual inheritance of the race, which through decades of degradation and misery, the nation has still clutched to her breast. The world is waiting for that treasure ; little do you know how much of hunger and of thirst there is outside of India for these wonderful treasures of our forefathers. We talk here, we quarrel with each other, we laugh at and we ridicule everything sacred, till it has become almost a national vice to ridicule everything holy. Little do we understand the heart-pangs of millions waiting outside the walls, stretching forth their hands for a little sip of that nectar which our forefathers have preserved in this land of India. Therefore we must go out, exchange our spirituality for anything they have to give us ; for the marvels of the region of spirit we will exchange the marvels of the region of matter. We will not be students always, but teachers also. There cannot be friendship without equality, and there cannot be equality when one party is always the teacher and other party sits always at his feet. If you want to become equal with the Englishman or the American, you will have to teach as well as to learn, and you have plenty yet to teach to the world for centuries to come. This has to be done. Fire and enthusiasm must be in our blood. We Bengalis have been credited with imagination, and I believe we have it. We have been ridiculed as an imaginative race, as men with a good deal of feeling. Let me tell you, my friends, intellect is great indeed, but it stops within certain bounds. It is through the heart, and the heart alone, that inspiration comes. It is through that feelings that the highest secrets are reached ; and therefore it is the Bengali, he man of feeling, that has to do this work.

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত

Arise, awake and stop not till the desired end is reached. Young men of Calcutta, arise, awake, for the time is propitious. Already everything is opening out before us. Be bold and fear not. It is only in our scriptures that this adjective is given unto the Lord—Abhih, Abhih. We have to become Ahih, fear-

less, and our task will be done. Arise, awake, for your country needs this tremendous sacrifice. It is the young men that will do it. "The young, the energetic, the strong, the well-built, the intellectual"—for them is the task. And we have hundreds and thousands of such young men in Calcutta. If, as you say, I have done something, remember that I was that good-for-nothing boy playing in the streets of Calcutta. If I have done so much, how much more will you do! Arise and awake, the world is calling upon you. In other parts of India, there is intellect, there is money, but enthusiasm is only in my motherland. That must come out; therefore arise, young men of Calcutta, with enthusiasm in your blood. Think not that you are poor, that you have no friends. Ay, who ever saw money make the man? It is man that always makes money. The whole world has been made by the energy of man, by the power of enthusiasm, by the power of faith.

Those of you who have studied that most beautiful of all the Upanishads, the Katha, will remember how the king was going to make a great sacrifice, and, instead of giving away things that were of any worth, he was giving away cows and horses that were not of any use, and the book says that at that time Shraddha entered into the heart of his son Nachiketa. I would not translate this word Shraddha to you, it would be a mistake; it is a wonderful word to understand, and much depends on it; we will see how it works, for immediately we find Nachiketa telling himself, "I am superior to many, I am inferior to few, but nowhere am I the last, I can also do something." And this boldness increased, and the boy wanted to solve the problem which was in his mind, the problem of death. The solution could only be got by going to the house of Death, and the boy went. There he was, brave Nachiketa, waiting at the house of Death for three days, and you know how he obtained what he desired. What he want is this Shraddha. Unfortunately, it has nearly vanished from India, and this is why we are in our present state. What makes the difference between man and man is the difference in this Shraddha and nothing else. What makes one man great and another weak and low is this Shraddha. My Master used to say, he who thinks himself weak will become weak, and that is true. This Shraddha must enter into you. Whatever of material power

you see manifested by the Western races is the outcome of this Shraddha, because they believe in their muscles, and if you believe in your spirit, how much more will it work! Believe in that infinite soul, the infinite power, which, with consensus of opinion, your books and sages preach. That Atman which nothing can destroy, in It is infinite power only waiting to be called out. For here is the great difference between all other philosophies and the Indian philosophy. Whether dualistic, qualified monistic, or monistic, they all firmly believe that everything is in the soul itself; it has only to come out and manifest itself. Therefore, this Shraddha is what I want, and what all of us here want, this faith in ourselves, and before you is the great task to get that faith. Give up the awful disease that is creeping into our national blood, that Idea of ridiculing everything, that loss of seriousness. Give that up. Be strong and have this Shraddha, and everything else is bound to follow.

I have done nothing as yet; you have to do the task. If I die tomorrow the work will not die. I sincerely believe that there will be thousands coming up from the ranks to take up the work and carry it further and further, beyond all my most hopeful imagination ever painted. I have faith in my country, and especially in the youth of my country. The youth of Bengal have the greatest of all tasks that has ever been placed on the shoulders of young men. I have travelled for the last ten years or so over the whole of India, and my conviction is that from the youth of Bengal will come the power which will raise India once more to her proper spiritual place. Ay, from the youth of Bengal, with this immense amount of feeling and enthusiasm in the blood, will come those heroes who will march from one corner of the earth to the other, preaching and teaching the eternal spiritual truths of our forefathers. And this is the great work before you. Therefore, let me conclude by reminding you once more, "Arise, awake and stop not till the desired end is reached." Be not afraid, for all great power, throughout the history of humanity, has been with the people. From out of their ranks have come all the greatest geniuses of the world and history can only repeat itself. Be not afraid of anything. You will do marvellous work. The moment you fear, you are nobody. It is fear that is the great cause of misery in the world. It is fear that is the greatest of

all superstitions. It is fear that is the cause of our woes, and it is fearlessness that brings heaven in a moment. Therefore, "Arise, awake and even stop not till the goal is reached."

Gentlemen, allow me to thank you once more for all the kindness that I have received at your hands. It is my wish—my intense, sincere wish—to be even of the least service to the world, and above all to my own country and countrymen.